রচনাসমগ্র | ১

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

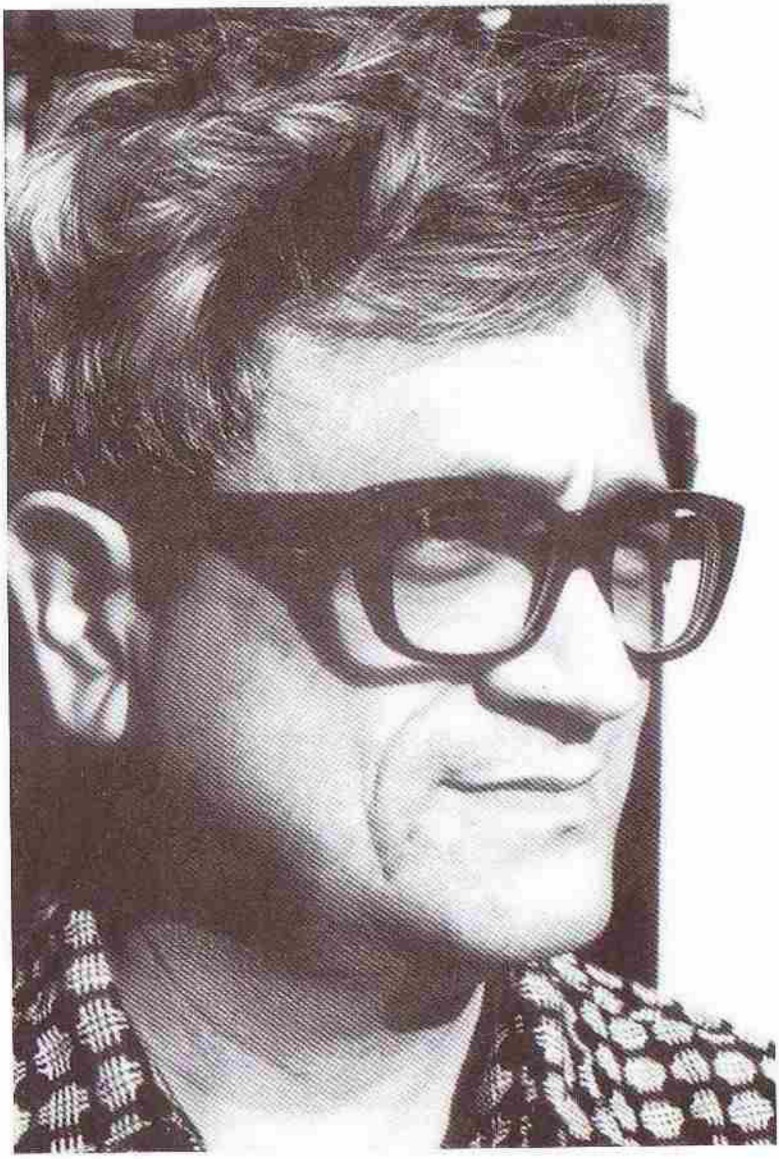

জন্ম : ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩ মৃত্যু : ৪ জানুয়ারি ১৯৯৭

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
রচনাসমগ্র ১

মাওলা ব্রাদার্স ॥ ঢাকা

প্রকাশনার ছয় দশকে
মাওলা ব্রাদার্স

© সুরাইয়া ইলিয়াস
সপ্তম মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০১২
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১৭৫২২৭ ৭১১৯৪৬৩
ই-মেইল : mowlabrothers@gmail.com

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
বাংলাবাজার কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ৩য় তলা
ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
নিউ এস আর প্রিন্টিং প্রেস
১০/১ বি কে দাস রোড ঢাকা ১১০০

দাম
চারশত টাকা মাত্র

ISBN 984 410 134 9

AKHTARUZZAMAN ELIAS RACHANASAMGRA VOL. 1 (A Collection of Short Stories) by Akhtaruzzaman Elias. Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers 39 Banglabazar, Dhaka 1100 Cover Designed by Dhruba Esh. Price : Taka Four Hundred only.

ভূমিকা

বাংলা কথা-সাহিত্যের একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। ৫টি ছোটগল্প গ্রন্থে প্রকাশিত ২৮টি গল্প, ২টি উপন্যাস, ১টি প্রবন্ধ সংকলন এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত কিছু সাক্ষাৎকার—এই তাঁর প্রকাশিত রচনাবলী। একজন সৎ ও অতৃপ্ত লেখক হিসেবে তিনি কখনোই লেখার সংখ্যা বৃদ্ধিতে আগ্রহী হন নি। গুণগত মানের দিকে অপরিতুষ্ট দৃষ্টি রাখলে সংখ্যা বৃদ্ধির সময় বা সুযোগ আর হয় কি করে? আর সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজনটাই বা কি? একজন লেখকের বলার কথা তো খুব বেশি নয়। একই কথা অবশ্য নানাভাবে, নানা ঢঙে বলা যায়, নানা ভঙ্গিতে কথার ওপর কথা চড়িয়ে গড়ে তোলা যায় কথার ফানুস, কিন্তু তারও তো একটা সীমা আছে। এই শূন্যগর্ভ ফানুস গড়তে গিয়ে লেখক প্রকরণের দিকেই মনোযোগী হন বেশি এবং তখন প্রসঙ্গের সঙ্গে প্রকরণের ঘটে বিচ্ছেদ, এবং প্রায় অবধারিতভাবেই প্রসঙ্গ হয় অবহেলিত। তাই বলা চলে প্রতিটি লেখাকেই জীবনের সৎ ও সত্যনিষ্ঠ শিল্পকর্মে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর হলে এবং নেহায়েত বণিকবুদ্ধি দ্বারা তাড়িত না হতে চাইলে একজন লেখকের প্রকাশিত রচনার সংখ্যা খুব বেশি না হওয়াটাই স্বাভাবিক।

পরিচিত অভিজ্ঞতার প্রায় সর্বস্তরে জীবনকে নির্মোহ দৃষ্টিতে একেবারে এর গভীরতম শাঁস পর্যন্ত অশেষ কৌতূহল নিয়ে পর্যবেক্ষণ করে শিল্পকর্মে তা বেপরোয়াভাবে প্রকাশ করার বিরল ক্ষমতা দেখতে পাই আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের লেখায়। প্রকৃতি তাঁকে এই বিশ্ব পর্যবেক্ষণের ও উপলব্ধির সময় বেশিদিন দেয় নি। হয়তো সেজন্যই এই নাজুক ও স্বল্পায়ু সময়ে তিনি মর্মভেদী দৃষ্টিকে শাণিত করে দেখেছেন তাঁর ইন্দ্রিয় ও বোধির চেনা বিশ্বকে। এই দেখা একাধারে নির্মম এবং কৌতুকবহ। নির্মম, কেননা সত্যনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ সব সময়ই নির্মম, এবং কৌতুকপ্রদ কেননা মানুষের অসতর্ক ও দুর্বল মুহূর্ত কি ভঙ্গি কি বেফাঁস বাক্য বা কাজকে তিনি যেমন অবলীলায় প্রকাশ করেন তাতে পাঠক একই সঙ্গে অস্বস্তি, বিব্রত এবং কৌতুক বোধ না করে পারে না। আর এই দুই অনুভূতি উস্কে দেওয়ার শক্তি বড় মাপের লেখকেরই বৈশিষ্ট্য। যে বাস্তবতার আলোয় তিনি

জীবন দর্শন করেন তা কখনোই একেবারে চাঁচাছোলা যান্ত্রিক বাস্তবতা নয়। খড়খড়ে শুষ্ক চোখে ইলিয়াস বিশ্ব দেখেন নি। চোখে কেবলি খরা নিয়ে সম্ভবত খুব বেশি দূর এগোনো কি খুব বড় মাপের শিল্প রচনা করা যায় না। চোখ তাঁর সিক্তই, কিন্তু সেই সজল চোখ বহির্বিশ্ব এবং অন্তর্বিশ্বকে ঝাপসা না করে বরং আলোর দ্যুতিতে উজ্জ্বলতর করেছে এবং তার উজ্জ্বল, স্বচ্ছ দৃষ্টিপথে যা-ই পড়েছে তা জীবন্ত এবং সরস হয়ে উঠেছে। এই যে দ্বিত্ব—সরস নির্মোহ—এর সাক্ষাৎ পাই ইংরেজ কবি চসারের অবলীলা বর্ণনা এবং তাঁর অন্তর্লীন হাস্যরসে।

ইলিয়াসের গল্পের বাস্তবতায় আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো স্বপ্নচারিতা যা ঐন্দ্রজালিক এবং অতিপ্রাকৃত আবহে লালিত। স্বপ্ন, অতিপ্রাকৃত উপাদান তো বস্তুজীবনের তথা বাস্তবতারই অংশ। স্বপ্ন দর্শন মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা। শ্রম যেমন শরীরে স্বেদ নিয়ে আসে, স্বপ্ন তেমনি মানুষের আত্মায় স্বেদ-বিন্দু জাগিয়ে তোলে। স্বপ্নবিহীন মানুষ নিজের কুশপুত্তলিকা ছাড়া আর কী? স্বপ্ন, যাদু, সংস্কার, আপাত অযৌক্তিক বিশ্বাস ইত্যাদি জীবনের বাস্তবতাকে দেয় গভীরতা, দেয় একটি বহুমাত্রিক, বহুস্তর আকার ও অনুভব এবং মুক্ত করে যান্ত্রিক যুক্তিবাদ থেকে। ইলিয়াসের একজন প্রিয় লেখক গার্সিয়া মার্কেস বলেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস না করো তো অন্তত কুসংস্কারে বিশ্বাস করো। একথা তিনি বলেন জীবনকে যান্ত্রিকতা থেকে মুক্ত রেখে সামগ্রিকভাবে যাপন করার জন্য। ইলিয়াস তাঁর গল্পের বিভিন্ন বিচিত্র মানুষের জীবনযাত্রা, তাদের বিশ্বাস, সংস্কার, দুঃখ, শোক, আনন্দ আহ্লাদ, অনুভূতি উপলব্ধি, ভঙ্গি, সংলাপ ইত্যাদি যে স্বচ্ছন্দ অথচ তীর্যক ও কৌতুকবহ ভঙ্গিতে সৃষ্টি করেন তাতে তাঁর লেখা যেমন জীবনের একটি সামগ্রিক, পূর্ণ-বৃত্ত বাস্তবতা তৈরি করে, তেমনি তাতে তাঁর স্বকীয় ধাঁচও প্রতিষ্ঠিত হয়।

জীবনের অস্থিমজ্জা সারাৎসারের অনুসন্ধানে নিয়োজিত থাকতে গিয়ে ইলিয়াস ব্যবহার করেন পর্যাপ্ত ডিটেলস্। কেবল বস্তুজগত কি দৃশ্যজগতের সাদামাটা বিবরণ নয়, মানসিক জীবনের সঙ্গে এই জগতের সম্পর্ক এবং মানুষের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এর সৃষ্ট তরঙ্গও তিনি খুব গভীর মনোযোগে পর্যবেক্ষণ করেন এবং তা বর্ণনা করেন ব্যাপক স্থান ও সময় জুড়ে। প্রকৃতি ও বহির্বিশ্বের সঙ্গে মানুষের দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্কের এই ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার অনুপুঙ্খ বিবরণ তাঁকে সাহায্য করে একটি নৈর্ব্যক্তিক অবস্থান পেতে এবং সেই অবস্থানে থেকে তিনি স্বচ্ছন্দে সৃষ্টি করেন তাঁর গল্পের জগৎ।

সানুপুঙ্খ বিবরণ বা ডিটেলসের প্রতি আকর্ষণ কিন্তু ইলিয়াসকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় না। বরং সচেতন নিমগ্নতা তাঁকে বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে প্ররোচিত করে। এই বিশ্বস্ততা দেখি ইতিহাসের প্রতি, প্রচলিত লোককাহিনী, কিংবদন্তীর প্রতি, মানচিত্রের প্রতি—তা সে মানচিত্র নদীর ভাঙাগড়ারই হোক কি পুরনো ঢাকার অলিগলি শতপথেরই হোক। জয়েস ও মার্কেসের একনিষ্ঠ পাঠক

ইলিয়াস তাঁর কাহিনীতে স্থানের যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেন তাতে একটি শহর, একটি জনগোষ্ঠী, একটি জনপদ অতীতের হাড়গোড়ের স্তূপ থেকে নড়েচড়ে উঠে আসে আরেকবার—এবং এবার একটি অমরণশীল জীবনযাপন করে।

আনুপুঙ্খিক বৃত্তান্তের একটি আশঙ্কা এই যে এতে লেখকের বিবরণ একঘেয়ে এবং ক্লান্তিকর হয়ে পড়তে পারে। কিন্তু বড় লেখক জানেন কখন বিবরণ শেষ করে ঘটনা সৃষ্টি করতে হয়, কিংবা কখন বর্ণনায় ছেদ টেনে কাহিনীর গতিকে এগিয়ে নিতে হয়। ইলিয়াসের এই পরিমিতিবোধ অসাধারণ। বৃত্তান্তকে যেমন তিনি কিছুতেই ক্লান্তিকর পর্যায়ে নিয়ে যান না, তেমনি তাঁর কাছে নিজস্ব বিশ্বাস বা আদর্শ বা নৈতিক প্রসঙ্গের প্রচার কি পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের প্ররোচনা একেবারেই প্রশ্রয় পায় না। তাঁর গল্পে রাজনৈতিক-সামাজিক-সাম্প্রদায়িক বিষয় তিনি পরিমিত পরিসরে নির্মোহ দূরত্ব রেখে উপস্থাপন করেন।

এই অসাধারণ ক্ষমতা তাঁকে আর যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জনে সাহায্য করে তা হলো চরিত্র সৃষ্টি। ইলিয়াসের কাহিনীর মানুষজন সবাই খুব জীবন্ত। রোগা পটকা অসুস্থ, মৃত্যুপথচারী মানুষ—এমনকি মৃতদেহ—থেকে শুরু করে সবল স্বাস্থ্যবান, শক্তিধর, শয়তান প্রকৃতির লোক সবাই খুব সজীব। এরা জীবন্ত হয়ে ওঠে প্রধানত ইলিয়াসের অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনায় এবং তাদের মুখে সঠিক সময়ে সঠিক সংলাপটি উচ্চারিত হওয়ায়। সমাজের দরিদ্রতম শ্রেণীর, বিশেষ করে শহরের বস্তি সমাজের নালা কাদা এঁদো জলে মলমূত্রে লেপ্টালেপ্টি করে বাস করা শ্রেণীর জীবন শিল্পে তুলে আনতে অপরিহার্যভাবে ব্যবহার করেন তাদের দিনকে দিন জীবনের গালমন্দ, খিস্তিখেউড়। ইলিয়াসের লেখায় এদের আধিক্য মনে হওয়ার কারণ নেই কেননা খিস্তি ওই জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। অতএব তথাকথিত অশালীন বা অশ্লীল গালমন্দ ছাড়া ওদের জীবনের বাস্তব চিত্র শিল্পায়িত করা কি পুনর্নির্মাণ করা একরকম অসম্ভব। মোক্ষম মুহূর্তে সঠিক চরিত্রটির মুখে যথার্থ খেউড় উচ্চারিত হওয়ায় সেই চরিত্রই শুধু নয়, গল্পের সেই সময়ের সামগ্রিক পরিবেশই জীবন্ত হয়ে জন্ম নেয়। এ ছাড়া আঞ্চলিক সংলাপের যথার্থ ব্যবহারও ইলিয়াসের গল্পের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। এর ফলে কাহিনীর চরিত্র যথাযথ সামাজিক প্রেক্ষিতে অবস্থান লাভ করে।

কথা-সাহিত্য ছাড়াও ইলিয়াসের রয়েছে একটি প্রবন্ধ সংকলন, কিছু তাৎপর্যপূর্ণ সাক্ষাৎকার, আত্মীয়-পরিজন বন্ধু-বান্ধব ও পাঠক-সম্পাদকের বিভিন্ন সময়ে লেখা চিঠিপত্র, শখ করে লেখা কিছু কবিতা এবং স্কুল পাঠ্যবইয়ের জন্য লেখা চিরায়ত সাহিত্যের রি-টোল্ড গল্প। এইসব লেখায় তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস এবং দৃষ্টিভঙ্গি স্বমহিমায় ভাস্বর। প্রবন্ধ সংকলনের ২২টি রচনায়—শিল্প-ব্যক্তিত্ব, গ্রন্থ, ফিল্ম, সম্পাদকীয়, সাহিত্য ও সমাজবিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে এবং বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে তাঁর চিন্তার স্বচ্ছতা ও সামঞ্জস্য এবং বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় পাই।

এইসব লেখায় প্রকাশিত তাঁর জোরালো ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও মতামত ইলিয়াসের গল্প উপন্যাসে কখনোই সোচ্চার নয়, যদিও এরা কখনো কখনো কোনো পরিবেশ, প্রতিক্রিয়া, আবহ ও চরিত্রে চকিত ছায়া সম্পাত করে।

বাংলা সাহিত্যের এই ক্ষণজন্মা ব্যক্তির রচনাসমগ্র প্রকাশের বিশেষ আগ্রহ দেখিয়ে মাওলা ব্রাদার্স আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। তিন খণ্ডে সমাপ্ত এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ইলিয়াসের ২৮টি ছোটগল্প অন্তর্ভুক্ত হলো। দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা ইলিয়াসের উপন্যাস *চিলেকোঠার সেপাই* এবং *খোয়াবনামা*, এবং তৃতীয় খণ্ডে তাঁর গ্রন্থিত ও অগ্রন্থিত প্রবন্ধ, প্রথম জীবনের প্রকাশিত কিছু ছোটগল্প, নির্বাচিত চিঠিপত্র ও ডায়েরি, পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকার, *লিরিক* পত্রিকার আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যায় প্রকাশিত *খোয়াবনামা* উপন্যাসটির অংশ, কবিতাগুচ্ছ এবং প্রকাশিত ৮টি গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ চিত্র প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র প্রকাশের ব্যাপারে যাঁদের সাহায্য সহযোগিতা, উৎসাহ ও প্রেরণা এবং পরামর্শ আমরা পেয়েছি তাঁদের প্রত্যেককে বিশেষ করে কথাসাহিত্যিক জনাব শওকত আলী, জনাব মাহবুবুল আলম, জনাব আনু মুহাম্মদ, জনাব ইকবাল আহমেদ, জনাব চৌধুরী মুফাদ আহমদকে জানাই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের জীবনপঞ্জি মূলত *তৃণমূল : আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যায়* চৌধুরী মুফাদ আহমদকৃত জীবনপঞ্জি থেকে নেওয়া হয়েছে।

ইংরেজি বিভাগ
নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি
ঢাকা

খালিকুজ্জামান ইলিয়াস

সূচিপত্র

নিরুদ্দেশ যাত্রা ১৩
উৎসব ২২
প্রতিশোধ ৩৩
যোগাযোগ ৪৭
ফেরারী ৫৯
অন্য ঘরে অন্য স্বর ৭৮
খোঁয়ারি ৯৩
অসুখ-বিসুখ ১১৭
তারা বিবির মরদ পোলা ১৩৩
পিতৃবিয়োগ ১৪৮
মিলির হাতে স্টেনগান ১৬৩
দুধভাতে উৎপাত ১৮৪
পায়ের নিচে জল ১৯৬
দখল ২১৪
কীটনাশকের কীর্তি ২৩৩
যুগলবন্দি ২৫৩
অপঘাত ২৬৮
দোজখের ওম ২৯৩
প্রেমের গপ্পো ৩২১
ফোঁড়া ৩৩৭
জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল ৩৫১
কান্না ৩৩৬
রেইনকোট ৩৯২

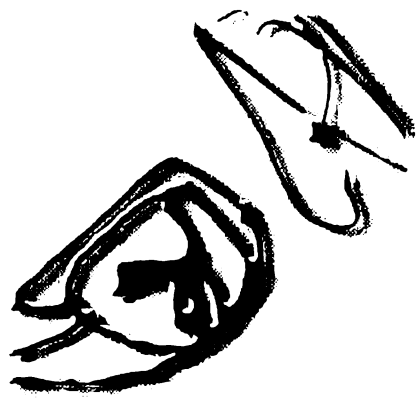

অন্য ঘরে অন্য স্বর

নিরুদ্দেশ যাত্রা

এই মনোরম মনোটোনাস শহরে অনেকদিন পর আজ সুন্দর বৃষ্টি হলো। রাত এগারোটা পার হয় হয়, এখনো রাস্তার রিকশা চলছে ছল ছল করে যেনো গোটিয়ার বিলে কেউ নৌকা বাইছে, 'তাড়াতাড়ি করো বাহে, ঢাকার গাড়ি বুঝি ছাড়ি যায়।' আমার জানলায় রোদন-রূপসী বৃষ্টির মাতাল মিউজক, পাতাবাহারের ভিজে গন্ধভরা সারি, বিষাদবর্ণ দেওয়াল; অনেকদিন পর আজ আমার ভারি ভালো লাগছে। ছমছম করা এই রাত্রি, আমারি জন্যে তৈরি এরকম লোনলী-লগ্ন আমি কতোদিন পাইনি, কতোকাল, কোনোদিন নয়। বৃষ্টি-বুনোট এইসব রাতে আমার ঘুম আসে না, বৃষ্টিকে ভারি অন্যরকম মনে হয়, বৃষ্টি একজন অচিন দীর্ঘশ্বাস। এইসব রাতে কিছু পড়তে পারি না আমি, সামনে বই খোলা থাকে, অক্ষরগুলো উদাস বয়ে যায়, যেনো অনন্ত-কাল কুমারী থাকবার জন্যে একজন রিক্ত রক্তাক্ত জন্মদান করলো এদের। চায়ের পেয়ালায় তিনটে ভাঙা পাতা ঘড়ির কাঁটা হয়ে সময়কে মন্থর কাঁপায়। ষাট পাওয়ারের বাল্বে জ্বলছে ভিজে আলো, আর চিনচিন করে ওঠে হঠাৎ, কতোদিন আগে ভরা বাদলে আশিকের সঙ্গে আজিমপুর থেকে ফিরলাম সাতটা রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনে, 'তুই ফেলে এসেছিস কারে', সেই সোনার শৈশবে ভুল করে দ্যাখা একটি স্বপ্ন, স্বপ্নের মতো টলটল করে। আমার ঘুম আসে না, আলোর মধ্যে একলা জেগে রই। সন্ধেবেলা আম্মার ঘরে যখন যাচ্ছি, আকাশ কালো, রাস্তার মানুষজন নেই, চারটে জানলায় আমাদের পাতাবাহারের ছায়া লুফে নিয়ে পালিয়ে গেলো দুটো ফক্সওয়াগন, কাক আর বাদুড়েরা চিৎকার করে উঠলো; আমার মনে হলো আজ আমি একটাও ঘুমোতে পারবো না। আধ ঘন্টা একা কাটিয়ে আম্মার ঘর থেকে যখন ফিরছি তখন ভরা স্বরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আমার খারাপ লাগলো, আজ আমার একটুও ঘুম হবে না। আম্মার ঘরে কি যেনো ফেলে এসেছি।

আম্মার ঘরে যাবার জন্যে রঞ্জু উঠে দাঁড়ালো। দরজার সামনে এসে ছিটকিনি খুলবে বলে হাত তুলতেই মনে পড়লো বাইরে থেকে এটা বন্ধ। মাঝখানে একটা ঘর পার হয়ে আম্মাদের ঘর। তবু দরজার ছোটো একটা ফুটোয় ছুঁচলো ঠোঁট রেখে নিচু ও নরম স্বরে ফিসফিস করে উঠলো, 'আম্মা, দরজা খোলো, দরজা খোলো।'

বৃষ্টি ধীরে ধীরে কমে আসছিলো, রঞ্জু জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখলো এখন একেবারে নেই। বকুল পাতার নিশ্বাস বড়ো শূন্য মনে হয়। ল্যাম্পোস্টে ভিজে আলোয় ইলেক্ট্রিক তারের ওপর সার বেঁধে জ্বলছে বৃষ্টির শিশির, জলের ফোঁটাগুলো এক পলক পর পর গানের টুকরোর মতো নিচে ঝড়ে পড়ছে। কাজলা দিদি এই তারের মধ্যে দিয়ে কোথায়, কার বাল্বে জ্বলে উঠছে? কোথায়? 'ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না একলা জেগে রই, মাগো আমার শোলোক বলা কাজলা দিদি কই?' এই জায়গায় এসে কাজলা দিদির জন্যে রঞ্জুর ভারি খারাপ লাগলো। ব্যাকুল ও দ্রুত হাতে ধাক্কা দিতে দিতে রুদ্ধ কণ্ঠে চিৎকার করতে থাকলো, 'আম্মা দরজা খোলো, দরজা খোলো, আম্মা দরজা খুলে দাও, খোলো না তাড়াতাড়ি, খোলো।' কয়েক সেকেণ্ড অনিয়মিত বিরতি দিয়ে এমনি চার পাঁচবার ডাকবার পর দীর্ঘ একটা বিরতির মধ্যে রঞ্জু জড়ানো একজোড়া স্বর শুনতে পায়।

'কে? কে যেন ডাকছে না?' স্বপ্নের মধ্যে থেকে আম্মা ছিঁড়ে আসছে, বেচারি মা আমার।

'রঞ্জু।' একটু থেমে আব্বা ফের বললো, 'রঞ্জু না?'

'রঞ্জু?'

'হুঁ। এখনো ঘুমোয় নি।'

'দরজা খুলে দিতে বলছে না?'

'হুঁ। ৎচ, ৎচ। ডাক্তার কাল বললো না ওয়েদার পাল্টালে একটু ইম্প্রুভ করতে পারে?'

'এই যে শোনো, ফের ডাকছে। কি করি, এ্যাঁ? দরজা খুলে দেবো?'

আম্মার ভীরু স্বর শুনে রঞ্জুরো একটু ভয় করলো।

'দরজা? দাও, খুলেই দাও। নইলে আরো বাড়তে পারে।'

'যদি বেরিয়ে যেতে চায়?'

'যাবে। এতো রাতে এসব ভাল্লাগে না। খুলে দাও।'

'চলো, তুমিও চলো।'

'একা যেতে ভয় করছে?'

পর্দার কাঁপা কাঁপা ছায়াকে মনে হয় অন্য কোনো মানুষ কিম্বা একজন মানুষ-নয়। 'পুকুর ধারে নেবুর তলে, থোকার থোকায় জোনাই জ্বলে,' নেবুপাতার মর্মর শুনতে শুনতে রঞ্জু ফের বিমর্ষ হলো : একজন বিপরীত লোককে আমি মিছেমিছি প্রতিবিম্বিত করছি। বাইরে তালা খোলার শব্দ পেয়ে টেনে ছিটকিনি খুলে ফেললো। ঢেউ তোলা পর্দায় তাকিয়ে দ্যাখে এ্যাবসার্ড প্রতিবিম্ব টুকরো টুকরো ভেঙে পড়ছে।

'এতো রাতেও ঘুমোসনি বাবা!' বৃষ্টির পর আব্বার চুল শাদা, বিষণ্ন ও অল্প হয়ে গিয়েছে। আব্বার শুকনো কণ্ঠস্বরে প্রয়াস বড়ো করুণ।

রঞ্জু যেনো ট্রাঙ্কলে একটা শোক সংবাদ শুনছে।

'এখনো ঘুমোসনি বাবা, কতো রাত হয়ে গেছে. যাও শুয়ে পড়ো।' ঘুমভাঙা জিভের মধ্যে লুটোপুটি খেয়ে আম্মার শব্দগুলো ক্লান্ত হয়ে বেরিয়ে এলো। আম্মা বেঁটে, ফর্সা ও গোলগাল। আম্মার ও আব্বার ছায়া তিরতির করে কাঁপছে দেখে রঞ্জু একটু অবাক হলো। এমন কেন হয়?

'আম্মা, তোমাদের ঘরে ইয়ে ফেলে এসেছি।'

'আমাদের ঘরে? কি ফেলে এসেছিস?'

'কখন? কি ফেলে এলি?'

'অই যে বিকেলবেলা, বৃষ্টি আসছে যখন', সাজিয়ে কথা কইতে ভালো লাগছে, যেনো কথা এঁকে রঞ্জু সেই ছবি হাওয়ায় টাঙিয়ে দিচ্ছে, 'আকাশে ভীষণ মেঘ করেছে, তুমি যে বলছিলে, "অঞ্জুটা এখনো ফিরলো না, কোথায় যে আছে," তালগাছ থেকে মস্ত একটা ডাল উড়ে এসে তারের ওপর ঝুলতে লাগলো, ধুলোয় চারদিক একাকার, তখন তোমার ঘরে ফেলে এসেছি।'

'কি, কি ফেলে এসেছিস?'

রঞ্জু ভারি বিব্রত হয়ে দেখলো ওর অনিচ্ছুক ছায়া আরো দ্রুত কাঁপতে শুরু করেছে। ঠাণ্ডা মেঝে, চেয়ারের গাঢ় খয়েরি পা ও টেবল ক্লথের লোটানো লতায় অগোছালো তাকিয়ে রইলো।

'কি ফেলে এসেছিস, কি?'

হঠাৎ অপরাধী, বিনয়ী ও এলোমেলো বলে ফেললো রঞ্জু, 'ঠিক মনে করতে পাচ্ছি না, ভুলে গেলাম, কি যেনো ফেলে এসেছি।'

'আচ্ছা, অই ঘরে চলো আমাদের সঙ্গে, কি ফেলে এসেছো, দেখবে চলো।'

আব্বা অসহিষ্ণু হাসলো একটুখানি, 'চলো, তাড়াতাড়ি চলো।'

পর্দার এপারে এলে আলোছায়া আর রইলো না। অঞ্জু মঞ্জু দুটো বিছানায় অনায়াস ঘুমোচ্ছে, স্বপ্নময়, নরম অন্ধকারে, সাধের মধ্যে সেঁধে। শেলফে আলমারিতে বইগুলো সারি সারি কফিনের মতো শুয়ে রয়েছে, এসব পার হয়ে ওরা একটা বড়ো ঘরে ঢুকলো, আব্বা, আম্মা আর রঞ্জু।

দেওয়ালে কোনোদিন-উড়বে-না তুলোর শাদা প্রজাপতি ও সবুজ সুতোর প্রেমিক ময়ূর দম্পতি লালচে হয়ে গিয়েছে। ইজি চেয়ারের বিস্তৃত হাতায় বেহায়া বার্নার্ড শ'র ওপর আব্বার পুরু চশমা মশারিকে পানসে তাকাচ্ছে।

'কোথায়? কি ফেলে গিয়েছো মনে পড়ছে?'

সন্ধেবেলা, তখনো আকাশ ভারি মেঘলা, চারদিকে আঁধার করে আসছে, এই ঘরে কি যেনো ফেলে গেলাম।

আলমারির লম্বা আয়নায় পেছনের দেওয়াল শাদা ও নিরুদ্বেগ প্রতিফলিত। আব্বার পালঙের মাথায় অন্তরঙ্গ টেলিফোনে কারো কণ্ঠস্বর জড়ানো রয়েছে স্পঞ্জের মধ্যে, রিসিভার তুললেই বাজতে শুরু করবে।

'কোথায়, রঞ্জু?' আব্বাকে বিকেলবেলা অনেক পুরুষ শোনা যায়, কিন্তু এখন এতো সাধারণ, রঞ্জুর একটু দুঃখ হলো, দিনদিন আব্বা বড়ো সাধারণ ও সংসারী হয়ে পড়ছে।

'কোথায়, মনে পড়ছে এখন? কি ফেলে গিয়েছিলে? কি?'

'রঞ্জু, ভেবে দ্যাখো না বাবা, মনে পড়ছে?'

মৃত্যুমন্থর এই রাত্রি কেবলি সময়হীন ছড়িয়ে পড়ে। রোগা হয়ে রঞ্জু একটু কাঙাল হাসলো। ফ্যাকাশে বলতে লাগলো, 'ঠিক মনে করতে পাচ্ছি না আম্মা, একেবারে ভুলে গেলাম।' কি জিনিশ বারবার ভুলে যাচ্ছি। সন্ধেবেলা, যখন চারদিক আঁধার করে এলো,—না তবে বোধ হয় অন্য কোনো সময়ে কি যেনো ফেলে গেলাম, আমি ঠিক—কি যেনো। চোখের মনির মধ্যে তখন আশ্চর্য একটা অকাল আঁধার সূর্যোদয়ের মতো জেগে উঠলো ধীরে ধীরে, ঝাপশা ও নিরাকারকে নিরনুভব স্থির তাকিয়ে রঞ্জু কণ্ঠের ঘন লবন-লালে মর্মর করে উঠলো, 'তবে অন্য কোথাও বোধ হয়।' ওর আরো ভেতরে হৃদপিণ্ড ও এ্যাবডোমেনের চামড়ার দেওয়ালে ভাসা ভাসা প্রতিধ্বনিত হলো, 'কোথায় যেনো ফেলে এসেছি।' চোখের চোপসানো চুলোয় বলকানো আঁধার ফুটিয়ে রঞ্জু আব্বা ও আম্মার সঙ্গে নিজের ঘরে ফিরলো।

'আমরা যাই, তুমি ঘুমোও, কেমন?' ওর গায়ে একটা চাদর টেনে দিয়ে আম্মা আব্বার দিকে তাকালো। আম্মা ও রঞ্জু দেখলো আব্বার চোখ ভারি ছলছলে।

'রঞ্জু!' আব্বার ডাক শুনে রঞ্জু অবাক হলো। কণ্ঠস্বর ফের অন্যরকম হয়ে গিয়েছে, নিচু, ক্ষীণ ও নেই-নেই।

'এখন ঘুমিয়ে পড়ো বাবা। দুটো দরজাই খোলা রইলো। যদি খুব খারাপ লাগে বারান্দায় যেও, রাস্তার বেরিয়ো না, আকাশ আজ ভারি বিশ্রী। ঘুমিয়ে পড়ো, কেমন?'

'আমার ঘুম আসে না।' রঞ্জু গুনগুন করে উঠলো।

'চোখ বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে থাকো। ভাবতে থাকো, সামনে মস্ত এক মাঠ, মাঠে অনেকগুলো ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে, অগুণতি ভেড়া, হাজার হাজার লাখ লাখ ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে। অইগুলো গুনতে থাকো, মনে মনে গোনো, এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়—।'

কোথায় যেনো আমি এমনি একটা মাঠ দেখেছি। সেই মাঠের একদিকে ধূসর রঙের পাহাড়, দীর্ঘ একজন মানুষ পাহাড়ের বিপরীত দিকে হাজার হাজার ভেড়ার পেছনে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে রয়েছে। কবে দেখেছি? কবে? কোন জন্মে?

'এমনি গুনতে থাকো, দেখবে টায়ার্ড হয়ে পড়ছো, তখন তোমার ঘুম পাবে।'

'টায়ার্ড হয়ে পড়লে ঘুম আসবে?' আমি তো সব সময়ই ভারি ক্লান্ত হয়ে থাকি, আমি এক জন্ম-ক্লান্ত লোক, আমার তবে ঘুম আসে না কেন? 'হ্যাঁ বাবা, চোখ বন্ধ করে অনেকক্ষন ধরে গুনতে থাকো, দেখো, কেমন সুন্দর ঘুম পাবে। আমি কতোদিন এমনি করে ঘুমিয়েছি।'

ওরা চলে যাবার পরো আম্মার শাড়ির ঘুম ঘুম গন্ধ সারা ঘরে নিথর জমে রইলো। নীল আলোর ফ্যাকাশে গন্ধ, বাইরের সোঁদা মাটির আভাস, আব্বার ছড়িয়ে যাওয়া সিগ্রেটের লুপ্ত ধোঁয়া, নিচে পুরোনো স্টেটসম্যান, ধুলোভরা স্লিপার, টেবলে শোপেনহাওয়ারের অনন্ত সৌরভ—রঞ্জু নিবিষ্ট কুঁকড়ে শুয়ে সমস্ত ঘর ব্যাপী ঘন গভীর নিশ্বাস নিতে শুরু করলো।

এই ঘরের গন্ধ দিন দিন পাল্টাচ্ছে। আগে ভোরবেলা এখানে নোতুন 'ছড়ার ছবি'র গন্ধ করতো। মনে হল, জবাব এল, "আমরা নাই নাই"।—এই কথাগুলো যে পাতায় ছিলো সেখানে সুন্দর তেতো গন্ধে চোখ রাখলে আমার ঘুম আসতো। মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে গিয়েছে আম্মার নীল জর্জেটের শাড়ির গন্ধে। অই শাড়িটার পুরোনো পুরোনো গন্ধ ছিলো একটা। ন্যাপথলিন, বাক্সের চামড়া, বাতাস সব মিলিয়ে এই সুবাস কতোরাতে রঞ্জুকে জাগিয়ে তুলেছে।

'আম্মা, ছবি দেখতে যাচ্ছো?' 'ও মা, তুই ঘুমোসনি এখনো?' শাড়ির কুঁচি ঠিক করতে করতে আম্মা মিষ্টি করে তাকাতো, 'যাও বাবা ঘুমোও, এসব বড়োদের ছবি, তোমাদের দেখতে নেই।' তখন রূপমহলে কেবল বাঙলা ছবি চলতো। আম্মা আমাকেও নিয়ে গেছে মাঝে মাঝে, 'সেতু' ছিলো একটা ছবির নাম, 'সংসার', 'নিয়তি', 'বাবলা', আরো সব কি নাম, মনে নেই। আব্বা একটু একটু রাগ করতো, 'এসব ছবি তোমাদের জন্যে নয়, তোমাকে "টারজান" দ্যাখাবো।'

মঞ্জু আর আমি আব্বার সঙ্গে নিউ পিকচার হাউসে টারজানের ছবি দেখে এলাম। তখন বুঝি সিনেমায় সিগ্রেট খাওয়া বারণ নেই, আব্বা সিগ্রেট ধরিয়েছিলো, আমার মনে আছে। ইন্টারভ্যালের সময় সামনের সিটে একজন কাকে যেনো একটু জোরে জোরে বললো, 'আরে না না, এবারো ফেল করেছে।' কেউ বোধ হয় কোনো পরীক্ষায় ফেল করেছিলো। সে কি বারবার ফেল করতো?

হঠাৎ দ্রুত ও বিরতিহীন ঘন্টাধ্বনি শুনে দিশেহারা বুকে রঞ্জু জানলার সামনে দাঁড়ালো। চাদরটা মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছে, অর্ধেকটা বিছানায়, জমানো প্রবাহিত হচ্ছে বিছানা থেকে মেঝেয়। ঢং ঢং চিৎকার করে ছুটে গেলো ফায়ার ব্রিগেডের লাল রঙের দ্রুতশ্বাস গাড়ি, কার সর্বনাশ ঘটলো এতো রাতে, ফর হুম দ্যা বেল টল্‌স্? কার বাড়ি ধ্বসে গিয়েছে, এইরাতে আগুন লেগেছে কোনখানে? চারদিকে জলের পাতলা জালে আলোর ইল্যুশন ফেলে গাড়িটা কোথায় মিলিয়ে গেলো। তখন কেমন হতাশ চিত্তে ও বাইরে এসে দাঁড়ালো। ঘর থেকে নীল আলোর একটুখানি এখানে এসে পড়েছে; আকাশে কালো মেঘ, কিন্তু বৃষ্টি থেমে গিয়েছে, গাছপালায় ভিজে অন্ধকার ছিপছিপে ছড়ানো; এই আলো ও আঁধারিতে, এই নীরব নিসর্গে ছমছম ভয় করে আমার।

কাঠের পুরোনো ছোটো ভিজে গেটটা নরম হয়ে গিয়েছে। ডান হাতের নখ দিয়ে রঞ্জু অল্প একটু কাঠ তুলে ফেললো। খুব ফ্যাকাশে, নেই-নেই একটা ভিজে গন্ধে ভারি পাতলা করে দুবার নিশ্বাস নিলো।

রাস্তার লাল সুরকির ফাঁকে ফাঁকে জল একটু একটু ঘোলা, ইলেক্ট্রিক তার, মেঘলা আকাশ, ল্যাম্পোস্টের বিনীত মাথা সেই জলে তির-তির কাঁপে। ম্লানআলো বাল্বের অইটুকু ছায়ায় রঞ্জু দেখতে পেলো নিশ্চিন্তপুরের সময়-কাঁদা, নির্লিপ্ত মাঠে দুপুর ঝাঁ ঝাঁ করছে। ছোটো ছোটো ছায়া ফেলে দুর্গার সঙ্গে রঞ্জু রেললাইন দেখতে কতোদূরে পাড়ি দিচ্ছে। দুর্গা সিঁদুরের কৌটো চুরি করে তাকের ওপর লুকিয়ে রেখেছিলো বলে রঞ্জুর বড্ডো মন খারাপ করে। 'দিদি, তুই সিঁদুরের কৌটা চুরি করলি কেন?' দুর্গাকে শুধোবে বলে রঞ্জু সামনের দিকে সোজা স্পষ্ট তাকালো। দেখলো, অন্ধকার ও জলের মধ্যে নিশ্চিন্তপুর অতল ডুবে গিয়েছে। ল্যাম্পোস্টে ঠেস দিয়ে দুর্গা রঞ্জুকে ভারি সময়হীন তাকাচ্ছে। দুর্গার শরীর একজন নিপুণ প্রতিমা হয়ে রঞ্জুর সমস্ত স্মৃতিকে গেঁথে রেখেছে। রঞ্জু উদ্বেল বুকে কলকল করে উঠলো, 'দিদি!'

তখন প্রচণ্ড, নির্বাক, নিস্পন্দ, সাংঘাতিক আতঙ্কে ওর গলা লম্বা হয়ে গেলো, শিরদাঁড়া বেয়ে স্রোতহীন দাঁড়িয়ে পড়লো শীতল প্রাণহীন রক্ত : কতোকাল হলো দুর্গা মারা গিয়েছে!

ওকে নিরনুভর ও স্নায়ুহীন করে গামবুট রেনকোটে মোড়া দুর্গা হান্টার হাতে এগিয়ে এলো।

'কে?' উত্তর না পেয়ে লোকটা ওর মুখোমুখি দাঁড়ালো, 'আপনি? ইলিয়াস সায়েবের লড়কা না? কুথায় যাচ্ছেন?'

'কোথাও না।'

'এতো রাতে ডাঁড়িয়ে আছেন কেনো?' পুলিস জিগ্যেস করলো, 'ঘরে চলে যান। এই মেঘলা রাতে বাহারে এসেছেন কেনো?'

রঞ্জু বললো, 'এমনি। ঘুম আসছে না। বাদলা রাতে আমার ঘুম হয় না।'

'নিদ আসছে না, না? একটু পাইচারি করেন রাস্তায়, বেশ আরাম লাগবে, দেখবেন।'

বৃষ্টি আর পড়ছে না। কিন্তু আকাশ জুড়ে কালো কানা মেঘ শেষ তারাটিকেও নিভিয়ে দিয়েছে। দুদিকের গাছ থেকে টিপটিপ জলপড়া শুনতে শুনতে পুলিসের সঙ্গে রঞ্জু হাঁটতে লাগলো।

'আপনি কালিজে পড়েন?'

'না।'

'চাকরি করেন, না?'

'না।'

'কেনো? কিছু করেন না?'

'এমনি, ভালো লাগে না।'

'ভালো লাগে না?' পুলিস একবার রঞ্জুর দিকে তাকালো, 'আপনার দাদার তবিয়ত এখন কেমন?'

'আপনি দাদাকে চেনেন?'

'হুঁহ্!' পুলিশ একটুখানি হাসলো, 'চিনি না? আপনের দাদা যখন কাটিহারে ছিলেন, তখুনি তো হামি পরথম কনস্টেবল হলাম। তারপর হাওড়া, শান্তাহারেও একসাথ ছিলাম। আপনের আব্বারা তো তখন সব ছেলেমানুষ।'

'আপনি আমার আব্বাকে চেনেন?'

'তোমার জন্মের আগে থেকে চিনি বাবা, বহুত দিন থেকে চিনি।' উচ্ছ্বাসে পুলিসের কণ্ঠ বলকানো দুধের মতো শব্দ করে উঠলো। একাগ্রচিত্তে রঞ্জু এই স্মৃতিশিহরিত মানুষকে ব্যাকুল তাকিয়ে রইলো। 'কাটিহারে থাকতে, তোমার দাদা যখন কাটিহারে ছিলো, খুব দাপটে থেকেছে, অমোন বড়োবাবু হামি আর দেখলাম না।'

এক হাত কোমরে রেখে হান্টারটা নিজের হাঁটুতে ঠেকিয়ে পুলিস দাঁড়িয়ে পড়লো। বাঁ দিকের রাস্তার শেষে ল্যাম্পোস্টে তাকিয়ে স্বগতের মতো মর্মর করতে লাগলো, 'তোমার আব্বা তখন কোলকাতায় পড়তো আর খালি মিটিং করতো ছাত্রদের সাথে মিলে। এই আজ রাণাঘাট তো কাল ঢাকা তো পরসোঁ বর্ডোয়ান, ফের সেরাজগঞ্জ, কখনো পাটনা, দিল্লী চলে গিয়েছে—এই খালি ঘুরতো আর মিটিং করতো। বড়োবাবু কতো রাগ করেছে, 'তুমি এইসব করবে তো পড়ালিখা করবে কখন?'

রঞ্জুর বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে : এইসব দিন আমার জন্মের কতো আগে মিশে গিয়েছে। এদের জন্যে আমার এমন করে কেন? আব্বার রক্তের সঙ্গে এই দিনগুলো কি আমার শরীরে উজান বয়ে এলো? আমার ভারি ইচ্ছে করে একবার এদের ছুঁয়ে দেখি।

তখন কোথায় যেনো বাজ পড়লো, অতর্কিত স্বাভাবিক কণ্ঠে পুলিস বললো, 'আমি এই রাস্তায় চলে যাবো ডিউটি দিতে। বাদলা রাত পেয়ে শালারা বহুত সুবিধা পেয়ে যাবে। আপনি বাড়ি যান বাবা, কোথায় বাজ পড়লো, বিজলী চমকাচ্ছে, ফির বারিশ হোবে।'

রেনকোটে ঢাকা কনস্টেবল স্মৃতি ও বিষাদে নুয়ে সাধহীন হেঁটে চলে গেলো ধীরে ধীরে। দুই দিকের বাড়িঘর সরে সরে গিয়ে ওকে পথ করে দিচ্ছে। মোড়ে ল্যাম্পোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে পুলিস রঞ্জুকে অবশ হাত নাড়লো। এখন একটুও বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না। মাথা নিচু করে সামনে তাকিয়ে রঞ্জু অন্ধকারের পানে পা বাড়ালো।

গায়ের ওপর ঝিরঝির বৃষ্টি পড়লে রঞ্জু ওপরে তাকিয়ে দ্যাখে মেঘে মেঘে আকাশ কতো নিচে নেবে এসেছে। চারদিকটা কেমন ছায়া ছায়া। পুরোনো জামগাছটায় হাজার হাজার ভিজে পাতা উদ্বন্ধন আত্মহত্যায় অতৃপ্ত ঝুলছে। রঞ্জুর গা'টা শিরশির করে উঠলো, এই যে পুলিশ আমার গতরক্তের স্মৃতিকে রোদন করে গেলো এ কি পুলিস, না অন্য কেউ? এ কি কেউ, না কেউ-নয়? এ যদি কেউ-নয়

হয়? না, আর ভাবা যায় না, মাথা নিচু করে কোনো দিকে না তাকিয়ে হন হন হাঁটতে শুরু করলো।

এখানে শহর শেষ। নদীর ওপর ঢেউ-খেলানো লম্বা মাঠটা গেরুয়া নিশ্বাস নেয়, বৃষ্টিতে ভিজে এখন একেবারে নেতিয়ে পড়েছে। নদীর তীরে একটা পুরোনো শিমূল গাছ সারাদিনরাত ওপারে তাকিয়ে থাকে। মন্থর মেঘগুলো অনিয়মিত বিদ্যুতে মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, রঞ্জু বিদ্যুতের আলোয় দ্যাখে : এই মাঠে আমি আগে মেলা এসেছি। এক হাজার নয়শো তেতাল্লিশ বছর আগে আমার স্কুলের বন্ধুরা এখানে ক্রিকেট খেলতো। আমি নদী তীরে বসে, মাঝে মাঝে ওদের দিকে, কখনো নদীর পানে চেয়ে সময় ও বিষাদ কাটিয়েছি। শেলী কতোবার ডেকে গেলো, 'এই রঞ্জু, খেলবি নিকি?' আমার ভয় করতো, আমি একদিনো খেলিনি। কতোদিন সন্ধে হতে দেখেছি এখানে। সন্ধের পরো উঠতে ইচ্ছে করতো না; মলিন নদীতে দুঃখী চাঁদ ফ্যাকাশে জ্যোস্না ঢেলে দিলো, আঁধারে নিসর্গ হয়ে উঠলো মূর্তি; নদীর শীর্ণ সুবাস, জলের অন্তর্বাস থেকে উঠে আসা নিরেট ভারী গন্ধের মধ্যে অকাললুপ্ত হয়ে গেলো, আমার কেমন লাগতো। একদিন ওরা ক্রিকেট বল হারিয়ে ফেলেছিলো। সারা বিকেল খুঁজলো, চাঁদমারির তিনদিকে ছোটো ছোটো ঝোপ, পশ্চিমে শিরীষ গাছের অন্ধকার, শিমূলতলা—সেই বল কোথাও পাওয়া গেলো না, ছেলেরা মন খারাপ করে বাড়ির দিকে চলে গেলো।

আমি কোথায় কি যেনো হারিয়ে এসেছি। ওর চিত্ত ভারি এলোমেলো হয়ে পড়লে রঞ্জু ভয়ানক উদ্বিগ্ন বোধ করে; উৎকণ্ঠ হয়ে কেবলি মনে করতে লাগলো, আমি কোথায় কি যেনো ফেলে এসেছি। কোথায়? তখন বিহ্বল রঞ্জু শিমূল গাছের নিচে শুয়ে পড়লো, নদীর জলে উন্মুখ কান পেতে।

কালো আকাশ ভেঙে ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছে। ওর এখন একটু একটু তেষ্টা পেয়েছে; জিভ দিয়ে ঠোঁট বুলোতে বুলোতে রঞ্জু শুনতে পায়, নদীর অনিকেত জলে পাগল ঢেউয়েরা জন্ম নিচ্ছে কেবলমাত্র মরবার জন্যেই। শিমূল গাছের বুকে মাতাল সমীরণ বেপরোয়া জায়গা করে নিচ্ছে। মেমোরি-মর্মরিত রঞ্জু তখন আব্বার শাদা রঙের তরল-ঘন সাধ, আম্মার রাঙা আঁধার থেকে শুরু করে নিশ্চিন্তপুরের মাঠ, নদীর জল, পাতার মর্মর–সবাইকে এক ঠাঁই করে পাগলের মতো খুঁজে বেড়াতে লাগলো। এ রকম এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্য, এইকাল থেকে সেই কাল ঘুরে ঘুরে রঞ্জুর তেষ্টা ওর কণ্ঠের মধ্যে শুঁড় বসিয়ে দিলো।

রঞ্জু জলের জন্যে কাঙাল হাঁ করে রইলো। বৃষ্টির জল ওর চিবুকে পড়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, নাকের ডগা থেকে ছিটকে চলে যায় কোথায়, গালে জলের ছিটে লাগছে। চারদিকে এতো জল, একটি ফোঁটাও ওর পাতলা ঠোঁট বেয়ে পড়লো না যা কিনা এলোমেলো দাঁতের সারি পার হয়ে জিহ্বার সড়ক ধরে কণ্ঠে পৌঁছে যেতে পারে। রঞ্জু জলের প্রত্যাশায় জলে-ডোবা মানুষের মতো এলোপাথাড়ি ঢোক গিলতে লাগলো। প্রত্যেকটা ঢোঁক কাঁটা হয়ে ওর বুকের মধ্যে খোঁচা খোঁচা গেঁথে যাচ্ছে কেবল।

প্রবলরকম ঝড় হইতে শুরু করেছিলো। আর দ্যাখো, এমন সময় শিমুল গাছের মস্ত একটা ডাল তার সমস্ত মর্মরিত পাতা, কাকলিশূন্য নীড়, বৃষ্টির ছড়ানো ফোঁটা ও রঞ্জুর জন্যে বুকভরা বর নিয়ে ঢেউয়ের মতো শব্দ করে ভেঙে পড়লো। রঞ্জুর মনে হলো, আমার ওপর, আমার বুকের মধ্যে, কালো, অন্ধকার ও ভারী কোনো নিরাকার নিশ্বাস স্থায়ী আশ্রয় নিয়েছে। দ্যাখ্যর জন্যে ও চোখ খুলতে চেষ্টা করলো; কিন্তু ভিজে শিমুল ফুলের রাশি স্তূপাকার পড়ে রয়েছে ওর চোখের ওপর। বুকে জড়িয়ে ধরবার সাধ করে হাত দুটো তুলতে গেলো; ওর হাতে শিমুল ডাল শান্ত, অনিবার্য ছড়িয়ে রয়েছে। শুঁকবে বলে রঞ্জু জোরে নিশ্বাস নিতে চাইলো; কিন্তু ওর নিশ্বাস তখন শেষ হয়ে এসেছে, রঞ্জু সুবাস নিতে পারলো না।

উৎসব

এখন আনোয়ার আলির বেশ মুড়ে থাকার কথা। এইতো কিছুক্ষণ আগে সে বড়োলোক বন্ধুর বৌ-ভাতের নিমন্ত্রণে ধানমণ্ডির মস্ত এক বাড়িতে গিয়েছিলো। ভিতর ধানমণ্ডির খুব সুসজ্জিত, অভিজাত ও আধুনিক বাড়ি। প্রচুর পরিমাণে ভালো ভালো মেয়ে দ্যাখা গেছে, কয়েকজনের সঙ্গে এমনকি আলাপও হলো। সমস্ত বিয়ে বাড়ির কুলীন কলরব অন্তত সপ্তাহখানেক সমস্ত শরীরে সুখ উদ্রেক করবে।

কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। ওদের সরু গলির মুখে ঢুকেই আনোয়ার আলি বিরক্ত ও দুঃখিত হয়ে পড়লো। তার বিরক্তির কারণ এইসব: গলির নালায় হলদে রঙের ঘন জল ল্যাম্পোস্টের ফ্যাকাশে আলোতে ঘোলাটে চোখে নির্লিপ্ত তাকিয়ে থাকে। নালার তীরে মানুষ ও কুকুরের অপকর্ম কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমায়। আর, আর এইসব লোকজন! পাড়ার অধিবাসীরাও তার বিরক্তির একটি কারণ। নাইট শো ছবি ভাঙতে এখনো আধঘণ্টা, পাড়ার তরুণ সমাজ মেয়ে দেখবে বলে এখন থেকেই পাঁয়তারা কষে। গলির বাঁ দিকে বড়ো রাস্তায় চলছে জুয়ার জমাট আড্ডা। আহমদিয়া হোটেল এ্যাণ্ড রেস্টুরেন্টে বিশ বছর আগেকার 'ছোড়ে বাবুল কা ঘর' বিরতিহীন বাজে। এখন রাত্রি সোয়া এগারোটা, আরো ঘন্ট দুয়েক এই কর্কশ কোলাহলের কাল।

আনোয়ার আলির দুঃখের কারণ : এই অঞ্চল এবং সন্ধ্যাবেলার উৎসবমুখর বাড়ি ও ঐ এলাকা তার বিরক্ত চিত্তে পাশাপাশি অবস্থান করে। ধানমণ্ডির রাস্তা সবই চওড়া, মসৃণ, নোতুন ও টাটকা। দুধেল আলোর নিচে গা এলিয়ে তারা আলো পোহায়; শুয়ে শুয়ে দ্যাখে, মাথার ওপর অনন্তকাল বিরাজ করছে রহস্যময় মহাশূন্য। দেশী-বিদেশী মেয়েমানুষভরা গাড়ি একেকটা রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে, উড়াল দিচ্ছে অন্য কোনো ইন্দ্রপুরীর দিকে। সম্মানজনক দূরত্ব নিয়ে পকেটে-হাত দাঁড়িয়ে আছেন মনিমুক্তাখচিত বড়ো বড়ো সব প্রাসাদ। বোঝা যায় ঐসব নিষিদ্ধ গ্রহ নক্ষত্রে কোয়ার্টার ডজন হাফ ডজন রূপসী অন্য কোনো ভাষায় বাক্যালাপ করে। এই সেতারে মালকোষ ধরলো কি হাই তুলতে তুলতে বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে মন্থর আঙুলে। মুনতাসির কি ইশতিয়াক কি আহরার এলে কণিকা

বন্দ্যোপাধ্যায়ের এল. পি চালিয়ে দিয়ে স্যোসালিজম সম্বন্ধে গল্প করছে কি নরম গলায়। আবার এরই ফাঁকে ফাঁকে সময় করে লোনলিনেসে কি মিষ্টি কষ্ট পায়। তখন আর উপায় থাকে না, পুরো দুটো ঘন্টা এয়ার কণ্ডিশনের ওপর ফুল স্পীডে পাখা চালিয়ে ডিউক এলিংটন শোনে।

আর দ্যাখো এখানে! এই দুপুর রাতে আটটা-নটা কুত্তা দৌড়ে বেড়াচ্ছে একবার গলির এমাথায়, একবার ওমাথায়। কুকুর কি আর ওদিকে নেই? ওদিকেও আছে। বিয়ে বাড়িতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন একজন। কি গম্ভীর তাঁর মুখ, কি তাঁর চেহারা! কি ভাঁটে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়ছিলেন মৃদু মৃদু। মনে হয় বাঙলা ফিল্মের জমিদারবাবু দোতলার ব্যালকনিতে ডেক চেয়ারে বসে পা দোলাতে দোলাতে সূর্যাস্ত উপভোগ করছেন। এইসব কুকুর দেখলেও মনের মধ্যে ভক্তিভাব জেগে ওঠে।

আর দ্যাখো, পাড়ার কুত্তার বাচ্চাদের একবার দ্যাখো! সবগুলো শালা নেড়ি, গায়ে লোম নেই এক ফোঁটা, শরীর ভরা ঘা নিয়ে কেবল কুঁই কুঁই গোঙায়। একেকটা আবার কোনো কোনো ছোটো লোকের বাচ্চার মতো যা তা খেয়ে ধ্যাবড়া মোটা হয়েছে, তাকিয়ে থাকে ভাবলেশহীন চোখে, ল্যাম্পোস্ট পেলেই ছিরছির পেচ্ছাব করে।

নিজের ঘরে ঢুকলে মনে হয়, এই ঘর ঐ গলিরই একটা বাইলেন। সেই ভিজে ভিজে ভ্যাপসা ভোঁতা গন্ধ, ৪০ পাওয়ারের টকটক আলোর ভেতরে ঘুম থেকে ওঠা সালেহা বেগমের পুরু ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটা হলুদাভ ও একটা শাদা দাঁত নির্লজ্জ উঁকি দেয়। সালেহা বেগম তার স্ত্রী, তার স্ত্রীর ঠোঁটের কোণে লালার আভাস, সমগ্র মুখমণ্ডলে গ্রাম্যতা, কেবল গ্রাম্যতা তোতলায়।

'পলির মা, আমার লুঙিটা কোথায়?' আজ অক্টোবরের ৫ তারিখ, মাসের প্রথম দিকে সে তার স্ত্রীকে সালেহা বলে সম্বোধন করে, রিকশায় উঠলে বলে শেলী। কিন্তু দুঃখ ও বিরক্তি তাকে দিয়ে আজ প্রথা ভাঙায়।

সালেহার ঘুমঘুম হাসি এড়াবার জন্য আনোয়ার আলি উল্টোদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে লুঙি পরতে থাকে। তার ক্ষোভ হয়, এই মেয়েটা বছরখানেক হলেও তো কলেজে পড়েছে, বিয়ের আগে এমনকি একটু প্রেম মতোনও করলো। অথচ এমন জবুথবু হয়ে থাকে কেন? শাড়ির ভেতর বুক নেই পাছা নেই, দিনরাত হেঁটে বেড়াচ্ছে একটা বেঢপ কোলবালিশ।

'রাত অনেক হলো, না? ক'টা বাজে, এ্যাঁ?' বলতে বলতে সালেহা বেগম চলে গেলো উঠানে। কলতলায় দুটো ইঁটের ওপর ধ্যাবড়া দুটো পা রেখে সে এখন গ্যালন খানেক পেচ্ছাব করবে। মেয়েমানুষের এরকম বারবার পেচ্ছাব পায়খানা করা, দলা দলা থুতু ফেলা—এসব আনোয়ার আলির মনঃপুত নয়। তো কি আর করা যাবে? এসব মেয়েমানুষ শোধরায় না কোনো দিন। করুক, সালেহা যতো খুশি পেচ্ছাব করুক, এই ফাঁকে সন্ধেবেলাটা ভেবে নেওয়া যাক। এক হাত

আলনায় প্যান্টের ওপর রাখা, আরেক হাতে স্যাতস্যাতে হলুদাভ আণ্ডারওয়্যার—ছোটো ঘরের স্বল্প শূন্যতায় উৎসব দ্যাখার জন্য আনোয়ার আলি নিবিষ্টচিত্ত হলো।

কিন্তু উৎসব, বা উৎসবের কোনো মহিলা গোটা শরীরে কখনো আসে না। ঝলমল আলোর নিচে সমস্ত বিবাহ উৎসব কখনো একটিমাত্র ঝাপশা চিত্রে, কখনো ছিঁড়ে ছিঁড়ে চোখের লাল লাল রেখায় চোখ টেপে। একবার মনে হয়, এ বিয়েতে না গেলেই ভাল হতো। কাইয়ুম তার কি এমন বন্ধু? সেদিন স্টেডিয়ামে হঠাৎ দ্যাখা না হলে সে তো এই বিয়ের কথা জানতেও পারতো না। কলেজে একসঙ্গে পড়েছিলো বছর দুয়েক, একই ছাত্র প্রতিষ্ঠানের কর্মী ছিলো বলে, এবং একটা ধর্মঘট আয়োজন করবার সময় দুজনে একটু ঘনিষ্ঠ হয়েছিলো। বেশ বড়োলোকের ছেলে, বামপন্থী রাজনীতি করে, ছাত্রও খুব তুখোড়, সবাই কাইয়ুমের কাছে ঘেঁষতে চাইতো। এই বিয়েতে না এলে কে আর ওর অভাব বোধ করতো? এসে দু'তিনজন পুরোনো সহপাঠির সঙ্গে দ্যাখা হলো।

কে কাইয়ুমের বেশি কাছে ঘেঁষতে পারে, এই নিয়ে হাফিজের সঙ্গে ওর একটু প্রতিযোগিতামতো ছিলো। ওকে দেখে দশ বছর পর সেই ঈর্ষাবোধ কিলবিল করে উঠলো। প্রথম যখন কলেজে ভর্তি হয়, হাফিজ তখন একটু গ্রাম্য ধরনের ছেলে, উচ্চারণে আঞ্চলিক টান এখনো কানে বাজে। ছাত্রজীবনে চাঁদা তুলে একুশে ফেব্রুয়ারির সংকলন বার করতো, এখন এখানেই কোন কলেজে বাঙলা পড়ায়, একুশে ফেব্রুয়ারির প্রতি দায়িত্ব আজো পালন করে চলেছে। লোকটা বড়ো বকে, বড়ো বেশি কথা বলে। উৎসবের রূপসীরা চোখের সামনে আসে, ফের চলে যায় কিন্তু হাফিজের আত্মজীবনীপাঠ বিরতিহীন, 'আমি ভাই এইসব ফাংশন এ্যাভয়েড করি। আমি বাবা প্রফেসর মানুষ, পড়াশোনা নিয়েই সময় কাটে। হৈ চৈ ভাল্লাগে না। পলিটিক্স তো ছেড়ে দিয়েছি ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়েই। লেখাও প্রায় স্টপ; তা রেডিও টিভির লোক পেছনে লেগেই আছে, ওদের চাপেই এখনো গান লিখি, এই গানই লিখি কেবল।'

আনোয়ার আলির এক হাত তখনো প্যান্টের ওপর রাখা, এক হাতে খামচে ধরে আছে নরম আণ্ডারওয়্যার। আহমদিয়া রেস্টুরেন্টে উচ্চ কণ্ঠে লতা মুঙ্গেসকর বাজে, রেকর্ডে অধ্যাপক ও গীতিকার হাফিজুর রহমানের আত্মজীবনী শোনা যায়। আনোয়ার আলি এদিক দ্যাখে, ওদিক দ্যাখে, মেয়ে কোথায়, ভালো ভালো মেয়ে খুব ভালো করে দেখে নেওয়া দরকার। একসঙ্গে এতো ভালো মেয়ে আর কোনো দিন পাওয়া যাবে না। জায়গাটা ও পেয়েছিলো সব চেয়ে ভালো। ঘন সবুজ লনে অজস্র চেয়ার ছড়ানো। অনেকে বসেছে, কেউ কেউ ঘুরে ঘুরে কথা বলছে। বাইরে বিশেষ ট্রাফিক পুলিস, গাড়ি পার্ক করে রেখে লোকেরা মেয়েরা লনে আসছে। কাইয়ুম কিম্বা কাইয়ুমের বাবা প্রায় সকলের সঙ্গেই একটু হাসছে। খুব সামান্য রসিকতা কিম্বা অরসিকতাতেও লোকেরা মেয়েরা হো হো করে দমকা হাসি

ছাড়ছে। কোনো কোনো মহিলা লন পেরিয়ে বারান্দায় উঠে ঘরের দিকে চলে যাচ্ছে, ঐ জায়গাটাও আনোয়ার আলির চেয়ার থেকে বেশ স্পষ্ট দ্যাখা যায়।

একটি কোণে আলোকিত কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে বাঙালি সংস্কৃতি ও সমাজতন্ত্র চর্চায় কয়েকজন নিবেদিতপ্রাণ লোক ও মেয়ে বেশ সুন্দর একটি কর্নার তৈরি করে নিয়েছে। আনোয়ার আলির কাঙাল সাধ হয় সেও ঐখানে ওদের সঙ্গে ভিড়ে যায়। এদের মেয়েরা অল্পের মধ্যে সুন্দর সাজতে পারে। খুব মনোহারী কণ্ঠে কি সুন্দর বাচনভঙ্গি এদের। আজকাল ১৪/১৫ থেকে ৩০/৩২, এমন কি কোথাও কোথাও ৩৯/৪০—এই বয়সের অনেক মেয়ে এদের কণ্ঠ ও বাচনভঙ্গি নকল করে। তবে বাইরে ইমিটেশন শোনা এক কথা, আর একেবারে ওরিজিন্যাল শোনা—কোনো তুলনা হয়? ওখানে যাওয়ার জন্যে সে উসখুস করে, কিন্তু ওখানে কাউকেই তো চেনে না, কি করে যায়?

'তোমার ভাবী, বুঝেছো, এসব ব্যাপারে খুব ইন্সপায়ার করে। আমার মাদার-ইন-ল ওয়েস্ট বেঙ্গলের খুব এ্যারিস্টোক্র্যাট ফ্যামিলির মেয়ে। সৈয়দ বদরুদ্দোজা সাহেবদের সঙ্গে রিলেটেড, খুব কালচার্ড ফ্যামিলি। আমার মেজো শালাকে চিনবে, শাহরিয়ার, সৈয়দ শাহরিয়ার হোসেন, এবার সিএসেসে এ্যাপিয়ার করেছিলো, সিভিল সার্ভিসই পেয়েছে, লাহোরে ট্রেনিং চলছে, সেও গান-বাজনার ভক্ত। আমার একটা গান শুনেছো বোধহয়, খুব পপুলার হয়েছে, প্র্যাকটিক্যালি ওরই ইনিশিয়েটিভে রেকর্ড হলো। খোন্দকার রফিক আহমদ গেয়েছে, খুব হিট গান, "ওগো বন্ধু, আমায় তুমি দিলে ওগো কেয়ার কাঁটা আজ, কারে তুমি পরালে গো কেয়া ফুলের সাজ?"—তো এই গান'—কাইয়ুম একজন যুবতীকে নিয়ে এদিকে এলে হাফিজের আত্মজীবনী পাঠের আকস্মিক বিরতি ঘটে। যুবক সুবেশধারী ও সুপুরুষ, তার চেহারা খুব ধারালো। পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় কাইয়ুম হাফিজের সাহিত্যকীর্তির প্রশংসা করলে আনোয়ার আলির বুকটা চিনচিন করে ওঠে। ঐ যুবকের নাম ইকবাল হোসেন চৌধুরী, পশ্চিম ইউরোপের এক রাজধানীতে পাকিস্তানী দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র ছিলো যখন, সে আজ তেরো চোদ্দো বছর তো হবেই, বাম রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রায়ই আমতলায় বক্তৃতা করতো, রবীন্দ্র সঙ্গীত ও গণসঙ্গীত এই দুই ধরনের গান গাইতো এবং তখনকার নিয়ম অনুসারে সংগ্রামী কবিতা লিখতো। সেই সময় তার লেখা একটি কবিতা 'আমরা সূর্যটা আনবোই' পড়ে আনোয়ার আলি অন্তত দিন তিনেক খুব চাঙা সময় যাপন করেছিলো। প্রাক্তন কবি ইকবাল হোসেন চৌধুরী আজ ফের অনুপ্রেরণা দিলো গীতিকার অধ্যাপক হাফিজুর রহমানকে। তার আত্মচরিত বর্ণনা করবার প্রধান ইন্দ্রিয় জিহ্বা রূপান্তরিত হয় একটি ল্যাজে, লোমহীন ছোটো ল্যাজ মুখগহ্বরের ধ্বনিপুঞ্জে কি কারুকাজ করে যার ফলে এই সব বাক্য উৎসারিত হতে থাকে : 'আপনার নাম আমি বহুদিন থেকেই জানি। ইফ ইউ ডোন্ট মাইণ্ড, লেখা ছেড়ে দিয়ে আপনি ভারি অন্যায় করেছেন। রাদার, শুড

আই বি এ্যালাউড টু সে দ্যাট ইউ কমিট এ ক্রাইম? উই হ্যাভ বিন গিফটেড উইথ এ্যান এ-ক্লাস ডিপ্লোম্যাট, নো ডাউট এ্যাবাউট ইট, বাট এ্যাট দা কস্ট অফ এ্যান এ-ক্লাস পোয়েট।'

ইকবালের তৈরি-করা ইউরোপিয়ান হাসি দেখে আনোয়ারের ঠোঁট একটু একটু ব্যথা করে। এর মধ্যে লোকজন অবিরাম আসছেই। কাইয়ুম গেটে গিয়ে শেরোয়ানি পরা একজন নামকরা রাজনীতিবিদ ও তাঁর তিন চারজন স্তাবককে নিয়ে বারান্দায় চলে গেলো। সংস্কৃতি কর্নারের পরিমিত হাসি হঠাৎ একটু উচ্চকণ্ঠে শোনা গেলে আনোয়ার আলির শরীরে বড়ো কোলাহল সৃষ্টি হয়। কাইয়ুম ফের এদিক এলো, তখনো হাফিজের লাঙ্গুলচর্চা চলছেই, 'আমি বলি, লোকে যাই বলুক না, আমি অলওয়্ বলে আসছি, আমার ছাত্রদেরও বলি, এই ফরেন সার্ভিস, সিভিল সার্ভিসের কিছু এনলাইটেণ্ড লোকের জন্যেই আমাদের আর্ট কালচার এখনো টিকে আছে। কর্তাদের যা এ্যাটিচুড, অন্তত সো ফার এ্যাজ আর্ট এ্যাণ্ড কালচার ইজ কনসার্নড, সেটা ঠিক, আই মিন'—

'নট ভেরি এগ্রিয়েবল।' ইকবাল নিজেই হাফিজের বাক্য সম্পূর্ণ করে দিলে কাইয়ুম আনোয়ার আলির সঙ্গে ইকবালের পাঞ্জাবি স্ত্রীর পরিচয় করিতে দেয়, 'উই আর ফ্রেণ্ডস সিন্স আওয়ার আর্লি ইউথ।'

মিসেস ইরশাত হোসেন চৌধুরী আনোয়ারের চোখের মণিতে ও বুকের খাঁচায় লাল ও শাদা হাসি ফোটায়, 'আচ্ছা! আপনারা কি য়েক সোঙে স্কুলে পোড়তেন?' এই বাঙলা শুনতে বেশ মিষ্টি কিন্তু কামোদ্রেক করে না।

কাউয়ুম বলে, 'না, আমরা কলেজে একসঙ্গে পড়তাম। উই সাবস্ক্রাইবড টু দ্য সেম পলিটিক্যাল ভিউজ। কলেজে খুব পলিটিক্স করতাম আমরা।'

'ইজ ইট?' রূপসীর কণ্ঠ, নেত্রকোণ ও ঠোঁটে ছায়াছবির পর্দা কাঁপে, 'মাই গড! আই অ্যাম এ্যাফরেড অফ পলিটিশিয়ান্স। পলিটিক্স টেরিফাইস মি লাইক এনিথিং।'

আনোয়ার আলি সালেহা বেগমের ছেলে কলি একটা পা তুলে দিয়েছিলো তাদের মেয়ে পলির গায়ের ওপর। ছেলেমেয়ের মা ছেলেমেয়েদের ঠিকঠাক করে শুইয়ে একপাশে সরিয়ে রাখে। ছেলেমেয়ে অঘোরে ঘুমায়। বাইরে দ্বৈতকণ্ঠে কারা 'আরমান' চলচ্চিত্রের একটি গানের একটুখানি গেয়েই থেমে গেলো। সালেহা ফ্যাসফ্যাসে গলায় কি বলে, আনোয়ার আলি তার কথাও শোনে, কয়েক ঘণ্টা আগে শোনা মিসেস ইরশাত হোসেন চৌধুরীর গুঞ্জরণও তার কানে বাজে। উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের সামনে সরকার-বিরোধী কথা বলবার তৃপ্তিতে হাফিজ খুব অভিভূত হয়ে পড়ে। মিসেস চৌধুরী কথার জবাবে আনোয়ার কি বলবে কি বলবে ভাবতে ভাবতে রূপসীর মনোযোগ চলে যায় অন্য কোথাও, অন্য কোনো প্রসঙ্গে। আনোয়ার আলি শোনে হাফিজ তার কানের কাছে মুখ এনে বলছে, 'আমি কাউকে কেয়ার করি নাকি? দেখলে না, কেমন মিষ্টি কথায় গভর্নমেন্টকে দিলাম এক চোট।' মিসেস চৌধুরীর চেহারা একটুও মনে নেই। তার সংলাপ সবই স্পষ্ট মনে

পড়ে, কিন্তু চেহারা কোথায়? মেয়েটাকে কতো মনোয়োগ দিয়ে দেখলো, এদিক থেকে দেখলো, ওদিক থেকে দেখলো, কয়েকটা ঘন্টা যেতে না যেতেই সমস্ত ভুলে বসে আছে। দিনদিন স্মৃতিশক্তি ক্ষয় হতে হতে কোথায় এসে ঠেকলো? বয়স বেড়ে যায়, এতো তাড়াতাড়ি বয়স বাড়লে কি পোষায়? আনোয়ার আলি খুব জোরে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। এই দীর্ঘশ্বাসে সমস্ত উৎসব একটু উড়ে গিয়ে বড়ো এলোমেলো হয়ে যায়।

সালেহা বেগম বালিশ সাজায় পাশাপাশি। 'কি গরম। ইস্ কী পচা গরম' বলতে বলতে সে গলায়, ঘাড়ে ও বগলে পাউডার ঢালে। এসব দেখে আনোয়ার আলি বড়ো বিব্রত হয়। চোখের ঘুম ঘুম ছায়া কেটে যাচ্ছে সালেহার, ঘুমের জায়গার আসছে কাম, সরাসরি কাম। তার ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠ ক্রমশ ঘর্ঘর হচ্ছে, তার কথাও বেশ বোঝা যায় এখন : আসতে এতো দেরি করলে কেন? খুব খেয়েছো, না? তোমার বন্ধু খুব বড়োলোক, না? ধানমণ্ডিতে কি নিজেদের বাড়ি? মেয়ে দেখতে কেমন? মেয়ের বাবা কি কি দিলো তোমার বন্ধুকে? তুমি কোনো কাজের না। আমি গেলে ঠিক জেনে আসতাম, বুঝলে। খুব লোক হয়েছিলো, না? কি খাওয়ালো, এ্যাঁ?'

শুয়ে পড়তে পড়তে আনোয়ার আলি তার স্ত্রীর প্রশ্নমালার সংক্ষিপ্ত ও মোটামুটি সন্তোষজনক উত্তর দেয়। এখন নিয়মিত প্রাক-নিদ্রা রতিক্রিয়ার পালা। এই মেয়েটিকে অন্তর মিনিট বিশেক ভালোবাসতে হবে। ভয় হয়, সালেহা তার মূল্যবান সন্ধেবেলাটা তছনছ না করে ফেলে। তবে ভালো ভালো মেয়ে দ্যাখা গেছে বহু, সুখ তো আজ ওদের নিয়ে, সালেহা উপলক্ষ মাত্র।

আনোয়ার আলি অভ্যস্ত হাতে স্ত্রীর ব্লাউজের বোতাম, ব্রার হুক খুলতে গেলে সালেহা নিয়মিত ও ঘর্ঘর কণ্ঠে আওয়াজ করে, 'উঁহু, আজ থাক।' এবং আনোয়ারের আরো কাছে সরে আসে। অথচ আনোয়ারের রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়ে সেখানে ঠাণ্ডা সর পড়ছে। শীতল শরীরে একটু ধ্বনি শোনা যায়: কি হলো আজ একটুও ইচ্ছা করছে না কেন? কোনো কোনো দিন দুপুরবেলা অফিসে বসে সে পর্নোগ্রাফি পড়ে, সেদিন রাত্রিবেলা কিন্তু এই মেয়েটার শরীরেই বেশ টাটকা স্বাদ পাওয়া যায়। আজ ক্ষোভ হয়: যতোই সেক্সি হোক না, কায়দাটা এরা ঠিক রপ্ত করতে পারে না,–এই সালেহা টাইপের মেয়েরা। অথচ পারভেজের বৌটাকে দ্যাখো। পারভেজের বৌও তো বড়োজোর আই.এ ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে। বিয়ের সময় কলেজে কেবল ভর্তি হয়েছিল, পরে আই.এ কি আর পাস করেছে? অথচ দ্যাখো তার কথা বলবার ঢং কি, কি তার তাকাবার কায়দা! মেয়েটার সঙ্গে আলাপ হলো একেবারে শেষের দিকে, ওরা তখন বেরিয়ে যাচ্ছে, আনোয়ার আলির ঘাড়ে হাত দিলো পারভেজ।

'আমি অনেকক্ষণ থেকে মার্ক করছি। অনেক মোটা হয়ে গেছো আনোয়ার, চিনতে অসুবিধা হয়।'

তারপর পরিচয় করিয়ে দিলো পাশে দাঁড়ানো বৌয়ের সঙ্গে, 'আমার স্কুলের বন্ধু। আমরা একই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেছি, একই কলেজে পড়েছি, কলেজ থেকে বেরিয়ে আমি ইঞ্জিনিয়ারিঙে গেলাম, ও গেলো ইউনিভার্সিটি।'

আনোয়ার আলি ইউনিভার্সিটিতে পড়েনি। ঐ কলেজেই ১ বার ফেল করে অন্য কলেজ থেকে বি. কম পাস করেছিলো। তার শৈশবকালের বন্ধু এ খবরটিও জানে না দেখে আনোয়ার বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে মেয়েটিকে দ্যাখে। যে ধরনের চেহারা তাতে তার চোখেমুখে কলকল করে কথা বলবার কথা। কিন্তু সে খুব নিবিষ্ট-চিত্তে সংস্কৃতিসেবীদের অনুসরণ করছে। সুতরাং তার কণ্ঠে রুগ্ন সৌজন্য ও উচ্চারণে ঝাপসা কাম, 'ওর ছেলেবেলার বন্ধু আপনি? কতোকাল থেকে আলাপ আপনাদের অথচ একদিনো তো আসেননি আমাদের বাসায়। কি আশ্চর্য!'

আনোয়ার সমস্ত মন দিয়ে স্থায়ীভাবে তার স্মৃতিতে এঁকে নিতে চেষ্টা করছে মেয়েটাকে। সমস্ত শরীর দেখছে গোগ্রাসে, দেখে নিচ্ছে তার জামা, তার জামদানি শাড়ির কারুকাজ, কপালের লাল টিপ, হাতের রোগা চুড়ি, ফর্সা আঙুল, নখের রঙ।

'তুই তো অনেক আগেই বিয়ে করেছিস, না? ছেলেমেয়ে কটা হলো? আয় না একদিন।' আনোয়ার আলি পারভেজের ঠিকানা নেয়, তার কথার যথাযথ জবাব দেয় আর সুগঠিত একটি বাক্য বোনে পারভেজের বৌয়ের উদ্দেশ্যে, 'কতোকালের বন্ধুত্ব, কিন্তু দ্যাখাও তো হয় না কতোকাল। যাবো, একদিন অবশ্যই যাবো, আপনাদের বিরক্ত করে আসবো।' কিন্তু বলবো বলবো করতে করতে পারভেজের বৌ বলে, 'মিসেসকে নিয়ে চলে আসুন না একদিন, যে কোন রোববার সকালে আসবেন। প্লীজ আসবেন। না এলে ভারি রাগ করবো কিন্তু।'

পকেট থেকে গাড়ির চাবি বের করে হাতের তালুতে খেলা করতে করতে পারভেজ চলে গেলো বৌকে পাশে নিয়ে। এতো সাজানো বাক্যটি আনোয়ার আলির বলাই হলো না। এরকম সুযোগ কি আর পাওয়া যাবে?

মৃদু সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছিলো মেয়েটার শরীর থেকে। খুব মৃদু গন্ধ, খুব স্নিগ্ধ। এইতো কিছুক্ষণ আগে এতো কাছে দাঁড়িয়ে কথা হলো, অথচ মনে হয় কতোকাল আগেকার কথা। আবার দ্যাখো, এর চেয়েও কতো কাছে হাতের একেবারে ভেতরে সালেহার স্তন, এতো কাছে, তবু তাকে স্পর্শ করা যায় না কেন? দুটো ফাঁপা বেলুনের মত স্তনজোড়া ধরে আছে যে হাতে সেই হাতে কি রাবারের পুরু গ্লাভস?

'প্লীজ আসবেন, না এলে খুব রাগ করবো কিন্তু' সংলাপ মনে থাকে, নাকে এসে লাগে সুবাস, কিন্তু তবুও উৎসব, উৎসবের মহিলারা কতো দূরে রয়ে যায়। এদিকে সালেহার মুখ থেকে, বুক থেকে, হাত থেকে রক্তের নোনা ধোঁয়া বেরিয়ে ঘর মেঘলা করে দিলো। তার স্তনজোড়া ফুটছে টগবগ করে! কিন্তু আনোয়ার আলির শক-প্রুভ গ্লাভস খুলবে কে?

রেস্টুরেন্টের মাইকে এখন 'আওয়ারা হুঁ'। সিনেমা হল থেকে ফিরে যাচ্ছে সুখী জনগণ, তারা সবাই এ ছবির নায়ক, তাদের কারো কারো কণ্ঠে এই ছবির হিট গান। মাত্র ১ বার খুব জোরে সিটি দেওয়ার আওয়াজ শোনা গেলো, বোঝা যায় মেয়েদের সংখ্যা কম। সাময়িক নীরবতার পর সমবেত কণ্ঠের ধ্বনি ক্রমেই বাড়তে থাকে। জুয়ার আড্ডায় কি কোনো গোলমাল হলো? কিন্তু এই ধ্বনির টোন থেকে বোঝা যায়, উল্লসিত জনগণ কোনো সুখের ঘটনা উদ্‌যাপন করছে।

কিন্তু আওয়াজ তো ওখানেও ছিলো। কতো লোক এসেছিলো বিয়ের অনুষ্ঠানে, কতো মেয়ে। কি শান্ত, কি সিগ্ধ সেই ধ্বনি, আস্তে আস্তে চলছিলো টেপরেকর্ডার। বেশির ভাগই ওয়েস্টার্ন মিউজিক, মাঝে মাঝে রবীন্দ্রসঙ্গীত। 'এসো, এসো আমার ঘরে এসো, আমার ঘরে' এই গান শুনতে শুনতে একজন মহিলা বললো, 'বৌভাতের ফাংশনে খুব এ্যাপ্রোপ্রিয়েট, না?' সেই মহিলা কে?

এখানে সমবেত ধ্বনির সঙ্গে 'আওয়ারা হুঁ' অস্পষ্ট হয়ে আসছে। একবার রেকর্ড পাল্টানো হলো। এবার গানের কোনো কথাই আর বোঝা যাচ্ছে না। জনতা কি নিয়ে এতো উল্লাস করে?

আনোয়ার আলি তার শরীরের ভঙ্গি একটুও না পাল্টে কান পেতে বুঝতে চেষ্টা করে শব্দটা কিসের। সালেহার উত্তপ্ত মুখ থেকে বলকানো শব্দ বেরিয়ে আসে, 'কি হলো বাবা এতো রাতে? ইস্! মড়ারা কি নিয়ে হৈ চৈ করে?'

'দমাদম মস্ত কালান্দার–কার ভরা-স্বরে তীব্র আওয়াজ হলে জনতা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। বাইরের প্রবল শব্দে আনোয়ার আলির শিথিল হাত কাঠের টুকরার মতো পড়ে যায় তার নিজের ঠাণ্ডা বুকের কাছে। সে উঠে বসলো, 'দেখি তো এতো রাত্রে শালাদের কিসের এত সুখ দেখে আসি।'

দরজা খুললেই সরু বারান্দা, ৩ ধাপ সিঁড়ি, তারপরই রাস্তা। এই গলির মুখে ক্ষুদ্র ১টি জনতার ভীড়। এই ভীরে নানা বয়সের লোক, ছোটো ছোটো ছেলেও আছে কয়েকজন। এরা কোনো বাড়ির না, বস্তিরও নয়। বাজারে ঝাঁকা বয়ে, সিনেমায় টিকেট ব্ল্যাক করে ও লোহার পুলে রিকশা ঠেলে ওরা দিনাতিপাত করে এবং এর ওর বারান্দায় ও ফুটপাথে ঘুমিয়ে ও না ঘুমিয়ে এরা রাত্রিযাপন করে। এদের ১ জনকে আনোয়ার আলি ডাকলো 'এই ব্যাটা, কি হইছে?' ছোকরা আনোয়ার আলির দিকে একবার তাকায়, তারপর প্রবল স্বরে চ্যাঁচায়, 'দমাদম মস্ত কালান্দার।'

গোটা দৃশ্য এবার স্পষ্ট হলো। ওদের গলির মুখে খিজির আলির বাকেরখানির দোকানের গা ঘেঁষে, ১টা ল্যাম্পোস্টের নিচে ১টি পুরুষ কুকুর ও ১টি মহিলা কুকুর যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হয়েছে। জনতা কুকুররতি দ্যাখার উৎসবে মুখর, তারা নানাভাবে কুকুরদের উৎসাহিত করে। বড়ো রাস্তার উঁচু রোয়াকে জুয়াড়িদের আড্ডা থেকে কে ১টি গানের কলি ভাঁজছে, ১টি জনপ্রিয় গানের প্যারোডি, 'এই কার্তিক মাসে, দুই কুকুর এসে'—কিন্তু এ আড্ডা থেকেই আরেকটি উচ্চকণ্ঠ ধ্বনি ওঠে, 'আব্বে হালায়, এক খামচা নিমক লইয়া আয় না বে। নিমক দিলেই তো ছুইটা যায় গিয়া;

যা না পিচ্চি, লইয়া আয় না হালায়, কইতাছি নিমক দিয়া ফালা!' ফলে গানের বাকি অংশ আর শোনা যায় না। কিন্তু কে যাবে লবণ আনতে? কেউই তার অবস্থান পরিবর্তন করতে চায় না। জুয়াড়িদের জায়গাটা এমন যে এখান থেকে খেলতে খেলতেও সমস্ত দৃশ্যটা স্পষ্ট দ্যাখা যায়।

চার চাকার ঠেলাগাড়িতে স্তিমিত চুলার ওপর রাখা শাহী হালিমের মস্ত ডেকচি: এই পাড়ার ১জন লোক সন্ধ্যা থেকে রাত্রি ১২টা সাড়ে ১২টা পর্যন্ত হালিম বিক্রি করে রথখোলার মোড়ে। রাত্রি ১টার দিকে তার গাড়ি ঠেলে ঠেলে এই গলির ভেতর দিয়ে সে ঘরে ফেরে। গলির মুখে ভীড়, লোকটা বাধ্য হয়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে উৎসবে যোগ দেয়। ছোটো মাটির মালসায় করে হালিম ঢেলে দিচ্ছে সে: তলানির হালিম, ১ টুকরা মাংসও যাচ্ছে না। অল্প দামে প্রায় ঠাণ্ডা হালিম কিনে খাচ্ছে লোকজন। আহমদিয়া রেস্টুরেন্টের সামনে যে ছেলেটা রেকর্ডের গানের সঙ্গে শিষ দিয়ে পান বিড়ি সিগ্রেট বেচে, জুয়াড়িদের রোয়াক ঘেঁসে দাঁড়িয়ে সে এখন হালিম খাচ্ছে। জুয়ার আড্ডা থেকে ১স্কুটার ড্রাইভার তাস ফেলতে ফেলতে কুকুরজোড়া দ্যাখে এবং ১ মিনিট পর পর সিগ্রেটওয়ালাকে ধমকায়, "আব্বে দে না হালায় চুতমারানি।" কিন্তু সিগ্রেটওয়ালার গলায় ঝোলানো পান বিড়ি সিগ্রেটের ডালা, ১ হাতে হালিমের বাটি, আরেকটা হাতে এ্যালুমিনিয়ামের চামচ, তার ২ হাত জোড়া, কি করে সে সিগ্রেট দেয়?

'এই যে আনোয়ার সাব', আনোয়ার আলি ঘুরে দেখলো নসরুল্লা সর্দার তার শোবার ঘরের জানলা দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে। নসরুল্লা সর্দার এককালে এই মহল্লার প্রধান ছিলো; নবাব সলিমুল্লাহ সাহেব নিজে নসরুল্লার বাবাকে সর্দারীর তাজ দিয়েছিলেন ১৯০৭ সালে। এখন নসরুল্লার তেমন পাত্তা নেই। আনোয়ার আলি তার জানলার কাছে এসে দাঁড়ালে সর্দার সাহেব গজগজ করে, 'শুওরের বাচ্চাগো কারবারটা দ্যাহেন। হালায় বেশরম বেলাহাজ মানুষ, কি কই এ্যাগো, কন? মহল্লার মইদ্যে কতো শরীফ আদমী আছে, ঘরে বিবি বাল-বাচ্চা আছে, আর দ্যাখছেন খানকির পুতেরা কি মজাক করতাছে রাইত একটার সময়? দ্যাখছেন?'

নসরুল্লা নিজেও বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। এই জায়গাটা তার জন্যে ভালো হয়েছে, আনোয়ার আলির জন্যেও। এখান থেকে গোটা দৃশ্যের সম্পূর্ণটা চোখে পড়ে।

'আপনাগো অফিসের মইদ্যে ছাটাই ছটাই হইলো?' বোঝা যায় নসরুল্লা আনোয়ারের সঙ্গে জমাতে চাইছে। '৩০৩ এর মইদ্যে আছে নাকি?'

'হ্যাঁ, আমাদের চেয়ারম্যান তো আপনার প্রথমদিকেই আছে।' 'মালপানি তো বহুত বানাইয়া রাখছে আগেই। অহন অগো ধইরা ফায়দা কি?' কিন্তু আনোয়ার আলি কথা বলে সময় নষ্ট করতে চায় না। এই লোকটা সুযোগ পেলেই আত্মজীবনী বলতে শুরু করে। আত্মজীবনীর ব্যাকগ্রাউণ্ডে নবাব সলিমুল্লাহ ও নবাব হাবিবুল্লাহর সময়ের সৎ বৃটিশ রাজপুরুষদের সঙ্গে পাকিস্তানী সরকারী কর্মচারীদের তুলনামূলক আলোচনা।

১ হাতে জলের বালতি, বালতিতে ছোটো কাঁচের গ্লাস, অন্য হাতে ছোটো ১টি কয়লার উনুনে চায়ের কেতলি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় 'চা-গ্রাম'। আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে নসরুল্লা ঘরে চলে যায়। জানলা দিয়ে কুকুরজোড়া শেষবারের মতো দেখে নিয়ে সে সশব্দে জানালা বন্ধ করে।

নসরুল্লার জানালা বন্ধ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ১টা কুকুরের গায়ে এসে পড়লো ইঁটের ছোটো ১টি টুকরা। দম্পতি লজ্জা কিংবা ভয়ে, অথবা লজ্জা এবং ভয়ে একটু একটু সরতে থাকে। কিন্তু এই অবস্থায় হঠাৎ বিছিন্ন হওয়া ওদের পক্ষে অসম্ভব। কিংবা সেরকম ইচ্ছাও বোধ হয় ওদের নেই।

হেমন্তকালের আকাশ জুড়ে গাভীর মতো চরে বেড়ায় মেঘশাবকের দল। পাতলা স্বচ্ছ কুয়াশার মাথায় জলে লালচে হলদে রঙের মস্ত চাঁদ; চাঁদ থেকে জ্যোৎস্নার সঙ্গে ফর্সা হাওয়া বয়ে এসে আনোয়ার আলির করোটির ভেতরে সুড়সুড়ি দিলে তার বড্ডো হাসি পায়। ওর ভাগ্যটা ভালো, জুয়াড়িদের আড্ডা থেকে ১টা তীক্ষ্ণ ধ্বনি শোনা গেলো, 'হায়রে বাইল্য বন্দু!' সমস্ত জনতা ফেটে পড়লো অট্টহাসিতে। আনোয়ার আলিও প্রাণ খুলে হাসে। সম্প্রতি ১টা বাঙলা ফিল্মে এই কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। আনোয়ার আলি সেই ছবি দেখেছে, ছবি দেখতে দেখতে সালেহা বেগমের সঙ্গে সেও খুব হেসেছিলো।

রাস্তার অন্যান্য কুকুর বড়ো রাস্তার অন্য দিকে জটলা পাকায়। শুয়ে আছে কেউ শিথিল ভঙ্গিতে, কেউ দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ করে হাসে। নিঃসঙ্গ ১জন কুকুর, মানুষ ও বোধহয় কুকুরদেরও দুর্বোধ্য কোনো যন্ত্রণায় দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। ১জন আবেগপ্রবণ কুকুর উৎসব থেকে একটু দূরে, রাস্তার মোড়ে রাখা ঠেলাগাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে গোলগাল মিষ্টিমিষ্টি চাঁদের দিকে বিষন্ন চোখ তুলে মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে খুব করুণ সুরে কাঁদে।

'জুম্মন আলি, আব্বে জুম্মন আলি' ১টি নতুন কণ্ঠস্বরে কুকুর ও মানুষ সবাই ফিরে তাকায়। রুটির দোকানের মালিক তোতামিয়া তার বালক কর্মচারীর খোঁজে চিৎকার করে, 'আব্বে চুতমারানী, এহেনে খাড়াইয়া কিয়ের রং দ্যাহো? রাইত বাজে একটা, আর তুমি হালায় খানকির বাচ্চা এহেনে রঙবাজি করো? তোমার কোন বাপে গিয়া কাউলকা দোকান খুলবো?'

জুম্মন আলি একটু আবদেরে গলায় বলে, 'কি হইছে? ব্যাকটি রুটিই তো পাকিন কইরা রাখছি।'

'আব্বে মাদারচোদ, তামানটি রাইত বায়োস্কোপ মারলে বিয়ানে দোকান খুলবার পারবি?' জুম্মন আলি খুব পরোয়া করে বলে মনে হয় না। শেষবারের মতো কুকুররতি দেখে তোতামিয়ার সঙ্গে চলে গেলো।

জুয়াড়িদের ভেতর থেকে কে যেনো জোরে বললো, 'জুম্মন আলি তো কুত্তার বায়োস্কোপ দেইখা গেলো, অহন তুমি হালায় বায়োস্কোপ মারো জুম্মনরে লইয়া, হেইডা দ্যাখবো ক্যাঠায়?'

কুকুরজোড়ার ধার ঘেঁষে আরেকটি ঢিল পড়লো। এই ঢিলটা তাক করা হয়েছিলা ল্যাম্পোস্টের বাল্বে। ল্যাম্পোস্টে টং করে আওয়াজ করে ঢিল ফিরে আসে। স্যাঁতস্যাঁতে আলোর ঘোলাটে বাল্ব অখণ্ড প্রতাপে জ্বলতেই থাকে।

ঘরে ঢুকে আনোয়ার আলি দরজা বন্ধ করতে করতে খুব ভরা ও সম্পূর্ণ কণ্ঠে ডাকলো, 'সালেহা!'

ঘুম ঘুম গলায়, আদুরে ভঙ্গিতে সালেহা বলে, 'এতোক্ষণ তুমি কি করছিলে, এ্যাঁ? বাইরে কি হয়েছে, বলো না।'

'বাইরে লোকজনের জটলা দেখে একটু মোড়ে গিয়েছিলাম।' বিছানায় শুয়ে 'আমার শেলী' বলে আনোয়ার আলি স্ত্রীকে কাছে টেনে নিলো।

'এতো হৈ চৈ কিসের এ্যাঁ, বলো না?'

'আর বলো না শেলী, দুটো কুকুরের ইয়ে দেখে লোকজন শালা–!' আনোয়ার আলির হাত থেকে রবারের পুরু গ্লাভস খুলে গেছে। চামড়ার আবরণটাও উঠে যাচ্ছে নাকি?

'রাত একটার সময় আর কাজ নেই, যতো সব ভালগার লোকজন।'

সুখ ও উত্তেজনায় আনোয়ার আলির উত্তপ্ত কণ্ঠ থেকে, মুখ থেকে আঠালো ধ্বনি চুঁয়ে পড়ে।

প্রতিশোধ

ইচ্ছা করলে ১০/১২ দিনের ছুটি নেওয়া যেতো। কিন্তু বাবা মারা না গেলে ছুটিগুলো মিছেমিছি নষ্ট হবে। 'ফাদার সিরিয়াস, কাম শার্প' মানেই কি আর অবধারিত মৃত্যু? আর ফাইন্যাল কিছু যদি ঘটেই যায় তো ঢাকা থেকেই ছুটি বাড়িয়ে নেওয়া যাবে। এইসব বিবেচনা করে অসুস্থ পিতাকে দেখবে বলে ১ সপ্তাহের ছুটি নিয়ে ওসমান ঢাকা রওয়ানা হলো। বাবা যদি এর মধ্যে সেরে ওঠে তো সময়টা বরং বাড়ি মেরামতের কাজে লাগানো যাবে।

স্টেশনে এসে শোনা গেলো ট্রেনের এখনো ঢের দেরি। ট্রেন আজকাল বড়ো লেট করে, রোজ কোথাও না কোথাও গোলমাল লেগেই আছে। স্টেশনে শুধু লোক, চারদিকে লোক, ওসমানের চেনাশোনার মধ্যেই পাওয়া গেলো অন্তত ১০/১২ জন। এরা ওসমানের সঙ্গেই চাকরি করে, ৩/৪ জন আশেপাশের জুট মিলের লোক। ওসমানের অসুস্থ পিতার সম্ভাব্য মৃত্যুর কথা হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ার মাঝে মাঝে গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করতে করতে সবাই মিলে খুব গল্প করলো। নানারকম দুশ্চিন্তায় সবাই কাতর ঃ জিনিষপত্রের দাম কি ভীষণভাবে বেড়ে যাচ্ছে; প্রত্যেকটা দিনই কোথাও না কোথাও ব্যাঙ্ক লুট হচ্ছে; ঢাকার কোনো সিনেমা হলে ভালো ছবি চলছে না, কোলকাতার ছবি আসে না কেন? ফরমান আলী-নিয়াজীর ফাঁসি হওয়া উচিত; ঢাকায় সিমেন্ট পাওয়া যাচ্ছে না; ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েরা অধঃপতনে যাচ্ছে; সিমেন্ট না পেলে ওদের এই প্রজেক্টের কাজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে; এখন কতো সিমেন্ট দরকার, পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী দেশ জুড়ে সমস্ত পুল, ব্রীজ, রাস্তা, বাড়ি ধ্বংস করে দিলো, সিমেন্ট না পেলে এসব ঠিকঠাক হবে কি করে? এখন ইন্ডিয়া যদি দেয়! ইন্ডিয়া দেবে কি? ইন্ডিয়ার লোকজন এসে যন্ত্রপাতি, ওষুধপত্র, পাট, কাপড়-চোপড়, ধানচাল—সব নিয়ে যাচ্ছে ওপার, লোপাট করে দিলো দেশটা, তো শালারা আবার দেবে কি?

প্রথমে পাকিস্তানের ওপর, পরে ইন্ডিয়ার ওপর ওসমানের খুব রাগ হলো। তবে এই সময় ট্রেন এসে পড়ায় ওর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে ট্রেনের ছাদে বসে থাকা, পাদানিতে ঝুলন্ত ও জানলায় জানলায় মুখ বাড়িয়ে দেওয়া, সমস্ত ট্রেনটার

আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো যাত্রীদের ওপর। ট্রেন দ্যাখা যায় না, ট্রেনের সমস্ত শরীরে কিলবিল করে লোক, শুধু লোক।

এর মধ্যেও ট্রেনে ওঠা গেলো। এয়ার কন্ডিশনড কামরার করিডোরে ভীড় করলেও ভেতরে ঢুকতে সাহস পায়নি লোকজন। ঐ কামরা থেকে বেরিয়ে এলো ওদের প্রজেক্টের ৩ নম্বর ডিভিশনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার; নিশ্চয়ই চট্টগ্রাম থেকে আসছে। এ লোকটি ওসমানদের একজন বস, সুতরাং এর ওপর একটু রাগ হলো। সঙ্গে সঙ্গে মুখটা করুণ করে মিনমিন করে উঠলো, 'ঢাকায় যাচ্ছি স্যার, ফাদারের খুব অসুখ।'

ট্রেন ছেড়ে দিলে ওসমান চিৎকার করে ওঠে, 'স্যার চিটাগাঙে কি সিমেন্ট এ্যাভেলেবল?' স্টেশনের কোলাহল, ট্রেনের আওয়াজে ওর কথা বুঝতে না পেরে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার প্রশ্নবোধক চোখে তাকিয়ে থাকে। বিপুল জনভারাক্রান্ত ট্রেন হেলেদুলে প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করে।

এয়ার কন্ডিশনড কামরায় মিষ্টি মিষ্টি ১টা গন্ধ পাওয়া যায়। ট্রেন এই চলে, আবার কোনো গ্রামের কাছাকাছি এলে কেউ না কেউ চেন টানে। চেন টানলে ট্রেন থামে, খুব জোরে সুদূর হুইসেল বাজিয়ে ট্রেন ফের চলে, আবার থামে। ১টা স্টেশনে ১জন লোক উঠলে ওসমান সোজা হয়ে বসে, চেকার টেকার নাকি? ওর টিকেট সেকেন্ড ক্লাসের, চেকার শালা আবার খারাপ কথাবার্তা বলবে না তো? লোকটাকে ভালো করে দেখবার পর নিশ্চিন্ত হয়ে সে বাইরে তাকায়। কাঁচের ওপারে গ্রাম, বিল, টেলিগ্রাফের তার, শালিক পাখি, কালো বালক, গোরু, ঝলসানো গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে দগ্ধ বাড়িঘর। ভেতরের ঠাণ্ডা গন্ধটা চেনা চেনা ঠেকে এই গন্ধটা কোথায় পেয়েছে, কোথায় পেয়েছে তাই খুঁজতে খুঁজতে ওর ঘুম পায়। তন্দ্রা, ঘুম ও জাগরণের মধ্যে টলতে টলতে সে তখন ১টা স্বপ্ন দ্যাখে।

এই স্বপ্ন ওসমান প্রায়ই দ্যাখে, প্রায়ই। ওদের প্রজেক্টের যে এলাকা তার শেষ প্রান্তে নদীর ঠিক ধার ঘেঁষে ১টা মস্ত বড়ো ক্রেন। খুব উঁচু ক্রেন, লোহার মই দিয়ে দিয়ে তার একেবারে মাথায় ওঠা যায়। ওসমান এর ১০/১২টা ধাপও ওঠেনি, ৫/৬ ধাপ উঠলেই বড়ো অসহায় মনে হয়, মনে হয় কোনোদিন আর নিচে নামা যাবে না। কাজও ওর এ্যাকাউন্টসে, সুতরাং সখ করে না এলে ওকে এদিকটায় আসতে হয় না। স্বপ্নের ভেতরে ওসমান মই দিয়ে অনেকটা ওপরে উঠে যায়, আর কয়েকটা ধাপ কোনোরকমে ম্যানেজ করতে পারলেই একেবারে চূড়া স্পর্শ করা যাবে। কিন্তু উঠতে উঠতেই হঠাৎ পা হড়কে পড়ে যায়। পড়তে পড়তে দ্যাখে নিচে মেঘনার পাতালমুখী কালো জল কেবলি নিচের দিকে গড়িয়ে পড়ছে। স্বপ্নেও না, বাস্তবেও না, ওসমান কোনোখানেই সাঁতার জানে না। ভীষণ ভয় পেয়ে আকণ্ঠ পিপাসায় কাঁটাবেঁধা ঢোঁক গিলতে গিলতে সে কেবল গভীর জলের অন্ধকার স্রোত দ্যাখে। জল দেখতে দেখতেই এখন তার ঘুম কিংবা তন্দ্রা ভেঙে গেলো। প্রতিবার এমনি হয়। পা হড়কে যাওয়ার ২/১ পলকের মধ্যে, মেঘনায় পৌঁছবার আগেই ঘুম

ছিঁড়ে স্বপ্নটা ১ টুকরো তুলোর মতো কোথায় যে উড়াল দেয়, কিছুতেই ঠাহর করা যায় না। কোনো কোনোদিন গভীর ঘুমের মধ্যেই সে স্বপ্ন বদল করে।

এই স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের পরও অনেকক্ষণ ট্রেন চলে। কেউ চেন টানলে ট্রেন থামে, ১৫ মিনিট পর ফের চলে। ওসমানের চোখ জোড়া পালা করে করকর করে. একবার বাঁ চোখ, একবার ডান চোখ। বারবার হাই ওঠে. রেলের লোকদের ওপর রাগ হয়. ফের ঘুম ঘুম চোখে লোকজন ও বাইরের গাছপালা দ্যাখে।

জাপার্টা গোঁফ, জুলফি ও লম্বা চুলের আড়ালে আনিসের ফর্সা মুখটাকে গাছপালাগুল্ম গজানো শ্বেত পাথর বলে ভুল হতে পারে। ২ চোখ ভরা তেতো আলো নিয়ে ১টা হোন্ডা ঠেলতে ঠেলতে আনিস বাইরে আসছে। এই হোন্ডাটা আগে কখনো দ্যাখা যায় নি, বোধহয় ইদানিং জোগাড় করেছে; তাহলে ওর ভেস্‌পা কোথায়? আর পুরানা পল্টনের ১ বোম্বেওয়ালার ফোক্সওয়াগন গাড়ি নিয়ে এসেছিলো, সেই গাড়ি কি লোপাট হয়ে গেলো? ওসমানকে দেখে আনিস বললো,

'হ্যালো, ভাইয়া।'

'কোথায় যাচ্ছিস?

'আব্বার মেডিসিন নিয়ে আসি। তোমার ট্রেন কি লেট নাকি?'

'হুঁ। কোথায় যাবি ওষুধ আনতে?'

'গুলিস্তান তো যাই। গুলিস্তান বায়তুল মোকাররমে না পেলে মিটফোর্ডের দিকে যেতে হবে। হার্ডলি ওয়ান আওয়ার। তুমি যাও, ঘরে যাও।'

কিন্তু বাড়িতে পৌঁছে ওসমানের মনে হচ্ছে ঘরের চেয়ে বারান্দাই ভালো।

'আব্বা এখন কেমন?'

'অনেক বেটার। যাও, ঘরে যাও। ডিলিরিয়ামে আব্বা শুধু তোমার কথাই বলছিলো। যাও।'

ওসমানের তো আরো কথা বলতে ইচ্ছা করে। এতো সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানবার থাকে, কৈ ট্রেনে তো এসব কিছুই মনে পড়েনি।

'কে দেখছে এখন?'

আনিস হোন্ডায় স্টার্ট দিলো. 'চার পাঁচদিন আগে নুরুল ইসলামকে কল দেওয়া হলো। সিরাজ শালা ট্রিটমেন্ট ভালোই করে, সিম্পল এম. বি. বি. এস., তবু দ্য বাগার ইজ এ গুড ফিজিশিয়ান। কিন্তু শালা রাত সাড়ে দশটার পর কোথাও যাবে না: মাসখানেক আগে স্বামীবাগে করো হাইজ্যাক করে ওর টাকা পয়সা কেড়ে নিয়েছে, তারপর থেকে রাত্রিবেলা আর কোথাও বেরোয় না।'

আবদুল গনির ঘরের দরজায় পৌঁছলে স্পিরিট, ডেটল, কমলালেবু, ওষুধপত্র ও রোগের মিলিত গন্ধে ওসমানের ভয় ভয় করে। আবদুল গনির দীর্ঘ শরীর জুড়ে নীল রঙের পাতলা কম্বল ধীরে ধীরে ওঠে আর নামে। তার নিশ্বাস নেওয়ার ধ্বনি খুব মৃদু। সারারাত হয়তো তার ভালো ঘুম হয়নি, হয়তো কয়েক ঘণ্টা মাথাব্যথায় কষ্ট পেয়ে একটু আগে চোখ জোড়া বুঁজেছে। এখন ঘরে ঢুকলে তাকে বিরক্ত করা হবে, এই বিবেচনা করে ওসমান বাথরুমে গেলো।

বাথরুমে শাওয়ারের নিচে দাঁড়ালে চোখে পড়ে বেসিনের ওপর নতুন ১টা তাক দেওয়া হয়েছে. এটা আগে ছিলো না। তাকের ওপর কলগেট টুথপেস্ট, বিদেশী দামী সাবান, শ্যাম্পু. শেভিং ক্রিম. ভাঙা একটা পেয়ালা, ডেটল। এই বোতলটা বোধ হয় আফটার শেভ লোশনের। এসব দামী দামী বিদেশী জিনিস এই বাথরুমে আগে কোনোদিন দ্যাখা যায়নি। বেসিনের সামনে তাকের ওপর এখন ১টা আয়না দেওয়া দরকার। হাসান আলী ওয়ালী ভাইয়ের দোকানটা তো আনিসের বন্ধুবান্ধবই দখল করেছে। ওখানে গিয়ে আলফাজ কি লিটনের সঙ্গে দ্যাখা করলেই একটু কম দামে ভালো বেলজিয়াম গ্লাস পাওয়া যাবে। ঐ সঙ্গে ফরাশগঞ্জে একবার সিমেন্টের খোঁজ করতে হবে। রড. ইঁট সব পড়ে রয়েছে মিছেমিছি, সিমেন্ট না পেলে বাথরুমটায় হাত দেওয়া যাচ্ছে না।

গোসল করলে যে রকম হবে ভাবা গিয়েছিলো সে রকম হলো না। শ্যাম্পু দেওয়ায় মাথার ভেতরটা নির্ভার মনে হয়, কিন্তু ঠিক ফ্রেশ লাগছে না, বরং ঘুম পাচ্ছে। গেঞ্জিটা গায়ে দিয়ে ওপরে নিজের ঘরে একটু গড়িয়ে নেবে—এই ভেবে গেঞ্জির গলায় হাতমুখমুণ্ডু গুঁজে দেওয়ার সময় হঠাৎ মনে পড়ে অসুস্থ বাপের সঙ্গে এখন পর্যন্ত দ্যাখাই করা হলো না।

কিন্তু ঐ ঘরে কারা যেনো এসেছে। আবদুল গনির ডিলিরিয়ামে বিধ্বস্ত কণ্ঠস্বর পুরোনো দরজা খোলার মতো ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ করে। বিছানার বিপরীত দিকে বেতের চেয়ারে আবুল হাশেমের মাথার পেছনটা উঁকি দেয়. আরেকটা চেয়ারে নার্গিস। হাশেমকে দেখে ওসমানের রাগ হলো, এই লোকটাকে কিছুতেই এড়ানো যাচ্ছে না। নার্গিস পরম যত্নের সঙ্গে শাড়ির আঁচলের প্রান্ত খুঁটছে দেখে ওসমানের বুকের লোম শিরশির করে ওঠে। নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে সে খুব যত্ন করে চুল আঁচড়ায়। ডান দিকের কয়েকটা চুল তার পাকা, ৩টে পাকা চুল ঠিকমতো ধরে তুলে ফেলতে লেগে গেলো পুরো ৪টে মিনিট।

চুল আঁচড়ানো ও পাকা চুল তোলার কাজ শেষ করে ওসমান ঘরে ঢুকলে আবদুল গনির কথা শুনতে শুনতেই হাশেম একটু হাসলো। ঢেউ-তোলা ঠোঁট এদিক ওদিক বিছিয়ে নার্গিস ফের গুটিয়ে নিলো। আর ওসমানের হাসি তো তৈরি করা ছিলো দরজার ওপার থেকেই। আবদুল গনির কাছে গিয়ে একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ওসমান বললো, 'আব্বা।'

কিন্তু এইসব সৌজন্যমূলক হাসিতে কোনো ফল হয় না। ঘর যেমন আড়ষ্ট ছিলো, তেমনি রইলো। আবদুল গনির খাটের স্ট্যান্ড ধরে দাঁড়িয়ে থাকা আনিসের ঠোঁটজোড়া একেবারে টাইট করে সাঁটা, কপালে কোঁচকানো রেখা মুণ্ডুর আঁচে তিরতির করে কাঁপে।

আবদুল গনি বড়ো উত্তেজিত, 'বাজে কথা বলো না,' সে কেবল আবুল হাশেমের দিকে তাকিয়েই কথা বলে, 'হেয়ার স্ট্রিটের বাড়ি আমার দরকার। এরা দুই ভাই বিয়ে-শাদি করলে কি একসঙ্গে থাকবে? আমি কখন আছি, কখন নাই।

মরার আগে আমি সব ঠিকঠাক করে না দিলে এরা নিজেদের মধ্যে গোলমাল করবে না?'

'বেশ তো, আপনার মেয়েকে থাকতে দিয়েছিলেন তো আপনিই। আপনার মেয়ের ছেলেমেয়েই সেই বাড়িতে থাকে; আপনার বাড়ি আপনি ফেরত নেবেন তো কার কি করার আছে?' আবুল হাশেম নিস্তরঙ্গ কণ্ঠে কথা বলে। সে বরাবরই স্বাভাবিক স্বরে বক্তব্য কি প্রতিবাদ ঠিকঠাক প্রকাশ করতে পারে।

'বাড়ি দিয়েছিলাম আমার মেয়েকে, মেয়ের কষ্ট দেখে ভাড়াটে উঠিয়ে দিয়ে তোমাদের থাকতে দিলাম। সেই মেয়েকে তো তুমি মেরেই ফেললে। আমার একমাত্র মেয়ে—।'' আবদুল গনির ফ্যাসফ্যাসে গলার ভেতর অসমাপ্ত বাক্য ক্রমে ঝাপশা হয়ে মিলিয়ে যায়।

আনিস খুব শান্ত ও কঠিন ধ্বনি সৃষ্টি করে হাশেমকে বলে, 'আপনি কি আব্বাকে বিরক্ত করতে এসেছেন?' তার এই কঠিন ভঙ্গিটি আবুল হাশেমের কাছেই শেখা।

আনিসকে সরাসরি অস্বীকার করে আবুল হাশেম আবদুল গনির চোখে তীক্ষ্ণ তাকায়, তার স্বাভাবিক স্বরে সে বলে, 'আপনার মেয়েকে আমি মেরে ফেলিনি, আপনার মেয়ে মারা গেছে এ্যাক্সিডেন্টে। আপনার মেয়ে তো আমারও স্ত্রী ছিলো, তাকে আমি মারবো কেন?'

ওসমান বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে খুব ঝাঁঝালো একটা জবাব দিলো, কিন্তু মনে মনে, 'তুমি আমার বোনের মার্ডারার। ঐ নার্গিসকে বিয়ে করার লোভে গাড়ি এ্যাক্সিডেন্ট করিয়ে আমার বোনকে খুন করেছো।' কিন্তু ওসমানের স্বগতোক্তি অন্যে শুনবে কি করে? প্রত্যেকের মনোযোগ আনিসের ক্ষিপ্ত সংলাপের দিকে, 'ডোঞ্চু ফিল এ্যাশেমড টু টর্চার এ ডাইং ওল্ড ম্যান?' আনিসের সাজানো ইংরেজি শুনে মনে হয় অনেকক্ষণ ধরে সে মনে মনে এই বাক্যটি গঠন করেছে।

আবদুল গনির চোখের গভীর কোটরে জল জমে ওঠে। শোক কিংবা অপমানের টানে জোয়ার লেগে সেই জল বেড়ে উঠলে মনে হয় তার কপালের নিচে কেউ একজোড়া সমুদ্রের কার্টুন এঁকে রেখেছে। সে তখন একটু একটু ফোঁপায়, 'আমার কপালের দোষ! আমার কপাল!'

তার এই ক্ষীণ ও ব্যর্থ বাক্যপ্রয়াসের মাঝখানে উঠে দাঁড়ালো আবুল হাশেম। ওসমানের মুখের মধ্যে জিভটা কুণ্ডলি পাকিয়ে হাঁপায়। একটু ফাঁক করেই সে মুখটা বন্ধ করে, ফের ফাঁক করে, ফের বন্ধ করে। সে কেবল ভাবে, এতো উত্তেজিত কথাবার্তার পর লোকে কি করে এমন স্বাভাবিকভাবে উঠে দাঁড়ায়? আবুল হাশেম নার্গিসকে বলে, 'চলো।'

তারপর প্রত্যেকের দিকেই একেকবার তাকালো, হাসলো, একটু বিব্রত হাসি, বিব্রত হওয়াটাও ওজন করা, 'চলি।'

নার্গিস উঠে দাঁড়ালে তার বেগুনী, শাদা ও সবুজ জামদানি শাড়ির খসখস আওয়াজ এবং তার কোনো অন্তর্বাস কি শরীরের মিষ্টি ও ঝাঁঝালো সুবাস ওসমানের নির্ভার করোটিতে ঢুকে শুয়ে থাকে মগজের এক কোণে।

এই নার্গিস হলো আবুল হাশেমের দ্বিতীয় স্ত্রী, প্রথম স্ত্রী রোকেয়ার ছেলেবেলার বন্ধু। ওসমানদের বাড়ির সকলেরই খুব ইচ্ছা ছিলো, এই মেয়েটিই ওসমানের বৌ হয়ে আসুক। ওসমানেরও ছিলো, তবে এজন্য সে সক্রিয়ভাবে কিছু করেনি। জীবনে একবার সে ওয়েস্ট পাকিস্তানে গিয়েছিলো। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় ডিপার্টমেন্টের ছেলেদের সঙ্গে। ওসমান সেখান থেকে নার্গিসকে ১টা চিঠি লিখেছিলো সোয়াত কি দীরের বর্ণনা দিয়ে। ১টি মাত্র চিঠি, সেখানে নিজের কথা কিছুই লেখেনি। রোকেয়ার কল্যাণে সেই চিঠির কথা ফাঁস হয়ে গেলে দুই বাড়িতেই একটু হাসাহাসি হয়েছিলো। তো এসব ব্যাপার অনেক আগের।

খাবার ঘরে চা খেতে বসলে আনিসের কপালের স্থায়ী কোঁচকানো রেখাগুলো করোটির তাপে প্রায় বলকাতে শুরু করে।

'এই লোকটা, এই বেটা হলো ন্যাবারি শয়তান। কি অডাসিটি দেখলে? আব্বা নেহায়েৎ সিক, আদারওয়াইজ আই উড হাড গিভন দ্য বাগার এ থরো বিটিং!'

এই সংকল্প ওসমানের বহুকালের, 'টু গিভ দ্যা বাগার এ থরো বিটিং।' যখন হাশেম আর ওসমানের বোন রোকেয়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজেরা বিয়ে করলো সেই সময়কার বাসনা। আবুল হাশেম তখন সাংবাদিক, বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ও সেই সূত্রে একজন সংস্কৃতিসেবী। বাপ-মার ইচ্ছার বিরুদ্ধে রোকেয়া বিয়ে করলো, কিন্তু বেচারাকে খুব কষ্ট করতে হয়েছে। কলতাবাজারের পেছনে নাসিরুদ্দিন সরদার লেনে ড্যাম্প একটা ঘরে বসবাস, ৩টে ছেলে হলো ২ বছর ঘুরতে না ঘুরতেই, বামপন্থী দৈনিক ঠিকমতো মাইনে দেয় না হাশেমকে; বড়ো টানটানি গেছে রোকেয়ার। আবুল হাশেমকে তখন মারতে ইচ্ছা করতো ওসমানের। কি ভণ্ড! এদিকে এলোমেলো পাজামা পাঞ্জাবি স্যাণ্ডেলে চষে বেড়াচ্ছে ঢাকার এমাথা ওমাথা, মুখে সর্বদা দুস্থ দুস্থ ভাব, মস্কো কোলকাতা ছাড়া কথা নেই শালার; সন্ধ্যাবেলা নিয়মিত সংস্কৃতিচর্চা; গণসঙ্গীত ছাড়া কোনো গানই কানে রোচেনা। আবার দ্যাখো, আমার নিরীহ বোনটাকে ভাগিয়ে নিয়ে বিয়ে করলো।—পরে আবদুল গনি অবশ্য সমস্ত ব্যাপারটা মেনেই নিয়েছিলো, এমন কি নিজের একটা বাড়িও লিখে দিলো মেয়েকে। আবুল হাশেমও বিয়ের ৩/৪ বছর পরই সাংবাদিকতা ছেড়ে দেয়। সংস্কৃতি ও সমাজতন্ত্রের চর্চা করে, ব্যবসা করে সে এখন মস্ত বড়োলোক।

'দ্যাখো না, শালাকে আমি কি করি! আব্বা একটু সেরে উঠুক, শালাকে আমি একেবারে সাফ করে দেবো, টোটাল এ্যানিহিলেশন!'

আনিসের কথা শুনে ওসমানের শরীর জুড়ে সুড়সুড়ি লাগে। কিন্তু ঠিক এ ধরনের সুড়সুড়ি লাগাটা ওর স্বভাবে নেই, এর প্রতিক্রিয়াও সে জানে না। তাড়াতাড়ি করে তাই বলে, 'আব্বাও ঐ রকম না বললেই পারতো। কাউকে খুনী বললে তো তার চটবারই কথা।'

'আব্বা কি বলেছে?'

আনিস খুব শান্ত হয়ে গেলো। তার কপালে কোনো বলকানো রেখা দ্যাখা যাচ্ছে না। মনে হয় সেখানে ঠাণ্ডা সর জমছে। এই শীতল কপাল দেখে ওসমান অসুবিধায় পড়ে যায়; সে কেবল মিনমিন করে, 'রোকেয়া তো এ্যাক্সিডেন্টেই মারা গেছে।'

'হাউ ডু ইউ ফিল শিওর এ্যাবাউট ইট?'

উচ্ছ্বসিত পুলকে ওসমান প্রায় দিশেহারা হলেও সে কিছুই বললো না। তার খুব রাগ হলো হাশেমের ওপর। হাশেমকে ফের মারতে ইচ্ছা করে। কিন্তু এখানে এসব বলা কি ঠিক? আনিস একজন তরুণ মুক্তিযোদ্ধা। ওকে আবুল হাশেমের ওপর ক্ষেপিয়ে তোলাটা কি উচিত হবে? এর ফলাফল কি খুব মারাত্মক হতে পারে না?

ওসমান তাই বললো, 'কিন্তু হাশেম যে ইচ্ছা করেই এ্যাক্সিডেন্ট করলো তার প্রমাণ কি?'

'ভেরি ক্লিয়ার! ভেরি ক্লিয়ার! বাস্টার্ড গাড়ি চালাচ্ছিলো, এ্যাক্সিডেন্ট হলো আর স্টুপিড শালা বেরিয়ে পড়লো গাড়ি থেকে আনহার্ট, আর রাস্তার নিচে পানির মধ্যে পড়ে মারা পড়লো আপা। এই শুওরের বাচ্চার গায়ে একটা আঁচড়ও লাগলো না, এসবের মানে কি?'

ওসমান কোনো কথা না বলে কেবল ১টার পর ১টা রুটির স্লাইসে ১ বার জেলী ১ বার মাখন লাগিয়ে চালান করে দিচ্ছে পেটের মধ্যে। তার খুব খিদে পেয়েছে।

আনিস বলে, 'আর এই নার্গিস, দিস হোর, শি ওয়াজ অলসো ইন দ্য কন্সপিরেসি। এই কিলিং এর ব্যাপারে তোমার নার্গিসেরও খুব ইম্পর্ট্যান্ট রোল ছিলো।'

'তোমার নার্গিস' বলায় ওসমানের গলায় জেলী মাখানো কিন্তু শুকনো এক টুকরা রুটি আটকে গেলো। গলার মধ্যে দিয়ে, তেতো কি মিষ্টি ঠিক ঠাহর করা যায় না, একটি নতুন ধরনের স্বাদ গড়িয়ে পড়ে পেটে। সে খুব ব্যাকুল হয়ে ঢোঁক গিলে বললো, বলার সময় এক ঠোঁট হাসি খেলিয়ে দিলো, 'আমার নার্গিস মানে?'

'সে তো তুমিই ভালো জানো।'

আনিস কি বলছে এসব? নার্গিস একজন ভদ্রলোকের বিবাহিতা স্ত্রী। বিয়ের আগেও নার্গিসের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক ছিলো তাকে কি কোনোভাবেই প্রেম বলা যায়? নার্গিসের সঙ্গে ওসমানের উল্লেখযোগ্য যোগাযোগ সেই ১টি মাত্র চিঠি; সেই চিঠিতে সে শুদ্ধ ও শিথিল বাক্যবিন্যাসে পশ্চিম পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলের একটি নিসর্গচিত্রের বর্ণনা দিয়েছিলো। এর বেশি আর কি?

'তুমি একটা এ-ক্লাস কাওয়ার্ড। তোমার সঙ্গে নার্গিসের বিয়ে হবে, এভরিবডি নিউ ইট। তাই না? তোমার বৌকে আরেকজন লোক ভাগিয়ে নিয়ে বিয়ে করবে, কিলিং ইওর সিস্টার, আর তুমি হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে? এটা কি তোমার ম্যাগনানিমেটি? না কাওয়ার্ডলিনেস? এসব কি?'

ওসমান তখন পাতলা করে পনির কাটে। জানলা দিয়ে তাকালে বাইরে সন্ধ্যাবেলা দ্যাখা যায়, সন্ধ্যার মধ্যে উঠান, উঠানের প্রান্তে লোহার রডগুলো সুরকির স্তূপে মাথা রেখে কালচে রঙ ধারণ করে ঘুমোচ্ছে। বারান্দার লাইটটা জ্বালিয়ে দেওয়া দরকার। এই স্তূপ থেকে বেছে বেছে বেশ মোটাসোটা ১টা রড তুলে নিলে ভালো হয়। এই রডের ১টা আঘাতই যথেষ্ট। খুব জোরে ১টা বাড়ি মারো মাথার ঠিক মাঝখানটায়; করোটি, কোঁকড়ানো চুল সব ভেদ করে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোবে, মনে হবে কালো ঝোপের মধ্যে ১টা ফোয়ারা থেকে লাল রঙের জল বেরিয়ে অকালে সন্ধ্যাকাল ঘটিয়ে দিলো।

পনিরের নোনতা স্বাদে মগ্ন হয়েছিলো কিছুক্ষণের জন্য, হঠাৎ আনিসের হাত থেকে টেবিলে একটু খয়েরি রঙের তরল রক্ত গড়িয়ে পড়তে দেখে ওসমান বড়ো বিচলিত হয়ে পড়লো। মাথা ভালো করে ঝেড়ে সচেতন হয়ে সে চায়ের পটটা নিয়ে নেয় আনিসের হাত থেকে। পট থেকে ঢালতে গেলে তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে আনিস একটু চা ফেলবেই। ওর হাত থেকে পট চেয়ে নিয়ে ওসমান ধীরে সুস্থে ও নিপুণ হাতে চা ঢাললো ২টো পেয়ালায়, চামচ দিয়ে আস্তে আস্তে দুধ চিনি মিশিয়ে ১টা পেয়ালা এগিয়ে দিলো আনিসের দিকে। তারপর বললো, 'কিন্তু আড়াই বছর হয়ে গেলো, এখন কোর্টে গিয়ে কি হবে?'

২টো কি আড়াইটে চুমুকে সবটা চা শেষ করে আনিস চলে গেলো। দরজার সামনে ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে সে একটু টক হাসি ছুঁড়লো, 'হু বদারস ফর এ কোর্ট? ড্যাম ইট!' তারপর বাইরে পা দিয়ে ফের পেছনে তাকালো, 'তোমাকে এসব কথা বলা ইউজলেস। শালাকে সাফ না করা পর্যন্ত আমার রেস্ট নেই, দা বাগার মাস্ট গেট এ্যানিহিলেটেড।'

আনিসের হোন্ডার আওয়াজ মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ওসমান চুপ করে রইলো। আনিসের প্রস্থান কানে বাজলে চায়ে চুমুক দিতে দিতে সে ভাবে, ইচ্ছা করলে আনিস এই কাজটা তো আগেই সেরে ফেলতে পারতো; রোকেয়ার মৃত্যুর পর কিছু না করলেও অন্তত নার্গিসকে বিয়ে করবার সময় আবুল হাশেমের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার কথাটাও ওরা যদি ভাবতো! এই বিয়ের পর আবুল হাশেমের সঙ্গে এ বাড়ির সম্পর্ক প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিলো। কেবল এই আনিসটা! মিটিং করতো ইউনিভার্সিটিতে, স্ট্রাইক করতো, এখানে রবীন্দ্র সঙ্গীতের আসর করো, ওখানে আয়ুব খাঁর ছবি পোড়াও, রমনা পার্কে সুন্দরী মেয়েদের পিছে ঘুরে বাঙালি সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ করে বেড়াও—সব ব্যাপারে আবুল হাশেমের সঙ্গে বরাবরই ওর একটা সম্পর্ক ছিলোই। আবার ২৫শে মার্চের পর কোলকাতা পালালে সেখানেও ওর ৮/৯টা মাস কাটলো আবুল হাশেম-নার্গিসের সঙ্গেই। আনিসের কতো বন্ধু বান্ধব এফ্রন্টে ওফ্রন্টে ফাইট করে মারা পড়লো, ক্যাম্পে চাষাভুষার সঙ্গে শুয়ে এইসব ছোটোলোকের ঘাম-পেচ্ছাবপায়খানার মধ্যে কি কষ্টই না করলো! কিন্তু আবুল হাশেমের কল্যাণে আনিস কটা মাস প্রতিবাদ সভা ও শোক

সভায় যোগদান করে. এখানে কটা মাস লাঞ্চ ডিনার মেরে ও লাঞ্ছিতা মাতৃভূমির জন্য নিবেদিত অশ্রুর সঙ্গে পাঞ্চ করা হুইস্কি জিনের স্বাদে আপ্লুত হয়ে দেশে ফিরলো বিজয়ীর বেশে। গোলমালটা আর মাস তিনেক চললেই আবুল হাশেমের সঙ্গে কোনো ডেলিগেশনের মেম্বর হয়ে ইস্ট ইওরোপটা দিব্যি ঘুরে আসা যেতো।

ওসমানের বলতে গেলে খুবই রাগ হতে লাগলো। প্রতিশোধ নেওয়ার সখ যদি অতোই, তো দেশে ফিলে এসেই সাফ করে দিলি না কেন? সে সময় কে কার খবর রাখে? দূর! এদের দিয়ে কিচ্ছু হবে না! আবুল হাশেমকে মারতে হলে তার নিজের হাতেই অস্ত্র তুলে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

তবে কোনো আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার তো তার জানা নেই, যা করবার করতে হবে ঐ রড দিয়েই। ওসমানের ডান হাতের ৫টা আঙুল শূন্যে কিসব এলোমেলো লিখলো। তার চোখের সামনে গাঁথা রয়েছে ১টা রড। বেশ বড়ো, ফ্যামিলি সাইজের লোহার রড! বাঃ! এইতো আবুল হাশেমের মাথা ফুঁড়ে দিব্যি ভেতরে ঢুকে গেলো। রক্ত বেরুচ্ছে ফিনকি দিয়ে; সমস্ত ছাদ, পাখার ব্লেড, ছাদের সিলিং—সব লাল। ওসমান আস্তে আস্তে তার নিজের মাথার তালুতে হাত চাপা দিলো; ১ সেকেন্ড পর শুকনো হাতটা মাথার ওপর থেকে টেনে নিয়ে ঝুলিয়ে দিলো তার পাশে। না, হাত কেবল উঠবো উঠবো করে। বুদ্ধিমানের মতো ওসমান তখন হাতটা রেখে দিলো ওর প্যান্টের পকেটে।

আবুল হাশেম ও নার্গিস চলে যাওয়ার পর, যা হওয়ার কথা নয়, আবদুল গনির শরীর একটু ভালো। জ্বর প্রায় ১.৫০ ডিগ্রী কম, সন্ধ্যার পর খুব ঘুমোচ্ছে; চা টা খেয়ে ওসমান ওর বাবার ঘরেই ১টা ইজি চেয়ার পেতে বসে রইলো। ওর বাবার বুক থেকে মৃদু বাঁশি বেজে চলে একটানা। আবদুল গনি ঘুমের মধ্যে পাশ ফেরে, তার মুখ থেকে বিড়বিড় শব্দ বেরিয়ে আসে, 'রোকেয়া!'

'রোকেয়া' বলতে পারে, 'পানি' বলতে পারে, 'আল্লা' কিম্বা 'ইয়াল্লা' বলতে পারে। অথবা আবদুল গনির শ্লেষ্মাঘন কণ্ঠ থেকে অর্থহীন ধ্বনি বেরিয়ে এসে ওসমানের ফাঁকা করোটিতে অকারণ তোলপাড় তোলে : নিহত কন্যার শোকে আবদুল গনি নিদারুণ শোকগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

বাপের গায়ের ওপর নীল কম্বল টান টান করে বিছিয়ে দিতে দিতে ওসমান ভাবলো, এখন হাশেমকে পাওয়া যায় কি করে? ওসমান অন্য কাউকে রাখতে চায় না মধ্যে, এসব ব্যাপারে কারো ওপর আস্থা কি রাখা উচিত? এমন কি আনিসকেও কিছু বলাটা ঠিক হবে না। কারণ ১. ডাঁট মারার জন্যে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে কোনো অটোমেটিক ফায়ার আর্মস দিয়ে সে আবুল হাশেমকে সাফ করে দিতে পারে; এবং/অথবা ২. রড দিয়ে মানুষ হত্যা করবার সংকল্পের কথা শুনলে সে ওসমানকে 'খ্যাত' বলে ঠাট্টা করতে পারে।

সুতরাং ঃ 'হাশেম, একটু ওপরে চলো তো, তোমার সঙ্গে একটা ব্যাপারে আলাপ করবো'—এইসব কথা বলে হাশেমকে নিয়ে সে চলে যাবে ছাদে। রড টড সব আগে থেকে তৈরি থাকবে। সন্ধ্যার পর আকাশ কালো হয়ে সামনের শূন্য

জায়গা অপরিচিত হয়ে গেলে ওসমান আবুল হাশেমের মাথায় ১টা বাড়ি দেবে। মারার পর মনে মনে বলবে, 'তুমি শালা আমার বোনকে মারো। গাড়ি চালিয়ে এ্যাক্সিডেন্ট করো, নিজে দিব্যি বেরিয়ে আসো গাড়ির ভেতর থেকে, গায়ে আঁচড় লাগে না কোথাও, আর নিজের বৌ তালগোল পাকিয়ে মরে। বৌ মরতে না মরতে বৌয়ের বন্ধুকে বিয়ে করে ফেলো।'

অনেক রাত্রি হলেও আনিস ঘরে ফিরলো না। ওসমানের খিদেও পেয়েছে; পাবদা মাছের ঝোল, খাসির গোশতের কালিয়া দিয়ে ভাত খেয়ে ফেললো অনেকটা।

খাবার সময় একটুও মনে হয়নি, সিগ্রেট ধরাতেই বুকটা খচ করে ওঠে, 'তুমি শালা আমার বোনকে মারো!' ওসমান দিনে ৪টে কি ৫টা সিগ্রেট খায়, কেউ অফার করলে সাধারণত না করতে পারে না। নিজেও কখনো কখনো অন্যদের সিগ্রেট খাওয়ায়। আজ অন্যমনস্কভাবে সে প্রায় ৭টা সিগ্রেট শেষ করেছে। এটা ঠিক নয়। সিগ্রেট ধরিয়ে সে দোতলায় গেলো। দোতলায় ঘর মোটে ২টো, ১টায় সে শোবে; সিমেন্ট পেলে বাথরুমটা কমপ্লিট করা যায়।

ছাদে উঠলে নিচের রডগুলো চোখে পড়ে। কাল সকালবেলা যে করে হোক ফরাশগঞ্জ যেতেই হবে। তারপর নিশ্চিত হয়ে ১টা রড দিয়ে ওর মাথাটা ঠিকমতো ভেঙে সোজা চলে যাবে আশুগঞ্জ। ছুটি শেষ হওয়ার আগেই কাজে জয়েন করলে ক্ষতি কি?

শুরকির উঁচু স্তূপ ও লোহার রডগুলো অন্ধকারে অন্যরকম শরীরে অবস্থান করে। উঠানের পাশে বড়ো চৌবাচ্চায় এখন জল আসছে, আওয়াজ উঠছে ছলছল। চৌবাচ্চার ওপর ঢেউ তোলা টিনের ঢাকনি। নইলে হয়তো চৌবাচ্চার জলে এই ঘরবাড়ি, মেঘ ও চাঁদের, এমন কি ওসমানের ছায়া দ্যাখা যেতো।

সিমেন্ট না পাওয়া যায় তো সন্ধ্যাবেলা কি একটু রাত্রি হলে আবুল হাশেমকে খতম করার কাজটা সেরে ফেলতে হবে এখানেই। সিমেন্ট পেলে কয়েকটা দিন দেরি হবে, বাথরুমটা সম্পূর্ণ করে নিতে ৩/৪ দিন, তারপরই ওকে ডেকে এনে কাজটা সেরে ফেলা চাই।

ছাদের তীরে দাঁড়িয়ে ওসমান খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিচের দিকে দেখতে লাগলো। নিচে উঠান, সমস্ত উঠান পাকা। বেশ পুরনো বাড়ি, পাকিস্তান হওয়ার পর কোলকাতা থেকে এসেই আবদুল গনি এই বাড়িটা কিনে ফেলে। পরে একতলার সার্ভিস পায়খানা ভেঙে ভালো বাথরুম হলো; উঠানটা আরো বড়ো ছিলো, একদিকে ৩টে ঘর করে সেটাকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, দোতলায় ১টা বাথরুম শুরু করা হয়েছে, সিমেন্টের অভাবে অর্ধেক হয়ে রয়েছে। আগেকার ও এখনকার গঠনে অনেক তফাৎ, নোতুন পুরনো সব নিয়ে বাড়িটাকে বড়ো বেঢপ মনে হয়। ছাদের এই তীরে দাঁড়ালে শুরকির স্তূপের পাশে উঠানকে মনে হয় উঁচু পাড়ওয়ালা পুকুর। এখান থেকে আবুল হাশেমকে ধাক্কা দিয়েও ফেলে দেওয়া যায়। আবুল হাশেম তাহলে ঠিক সুরকির স্তূপের ওপর পড়বে; সুরকির হৃদপিণ্ড স্পর্শ করবে বলে আবুল হাশেম ওর ফর্সা, মোটাসোটা, লম্বা শরীর নিয়ে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হবে।

আবুল হাশেমের এতো বড়ো শরীরটা পাতালমুখী নামে আর ওসমানের ছমছম ভয় করতে শুরু করে। কেবল এই ভয়ে সম্পূর্ণ মগ্ন থাকার ফলেও ওর নিজের পা জোড়া কখন আটকে গেছে চোরাবালির মধ্যে, বেচারা খেয়ালই করতে পারেনি। আস্তে আস্তে ডুবে যায় ওর সমস্ত শরীর, ওপরে তাকালে দ্যাখা যায় একটিমাত্র চাঁদ, সেও আবার তাকিয়ে রয়েছে অন্য দিকে, ঐ দিকে বোধহয় অন্য কোনো গ্রহ। সেই উদাসীন চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চাঁদের সঙ্গে ওর দূরত্ব কেবল বাড়ে। সে ভেতরেই গেঁথে যাচ্ছে কেবল। কিন্তু চাঁদ শালা মেঘহীন আকাশ পেয়ে নিজের অবস্থানের এক চুল পরিবর্তন ঘটাতে চায় না।

আবার দ্যাখো, চোরাবালিতে গেঁথে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে ছাদের তীরে ঝুঁকে ফের চকচকে চোখে তারিয়ে তারিয়ে সুরকির স্তূপ দ্যাখে। হঠাৎ বুকের মধ্যে দিয়ে এক ঝুড়ি সুরকি গড়িয়ে পড়লো তার ফাঁকা এ্যাবডোমেনে। বুক, পেট, এ্যাবডোমেন, পাকস্থলী কাঁপিয়ে আওয়াজ ওঠে; ওসমান খুব স্মার্ট যুবকের ভঙ্গিতে লাফ দিয়ে চলে গেলো পেছনে। আর একটু অসাবধান হলেই সে গড়িয়ে পড়তো ঠিক সুরকির গা ঘেঁষে, উঠানে, একেবারে নিচে। ওসমান তখন বিবেচনা করে দেখলো যে রাত্রিবেলা এই ছাদে না আসাই ভালো। সে জানে নিশীকাল ২য় কি ৩য় যামে পৌছলে বড়ো অপরিচিত হয়ে যায়। এরকম অপরিচিত সময়ে রেলিঙহীন ছাদে দাঁড়িয়ে থাকাটা কোনোরকমেই নিরাপদ নয়।

পরদিন সকালবেলা ওসমান বেরুলো সিমেন্টের খোঁজে। ফরাশগঞ্জ শ্যামবাজার চষে বেড়ালো, কোথাও সিমেন্ট নেই। বাথরুমের আয়নার খোঁজে হাসান আলী ওয়ালী ভাইয়ের দোকানে গিয়ে দ্যাখে দরজায় বড়ো বড়ো তালা। বোম্বেওয়ালার দোকান, স্বাধীনতার পর সে ব্যাটা ইন্ডিয়া ভাগলে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা দোকানটা চালাচ্ছিলো, এখন এদের মধ্যে গোলমাল, ৩টে গ্রুপে ভাগ হয়ে গিয়ে এরা সমস্ত মালপত্র এদিক ওদিক করে দোকানটাই বন্ধ করে ফেলেছে। থাক এখন আয়না না হলেও চলে, আগে সবচেয়ে দরকারী কাজটাই সেরে ফেলা যাক।

ফরাশগঞ্জ থেকে ঘরে ফেরার সময় দারুণ ট্রাফিক জাম। ভাগ্যিস রিকশা নেয়নি। নবাবপুরটা ওয়ান ওয়ে করে দেওয়ায় এই রাস্তার লোড বড়ো বেশি। রিকশাগুলো দাঁড়িয়ে থাকে ৩/৪টে লাইনে, মাঝে মাঝে একেকটা ট্রাক, ঠেলাগাড়ি—জড়োয়া গয়নায় একেকটি মূল্যবান পাথর। এ রাস্তায় কোনো ট্রাফিক পুলিস নেই, পাড়ার কয়েকজন মস্তান ট্রাফিক ক্লিয়ার করার ভার নিয়েছে। নারিন্দা পুল অতিক্রম করবার পর থেকে ট্রাফিক জাম কমে গেছে, গ্রন্থিটা খুলে যাওয়ায় রাস্তাটা নড়াচড়া করে। রেশন দোকানের সামনে লম্বা লাইন। ত্রিপলে মোড়ানো উঁচু ট্রাক আসছে ১টা, খুব ধীরগতিতে। মোড়ে মোরগ পোলাওয়ের দোকান, ছোটো সাইনবোর্ডে অস্বাভাবিক বড়ো করে লেখা 'সালাউদ্দিন ভাই হোটেল এণ্ড রেষ্টুরেন্ট।' সাইনবোর্ডের ওপরের দিকে এক কোণে ১টি মোরগের ছবি আঁকা; এক পায়ে দাঁড়িয়ে সেই মোরগ তার ঠোঁটের ফাঁকে সিগ্রেটের বদল পোলাও ভরা ১টি

প্লেট ধরে রয়েছে। প্লেটের পোলাওয়ের ফাঁকে ফাঁকে মুরগীর রান, বুক প্রভৃতি লোভনীয়ভাবে ছড়ানো। হোটেলের সামনের দরজায় মস্ত ডেকচির ঢাকনিটা একটু ফাঁক করে এনামেলের থালায় করে প্লেটে প্লেটে পোলাও তোলা হচ্ছে। ওসমান এই ডেকচি ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়লো। কি সুন্দর গন্ধ! এরই পাশে সস্তা ফলের দোকান। আবুল হাশেম সঙ্গে থাকলে বলা যেতো, 'দেখি, কলার দাম দেখি।' তারপর কলা, কয়েতবেল, আতা, টুকরা করে কেটে রাখা নারকেল, বৈঁচি ফলের মালা—এসব দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হাশেমকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতো ঠিক শেষ মুহূর্তে। ভালো করে কিছু বোঝার আগেই হাশেমের বড়ো বড়ো চোখজোড়ার ঘন খয়েরি মণিগুলো ঠিকরে বেরিয়ে এসে ওর ফর্সা গালে একজোড়া মার্বেলের মতো টলমল করতো। আবুল হাশেম ওসমানকে কোনো বাধাই দিতে পারতো না। ঐ ট্রাকটা এখনো আসছেই। ট্রাকের কপালে আরবি অক্ষরে 'ইয়া আল্লাহ্' ও 'ইয়া মোহাম্মদ' লেখা। যে চালায় সে বিরক্তিকররকম দৃঢ় হাতে স্টিয়ারিং ধরে থাকে। রাস্তার ওপারে চায়ের দোকানে ডালপুরি ভাজা হচ্ছে, সন্ধ্যাবেলা এখানে শিককাবাব পাওয়া যাবে। ঐ দোকানের পাশে সরু গলির মাথায় ১ রিকশাওয়ালা রাস্তার ভীড়, মিনিট দশেক আগেকার ট্রাফিক জাম—সমস্ত অগ্রাহ্য করে নিজের রিকশার সিটে বসে ড্রাইভারের সিটে পা রেখে ডালপুরি খাচ্ছে। ঐ ট্রাকটা আসছেই।

ওসমান নারিন্দার পুলের দিকে এগিয়ে গেলো। ট্রাকটা এগোয় বেশ ধীরে। এই ১টা ঠেলাগাড়ির জন্য আরেকটু শ্লো করলো, ১টা স্কুটারকে জায়গা দেওয়ার জন্য একটু কাৎ হলো, এই দাঁড়িয়ে পড়লো বাকেরখানির দোকানের ঠিক সামনে। মুখ বার করে ট্রাক ড্রাইভার ১ রিকশাওয়ালাকে 'আব্বে খানকির বাচ্চা, চোখ দুইটা কার হোগার মইদ্যে রাইখা আইছস বে?'—এই জরুরী প্রশ্ন করে ফের স্টার্ট দিলো। এবার অনেকটা ফাঁকা পাওয়া যায়। একেবারে পুল পর্যন্ত, না আরো বেশি, নন্দলাল দত্ত লেনের মাথা পর্যন্ত গোটা রাস্তায় কেবল ৬টা রিক্সা, ৩টে স্কুটার, ১টা হোণ্ডা, ৪টে সাইকেল, ১টা মেয়ে ও ১২টা লোক। সুতরাং ট্রাকের স্পীড একটু বাড়ে। এইতো সুযোগ! এই জায়গাটায় সিগ্রেট কিনবে বলে দাঁড়িয়ে, 'পাঁচটা ক্যাপস্ট্যান দাও'—দোকানদারকে এই নির্দেশ দিয়ে আবুল হাশেমকে আলগোছে ১টা ধাক্কা দিলেই হারামির বাচ্চা পড়বে ট্রাকের সামনের ডানদিকের চাকার ঠিক তলায়। শালার একটু ইন্টেলেকচুয়াল, একটু পলিটিক্যাল, একটু কালচার্ড ও একটু কমার্শিয়াল মুণ্ড ট্রাকের চাকায় চমৎকার ডিসেকটড হয়ে যাবে।

ওসমান দাঁড়ালো রাস্তার ঠিক মাঝখানে। কিন্তু বড়োজোর ৩ পলক কি ৪ পলক কি তার একটু কম কি বেশি ঠিক হিসাব করা সম্ভব নয়, কারণ অঙ্কে সে ভালো হলেও এসব ব্যাপারে সঙ্গে সঙ্গে যথাযথ উত্তর দেওয়া খুব কঠিন। যাই হোক, তারপরই সে ছিটকে চলে এলো রাস্তার ধারে। ট্রাকটা তখনো কয়েক হাত দূরে। পুল পার হয়ে ট্রাক অতিক্রম করলে তবে ওসমান দাঁড়িয়ে পড়লো, তার আগে পর্যন্ত সে কিছুই দেখলো না। ডালপুরির দোকানের সামনে সেই

রিকশাওয়ালা এখন ডান হাতে চায়ের পেয়ালা ধরে বাঁ হাত নেড়ে নেড়ে কার সঙ্গে সিনেমার গল্প করছে। পোলাওয়ের দোকানের সামনে ডেকচির ঢাকনি হঠাৎ করে অনেকটা খুলে ফেলায় গলগল করে ধোঁয়া বেরিয়ে সাইনবোর্ডে আঁকা মোরগের ঠোঁটে ধরে রাখা প্লেটের পোলাও পর্যন্ত সুবাসিত করে দিচ্ছে।

ওসমান একটা রিকশায় উঠে বসলো; এবার সোজা বাড়ি চলো বাবা! এসব রাস্তায় যানবাহন থাকেই, ভীড়ও আছে বেশ, ট্রাকে চাপা পড়বার সম্ভাবনা কম। তবুও ভাবনা চিন্তা করে ও দেখলো যে সাবধান হওয়াই ভালো। কারণ কার মধ্যে কখন কি লোভ জেগে ওঠে কে বলতে পারে?

বাড়িতে ফিরে দ্যাখে বিরক্তি কেটে গিয়ে আনিসের মুখে চাঁদ উঠেছে। আবদুল গনির শরীর অনেকটা ভালো। ইজি চেয়ারে মাথা এলিয়ে ক্লান্ত সুখে সে দরজার বাইরে উঠানের রোদ দ্যাখে। হাতলওয়ালা চেয়ারে আনিস।

ঘোড়াশাল-টঙ্গি ট্রান্সমিশন লাইন তৈরির কাজ চলছে; সেখানে টেন্ডার সাবমিট করা যায় কি না—এই নিয়ে আবদুল গনি ও আনিস খুব সিরিয়াসলি পরামর্শ করছে। আনিস আবুল হাশেমের কথা বললো। আবুল হাশেম যদি মিনিস্টারের সঙ্গে একবার দ্যাখা করে, তাহলেই কাজটা পাওয়া যায়। আবদুল গনি সৌম্য মুখে হাসে। আজ রাত্রে আবুল হাশেমকে ডাকলে ভালো হয়, ওরা দুই ভাই ওর সঙ্গে বসে একটু খাওয়া দাওয়া করতো, আবদুল গনির দেখেই সুখ। আবুল হাশেম তো বেয়াদব ছেলে নয়; বুড়ো মানুষ কাল জ্বরের ঘোরে কি বলতে কি বলেছে, তাই নিয়ে সে কি আর রাগ করে বসে থাকবে?

'হাশেম ভাই ঐ টাইপের লোকই না। লেফটিস্ট তো, খুব স্ট্রেট ফরোয়ার্ড লোক। মাঝে মাঝে কথাবার্তা বলে একটু রাফ, কোনো রাখা ঢাকা নেই, যা মনে হয় বলে ফেলে। কিন্তু হার্টটা ভালো।'

আনিসের কথায় আব্দুল গনি মাথা নাড়ে, 'সে তো বটেই। তা না হলে কি আর এতোটা উন্নতি করতে পারে? গুণ আছে, গুণ আছে! কি অবস্থা থেকে স্ট্রাগল করে করে কোথায় উঠেছে, সে কি এমনি এমনি?'

এই লোকটিকে কিছুতেই বাদ দিতে পারে না এরা। কোনোভাবেই না! শুওরের বাচ্চাকে চিরকালের জন্য বাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে ওসমানকেই। বড়ো একটি দায়িত্বভার গ্রহণের ভারে ঈষৎ বিনীত হয়ে সোজা উঠানে গিয়ে বেছে বেছে শক্ত দেখে বড়ো ১টা রড নিয়ে সে সোজা ছাদে চলে গেলো।

আবুল হাশেম এলে আনিস আজ নিশ্চয়ই তোয়াজ করবে খুব। টেন্ডারের ব্যাপারটা আছে বলে আবুল হাশেমের পার্টির বিরোধী নেতাদের সঙ্গে নিজের ব্যক্তিগত পরিচয়ের কথা উল্লেখ করে তাদের গুষ্টি উদ্ধার করবে। গল্প করতে করতে রাত হবে একটু। তারপর খাওয়া দাওয়া, খাওয়ার পর ফের একটু গল্প গুজব হবে। ওসমানও যোগ দেবে ওদের সঙ্গে! পলিটিক্সে ওসমানের আগ্রহ কম। কালচার ফালচারও ওর ঠিক জমেনা। তবে করবে, গল্প করাটা কি আর কোনো

সমস্যা? আশুগঞ্জের কথা, ওদের অফিসের কথা, সিমেন্ট পাওয়া যায় না, কোলকাতার ফিল্ম আসা উচিত, ফরমান আলী নিয়াজী—একথা সেকথার পর হাশেমকে নিয়ে চলে আসবে ছাদে। 'একটা কথা আছে, ছাদে চলো, নিরিবিলি বলা দরকার।' 'কি ব্যাপার?' 'না, একটা সাইড বিজনেস শুরু করবো, একটু পরামর্শ ছিলো, ছাদে চলো।' এইতো, এসব বললেই আবুল হাশেম সুরসুর করে উঠে আসবে।

ছাদের প্রান্তে ২জনে বসবে। এর আগে, রোকেয়া যখন বেঁচে ছিলো রোকেয়ার সঙ্গে হাশেম কখনো কখনো এখানে বসতো। রডটা হাতে নিয়ে ওসমান গল্প করবে। রড নিয়ে খেলতে খেলতে হঠাৎ, একেবারে অতর্কিতে হাশেমের মাথায় ১টা লাগিয়ে দাও। অথবা রডের ১টা মাথা যদি ঠিকমতো সেঁধিয়ে দেওয়া যায় ওর মাথার ঠিক মাঝখানটায়, যাকে বলে ব্রহ্মতালু, ঠিক সেখানটায়, তাহলে মুহূর্তের মধ্যে শ্রীমানের অতীত ও ভবিষ্যৎ এসে মিলিত হবে ছোট্ট একটি বর্তমানে এবং শোচনীয়ভাবে স্বল্পায়ু সেই বর্তমান তার নিজেরই রক্তধারার সঙ্গে কোথায় উধাও হবে শালা একবার আঁচও করতে পারবে না।

রডটাকে ছোটোই বলা চলে, হাত দেড়েকের বেশি হবে না, তবে ওজন খুব। সেই রড হতে নিয়ে ওসমান একটু একটু ঘোরায়, কখনো খেলায় তার নিজের মাথার কাছে, কখনো এমনি এহাত ওহাত করে। ঠিকঠাক বসিয়ে দাও একবার। রক্ত উঠবে ফিনকি দিয়ে, হ্যাঁ; রক্ত উঠছে ৩/৪টে ধারায়।

ওসমান এই দৃশ্য কখনো চোখে দ্যাখেনি, সিনেমাতেও না। তবু বেশ বোঝা যায়, তীক্ষ্ণ ধারায় প্রবাহিত হয় রক্ত; মাথার ওপর ঘোলাটে শাদা পাখা লাল হয়ে গেলো। পাখার ঘুরন্ত ব্লেডের কল্যাণে রক্তাক্ত হলো চারদিকের দেওয়াল, গড়িয়ে নিচে পড়ে গেলো ওসমানের লাশ। বুকের হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে যায় এই দৃশ্য দেখে, সে ওপরে তাকালো।

ওপরে ছাদ নেই, কোনো ছাদ নেই, কেবলি আকাশ। নীল ও নির্লিপ্ত আকাশ। অনেক দূরে দূরে চরে বেড়ায় সাদা মেঘের পাল। সমস্ত আকাশে কোথাও একবিন্দু রক্তচিহ্ন নেই। শরৎকালের নীলচে শাদা রোদে আকাশের নিচেকার নিরাবরণ শূন্যতার একেবারে ভিতটাও দ্যাখা যায়। কোথাও রক্ত নেই। ওসমানের বাঁ হাত চলে যায় ওর নিজের মাথায়। একেবারে শুকনো চুল, হাতটা চোখের সামনে তুলে ধরলে সেখানে হৃদয়, বুদ্ধি, আয়ু, প্রেম প্রভৃতির রেখা প্রখর দুপুর বেলার খরায় খটখট করে।

বিচলিত হয়ে ওসমান একটু ঝুঁকে নিচে দেখলো। খুব ব্যস্ত হাতে তাড়াতাড়ি করে সে ছুঁড়ে ফেললো লোহার রডটা। তারপর দ্রুত পদক্ষেপে নেমে এলো একেবারে নিচতলায়। না, না, এসব ব্যাপারে সাবধান হওয়া ভালো। কখনো কখনো লোভ সামলানো বড়ো কঠিন। কখন কি বাসনা হয় কে বলতে পারে?

যোগাযোগ

'রোকেয়া, অ রোকেয়া, আর কতো ঘুমাইবি? কাইন্দা কাইন্দা পোলার তর শ্বাস বন্দ হয়। উঠলি? অ রোকেয়া!'

খোকনের একটানা কান্নার সঙ্গে মায়ের ডাক শুনে রোকেয়ার স্বপ্ন ও ঘুম সব ছিঁড়ে বড়ো এলোমেলো হয়ে গেলো : হায়রে কি কালঘুমেই না পাইছিলো আমারে! পোলায় না জানি কখন থাইকা কান্দে!

দুই চোখ খুব টান টান করে খুলে সোজা হয়ে বসলে তন্দ্রার সঙ্গে ৩ বছর আগে মৃত মা-ও জানলা দিয়ে বাইরে গড়িয়ে পড়ে। বাইরে কখনো কখনো ঘন কালো অন্ধকার, কখনো ফ্যাকাশে অন্ধকার খুব দ্রুতবেগে ছুটে যায় এদিকে থেকে ওদিকে; কিছুক্ষণ পর পর ঝিমিয়ে পড়া হলদে রঙের স্টেশন হাই তুলতে না তুলতে ঘুমিয়ে পড়ে কালো অন্ধকারে। খটখটে গলায় কষাটে ঢোঁক কাঁটার মতো বিঁধলে তবে স্পষ্ট দ্যাখা যায়। সামনের সীটে অল্প বয়সী একজন মায়ের কোলে ৭/৮ মাসের শিশু নিজের ছোট্ট শরীরকে ভেদ করে, রোকেয়ার করোটি ও মগজ ভেদ করে কেবল কেঁদেই চলেছে। এই কান্না তবে খোকনের নয়, এভাবে কাঁদার বয়স তার খোকন পার হয়ে এসেছে অন্তত ৬ বছর আগে; এ কান্না অন্য কারো ছেলের—এইসব মনে করে নিশ্চিন্ত হলে এই ছেলেটার জন্য রোকেয়ার বেশ মন খারাপ হলো; ইস! বৌটার কি কষ্ট! পোলায় এই কান্দে তো দুধ দ্যাও, এতগুলি বেটা বইস্যা দ্যাখতাছে, হাগো সামনেই ব্লাউজের বুতাম খোলো, দুধ খাইতে খাইতে ঘুমাইয়া পড়ছে তো মায় যদি এট্টু সিধা হইয়া বইছে—পোলায় একখান চিক্কুর ছাড়বো, আল্লারে আল্লা, মাথার মধ্যে গিয়া ব্যাবাকটি মগজরে টাইনা ধইর‍্যা চুখের মইদ্যে ফালাইয়া দিবো।

'ইস! সারাটা রাইত খুব কান্দছে! আপনার লগে গ্রাইপ ওয়াটার নাই?' সারারাত্রি একই কম্পার্টমেন্টে কাটাবার পর রোকেয়ার এই যেচে পড়া সহানুভূতিতে রোগা ফর্সা মেয়েটা কোনো জবাব দেয় না। অসহায় ও বিরক্ত চোখে সে উল্টোদিকে ওপরের বাঙ্কে বারবার তাকায়, সেখানে কালো রঙের ১টা মোটসোটা লোক তেলতেলে চুলওয়ালা মাথার নিচে ১ হাত রেখে, আরেকটা হাত

২ হাঁটুর মাঝখানে, অঘোরে ঘুমায়। তরুণী মা তখন শিশুকে বুকে নিয়ে ঘুম পাড়াবার জন্য 'ওওও বাবু ঘুমায়! ওও' ধ্বনি করে।

কোলে লইয়া খাড়াইলেই তো পোলাটা ঘুমাইয়া পড়ে। বইস্যা রইলে রাইত ভইরা যতোই না আদর করো, পোলায় কি আর ঘুমাইবো?—রোকেয়া তো ছেলেকে নিয়ে খুব একটা বাইরে যায়নি। খোকনের বয়স তখন বছরখানেক হয়েছে কি হয়নি, সেই ১ বার মুন্সীগঞ্জ গিয়েছিলো লঞ্চে। রোকেয়ার ননদ সিতারার তখন নোতুন বিয়ে হয়েছে, বর মুন্সিগঞ্জে এস. ডি. ও অফিসে টাইপিস্ট। সদরঘাটে উঠেছিলো, ঘণ্টা দেড়েক বোধহয় লঞ্চে ছিলো। লঞ্চের নিচে পানির ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ কি ভালো যে লেগেছিলো! রোকেয়ার কোলে একটুও কাঁদেনি খোকন। কাঁদলেই ওর বাবা খুব রাগ করতো, 'পোলায় চিল্লায় ক্যান?' রোকেয়া সঙ্গে সঙ্গে দুধ দিয়ে কি কোলে নিয়ে এঘর ওঘর করে খোকনকে থামিয়ে দিতো। খোকনকে নিয়ে বাইরে গিয়েছিলো সেই ১ বারই। ঐটুকু খোকন, সারাটা পথ তার খুশি কী! খোকন নদী দেখে হাসে, পানির ঘোলা স্রোত দেখে হাসে, নৌকা দেখে হাসে; নৌকার মানুষ, পাখি, মাছ ধরার জাল, কচুরিপানার বেগুনী ফুল—সবই তার কাছে হাসির সামগ্রী। এমনি হেসে হেসে, দুটো দাঁত-ওঠা ছোট্ট মুখে নানারকম গুরুত্বপূর্ণ ধ্বনি তৈরি করে অবশেষে সে ক্লান্ত হয়ে পড়লো। মুন্সিগঞ্জ ঘাটে লঞ্চ যখন ভেড়ে, ছেলে ঘুমে নেতিয়ে পড়েছে। লোকজনের এতো ছোটাছুটি, কুলিদের হৈ চৈ, পানির ছলাৎ ছলাৎ শব্দ; কিন্তু দ্যাখো, রোকেয়ার বুকে খোকন নিশ্চিন্তে ঘুমায়।

রোকেয়ার বুকটা খালি খালি লাগে, শরীর নিসপিস করে। সামনের ছেলেটাকে কোলে নেওয়ার জন্য হাত দুটো সামনে চলে যেতে পারে, সে ২ হাতের আঙুলে আঙুলে তালা লাগিয়ে দিলো। তারপর ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'বাচ্চাটা খুব কষ্ট পাইছে।'

সোলায়মান আলী কোনো কথা না বলে সংক্ষিপ্ত হাই তোলে। শোবার জায়গা না পেলেও শেষরাতের দিকে কোন এক স্টেশনে দুজন লোক নেমে যাওয়ায় দিব্যি পা ছড়িয়ে বসা গিয়েছিলো। পেছনের কাঁচের জানলাটা টেনে দিয়ে মাথা রেখে যেই একটু ঘুমোতে যাবে তো এই শিশুর চিৎকারে মাথার সমস্ত ভেতরটা চোখ দিয়ে বেরিয়ে চোখের মণিতে ঝুলে পড়ে। সোলায়মান আলীর চোখ দুটো করকর করে, নিশ্বাস টেনে নেওয়ার সময় মনে হয়, রাস্তায় পীচ পোড়ানো আগুনের খুব ঘন ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে মগজটা ঝাপশা করে দিলো।

কিন্তু রোকেয়ার চোখে কি মাথায় কোথাও একটুও ঘুম নেই। তার দুই চোখের নিচে কালো রঙের দুটো একাদশীর চাঁদ। হাই তুলতে তুলতে সোলায়মান আলী মেয়ের দিকে তাকায়, ভাঙা ভাঙা গলায় জিগোস করে, 'ফজরের ওকতো হইছে?' বলে নিজেই ফের বাঁ হাতে ঘড়ি দ্যাখে, 'না অখনও দশ পনরো মিনিট!' তারপর খুব বিরক্ত চোখে বাইরে তাকায়। তার বিরক্তি বড়ো স্পষ্ট। দুই ভ্রূর মাঝখানে একটা পার্মানেন্ট গেরো দিয়ে উল্টোদিকের জানলার ওপারে সে ঝাপশা গাছপালা,

কালচে গোলাপী আকাশ, অক্টোবর মাসের পাতলা কুয়াশা, কুয়াশায় ভিজে একটু টক টক হয়ে-যাওয়া টেলিগ্রাফের তার প্রভৃতি দ্যাখে।

শিশুর কান্না থামাবার জন্য তরুণী মায়ের বিচিত্র ধ্বনি, শিশুর এক টানা এঁ এঁ এঁ এঁ কান্না, ট্রেনের ঝকঝক আওয়াজ, ভেতরের যাত্রীদের ভারী নিশ্বাসপতন, একটিমাত্র পাখা বেজে চলে ভোঁ ভোঁ করে—এই সমবেত গুঞ্জন রোকেয়ার বুকে ঠকঠক বাড়ি মারে ঃ খোকনের আমার কি না জানি হইলো। কিসে যে পাইলো আমারে, আল্লা রে, কি যে হইলো, সাত বছরের পোলারে ঘরে রাইখ্যা বুইড়া মাগীটা আমি যাই মামুগো বাড়ি বেড়াইতে। আমি ঘরে থাকলে খোকনের এ্যাক্সিডেন্ট কি হইতে পারে?

সপ্তাহখানেক আগে সোলায়মান আলী নিজেই ওদের বাসায় গিয়ে বললো, 'রোকেয়া, তর বড়োমামুর য্যান খুব ব্যারাম শুনছিলাম, বহুত কঠিন ব্যারাম, মনে হয় ক্যান্সার হইতে পারে।'

রোকেয়া তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে এসে সোলায়মান আলীর কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালো, 'কেঠায় কইলো আব্বা?'

'তর মামুগো দ্যাশের কাদের মিরধা আইছিলো আমার দুকানে, মাল লইয়া গেলো।'

'কাদের মিরধা যানি ক্যাঠা?'

'কাদের মিরধারে তুই চিনবি ক্যান? তর বড়োমামুর সম্মুন্দির কেমুন ভায়রা লাগে। আমি তর মামুর কথা জিগাইলাম তো কয়, "হায় হায়, হ্যার তো বহুত কঠিন বিমার হইছে।" মনে লয় একবার গিয়া দেইখা আহি। বুধবার দিন স্বরূপখালির হাট আছে, হাটটাও দ্যাখতাম, দুইটা দিন তর মামুগো তালাশ লইয়া আহি।'

'আব্বা, আমারে লইবা?' তোমার লগে আমিও যাই? লইবা?'

'তুই যাস ক্যামনে?' সোলায়মান আলী হাসে, 'তর পিচ্চিটা কই থাকবো? লগে না লইলে হ্যায় ছাড়বো ক্যান?'

'না আব্বা, খোকনরে সেতারার লগে রাইখা যামু। সেতারারা তো কাগজীটোলা আইয়া পড়বো, নিজেগো বাড়ি খালি হইছে অগো, কাগজীটোলা আইলে কাছেই থাকবো; ফুফুও দ্যাখবো, বাপেও গিয়া গিয়া দেইখা আইবো।' কিন্তু হান্নান বললো, 'মামুগো বাড়ি যাওনের হাউস হইছে তো যাও গিয়া। পোলারে আবার কৈ থুইয়া যাইবা? খোকনরে আমি রাখতে পারি না?'

যাওয়ার সময় বুকটা খচখচ করছিলো। কিন্তু মামাবাড়ি পৌছবার আগেই, স্বরূপখালি স্টেশনে নেমে যখন নৌকায় ওঠে তারো আগে থেকে শৈশবের অল্প অল্প চেনা গোরুবাছুর, সবুজ ও ধূসর গাছপালা, ন্যাংটাকালো রাখাল বালক, পুকুরপাড়ে পচা ঘাসের ঘন সুবাস, খড়ের হলদে গাদা, গেরস্থ বাড়ির ঈশান কোণে গোয়ালঘরের গন্ধ, হাল্কা মিষ্টি গন্ধের খোলা শাদা রোদ—কতোকাল পর এদের দ্যাখা পেয়ে রোকেয়ার সমস্ত বুক, পিঠ, মুখ, চোখ কানায় কানায় ভরে

গিয়েছিলো। কেবল একটি মাছরাঙা চোখে পড়ার পর থেকে যা দ্যাখে শুধু মনে হয়, আহা খোকনটারে দ্যাখাইতে পারতাম! স্বরূপখালি ঘাটে নৌকায় উঠতে গিয়ে পা ফসকে পড়ে যাচ্ছিলো, ঠিকঠাক সামলে নিয়ে ভেতরে বসতে বসতে খোকনের জন্য মন খারাপ করে।

মামার শরীর সত্যি বেশ খারাপ। কিন্তু ক্যান্সার হয়নি। মাঝে মাঝে পেটে মোচড় দেয়, টক ও তেতো জলের জোয়ার ভাটা শুরু হয় বুকে ও পেটে। পূর্ণিমা অমাবস্যায় শরীরটা আর নিজের থাকে না, তখন না যাওয়া যায় দোকানে, না করা যায় হাটবাজার। বড়োমামার কোনো ছেলে নেই, তিনটেই মেয়ে, তিন মেয়েরই বিয়ে হয়ে গেছে, কে কি করে? কেবল মেজো মেয়েটা কাছে থাকে বলে প্রায়ই আসে। ঐ জামাইটা ভালো, সময় পেলেই শ্বশুরের খবর নেয়। সে বললো, স্বরূপখালির নারায়ণ ডাক্তার বলে যে ঢাকায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে পেট কাটলে সেরে যেতে পারে। সোলায়মান আলী চুপ করে থাকে। তারা মিয়ার কেবল শ্বশুরকে ঢাকা নিয়ে যাওয়ার কথা! সোলায়মান আলী দুপুরে খেয়ে উঠে দরজায় দাঁড়িয়ে গলায় নানারকম ধ্বনিতরঙ্গ তুলে মুখ ধোয়, তারপর হাত ধোয়ার ফাঁকে ফাঁকে বলে, 'মেডিকলের কথা কও বাবাজি, হ, তোমরা গেরামে থাকো, তোমরা কইবা না ক্যান? তোমাগো ক্যামনে কই, ঢাকার হাসপাতালগুলি মানুষ মারণের ফ্যাক্টরি।'

রোকেয়া কখনো ওর মামীর সঙ্গে, কখনো একাই এবাড়ি ওবাড়ি করে বেড়ায়। কতো মামীর সঙ্গে, কতো খালার সঙ্গে জীবনে প্রথম দ্যাখা হলো। রোকেয়ার মা মারা গেছে চার পাঁচ বছর আগে, অনেকে জানেই না। আরো অনেক আগে ঢাকার আর্মানিটোলার সোলায়মান আলী ভালো তাঁতের শাড়ি কিনবে বলে স্বরূপখালি এসে চকলোকমান গ্রামের নুরুন্নেসাকে বিয়ে করে নিয়ে গিয়েছিলো; প্রথম কয়েক বছর একটু যোগাযোগ ছিলো, পরে কোনো খোঁজখবরই রাখতো না। সোলায়মান আলী আজ বিশ বাইশ বছর পর বেড়াতে এসেছে শ্বশুরবাড়ি। ভালোই কাটিয়ে দিলো। তিনদিন, চারদিন, দেখতে দেখতে পাঁচদিন কেটে গেলো। সোলায়মান আলী সম্বন্ধীর সঙ্গে যায় স্বরূপখালি, তাঁতের শাড়ি খোঁজ করে। বছরখানেক হলো সে ফের কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেছে, এবার যাওয়ার সময় এক বেল কাপড় নিয়ে যেতে পারলে ভালো হতো!

রোকেয়ার ভারি সুন্দর কাটলো, ভারি সুন্দর। এই জায়গা সত্যি ভালো। ছেলের কথা মনে হলে একটুও খারাপ লাগেনি, বরং এতদূর এসে খোকনের কথা ভাবতে বড়ো সুখ, খোকনের বাপের কথা ভাবতেও সুখ। কেউ ছেলের কথা জিগ্যেস করলে রোকেয়ার বড়ো ভালো লাগে। 'মামানীগো, কি কই, হেইডা একটা বিচ্ছু হইছে। এক্কেরে বিচ্ছু। লগে লইয়া আইতাম তো দ্যাখতেন, তামামটা দিন কি পোংটামি কইরা বেড়াইতো। আমারে বাড়ি থাইকা বারাইতে দেইখা খালি ফাল পাড়ে, "আম্মা আমিও যামু!" তো হ্যার বাপে কয়, "না, এক মাস বাদে পরীক্ষা অহন পোলায় ক্যামনে যায়?"'

সন্ধ্যাবেলা বাড়ির পেছনে পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। বাড়ির পেছনে একটা পাতকুয়ো, তারপর ছোটো এক টুকরো বেগুনখেত, বেগুনখেত পার হলে বাঁশঝাড়, বাঁশঝাড়ের পেছনেই জোড়াপুকুর—পাশাপাশি দুটো বড়ো পুকুর, কচুরিপানার ফাঁকে ফাঁকে পানি। পুকুরপাড়ে একটা মস্ত সজনে গাছ; বড়োমামী বলে, রোকেয়ার মা বিয়ের আগে লাগিয়েছিলো। রোকেয়ার মা সজনে ডাঁটা খেতে ভালোবাসতো, পুকুরপাড়ে গোটা চারেক গাছ পুঁতে দিয়েছিলো, শেষ পর্যন্ত টিকলো একটা। সন্ধ্যার পর সজনেতলায় কোনো কোনো দিন শাদা শাড়ি পরা একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। রোকেয়া ভালো করে দেখবার আগেই কোথায় চলে যায়। রোকেয়া এদিক ওদিক তাকায়, চোখ কচলায়, কোথাও পাওয়া যায় না। একদিন সন্ধ্যায় রোকেয়া পুকুরপাড় থেকে ফিরছে, বাঁশঝাড়ে তখনো পৌঁছয়নি। সজনেতলায় শাদাকালো মাটিতে লম্বা লম্বা আঙুলের মতো সজনের ছায়া অল্প বাতাসে একবার ছড়িয়ে পড়ে, একবার গুটিয়ে নেয়। সেই অচেনা জন্তুর হাত মাড়িয়ে যেতে একটু ভয় ভয় করছিলো। হঠাৎ দ্যাখে, অন্যদিক থেকে শাদা শাড়ি পরা অল্প বয়সী একটি মেয়ে বেগুনখেত পার হয়ে বাঁশঝাড়ের পথ ধরলো। রোকেয়ার বুকের মধ্যে শিরশির করে ওঠে। ঠায় দাঁড়িয়েই রইলো সে। বাঁশঝাড়ে চাঁদের ময়লা রঙ আলো। বাঁশঝাড় পার হয়েও মেয়েটা একটুও থামে না। এ কে? খুব কাছাকাছি চলে এলে রোকেয়া শুনলো মেয়েটা বলছে, 'রোকেয়া, তর পোলায় কেমুন আছে?'মায়ের কণ্ঠস্বরে খুব চমকে উঠে ও তখন চারদিকে তাকিয়ে দ্যাখে। না, কোথাও কেউ নেই। সামনে পুকুর, পুকুরের ওপারে মাঠ, মাঠভরা পাকা ধানে হলদে জ্যোৎস্না অলস গা এলিয়ে ঘুম ঘুম চোখে শূন্যতা দ্যাখে। ডান দিকে কালচে সবুজ গ্রাম, বাঁ দিকে সুপারি বাগান। ওর মা তবে কোথায় গেলো?

নিজের শরীরকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে রোকেয়া ঘরে ফিরে শুনলো হান্নানের টেলিগ্রাম এসেছে। দোতলার কার্নিশ থেকে পড়ে গিয়ে খোকন শরীরে আঘাত পেয়েছে।

রোকেয়ার সমস্ত সময়টা, এমন কি গত কয়েকটা দিনও বড়ো ফাঁকা হয়ে গেলো। ওর মেজোমামার খুব ইচ্ছা—রোকেয়া একটা দিন ওদের ঘরে কাটিয়ে যাক। চার পাঁচদিন হলো এসেছে, মেয়েটাকে এক সন্ধ্যা ভালো করে খাওয়ানো গেলো না, আবার কবে আসে, আদৌ আসে কিনা কে জানে? একটা দিন থাকলে কি আর এসে যায়? ওর মেজোমামা স্বরূপখালি গিয়ে টেলিফোনে আলাপ করবে হান্নানের সঙ্গে; খোকনের আঘাত সম্বন্ধে আরো বিস্তৃত জেনেই রোকেয়া রওয়ানা হোক না। রোকেয়াকে কে বোঝায় সে কথা?'

'না মামু, আমারে যাইতে হইবো।'

বড়োমামীও তাই বলে। ওর যাওয়াই ভালো। 'মায়েরে না দ্যাখলে পোলায় সারবো ক্যান?' রওয়ানা হওয়ার ঠিক আগে মেজোমামী এসে আলগোছে ওর পিঠে হাত রাখে, 'তরে দেইখ্যাই পোলায় তর ঠিক ভালা হইয়া যাইবো, দেহিস!'

পশ্চিম দিকে মুখ করে বসে নামাজ পড়ে নিচ্ছে সোলায়মান আলী। জানলার বাইরে সমস্ত ভুবনজোড়া খোসাটা আস্তে আস্তে ভেঙে পড়েছে। আকাশ এখন বেশ

স্পষ্ট : গোলাপী রঙের, নীল রঙের, ঘাসের ওপর শিশিরবিন্দু বেশ স্পষ্ট : সবুজ চোখের মাথায় একটি শাদা মণি; টেলিগ্রাফের তারের রেখা বেশ স্পষ্ট : শিশিরে ধুয়ে খুব ধারালো ও নির্লিপ্ত। এই একটু সবুজ, একটু কালো মাঠে, রোদের নিচে, শিশিরের নিচে, চাপড়া চাপড়া ঘাসেরও নিচে একটা নোতুন কবর, টাটকা শোকে উঁচু। কার কবর? রোকেয়ার চোখের সামনে কোটি কোটি ছোটো বিন্দু শূন্যে ভাসতে থাকে। 'রোকেয়া, তুমি আসছো? সুবে সাদেকের আগে খোকন যে আমাগো ছাইড়া চইলা গেলো।' কে বলছে? ভালো করে লক্ষ্য করতে না করতেই ট্রেন চলে যায়।

'খোকন নাই?'

'না রোকেয়া, স্যায় নাই! রাইত ভইরা খালি আম্মাআম্মা করছে।'

এবার চেনা যায়। টেলিগ্রাফের পোস্টে দাঁড়িয়ে আছে ওর মা, 'রোকেয়ারে, মারে মা, আইছস তুই? এতো দেরি করলি মা? চাইরটা ঘন্টা আগে আইলেও তো পোলাডার মুখে পানি দিবার পারতি!'

সকালবেলায় ট্রেনের কি স্পীড! একটার পর একটা টেলিগ্রাফের পোস্ট পার হয়ে যায় চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই। এইতো একটি পোস্টের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলো ওর মা, আবার দ্যাখো আরেকটা পোস্টের ওপারে উবু হয়ে মাটি খুঁড়ছে রোকেয়ার স্বামী। ট্রেন চলছেই। হান্নান সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পেছনে মুখ ফিরিয়ে দেখলো রোকেয়া। ট্রেন চলে যায়। টেলিগ্রাফের আরেক পোস্টে দাঁড়িয়ে ওর স্বামী ট্রেন দ্যাখে; রোকেয়ার মুখোমুখি হলে দুই হাতে নিজের মুখ চেপে ধরে আস্তে আস্তে বসে পড়ে।

'রোকেয়া তুমি! খোকনের মাও, তুমি আইছো? খোকন যে আমার সারাটা রাইত খালি তোমার কথাই কয়। খালি আম্মাআম্মা করছে, রাইত ভইরা স্যায় কেবল তোমারে ডাকছে। আমাগো সোনার টুকরাটারে মাটি চাপা দিয়া অহন আমি কেমনে বাড়ি যাই? খোকনের মা-ও, আমাগো ঘরবাড়ি এক্কেরে খালি হইয়া গেলো, এই খালি বাড়ির মইদ্যে আমরা কেমনে থাকুম, কও!' ট্রেন চলে যায়, টেলিগ্রাফের পরের পোস্টে দাঁড়িয়ে বিলাপ করে হান্নান।

সম্পূর্ণ সকাল হলো; গোলাপী ও নীলাচে আভা কেটে গিয়ে মাঠে এখন শাদা ও নিরাভরণ রোদ, ঘাসের মাথায় শুকনো শিশির বিন্দু শূন্য চোখের কোটর থেকে কেবল তাকিয়ে থাকে, কিছুই দ্যাখে না।

মোনাজাত শেষ হলে সোলায়মান আলী জোড় হাতে মুখ-চোখ মুছে দুই হাতের আঙুলের ডগায় চুমু খায়। তারপর সোজা হয়ে বসে পাশে তাকিয়ে দ্যাখে রোকেয়া শাড়ির আঁচল দিয়ে নিজের চোখ মুছছে।

সারা রাত বড়ো অশান্তিতে কাটলো মেয়েটার। আহা, এইতো একটুখানি মেয়ে, এতো কষ্ট সে কিভাবে সহ্য করে? ডান হাতটা আস্তে করে রোকেয়ার পিঠে রেখে সোলায়মান আলী আঙুল বুলিয়ে দেয়। একটু আগে মোনাজাত করা আঙুলগুলো রোকেয়ার পিঠে তিরতির করে কাঁপে।

'রোকেয়া, এতো চিন্তা করস ক্যান মা? পোলার তর তেমুন কিছু হইলে কি আর হ্যার বাপে জানাইতো না?'

রোকেয়া স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। তার চোখ এখন শুকনো, সে ছোটো ছোটো নিশ্বাস ফেলে ঃ আমি থাকলে কি আর খোকনের এ্যাক্সিডেন্ট হইতে পারে? আমি তাড়াতাড়ি পোলার কাছে গিয়ে খাড়াইতে পারলেই হ্যার ব্যাবাকটি বিষ মুইচ্ছা ফালাইতে পারতাম।

সোলায়মান আলীর আঙুল কাঁপতেই থাকে। ছেলেবেলা থেকেই তার মেয়ে বড়ো আদুরে, একটা কিছু হলো তো কিছুতেই সামলানো যায় না। খুব ছোটোবেলাতেই মেয়ে খুব বাপঘেঁষা ছিলো, সুযোগ পেলেই খালি বাপের পিছু পিছু ঘুরতো। কিন্তু একবার কিছু হলো তো এই বাপও কিছু করতে পারতো না।

সোলায়মান আলীর তখন হোটেলের ব্যবসা। আলুবাজারে হাজী ওসমান গনি রোডে জমজমাট হোটেল। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে সোলায়মান আলী সোজা চলে যেতো হোটেলে, সঙ্গে রোকেয়া থাকতোই। হোটেলে ঢোকার মুখে মস্ত ডেকচিতে রাঁধা তেহারি, ডেকচির ওপর ঢাকনি, খুললেই ভেতর থেকে খশবু বেরিয়ে সমস্ত হোটেল, হোটেলের সামনের রাস্তাটুকু কি সুন্দর ম' ম' করতো। রোকেয়ার বসবার জায়গা ছিলো ক্যাশেই, বাপের কোল ঘেঁষে। সে মাত্র কিছুক্ষণের জন্য। মিনিট দশেক পার হলে সে নিজেই উঠে গিয়ে একবার রান্নাঘর, একবার কাউন্টার এমনি কেবল ঘুরঘুর করতো। মাঝে মাঝে ফালু এসে একটা এনামেলের থালা দিয়ে তেহারি তুলছে আরেকটা থালায়, ছোটো ছোটো গোশতের টুকরো সাজিয়ে দিচ্ছে থালার ওপরে, থালা সাজানো হয়ে গেলে সোজা নিয়ে যাচ্ছে কাস্টমারের সামনে; খুব কায়দা করে মাথাটা ঘুরিয়ে মগ দিয়ে ড্রাম থেকে পানি তুলে ঘোলাটে রঙের গ্লাস ঠক করে রেখে দিচ্ছে টেবিলে—রোকেয়া কি গভীর আগ্রহ নিয়েই না সব দেখতো। রান্নাঘরে মতিমিয়া বাবুর্চির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখে নিতো বিরাট হাঁড়ির গহ্বর। একদিন শীতের সকালে হোটেলের রান্নাঘরে ঢুকে রোকেয়া দ্যাখে চুলার ওপর মস্ত ডেকচি চাপানো, ডেকচিতে ঢাকনির ওপর একটা কালো ন্যাকড়া ও বড়ো একটা হাতা।

'আউজকা কি পাকাও?' এই কথা বলে রোকেয়া ন্যাকড়ায় হাত দিয়ে ঢাকনাটা একটু সরিয়েছে, অমনি ফুটন্ত পায়ার ঝোল থেকে গরম ধোঁয়া বেরিয়ে ওর কণ্ঠার হাড়ের নিচে অনেকটা জায়গা ঝলসে গেলো! মতিমিয়া বাবুর্চি পেছনের দরজায় কয়লার স্তূপের সামনে বসে বিড়ি টানছিলো। রোকেয়ার চিৎকার শুনেই পেছন ফিরে রোকেয়াকে টেনে নিলো কোলের মধ্যে। রোকেয়া তখন আরো জোরে চিৎকার করে। সোলায়মান আলী হোটেলের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে নিজেই তেহারির পরিমাণ দেখে নিচ্ছিলো, দৌড়ে এসে কোলে তুলে নিলো মেয়েকে। বাপের কোলে গিয়ে রোকেয়া একটুখানির জন্য থামে, সে এক পলক, তারপর ফের সেই চিৎকার। সোলায়মান আলী রোকেয়ার গলায় চুমু খায়, কপালে, গালে, ঝলসানো চামড়ায় আদর করে, কতো চুমু খায়; কিন্তু রোকেয়ার কান্না কিছুতে থামে না। এমন কিছু

ঝলসায়নি, একটু আঁচ লেগেছে কেবল। তবু সোলায়মান আলীর এতো আদর এতো ভালোবাসায় ওর কষ্ট কি একটুও কমে না? সোলায়মান আলী একটু বিরক্তই হয়ে গিয়েছিলো, মেয়েটা ভীষণ জেদী। তবে বড়ো মায়া, বাপের জন্যে, স্বামীর জন্যে, ছেলের জন্য বড়ো মায়া তার মেয়েটার। তাই একটুতেই এতো ভেঙে পড়ে। কতো সখ করে মামাবাড়ি গেলো, কি সুন্দর হাসিখুশি ছিলো সেখানে; দ্যাখো, এক রাতে শরীরটার কি দশা হলো। খুব মিনতিমাখা গলায় সোলায়মান আলী বলে, 'রোকেয়া, আমি তরে কই,তর পোলার কিছুই হইবো না। তুই হুদাহুদি ভাইবা মরস রে পাগলি!' রোকেয়ার পিঠে সোলায়মান আলীর ডান হাতের আঙুলগুলো খুব অধীর হয়ে ওঠানামা করে। একবার তর্জনী দিয়ে একটু চাপ দেয়, ফের মধ্যমা, ফের অনামিকা—এরকম করে তার আঙুলসমূহ মেয়ের পিঠে কেবল কেঁপে কেঁপে চলে।

কিন্তু রোকেয়ার স্তব্ধ কাতর মুখে কোনো পরিবর্তন নেই; তার চোখের কোণে জলের দাগ শুকিয়ে এক টুকরো মেঘের মতো দ্যাখায়। মেয়ের অপরিবর্তিত মেঘলা মুখ দেখে সোলায়মান আলীর মুখটাও করুণ হয়ে যায়। সে তার ছানি পড়বে-পড়বে চোখ দুটো নিচের দিকে রেখে আস্তে আস্তে তার সমস্ত হাতখানা টেনে নেয়।

কমলাপুর স্টেশন থেকে যখন ওরা রোকনপুর পৌঁছলো হান্নান তখন গোসল করে বাইরে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে।

'তোমরা আইছ?'

'তুমি কই যাও?'

'হাসপাতাল যাইতাছি। তুমিও চলো আমার লগে', হান্নান সোলায়মান আলীকে বললো, 'আপনেও চলেন।'

'চলো, চলো,' রোকেয়ার অস্থিরতায় হান্নান একটু হাসে, 'যাওনা, চোখে মুখে পানি দ্যাও, সারা রাইত জাগনা আছিলা, চোখে মুখে পানি দিয়া নাশতা কইরা লও!' সোলায়মান আলীকে বসিয়ে রেখে হান্নান বাইরে গেলো ডালপুরি কিনতে।

হাত মুখ ধোয়ার জন্য রোকেয়া কলপাড়ে চলে যায়। ডালপুরির ঠোঙা হাতে হান্নান ফিরে এলে সোলায়মান আলী বলে, 'কি মনে হয় অহন?' 'অহনও কিছু কওন যায় না। ডাক্তারে আগে কইছিলো একটা পাও বাদ দেওন লাগবো। আউজকা বড়ো ডাক্তারে কইলো, না কাটলেও চলতে পারে।'

'তুমি কখন আইছ হাসপাতাল থাইকা?'

'অখখন! সেতারা আর সেতারার জামাইরে রাইখা আইছি। রোকেয়া, লও নাশতা কইরা লও।'

কিন্তু রোকেয়া কিছুই খাবে না। সোলায়মান আলী ক্লান্ত ঠোঁটে হাসে, 'অখন আর তর চিন্তা কিরে পাগলি? হায় হায়, সারাটা রাইত কি কষ্ট করছে। অখন তরে দ্যাখলেই তর পিচ্চিডা ফাল পাইরা উঠবো!' রোকেয়া কোনো কথাই বলে না। শাড়িটাও সে পাল্টায়নি, মলিন কাপড়ের এক প্রান্ত আঙুলে জড়াতে জড়াতে তার বুক শিরশির করে : আমারে দ্যাখলে পর খোকন আমার কি না জানি করে!

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের দোতলায় উঠে করিডোর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে রোকেয়া খুব ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে। করিডোরের দুই দিকের বিছানাগুলোতে শোয়া, আধশোয়া, রোগাটে, মোটাসোটা, ফর্সা, কালো, কাশতে-থাকা, থুথু ফেলছে, হাঁপাচ্ছে, আজকেই মারা যাবে—না, স্পষ্ট করে কেউ তার চোখে পড়ে না। ডেটলের, স্পিরিটের, ফিনাইলের গন্ধ—কিছুই কি ওর নাকে লাগে না? রোগীদের নোংরা শরীরের গন্ধ, পায়ের ঘায়ে বাঁধা হলদেটে ব্যাণ্ডেজের গন্ধ মেঝে থেকে উঠে আসছে একই সঙ্গে ফিনাইল ও মেঝের ভ্যাপসা গন্ধ, নার্সের ধবধবে এ্যাপ্রন থেকে আসা রোদের টাটকা গন্ধ—সবই তার ফর্সা টিকলো নাকের এদিক দিয়ে ওদিক দিয়ে চলে যায়, কৈ তাকে তো স্পর্শও করে না। শিশুদের ওয়ার্ডে সারি সারি খোকন শুয়ে আছে নানা ভঙ্গিতে। রোকেয়ার বুকে ও মাথায় জট পাকায়, এর মধ্যে তার খোকনটাকে সে চিনে নেবে কি করে? হান্নানের পেছনে পেছনে একটা খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়ালে ওর চোখের ঘোরটা কাটে; প্রথমেই চোখে পড়ে সিতারাকে, সিতারার স্বামী আহমদউল্লা বৌকে কি বলছিলো, ওদের দেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। খোকন শুয়ে আছে চিৎ হয়ে। তার শাদা প্লাস্টার করা ডান পা দেওয়ালের দিকে একটা রডের সঙ্গে ঝোলানো। ডান হাতে প্লাস্টার, গলা থেকে ব্যাণ্ডেজের কাপড় দিয়েই ঝোলানো সেই হাতটা এখন ওর বুকের ওপর ফেলে রাখা। বিছানার পাশে একটা লোহার স্ট্যাণ্ড, স্ট্যাণ্ডে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে স্যালাইন ওয়াটারের স্বচ্ছ ব্যাগ, সরু শাদা নল দিয়ে স্যালাইন জল এসে খোকনের ডান হাতের রগ দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে ওর শরীরের অলিতে গলিতে।

ওরা দাঁড়াতে না দাঁড়াতে শাদা এ্যাপ্রন পরা, মাথায় শাদা রুমাল জড়ানো একজন নার্স এসে স্যালাইন ওয়াটার ব্যাগ, পাইপ, খোকনের নাড়ি, তাপ প্রভৃতি দেখে নেয়। নার্সের গায়ের রঙ ফর্সার ধার ঘেঁষে, সামনের দুটো দাঁত একটু উঁচু, ডান চোখের নিচে একটা কাটা চিহ্ন। আহমদউল্লা বলে, 'সিস্টার, ছেলে খুব কষ্ট পাচ্ছে।'

'কষ্ট তো আজ হবেই,' সিস্টার ঠাণ্ডা গলায় কথা বলে, 'কষ্ট হবে না? কাল এ্যানাসথিসিয়া করা ছিলো, কিছু বুঝতেই পারেনি। আজ খুব ব্যথা হবে।' রোকেয়াকে দেখে নার্স সিতারার দিকে প্রশ্নবোধক ভ্রূ নাচায়, 'মা তো, না?' সিতারা ঘাড় নাড়লে নার্স একটু হাসে; দাঁত দুটো উঁচু, তবু নার্সের হাসিটা মিষ্টি, 'এখন আর কি? মা এসে পড়লো, এখন আর কি? কষ্ট কি আর থাকে?'

নার্স অন্য বিছানার দিকে চলে গেলে আহমদউল্লা বাইরে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালো, 'আমি যাই। অফিসে একটু হাজিরা দিতে হইবো। কাইলও যাইতে পারি নাই। যাই।' সোলায়মান আলী ও হান্নানও কথা বলতে বলতে আহমদউল্লার সঙ্গে বাইরে গেলো।

খোকন শুয়ে থাকে চিৎ হয়ে। খোকন কি বাড়িতে চিৎ হয়ে শোয় কখনো? চিৎ হয়ে শুতে পারে না সে কতো ছোটো থেকে। এক বৎসর দেড় বৎসর বয়সেও কেবল এপাশ ওপাশ করতো। পশ্চিমদিকে মাথা রেখে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছো, কিন্তু

আধ ঘন্টা পর এসে দ্যাখো মাথা সরে গেছে উত্তরদিকে। ছেলেটা রাতভর শুধু চর্কির মতো ঘোরে, কখনো স্থির হয়ে ঘুমোবে না। আজ এভাবে শুয়ে থেকে খোকন কিভাবে শ্বাস প্রশ্বাস নেবে? খোকন মুখটা কাৎ করে রোকেয়াকে দ্যাখে। মুখ দেখেই স্পষ্ট বোঝা যায় তার শরীরের কোথাও না কোথাও খুব কষ্ট। হয়তো খুব ক্লান্ত কিম্বা কয়েকবার নানা ধরনের ইঞ্জেকশন দেওয়ায় তার স্পর্শকাতরতা এখন একটু ভোঁতা, সে চিৎকার করে না, কাঁদেও না, ওর গলা দিয়ে বেরিয়ে আসে কেবল ক্ষীণ ধ্বনির কাৎরানি।

'খোকন দ্যাখছ, তোমার আম্মায় আইসা পড়ছে। অখন আমাগো খোকন মিয়ারে হাসপাতালে বাইন্দা রাখে ক্যাঠায়?' সিতারা কথা বলে আর খোকনের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। এই মেয়েটার এই এক গুণ, শিশুদের সঙ্গে অবিরাম বকে যেতে পারে। তার একটানা কথা বলার ফলে খোকনের গোঙানি পেছনে পড়ে গেছে। 'আমার বাপজানের হাসপাতালে পইড়া থাকলে চলবো ক্যান? মহল্লার ব্যাবাকটি কাম পইড়া রইলো, বাবা, তোমারে জলদি যাইতে হইবো না?'

রোকেয়া আঙুলে শাড়ির আঁচল জড়াতে জড়াতে একটু তৈরি হয়ে বিছানার প্রান্তে এসে দাঁড়ালো।

খোকনের বিছানার ধার ঘেঁষে রোকেয়া খুব সোজা হয়ে দাঁড়ায়। একেবারে সোজা, ঋজু; ওর বুকটা এখন খুব চওড়া,—এই বুকের ভেতরে, ওপরে সমস্ত জায়গা খালি পড়ে রয়েছে। সে ইচ্ছা করলে ব্যান্ডেজ, প্লাস্টার, স্যালাইন ব্যাগ শুদ্ধ খোকনকে বুকের ভেতর নিতে পারে। এই খালি বুকে ঢোঁক গিললে কেবল ঢক ঢক আওয়াজ হয় : খোকন আমারে পাইয়া কি না জানি করে! আমার পাগলাটা!

ছেলের কপালে একটা হাত রেখে ঝুঁকে রোকেয়া ওর ছেলের মুখ লক্ষ্য করে। খোকনের বেশ জ্বর, গরম ভাপ আসছে কপাল থেকে। চুল ওর বড়ো অগোছালো। কখনো ঠিকমতো আঁচড়ানো যায় না। তপ্ত কপালে লেপ্টে থাকে এলোমেলো কালো চুল, রোকেয়া আস্তে আস্তে কপাল থেকে চুল ঠেলে দেয় পেছনদিকে।

বড়ো বড়ো দুটো চোখে খোকন এক দৃষ্টিতে মায়ের মুখ দ্যাখে। অনেকক্ষণ ধরে দ্যাখে।—খোকন আমারে দেইখা কি না জানি করে! ছেলের চোখজোড়ার একেবারে ভেতরটা দেখে নেওয়ার জন্য রোকেয়া ওর মুখের সামনে অনেকটা ঝুঁকে পড়ে। একটানা গোঙানির মধ্যে খোকন ওর চোখজোড়া পাঠিয়ে দিলো স্ট্যাণ্ডে ঝোলানো স্যালাইন জলের ব্যাগে। হাত কি পায়ের ব্যথায় কিম্বা শরীরের জন্য কোনো জায়গার কষ্টে তার চোখের মণি তিরতির করে কাঁপে। এখন ওর চোখ জোড়া গাঁথা রয়েছে সামনের শাদা দেওয়ালে। শাদা শূন্য দেওয়াল। এতো শূন্য দেওয়াল রোকেয়ার একটুও পছন্দ নয়। বোবা দেওয়াল, শরীরে আর কিছু না হোক এক গাছা টিকটিকিও কি পরতে নেই? এক মিনিট সেই নিরাভরণ দেওয়াল চেখে নিয়ে খোকনের চোখ চলে যায় নিজের প্লাস্টার করা পায়ে, সেখানে তিন সেকেণ্ড, তারপর সেই অপরিবর্তিত চোখজোড়া উড়াল দিলো উল্টোদিকের শেষ কোণের বিছানায়, সেখানে সাত আট বছরের একটি ছেলেকে অক্সিজেন দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে।

'খোকন, আব্বা, খোকন!' রোকেয়ার গলা একেবারে বুক পর্যন্ত খাঁখাঁ করে। জিভে অনেক কসরৎ করবার পর গলাটা একটু ভিজলে সে খসখসে আওয়াজ করে, 'খোকন, খুব ব্যাদনা করে বাবা?'

জবাবে খোকন কিছুই করে না। তার একটানা চাপা গোঙানিতে মনে হয় ওর শরীরের ভেতরে দারুণ চাপা গলি, নোনাধরা উঁচু নিচু দেওয়াল, যন্ত্র বিগড়ে যাওয়া ট্রাক ও নারিন্দার নিয়মিত ট্রাফিক জ্যাম পার হতে হতে বেরিয়ে আসছে ঠেলাগাড়ি ভর্তি হাওয়ার চাপ।' এতো কষ্ট কিসের বাবা? কই ব্যাদনা করে আমারে কওনা।'

এবার খোকন ফের মার চোখে তাকালো। ঠোঁটের কোণে একটুখানি ঈদের চাঁদ খেলিয়ে দিলো, সে দ্যাখা যায় কি যায় না। সে হাসি আর কতোক্ষণ! নতুন কোনো উপসর্গ শুরু হলো বোধহয়, মুখ বাঁকা করে সে একটু জোরে আঁ করে ওঠে। তারপর ফের একটানা চাপা গোঙানি। এবার আওয়াজটা বেশি। খোকনের চোখের কোণে ঘন নীল ছাপ, কোঁচকানো কপাল, অল্প ফাঁক হয়ে থাকে ফ্যাকাশে ফর্সা ঠোঁট। ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে এলোমেলো গঠনের দাঁতের শাদা টুকরো। খোকনের চোখ ফের অক্সিজেন দেওয়া রোগীর বিছানায় গিয়ে থেমে যায়। গোঙানি আরো বাড়ে।

'খোকন, সোনা, এই যে আমি আইছি, দ্যাখছো, আমি আইয়া পড়ছি তো!' খোকনের কেবল একটানা কাৎরানি। মাঝে মাঝে শরীরটা বাঁকাচ্ছে। একটানা গোঙানির মধ্যেই খোকন এবার সিতারার মুখে তাকায়। সিতারা বলে 'খোকন, তোমার মায়ে আইয়া পড়ছে, দ্যাখো বাবা, তোমার আম্মায় আইছে। দ্যাখছো?' রোকেয়ার দিকে তাকিয়ে সে বলে, 'ভাবী, আমি ম্যাট্রনরে লইয়া আহি। পোলায় কেমুন করে!' কিন্তু রোকেয়া কিছু না বলে খোকনের কপাল আরো নিবিড় করে চেপে ধরে। খোকন দেওয়াল দ্যাখে, স্যালাইন ওয়াটারের ব্যাগ দ্যাখে, অক্সিজেন দেওয়া মেয়েটাকে দ্যাখে, দুটো বিছানার পর একটা খাটে শান্ত হয়ে ঘুমায় একটি শিশু, তাকেও দ্যাখে, আর এর সঙ্গে চলে ক্রমাগত গোঙানির আওয়াজ। এদিকে সেতারাটা যে সেই কাকে ডাকতে গেলো তো এখনো তার ফেরবার নাম নেই। হান্নান, সোলায়মান আলী কোথায় গেলো? চারদিকে সব শিশু রোগী, দু'জন বাইরের লোক, ওয়ার্ডের ঐ প্রান্তে দুতিনজন নার্স। ফিনাইল জলের বালতি হাতে ঢুকলো গোঁফওয়ালা মেথর। নিজের সমস্ত মনোযোগ দিয়ে খোকনের কপাল টিপতে টিপতে রোকেয়া এসব ভুলে যায়। খোকনের একটানা গোঙানি হঠাৎ মনে হয় বহু দূর থেকে আসছে। এই গোঙানিতে অকস্মাৎ পরশু সন্ধ্যার হলদে ধানজমি, চাঁদের ময়লা আলোর নিচে বাঁশবন এবং সজনেতলায় গাছের ছায়ায় হু হু করে বাতাস বইতে শুরু করে। এরকম হাওয়ায় চুল উড় উড় হয়ে যায়, এই হাওয়ায় খোকনের কষ্ট কেবল বাড়ে। 'খোকন, বাবা!' রোকেয়ার আঙুলগুলো খোকনের তপ্ত কপালে খুব দ্রুত নাচে। খোকনের গোঙানি কি আরো বাড়লো? রোকেয়া একটু জোরেই ডাকে, 'খোকন!' কয়েকজন শিশু রোগী তার দিকে দেখে আবার নিজেদের পূর্ব মনোযোগে ফিরে যায়।

রোকেয়ার হাতের তালুর নিচে খোকনের জ্বরের তাপ শুধু বাড়ে। হায়রে, এ্যামনে তো পোলার তামাম শরীরটা ফালা ফালা করছে, অহন জ্বর বাড়বো তো লগে লগে মাথা বিষাইবো, পোলায় আমার ক্যামনে বাঁচে? জলদে পৌঁছানো সেতারীর হাতের আঙুলের মতো রোকেয়ার দীর্ঘ ও ফর্সা আঙুলগুলো খোকনের কপালে খুব দ্রুত কাঁপে। কিন্তু ১০৪° জ্বর খোকনের শরীরে কম্বলের মতো বিছানো, রোকেয়ার আঙুল এই কম্বল ভেদ করে কি করে খোকনকে ঠিক ঠিক স্পর্শ করে?

'খোকন!' খোকন তখন বিড়বিড় করে কি বকছে।

'খোকন।' রোকেয়া ফের চিৎকার করে উঠলো। খোকন ওর মাকে এক নজর দেখে নিয়ে পাশের রোগীর টেবিলে রাখা ভাঙা কমলালেবু, এক হালি কলা ও এক গ্লাস হর্লিক্স দেখতে থাকে।

মেট্রনকে নিয়ে সিতারা ফিরে এলো। খোকনের গোঙানি এখন খুব স্পষ্ট। গলা থেকে মাঝে মাঝে এ্যাঁ এ্যাঁ ধ্বনি বেরিয়ে একটা নিয়মিত তাল সৃষ্টি করে। মেট্রন বললো 'আপনি বেডে বসবেন না, সরে আসুন।' কিন্তু রোকেয়া সরে বসলে কি চলে? খোকনের এখন চোখের রঙ লাল, লাল রঙের বোবা চোখে সে শাদা রঙের শূন্য দেওয়াল দেখছে। 'খোকন' রোকেয়া তার গোটা বুকের সব শক্তি উজাড় করে হামলায় 'খোকন! বাবা আমি আইছি তো! দ্যাখস না? বাবা!'

শূন্য দেওয়াল ছেড়ে খোকন এবার ওর লাল রঙের বোবা চোখ রোকেয়ার মুখে একবার ছুঁইয়ে দিয়ে পাঠিয়ে দিলো পশ্চিমদিকের দরজার ওপারে, ঐ দরজার পর বারান্দা, বারান্দায় রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকে দুতিনজন আয়া।

সিতারা তাড়াতাড়ি কাছে এসে রোকেয়ার হাত ধরে, 'ভাবী তুমি খালি খালি অস্থির হইছ? খোকনের কি হইছে? কাউলকাও এমনু টাইমে বিছনার উপর খালি ফাল পাইরা উঠছে। এইতো সিস্টার আইছে একটা সুঁই দিবো ঠিক হইয়া যাইবো।'

খোকনের কপাল থেকে রোকেয়ার হাত তুলে নিয়ে মেট্রন বললো, 'আপনি এখান থেকে সরে বসুন।'

রোকেয়া তবু বিছানায় বসেই থাকে। এবার মেট্রন বিরক্ত হয়, 'আপনি এখানে বসে কি করবেন?'

সিতারাও সায় দিলো, 'তুমি আর কি করবা ভাবী? এই টুলে বহ।'

সিতারা রোকেয়ার হাত ধরে তুলে নিয়ে তাকে বসিয়ে দেয় একটা টুলে। টুলে বসে খোকনের সমস্ত বিছানাটা আরো স্পষ্ট চোখে পড়ে। এদিকে টুলের ওপর রোকেয়া, মাঝখানে সরু ঠাণ্ডা মেঝে, তারপর বিছানার ওপর তার ব্যাণ্ডেজ নিয়ে, প্লাস্টার নিয়ে, স্যালাইন ওয়াটার ব্যাগ থেকে প্রবাহিত পাইপ নিয়ে খোকন একটানা গোঙায়।

ফেরারী

ডিসপেন্সারিতে ডাক্তার নেই শুনে হানিফের শরীরটা সহজ ঠেকলো। ভারি মাথা, ভারি বুক, ভারি হাত পা আর কাঁহাতক টানা যায়? কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে কথা বলতে গেলে আঠালো উৎকণ্ঠা গলায় তবু চটচট করে।

'ড্ ডাক্তারে ক্‌কৈ গেছে?'

সামনে ঝুঁকে প্রতাপ কম্পাউণ্ডার রাস্তার ওপার টোকা মিয়ার রেস্টুরেন্টের দরজায় মস্ত তাওয়ায় বিছিয়ে রাখা আলুর চপ দেখছে। পাশে জিলেপি ভাজা হচ্ছে, কম্পাউণ্ডার বোধহয় জিলেপিও দেখছে। রিকশা, স্কুটার ও ঠেলাগাড়ির ফাঁকে ফাঁকে তার লাল, শাদা ও খয়েরি রঙের চোখে এইসব খাদ্যদ্রব্য ছেঁকে নিতে নিতে সে কপাল কোঁচকায়, 'কি?'

'ড্ডাক্তারে কৈ গেছে?'

'আমারে কইয়া গেছে?'

কম্পাউণ্ডারের জবাব শুনে হানিফের করোটিতে দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে : মালাউনের বাচ্চা, চাইয়া চাইয়া দ্যাখ। জিন্দেগিতে খাইতেতো আর পারবি না, দেইখাই মর!

আগুন জ্বলবার দপ আওয়াজে মাথা স্বাভাবিক ও পরিচিত হলো। নরম নরম গলায় সে মিনমিন করে, 'অহন আইবো না?'

'ক্যামনে কই?'

প্রতাপ কম্পাউণ্ডারের তেজটা বড়ো বেশি। হানিফ কি আর করে, ডানদিকে বাঁদিকে দেখে রাস্তা ক্রস করলো। প্রতাপের তাপে ওর ঘাড়ের চামড়া অনেকটা ঝলসে গেছে : কম্পাউণ্ডার হালায় বহুত বাইড়া গেছে। আউজকাই ডামলালুরে যুদি না কইছি!

নন্দলাল দত্ত লেন ধরে খানিকটা হাঁটতেই পাঁচভাইঘাট লেনের মাথায় ক্যারম বোর্ডের আড্ডা দেখে ঘাড়ের জ্বালাটা জুড়িয়ে গেলো।

খালি ড্রামের ওপর রাখা ক্যারমবোর্ড, বোর্ডে নতুন করে পাউডার ছিটিয়ে গুটি সাজাচ্ছে সালাউদ্দিন। হানিফ পাশে এসে দাঁড়ালে সালাউদ্দিন বলে, 'তর বাপে মরছে?'

কথা বললে কি হবে, সালাউদ্দিন ওর দিকে একবার তাকায় না পর্যন্ত।

বোর্ড সাজাবার কাজে সে বড়ো ব্যস্ত।

'কি রে গুটলি, কইলি না?'

হানিফ তার মুখের দিকে তাকালে সালাউদ্দিনের ভ্রূজোড়া দুলে ওঠে, 'তর বাপে মরছে?'

হাসি হাসি মুখ তৈরির চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে হানিফ এমনি প্লেন মুখেই বলে, 'ড়ডাক্তাররে পাই না, মুমউতরে ক্যামনে ঠ্যাকাই?'

বোর্ড সাজানো হলে প্রথমবার স্ট্রাইক করলো আহসানউল্লা। ওয়েল্ডিং মেশিনে কাজ করে ওর আঙুলগুলো হয়েছে সব ঝলসানো রডের মতো, ঐ দুটো রড দিয়ে পরপর দুটো শাদা গুটি গর্তে ফেলে সে স্ট্রাইকারের পজিশন ঠিক করে। কিন্তু লোকটার মনোযোগ সবদিকেই।

'মতিন ডাক্তারে দ্যাহে না?'

খুক করে এক টুকরো হেসে সালাউদ্দিন মতিন ডাক্তারকে নস্যাৎ করে দিলো, 'হেই লাইগাইতো জিগাই। অহনো জিন্দাই রইছে?'

হানিফের ঠোঁট থেকে সিগ্রেট টেনে নিয়ে লম্বা টান দিলে সালাউদ্দিনের গলা দরজা খুলে গেলো, 'বুঝলি, ঐ হালার মতিন ডাক্তাররে ছাড়ান দে। তর বাপে না কাউলকাও কি যানি দ্যাখছে?'

হানিফ অন্য দিকে তাকিয়ে লালচে হাসে, 'হ, জিন না পরী দেইখা রাইত ভইরা খালি চিল্লাইছে।'

জিনপরী দেখবার ক্ষমতা ইব্রাহিম ওস্তাগরের কি আজকের? এই মহল্লার এসব জানে না কে? বাপের ওস্তাদীর কথা বলবার জন্য হানিফের জিভ নিসপিস করে, কিন্তু সে খানিকটা তোতলা, একটু দেখে শুনে কথা না বললে তার চলে না; তাই মাটির দিকে তাকিয়ে একটু একটু হাসা ছাড়া বেচারা কি আর করতে পারে?

সিগ্রেট ফেলে দিয়ে সালাউদ্দিন সোজা হয়ে দাঁড়ালো। ঘাড় ঘুরিয়ে একটা রিকশার ভেতরে মেয়েও দেখে নিলো গোটা দুয়েক; তারপর সরু ও তীব্র ধারায় থুতু ফেললো দাঁতের ফাঁক দিয়ে।

মতিন হালার দাওয়াই খাইলে জিনপরীমাহাক্কাল ব্যাকটি হালায় লোর পাইড়া আইবো। ঐ ডাক্তারে আগে আছিলো জিন্দাবাহার, বুঝলি? মহল্লার মইদ্যে কেউগার ঘরে হালারে ডাকতো না।'

'তুই জানলি ক্যামনে? খালি খালি প্যাচাল পারস!'

'ঈমানে কই ওস্তাদ! ঈমানে কই!' আহসানউল্লার কথার জবাব দিতে সালাউদ্দিনের চোখে মুখে সাড়া পড়ে যায়, 'জিন্দাবাহারের মইদ্যে ঢুইকা চাইরটা পাঁচটা ঘর বাদ দিয়া চিপা গল্লি আছে না একটা?—আছে না?—ঐ গল্লির লগেই ডাক্তারের ডিসপিনচারি, ডিসপিনচারির বগলে আমার মামুগো তেহারির দোকান। কতো গেছি না আমি? বড়ো রাস্তাটা পার হইলেই তো তোমার বাদামতলীর

মাগীপট্টি. মতিনে হালায় দাওয়াই দিতো খানকি মাগীগো আর খানকিগো ভাউরা থাকে না?—হেইগুলিরে। মাগীপট্টির কেউগার ব্যারাম হইছে তো ডাকো হালায় লম্বুরে, জিন্দাবাহারের মইদ্যে হ্যার নামই আছিলো খানকির ডাক্তার।' সালাউদ্দিন খুক খুক করে কাশে আর ঘোলাটে দাঁতের ফাঁক দিয়ে চিক চিক থুথু ফেলে।

'হেই পট্টি না উইঠা গেছে!'

'হেই লাইগাই তো!—গুটলিচোদারে ক্যামনে কই?' হানিফের নিরীহ কথায় সালাউদ্দিন চোখ মুখ কোঁচকায়, 'হেই লাইগাই তো, গুটলিরে ক্যামনে বুঝাই? মোনেম খানে বাদশারে ফিনিস করবো,—বাদশা আছিলো বাদামতলীর বাদশা, শাহানশা। তে বাদশারে খতম করবো, হালার মোনেম খানে তাই মাগীপট্টি উঠাইয়া দিলো। খানকিরা কৈ কৈ গেলো গিয়া, লম্বুরে অহন ক্যাঠায় ডাকে? কেউগায় অরে কইছে, মিয়া, রোকনপুর যাও গিয়া, ডাক্তার উক্তার নাইকা, যাও, জমাইতে পারবা।' 'কি বে হানিফ, খেলবি?' সালাউদ্দিনের দীর্ঘ সংলাপ সংক্ষিপ্ত করার জন্য আহসানউল্লা এই প্রস্তাব দিলে হানিফ খুশিও হয়, ফের ভয়ও করে ওর, ওকে কি আর চান্স দেবে? ও ভালো খেলতেও পারে না; তবে সালাউদ্দিন কেটে পড়লে আর কেউ নেই বলে ওকে নিতে পারে। সালাউদ্দিন এখন কোথায় আর যাবে : বাঙলাবাজারের ছেমরিগো ইশকুল অহনতক ছুটি হয় নাই।

আহসানউল্লা ফের বলে, 'খেলবি তো খাড়াইয়া থাক। ডামলালু আহুক।' কিন্তু ডামলালুর ঠিকঠাক কোনো সময় নেই; কৈ কৈ ঘুরাঘুরি করে, কারে মারবো, কেউগার পকেট কাটবো, কেউগারে ছপ্পনের ঝিলিক দ্যাহাইয়া মালপানি ব্যাকটি খসাইয়া লইবো, ওস্তাদের হালায় টাইম টুইম কিছু আছে?—আর পয়সা ছাড়া ডামলালু বোর্ডে হাত দেবে না। কিন্তু ক্যারমে পয়সার ব্যাপার থাকলে হানিফের হাত পা বড়ো কাঁপে, স্ট্রাইকার হয় গড়িয়ে পড়ে গর্তে, নইলে একসঙ্গে লং জাম্প হাই জাম্প দিয়ে বোর্ড ও ড্রাম ডিঙিয়ে রাস্তায় গড়াগড়ি করে। সালাউদ্দিন বললো, 'ডামলালু আর আইছে!'

কথা বলতে বলতে সে চেষ্টা করছিলো রেড ফেলতে, গুটিটা গর্তে পড়লে ডান হাতের তিনটে আঙুলে সশব্দে চুমু খেয়ে হাঁক ছাড়ে, 'দিছি, হালারে এক্কেরে হান্দাইয়া দিছি।'

আহসানউল্লা একটু ধমক দেয়, 'ডামলালু আইবো না? কেল্লায়?'

সালাউদ্দিন ফের হাত পা গুছিয়ে নিলো, 'হায় হায়! তুমি জানো না ওস্তাদ? পুলিসে আউজকা ঐ হালার ঘরে ভি গেছিলো দুই তিনবার। হোনো নাই তুমি?'

'পুলিসে বিচরায়? কারে? ডামলালুরে?' হানিফের কণ্ঠে দ্রুতগতি তরঙ্গের আভাস পেয়ে সালাউদ্দিন নাকে ও গলায় অম্লধ্বনি উদগার করলো, 'সোনার চান্দ, পিতলা ঘুঘু, ডামলালুকা পাট্টিমে তুম ভি ঘুসা? আভি টেনিং চল রাহা?'

ডামলালুকা পাট্টিমে যানা এতনা আ'সানি নেহি। ডামলালু অতো সহজে কাউকে পাত্তা দেয় না। হানিফ ওর আশেপাশে ঘুরঘুর করছে আজ কতোদিন ধরে;

পাত্তা কি দেবে, ভালো করে তাকায় না পর্যন্ত। মাত্র কয়েকদিন আগে ওকে একটা চান্স দিলো ওর সঙ্গে যাওয়ার। এইতো কয়েকদিন আগে। হানিফ বাপের জন্য বাকেরখানি নিয়ে ফিরছিলো কালাচান মিয়ার লঞ্চির সামনে দিয়ে, তো দেখতে পেয়ে ডামলালু বললো, 'ঘরে রুটি দিয়া এহানে আয়।'

কালাচান মিয়ার লঞ্চিতে বাকেরখানি রেখে হানিফ এগিয়ে আসে, 'কৃকি ওস্তাদ?'

'আমার লগে যাইবি। রুটি ঘরে রাইখা আয়।'

'আইয়া দিমু।'

'দিয়া আয় কইলাম! তর বাপে খাইবো না?'

ডামলালুর কথা অস্বীকার করবে হানিফ? বাবার ঘরে কাগজে জড়ানো বাকেরখানি ক'টা রেখেই চলে আসছে, ঘরে এক মিনিটও ছিল না, এর মধ্যেই বাপ হালায় গোঙাতে শুরু করলো, 'পানের দোকানটা কইরা দিলাম, দুইটা ঘন্টাও যুদি বইতো! কৈ কৈ যায়, কি করে, হারামজাদারে লইয়া ক্যামনে কি করি!' রাস্তায় নামতে নামতে শোনা গেলো ভাবীও যোগ দিয়েছে, 'হ্যায় হইলো আমাগো বাড়ির মেহমানসাব। হ্যায় আইবো খালি খাওনের টাইমে টাইমে!'

তারপর শরীর ভরা ছটফটে সুখ নিয়ে ডামলালুর সঙ্গে সন্ধ্যাবেলার ভিড়ে সদরঘাট থেকে বাসে প্রেসক্লাব, প্রেসক্লাব থেকে হেঁটে হেঁটে রেসকোর্স।

ইঞ্জিনীয়ার্স ইন্সটিট্যুটের সামনে একটি দুটি লোক, একটু দূরে আলো জ্বলছে ঢাকা ক্লাবে। ঝাপশা মাঠের ওপারে দালানের সারি। এপারে রাস্তা। এতোক্ষণ ডামলালু একটি কথাও বলে নি। এখানে এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে খুব গম্ভীর স্বরে বললো, 'তুই খাড়াইতে পারবি না এহানে? পারবি?'

ঘাড় কাৎ করে হানিফে সায় দিলে ডামলালু বলে, 'এহানে খাড়াইয়া থাক। পুলিস দ্যাখলে ময়দানের দিকে চাইয়া "জুম্মন" কইরা বহুত জোরসে ডাক পাড়বি, বুঝলি?'

মস্ত বড়ো দুটো গাড়ি মসৃণগতিতে ওদের পাশ কাটিয়ে চলে গেলো। গাড়ির ভেতরে শাদা পুরুষ ও রঙিন মেয়েমানুষ। কিন্তু ডামলালুর লক্ষ্য অন্যদিকে। ঢাকা ক্লাবের সামনে দিয়ে একটা রিকশা আসছে। মনে মনে স্ট্র্যাটেজি ঠিক করে ডামলালু বললো, 'তুই তাইলে খাড়াইয়া থাক। আমি কাম করি।'

ডামলালু একটু এগোতেই দ্রুতবেগে একটা জিপ ছুটে আসে ঐদিক থেকেই। শাদা রঙের নতুন মডেলের জিপ। ওদিকে ডামলালু হাঁটছে ধীরে ধীরে, রিক্শার কাছাকাছি চলে এসেছে। ডামলালু কি জিপটার দিকে তাকিয়েও দ্যাখেনি একবার? রেসকোর্সের কাঠের রেলিঙ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইলো হানিফ; ডামলালু কি কিছুই বুঝতে পারেনি? জিপ এসে দাঁড়ালো হানিফের উল্টোদিকে, ইঞ্জিনীয়ার্স ইন্সটিট্যুটের বিপরীত ফুটপাথ ঘেঁষে ঝাঁকড়া-মাথা কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায়। হানিফের বুক টিপ টিপ করে : পুলিসে আইয়া পড়লো! ডামলালুরে অহন ক্যামনে কই? ওস্তাদরে ক্যামনে ডাকি? পুলিসে আইয়া পড়লো!

গাড়িটার দিকে তাকাতে গেলে চোখজোড়া সেঁধে যায় কোটরে, এর ফলে চোখের মণি নিভে যায় ও মাথার শিরাগুলো দপদপ জ্বলতে শুরু করে : পুলিসরে কইয়া ফালাই, আমি রিকশা হাইজ্যাক করুম, হেই লাইগা এহানে খাড়াইয়া রইছি। আমার নাম আবদুল হানিফ, কলতাবাজারের ইব্রাহিম ওস্তাগর আমার বাপ লাগে, আমারে ধইরা লন, আমি রিকশা হাইজ্যাক করবার লাইগা আইছি, আমারে ধইরা সূত্রাপুর লইয়া চলেন।—শিরাউপশিরাসমূহের এরকম রিমঝিম নাচের পর শিথিল ধড় নিয়ে হানিফ পুলিসের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

পুলিসের বদল গুটি গুটি পায়ে ফিরে আসে ডামলালু, 'ল, যাই গিয়া।' অনেকক্ষণ চুপচাপ হেঁটে হাইকোর্টের সামনে এসে ডামলালু চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, 'চুতমারানি!'

বিগলিত গলায় হানিফ উত্তর দেয়, 'প্‌পুলিসে আইয়া পড়লো, ন্‌নাইলে ঐ রিক্‌শার মইদ্যে ম্‌মালপানি বহুত ম্‌মিলতো, না ওস্তাদ?'

ডামলালু অবাক হলো 'পুলিস পাইলি কৈ?'

'জ্‌জিপগাড়ির মইদ্যে প্‌পুলিস আছিলো না?'

'আমার ল্যাওড়া আছিলো! জিপগাড়িটা দেখছিলি ভালো কইরা? দেখছিলি?'

হানিফ একেবারে চুপসে গেলো, 'প্‌পুলিস আছিলো না?'

'পুলিসের বাপে আছিলো বে তোতলাচোদা! দেখলি না লম্বা চুল, জুলফিআলা মস্তানগুলি হালায় ফাইব ফিফটি ফাইব মারতাছে! ঐগুলি পুলিসের বাপ লাগে, বুঝলি? হালারা ইসটুডেন!'

'ইসটুডেন? ইইসটুডেনে ক্‌কি করবো?'

'তরে না একখান চটকানা দিয়া কলতাবাজার পাঠাইয়া দেই তো আরাম পাই বুঝলি?' ডামলালু খুব বিরক্ত হয়েছে, 'ইসটুডেন হালারা কি করবো তুমি জানো না, না? কেলাব থাইকা, হোটেল থাইকা সায়েবরা বারাইবো মাল টাইনা, অরা হেই গাড়িগুলি ধইরা মালপানি কামায়, মাগীউগি পছন্দ হইলে ময়দানের মইদ্যে লইয়া হেইগুলিরে লাগায়। অহন বুঝলি হালার বাঙ্গুচোদা, বুঝলি? দিন তো অহন হালায় ইসটুডেন গো, হালায় ইসটুডেনের মারে বাপ!'

প্রেসক্লাবের সামনে এসে একটা বাস দেখে ডামলালু বলে, 'ওঠ, যা গিয়া।'

হানিফ বলে, 'ত্‌তুমি?'

'আবে, তুই যা না বে।'

'গুটলি, তর ডাক পড়ছে। সালাউদ্দিনের কথায় একটু চমকে উঠে ভাইপোকে আসতে দেখে হানিফ লাজুক লাজুক মুখে—ওর গালের রঙ তখন বেশ বেগুনী ও ঠোঁটজোড়া একটু ফাঁক করা—এদিক পানে ওদিক পানে দ্যাখে। কামাল কাছে এসে বলে, 'চাচা, তোমারে যাইতে কইছে। জলদি চলো, দাদায় না খালি জিনপরী দ্যাখতাছে।'

কামালের সঙ্গে যেতে যেতে হানিফ বলে, 'তর দাদায় কি করে রে?'

'দাদা? জিনপরী অহন দাদারে বহুত ডিসটাব করতাছে।'

হানিফের বেঁটেখাটো পাজোড়া লম্বা লম্বা পদক্ষেপে প্রায় দৌড়ে চলে। কামাল কথা বলে যাচ্ছে অবিরাম, 'চাচা, দাদায় মনে লয় খুব সোন্দর পরী দেখছে একখান। পরী না খাটের তলায় ঢুইকা পড়ছিলো, পরীগো বডি তো বহুত লাইট, খাটের তলায় ঢুইকা চুপ মাইরা বইয়া রইছে। দাদায় না বুঝবার পাইরা খালি জাম্প মাইরা উইঠা খাটের তলে বিচরাইয়া বেড়ায়। পরীরে দেইখা দাদায় খুব খুশি, না চাচা?'

হানিফের মাথা পরিষ্কার হয়ে আসছে আস্তে আস্তে। স্বচ্ছ করোটিতে নতুন ও কোমল একটি হাওয়া খেলে যায় : বাবায় বহুত দিন বাদে অগো লগে মিলতাছে।

'চাচা, আমাগো ইশকুলের ড্রিল স্যারে না আমাগো চানা খাইতে কর। ক্লাস নাইন বি'র সিদ্দিক ভাই চানা খায় তো, বডির মধ্যে বহুত পাওয়ার, কারাত মাইরা বেঞ্চির পায়া ভাইঙ্গা ফালাইতে পারে।'

কিন্তু কামালের উৎসাহ হানিফকে ছুঁতেও পারে না। নিজেকে তার খুব ফালতু ঠেকে, তার কপালে কি জিনপরী আছে? অথচ ইব্রাহিম ওস্তাগরের সঙ্গে জিনপরীদের যোগাযোগ কি আজ থেকে? পৈতৃক পেশায় ঢোকার আগে যখন সে তরুণ যুবক, ঘোড়ার গাড়ি চালাতো, জিনপরীদের সঙ্গে তার সম্পর্ক সেই তখন থেকেই। আজ সপ্তাহখানেক হলো ইব্রাহিম ওস্তাগর অসুস্থ। তিনদিন থেকে বেশ বাড়াবাড়ি, গতকাল রাত্রি থেকে খাটের নিচে সে কি সব খুঁজে বেড়াচ্ছে। সন্ধ্যাবেলার বাতাসে বাবার রোগা শরীরটা বেলুনের মতন ওড়ে : বাবার সিনার মইদ্যে, দিলটার মইদ্যে আজ বহুত হাওয়া খেলতাছে।

'চাচা, সোহেলে না হাঁটতে গিয়া খালি পইড়া পইড়া যায়। দাদারে দেইখা ফুফু কানতাছে আর সোহেল খাড়াইতে গিয়া পইড়া গেছে তো, সোহেলে খালি কান্দে। দেওয়ালের লগে, ছাদের লগে জিনপরী দেইখা দাদায় হ্যাগো ধামকি লাগায় আর সোহেলে খালি ডরায়।'

কখনো কখনো ঘরের দেওয়াল কি ছাদের দিকে তাকিয়ে ইব্রাহিম কার সঙ্গে কি বলে, কাকে ধমক দেয়, মিনতি করে সরে যাওয়ার জন্য। হানিফ তাড়াতাড়ি হাঁটে; ওর পায়ের রক্তে জলতরঙ্গ বাজে : বহুত দিন বাদে বাবায় অগো লগে মিলছে, বাবার না জানি কেমুন সুখ।

'চাচা, ফুফায় না দাদার ঘর বাইন্দা দিবো। দোয়া পইড়া বাইন্দা দিলে জিনে আসতে পারবো না, না, চাচা?'

'কি?' কামালের কথায় হঠাৎ খেয়াল করে হানিফ বলে, 'ফুফা? তর ফুফায় আইছে? তর ফুফুও ভি আইছে?'

'আইছে না? এইতো এট্টু পরে ফুফু, ফুফা আর সোহেল আইছে রিকশা কইরা, আমি দরজা খুইলা দিছি তো, ফুফু দাদারে দেইখা খালি কান্দে, ফুফু না সুটকেসের চাবি ফালাইয়া আইছে।'

বড়োবোনের আসার খবর শুনে হানিফের পাজোড়া জমে গেলো। হানিফকে দেখে ফাতেমা নোনতা ও ঈষদুষ্ণ জলে একুল ওকুল প্রবাহিত হবে : ঘরের মেঝে, ছাদ ও দেওয়াল থেকে শূন্যতা ঝরে পড়বে নোনা স্বাদে, হানিফের স্বচ্ছ ও নতুন-হাওয়া-লাগা করোটি হয়ে উঠবে ভারি ও গুমোট। শ্বশুরের আসন্ন মৃত্যুর অগ্রিম শোকে কণ্ঠ কানায় কানায় উৎকণ্ঠায় ভরে ফাতেমার স্বামী হবিবর আলী মৃধা—হালায় গেরাইম্যা মোল্লাটা—হানিফের দায়িত্বহীনতাকে ন্যাংটো করে চাবকাবে, 'মিয়া, বাপে দোকান কইরা দিলো, তাও দ্যাখবা না; হান্নানের কারবারের মইদ্যেও হাত লাগাইবা না, তোমারে দিয়া কি হইবো?' আর ফাতেমার শৈশব থেকে সঞ্চিত পিতৃস্নেহে সমস্ত বাড়িঘর ভেসে গেলে হানিফ কোথায় ঠাঁই পায়? হানিফের বাঁ পায়ের লাল রক্ত ও ডান পায়ের লাল রক্ত জমে খয়েরি রঙের সুরকি হয়ে করকর আওয়াজ করে।

বড়োভাইকে নিয়ে হানিফের কোনো ঝামেলা নেই। হান্নান, সে এখন নতুন লেদ মেশিন বসাচ্ছে, শান্তিনগর বাজারের সঙ্গেই ঘর ভাড়া নিয়েছে, সেই ব্যাপারে সে বড়ো ব্যস্ত। ২৪ ঘন্টা তার ১ চিন্তা ১ ভাবনা—বিহারী ইসমাইল মোহাম্মদের মেশিনটা কেনার সময় কি করে ২০০০.০০ টাকা ২৫০০.০০ টাকা বাঁচানো যায়। না, হান্নান কোনো অসুবিধা সৃষ্টি করে না। কিন্তু ওর বোন ফাতেমাবিবি, হানিফের শৈশবকালের একমাত্র বন্ধু ফাতেমা, লম্বাটে মুখে তিনটে বসন্তের দাগ, ডানদিকের দাঁত একটা উঁচু; ঠাণ্ডা, নরম, ঘামে ভিজে, রোগা ও কালো ডান হাতে আঁকড়ে-ধরা হানিফের বাঁ হাতের তর্জনী—এইতো এইসব রাস্তা, গলির ভেতর দিয়ে ভোরবেলা সোজা চলে গেছে শাহ সাহেব মসজিদের বারান্দায়, সেখানে আসিরুদ্দিন মৌলবির মক্তব। ঘন্টাখানেক আমপারা পড়ে আমড়ার আচার কি কাঠি দিয়ে কয়েতবেল খেতে খেতে ঘরে ফিরেছে। গরম জলের ভাপের আড়ালে সেই লম্বাটে মুখ ঝাপশা ও অস্বস্তিকর ঠেকে।

'চাচা, আব্বা সোহেলরে ইম্পিরিঙের জাহাজ দিছিলো না ১২ টাকা দিয়া, সোহেল না চাক্কাউক্কা ব্যাকটি ভাইঙ্গা ফালাইছে। আম্মায় কয় কি, কুনো জিনিসের কুনো যনত নাই, অগো দিয়া ফায়দা কি? চাচা, আব্বায় কইছে, আল্লায় বাঁচাইলে আমাগো টয়েটা গাড়ি ভি হইবো। মালীবাগের বাড়ি হইয়া গেলে আব্বায় না গাড়ি কিনবো। কিনবো না?'

কামালের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সাধ, হানিফের নিজের দুপায়ের শুকিয়ে যাওয়া রক্তবিন্দুসমূহের করকর আওয়াজ ও মাথার গুমোট স্তব্ধতা কানে বাজে এবং চাচা ভাইপোতে ঠিকমতো বাড়ি পৌঁছে যায়।

ড্রেনের ওপর সিমেন্টের দুটো ঝুলন্ত ধাপে পা দিয়ে ঘরে ঢুকতেই দ্যাখা গেলো হবিবর আলী মৃধা মগরেবের নামাজ পড়ে জায়নামাজে বসেই ডান হাত দিয়ে তার পিঠের দুর্গম জায়গাসমূহ চুলকাতে চেষ্টা করছে।

'আরে মিয়া, তোমরা কৈ কৈ থাকো?' দাড়িতে হাত বুলিয়ে জায়নামাজ তুলে ভাঁজ করতে করতে হবিবর আলী মৃধা হানিফের সঙ্গে ভেতরের ঘরে ঢুকলো।

ডানদিকে পাশ ফিরে চুপচাপ শুয়ে রয়েছে ইব্রাহিম ওস্তাগর। সে কি ঘুমিয়ে পড়েছে, না কিসব দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে এখন বিশ্রাম নিচ্ছে? নাকি চোখ বন্ধ করে একেবারে ভেতরপানে চোখ ফেলে শেষবারের মতো তাদের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে নিচ্ছে?

'দ্যাহো মিয়া, হান্নান মিয়ায় অহন কতো রোজগারপাতি করে, বুইড়া মানুষটার বহুত তকলিপ, ঘরে একটা ফ্যান লাগাইতে পারো না?'

হবিবর আলী মৃধা বয়সে এদের চেয়ে অনেক বড়ো, এ ছাড়া সে একজন মৌলবি, তাই সর্বদা তার মুরুব্বি মুরুব্বি ভাব।

কামাল সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, 'ফুফা, আম্মায় কয়, এই দোজখখানার মইদ্যে ফ্যান লাগাইয়া কি হইবো? মালীবাগে বাড়ি হইলে এক্কেরে ফ্যান উন—।'

মাথার ওপর ধুলো কালি ঝুলে বাড়ানো তার বেয়ে টিমটিমে আলো এসে জ্বলছে ৪০ পাওয়ারের বাল্বে। ইব্রাহিম ওস্তাগর চিৎ হয়ে শুয়ে সেই বাল্বের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে।

বাপের মাথার কাছে মুখ নিয়ে ফাতেমাবিবি বলে, 'বাবা! কি কও?' বালিশ থেকে মাথা সরিয়ে নিয়ে ইব্রাহিম ওস্তাগর তখন বেশ ঝুঁকে পড়ে তক্তপোষের নিচে কি খুঁজতে শুরু করলো।

ফাতেমা বলে, 'ও বাবা, কি বিচরাও? বাবা! ও বাবা?'

মাথাটা ফের বালিশে ফিরিয়ে এনে ইব্রাহিম মেয়ের দিকে তাকিয়ে তার দশ বছর আগে মরে যাওয়া বৌকে ধমকায়, 'হালিমের মাও, অজু না কইরাই এহানে আইছো? তোমারে কতো কই—।'

এতোকাল পর মৃত মায়ের প্রতি বাপের সম্বোধন শুনে ফাতেমা ফোঁৎ ফোঁৎ করে কাঁদে।

কাঁদলে ফাতেমাকে আরো খারাপ লাগে। বসন্তের দাগ একটা মিলিয়ে গেছে। আর দুটোর আকার আরো বেড়ে যাওয়ায় অশ্রুবিন্দু জমে সেগুলো বসন্তের জ্যান্ত গুটি হয়ে দৃষ্টিহীন তাকিয়ে থাকে।

ফাতেমার গেঁয়ো গেঁয়ো চেহারা দেখে হানিফের রাগ হয় : মোল্লা হালায় আর কেমুন কইরা রাখবো?

হবিবর আলী মৃধা ইব্রাহিম ওস্তাগরের বাড়িতে থেকে লালবাগ ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় পড়াশোনা করতো। পরে ফাতেমার সঙ্গে বিয়ে হলে নিজেদের গ্রামের কাছেই মীরকাদিম জামে মসজিদের ইমামতির চাকরি নিয়ে সে গ্রামে চলে যায়। অনেকক্ষণ দেখবার পরও ইব্রাহিম জামাইকে চিনতে পারে না, খুব ভক্তির সঙ্গে বলে, 'স্লামালেকুম মৌলী সাব। লক্ষ্মীবাজারের গলাকাটায় ঐ ছেমরিটারে বহুত দিগদারি করতাছে। কহন ফালাইয়া দিয়া ছেমরিরে মাইরাই ফালাইবো। আমারে দ্যাখলেই গলাকাটায় হালায় খালি ফাল পাইড়া ওঠে। আউজকার দিনটা বাদ দিয়া কাউলকা আমার মউত, আমারে পেরেশানি কইরা অগো ফায়দাটা কি?'

এক গ্লাস পানি হাতে এসে দাঁড়ালো হান্নানের বৌ। 'আব্বা, ওষুধ খান,' টেবিলে রাখা একটা শিশি থেকে ক্যাপসুল বার করে সুফিয়া ইব্রাহিমের মাথার নিচে হাত রাখলো, 'আব্বা, এট্টু দেহি!'

ইব্রাহিম মিনতি করে, 'তোমরা আমারে বহাইয়া দিবার পারো?'

হানিফ ও হবিবর আলী মৃধার মিলিত প্রচেষ্টায় ঘাড়ের নিচে ও পিঠের সঙ্গে তিনটে বালিশ দিয়ে ইব্রাহিমকে বসিয়ে দেওয়া হলো। সে খুব ক্লান্ত এবং তার চোখ দেখে মনে হয় তার ঘুম পাচ্ছে। কিন্তু ক্যাপসুল মুখে দেওয়ার আগের মুহূর্তে সে বিকট চিৎকার করে, 'চুতমারানি, তুই গেলি না? তরে আমি জানে খতম কইরা দেই, র, খাড়া।'

সুফিয়া ও ফাতেমা ছিটকে সরে দাঁড়ালো। হবিবর মৃধা বলে, 'আরে ডরাও ক্যান তোমরা? ডরাও ক্যান? এগুলি ইবলিসের কারসাজি। আল্লার নাম লইলে ইবলিসে তোমাগো ছুঁইবার পারবো?'

এর সঙ্গে শয়তানের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের খবর জানতে পেরে দুজনে আরো ভয় পায়।

ইব্রাহিম ওস্তাগর ক্লান্ত হাতে একবার ডানদিকে একবার বাঁদিকে মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে হাত নাড়ে। হাত নাড়তে নাড়তেই বিরক্ত ও শ্রান্ত স্বরে সে কাউকে দূরে সরে যেতে আদেশ দেয়, 'আঃ! যা, যা!' চোখ বুঁজে আসে তার, কথা শুনে মনে হয় চাঁদনী রাতে কাউকে ডাকতে ডাকতে সে খুব দূরে মাঠের ওপারে চলে যাচ্ছে। ঘুমে তার চোখের পাতা একেবারে বুঁজে আসে, কোনোবার অল্প খোলে, একেকবার সম্পূর্ণ খুলে সে জগৎ দ্যাখে। ঘুমঘুম, দীর্ঘ ও গম্ভীর কণ্ঠে সে বলে, 'যাঃ! যা কইলাম!' কাউকে তাড়াবার জন্যে শূন্যে উড়তে গিয়ে ডান হাতটা তার পড়ে যায় ধপাশ করে।

বাইরের ঘরে কণ্ঠ ও জুতোর শোরগোল তুলে এই ঘরে ঢুকে হবিবর আলী মৃধাকে দেখে হান্নান হাসলো, 'আরে স্লামালেকুম মৌলী সাব! আইয়া পড়ছেন? অহন আমাগো আর কিয়ের ভাবনা?' তারপর সে ডাকে তার বৌকে, 'কামালের মা, কামালের মা! বাবার ঘরটা এট্টু ঠিকঠাক কইরা লওতো। ডাক্তার লইয়া আইছি। ডাক্তার শামসুদ্দোহারে কল দিছি। জলদি করো।' সে নিজেই বাপের ওষুধপত্র, হাতপাখা, চিলমচি, থার্মোমিটার, টয় গ্লাস, পানির জগ, আধখানা কমলালেবু, বাকেরখানির ভাঙাচোরা টুকরা, কারুকাজ করা শাদা কিস্তিটুপি—এইসব জিনিষপত্রের জায়গা বদলে দিতে দিতে বৌকে ধমকায়, 'খালি খাড়াইয়া থাকে! হাত লাগাও না! ডাক্তার সাব গাড়ি পার্ক কইরা এই আহে! মেডিকেলের পেরপেচার, বহুত বড়ো ডাক্তার, এই মহল্লার মইদ্যে জিন্দগীতে আইছে? ৪০ টাকা লইবো খালি ভিজিট!' ৪০ টাকার কথায় কাজ হলো। হানিফের হাত থেকে পড়ে গিয়ে একটা খালি শিশি ৪ কি ৫ টুকরা হয়ে যায়, চিলমচি চলকে নোংরা পানি গড়িয়ে পড়ে সুফিয়ার পা লেগে, একবার পড়তে পড়তে চেয়ারের হাতল ধরে সামল নিলো ফাতেমা।

গম্ভীর ও অসন্তুষ্টমুখে ইব্রাহিমের নাড়ি টেপে ডাক্তার। বুকে স্টেথসকোপ লাগায়, জিভ দ্যাখে ও শেষ পর্যন্ত নিজের নাম ও দুলাইন ডিগ্রী ছাপানো প্যাডে প্রেসক্রিপশন লেখে। এই সময় হান্নান ঘরের প্রত্যেকটি লোক ও মেয়েলোককে নানাপ্রকার ইঙ্গিত করে। যেমন, সে হানিফকে নাক খুঁটতে বারণ করে, হবিবর আলী মৃধাকে ইশারা করে ময়লা ও ছেঁড়া গেঞ্জিটার ওপর জামা চড়াবার জন্য, দরজার ওপার থেকে উঁকি দিতে থাকা বৌকে কাছে আসতে বলে; কিন্তু ওর কোনো নির্দেশ কেউ বুঝতে না পেরে কেবল এদিক ওদিক তাকায়।'

ডাক্তার উঠতে উঠতে বলে, 'ঘরটা বড়ো ড্যাম্প।'

'ইয়েস স্যার!' হান্নান সঙ্গে সঙ্গে ওর জিভটাকে ল্যাজের মতো নাড়ে, 'বহুত পুরানা আমলের ঘরবাড়ি স্যার। ড্যাম্প স্যার। আনহাইজিনিক স্যার!' রোগ নির্ণয়ের ভঙ্গিতে ডাক্তার নোনা ধরা দেওয়াল দ্যাখে, 'হুঁ বোঝাই যায়।' ডাক্তারের মুখ একই রকম অসন্তুষ্ট ও গম্ভীর।

হান্নান ফের বলে, 'ওল্ড ঢাকা খুব ন্যাস্টি স্যার। আমি স্যার মালীবাগে বাড়ি করতাছি, দোয়া কইরেন স্যার। বাড়ি কমপিলিট হইলেই চইলা যাই স্যার। ওল্ড ঢাকার যা কন্ডিশন স্যার!'

ডাক্তার চলে গেলে ঘরের বাইরে গলিতে উপগলিতে লোম-ওঠা নেড়ি সন্ধ্যাকাল নর্দমা থেকে উঠে এসে গা ঝড়ে। ঘরের ভেতর ইব্রাহিম ওস্তাগরের শ্যাওলা-পড়া চোখের ছাই রঙ মণিতে লেখা চলে লালকালো ছবি। ঘরে বড়ো গুমোট। গুমোট এতো বেশি যে ছাদের পুরনো কড়িবর্গার টকটক মেঘ যে কোনো সময় ঘাম হয়ে ঝরে পড়তে পারে। তার ২ ছেলে, ২ মেয়ে ও ১ জামাই অপরিচিত অনুভূতি নিয়ে চূড়ান্ত কোনো কিছুর প্রতীক্ষা করে। এদের গলায় খরা, সুতরাং জিভ জলশূন্য। এই কষাটে স্বাদের নীরবতায় ঢিল পড়ে যখন হবিবর আলী মৃধা ভাঙা ভাঙা ও খরাঝলসানো স্বরে বলে ওঠে, 'আল্লা, আল্লা, তুমি রহমকরনেওয়ালা, আল্লাহু গনি!' এই ঈশ্বর-সম্বোধন একটি নোতুনপাখা গজানো পিঁপড়ে হয়ে সমস্ত ঘরে পতপত ঘুরে দীর্ঘ উড়াল দেয় বাইরের রোঁয়া-ওঠা সন্ধ্যাবেলার লাল ও ধোঁয়াটে প্রদীপশিখায়। সেই ডানা-ওঠা পিপীলিকা দেখে হবিরর আলী মৃধার রুহ কেঁপে ওঠে, 'এশার আজান অয় নাই?'

তার এই প্রশ্ন শেষ হতেই ইব্রাহিম ওস্তাগর সমস্ত ঘর কাঁপিয়ে চিৎকার করে, 'অরে লইয়া তুই কৈ যাস? আব্বে খানকির বাচ্চা, কই লস অরে?' একই সঙ্গে পাড়ার দুটো মসজিদ থেকে আজান শোনা যায়। আজানের ধ্বনি ও ইব্রাহিমের জিনপরীদের প্রতি নিক্ষিপ্ত সংলাপ ঘরের নোঙরা ও স্যাঁতস্যাঁতে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে মাথা ঠোকাঠুকি করে ও পড়তে পড়তে বেঁচে যায়। এদের কোনো কোনো টুকরা ছিটকে পড়ে গলিতেও এবং গলির শেষপ্রান্তে দোলাইখালে ডাইভ দিতে গিয়ে দ্যাখে ঘোলা জলের জায়গায় সেখানে রাস্তা তৈরি হচ্ছে।

এদিক ইব্রাহিমের তৎপরতা ক্রমে বেড়েই চলে। এক হাতে বিছানার একটি প্রান্ত ধরে তক্তপোষের নিচে সে কি খোঁজে, তখন সমবেত প্রচেষ্টায় সবাই তার

হিজিবিজি স্মৃতি-ও-সাধে-ভারি মুণ্ডু উত্তোলন করে রেখে দেয় বালিশের ওপর। তার চোখ প্রায় বোঁজাই থাকছে। মাঝে মাঝে চোখ রাঙাবার জন্য সেই চোখজোড়া মেলতে গেলে মরচে পড়া দরজার মতো আধখানা খুলেই সেগুলো থেমে যাচ্ছে। কাউকে তাড়াবে বলে কখনো ডান হাত কখনো বাঁ হাত তুলতে গেলে তার দুটো হাতই দুই টুকরা কাঠ হয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে। একটানা গোঙানি বেরিয়ে আসে তার মুখ থেকে; মনোযোগ দিয়ে শুনলে বোঝা যায় সে 'আঃ। অরে ছাইড়া দে না! অরে ছাড় ছুতমারানি, তরে আমি দেইখা লমু! ছাড়লি না? খানকির বাচ্চা তর মারে চুদি তর বাপের গলায় বাইন্দা, ছাড়!'—এইসব কথা বলবার চেষ্টা করছে।

এশার নামাজ পড়ে হবিবর আলী মৃধা ফিরে আসে মসজিদ থেকে। সুন্নত, ফরজ, নফল ও বেতের—সর্বমোট ১৫ রাকাত নামাজ পড়ে তার শক্তির অনেকটা ক্ষয় হয়ে যাওয়ায় হবিবর আলীর গলা থেকে খুব কাঠকাঠ কথা বেরিয়ে আসে ঠা ঠা করে।

'হানিফ মিয়া, কোরান শরীফ লও তো, রাইতটা তেলোয়াৎ করি।'

হানিফ হান্নানের দিকে ও সুফিয়ার দিকে তাকালো।

তাড়াহুড়া কইরা আইছি তো, কেতাব লইয়া আইতে পারি নাই।'

কিন্তু এদের ঘরে কোরান শরীফ নেই। ঘরে কোরান শরীফ নেই এই লজ্জায় হান্নানের ফর্সা গাল লালচে ও কাচুমাচু হয়। তবে লজ্জা কাটিয়ে ওঠার আগেই সে সপ্রতিভভাবে বলে, 'হানিফ, আমীর চাচামিয়াগো বাড়ি যা তো এট্টু। চাচামিয়ারে গিয়া বাবার খবরটাও কইবি, কোরান শরীফ ভি লইয়া আইবি।'

'যাও মিয়া, জলদি যাও। রাইতটা তেলোয়াৎ করলে আব্বার রুহের উপরে আল্লাপাকের রহম হইবো?'

হবিবর আলীর এই শুকনো ও কালো বাক্যে অদৃশ্য আগরবাতি ও লোবানের গন্ধে ঘরবাড়ি ম' ম' করে। হানিফ ছিটকে পড়ে বাইরে।

তেরো চোদ্দো দিন আগে গেলো রোজার ঈদ। আজ তা হলে পূর্ণিমা কি তার কাছাকাছি। আকাশে বড়ো সাইজের হলদে চাঁদ। এইসব সরু সরু রাস্তায়, গলি উপগলিতে চাঁদের আলো আড়ষ্ট, এখানে ওখানে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ায়। লাজুক জ্যোৎস্না কোথাও কোথাও ময়লা রঙে খেলা করে। এই অসূর্যম্পশ্যা, কোমলভাষিনী ও গুণ্ঠণবতী আলোতে কোনো গুমোট নেই, জ্যোৎস্না থেকে হাওয়া বইছে; হাল্কা পায়ে উড়তে উড়তে হানিফ চলেছে ওর পিতৃবন্ধু আমীর আলীর বাড়ি।

বন্ধুর ওপর আমীর আলী বেশ চটা, 'তর বাপেরে আমি জিন্দেগীতে নমাজটা ধরাইতে পারলাম না। খালি বায়োস্কোপ দেখছে, খালি বায়োস্কোপ দেখছে। ঘোড়ার গাড়ি চালাইতো আর বায়োস্কোপ দেখতো। ওস্তাগরি করলো বহুত দিন, তহনো ভি চানাস পাইলে লায়নের মইদ্যে ফুল সিরিয়াল মারছে।'

আমীর আলী প্রথমে কোরান শরীফ দিতে চায় না, 'পেশাব কইরা পানি লইবি না, নাপাক থাকস, তগো হাতে আল্লার কালাম দেই ক্যামনে?' অনেকক্ষণ বকার পর তার দয়া হলে সে বলে, 'লইয়া যা, মগর আগে অজু কইরা ল।'

আমীর আলীর বিধবা ভাগ্নী বদনায় পানি এনে দিলে হানিফ বারান্দায় বসে অজু করে আর জলচৌকিতে বসে-থাকা আমীরের দিকে আড়চোখে দ্যাখে, কখন কি ভুল করে ফেলে! অন্ধকার উঠানের গাঢ় কালচে সবুজ পেয়ারাগাছের শিরশির বোলের ব্যাকগ্রাউণ্ডে আমীর আলী বিড়বিড় করে, 'বুঝলি, তর বাপেরে টুপি ছাড়া কুনোদিন দেহি নাই, মহল্লার মইদ্যে ওয়াজ কি কাওয়ালি উয়ালি হইছে তো হ্যায় গিয়া খাড়াইছে ব্যাকটির আগে, মৌলবির লগে বেটির শাদি ভি দিলো, মগর—।' হঠাৎ কথা বন্ধ করে অনেকক্ষণ একনাগাড়ে কেশে নিয়ে জিভ ও ঠোঁটের মিলিত তৎপরতায় করোটিবিদারী ধ্বনি করে সে পোয়াটাক থুথু ফেলে, অন্ধকারে পেয়ারাগাছের খুচরা আঁধারসমূহ তিরতির করে কাঁপে; বড়ো বড়ো কয়েকটা নিশ্বাস নেওয়ার পর সে তার দীর্ঘ বাক্য সম্পূর্ণ করে, 'মগর ওস্তাগররে নমাজ ধরাইতে পারলাম না।'

হানিফের অজু করা শেষ হলে আমীর আলী ঘরের উঁচু তাক থেকে রেহেলে রাখা কোরান শরীফ খুব সাবধানে পেড়ে এনে ওপরের লাল ও শাদা জুঁইফুল আঁকা ছিটকাপড়ের ঢাকনা ফুঁ দিয়ে ঝেড়ে আলগাছে সমর্পণ করে হানিফের হাতে।

কাউলকা ফজরের নমাজ পইড়া ইনশাল্লা তগো বাড়ি যামু, ওস্তাগররে কইস।'

ডান হাতে কোরান শরীফ শক্ত করে ধরে হানিফ পাতলা খান লেন থেকে বেরুলো! সে হাঁটছে বেশ ধীরে, হাতে তার আল্লার কালাম পাক, দেখে শুনে পা ফেলা দরকার। নর্থ ব্রুক হল রোডের মোহনায় বড়ো দালানের সারি বাঁকা হয়ে চলে গেছে বাঁদিকে, ডানদিকে ট্রাফিক পুলিস দাঁড়াবার উঁচু জায়গা। পাশে ভিক্টোরিয়া পার্কের কালচে সবুজ আভা মেশানো ঠাণ্ডা হাওয়া একটা ঝাপটা দিলে হানিফের বুকের খাঁচা দুলে উঠলো। কিন্তু হাতে ওর কোরান শরীফ, কে কি করবে ওর? দুই হাতে কোরান শরীফ আঁকড়ে ধরলো বুকের সঙ্গে, কার ক্ষমতা ওকে স্পর্শ করে? কোরান শরীফ সঙ্গে থাকলে ওদের নাম পর্যন্ত কাছে ঘেঁষতে পারে না : বাবার লগে তো আর আল্লার কেতার আছিলো না।

কিন্তু সবকিছু ভেদ করে হানিফের বুকের ঝোপে ঝাড়ে ইব্রাহিম ওস্তাগরের ডানা ঝাপটানো শোনা যায় : 'হেইদিন খিজিরে আমাকে কইয়াও ভি গেলো, "তাজমহলের মইদ্যে 'পুকার' খেলতাছে, ল যাই সেকেন শো মাইরা দেই।" মগর খিজিরের লগে গেলাম না।'

কতোকাল আগেকার সেই সব শীতগ্রীষ্ম এবং সেইসব রৌদ্র ও রাত্রি। ইব্রাহিমের তখন বিয়ে হয়নি, বাপও বেঁচে ছিলো। ঘোড়ার গাড়ি চালিয়ে, আড্ডা দিয়ে ও বায়োস্কোপ দেখে ওর দিন কাটে। 'তে খিজিরের লগে গেলাম না। ঈদে উদে কি জন্মাষ্টমী মহরমে লায়নের মইদ্যে তহন ফুল সিরিয়াল লাগাইতো, সাড়ে ছয় আনার টিকেট না লইয়া রাইত ভইরা হালার ফাইটিং খেল দ্যাহো।'

লোরি মাস্টারের জামাই ছিলো লায়নের টিকেট মাস্টার। আগের দিন ইব্রাহিমের গাড়ি করে সপরিবারে গিয়েছিলো পরীবাগ পীরসাহেবের বাড়ি।

চিরাচরিত প্রথায় নামমাত্র ভাড়া দিয়ে টিকেট মাস্টার কোনোদিকে না তাকিয়ে পা বাড়াতে বাড়াতে বললো, 'কাল ফুল সিরিয়ালমে 'জওয়ানি কি বাস' আওর 'তখতে তুফান' খেলেগা, বহোত তেজী পিকচার হ্যায় মিয়া।'

তো ইব্রাহিম ভাবলো, আসল ছবি শুরু হতে হতে সাড়ে ন'টার আগে নয়, রাত্রি আটটার ট্রেন ধরতে পারলে প্যাসেঞ্জার পাওয়া যায়। সে তাই গাড়ি নিয়ে গেলো ফুলবাড়িয়া স্টেশন। 'ধানকুরার বাবুগো বাড়ির সন্তোষ বাবুর সম্বন্ধী না ভায়রা কি লাগে, হ্যায় আইছে কইলকাতা থাইকা বিবি পোলাপান লইয়া, হ্যাগো লইয়া একটা টিরিপ মারলাম বাঙলাবাজার।' প্যারীদাস রোডে যাত্রী নামিয়ে দিয়ে ইব্রাহিম চললো কলতাবাজার, গাড়ি ঘোড়া রেখে সোজা হেঁটে চলে যাবে লায়ন সিনেমা। আশেক লেনে পাগলার দোকানে এক প্লেট গেলাসি মেরে দেবে দুটো খাস্তা পরোটার সঙ্গে। তারপর সারারাত নাচে গানে ভরপুর ফাইটিং পিকচার। এইসব কারণে ইব্রাহিমের মেজাজ খুব ভালো। বিকালবেলা ঘরে গিয়ে সে গোসল করেছে একবার, তার রেশ এখনো কাটেনি। তার গায়ের শাদা পাঞ্জাবীর গলার কাছে, বুকে ও দুই হাতায় সরু কাজ করা, তার পরনে চিকন পাড়ওলা সেলাইহীন শাদা লুঙি। গলায় লাল গোলাপ ও সবুজ পাতা আঁকা আতরমাখা রুমাল জড়ানো। এদিকে আবার ঝিরঝিরে হাওয়া দিচ্ছে সন্ধ্যা থেকে, চারদিকে জোৎস্না। ইব্রাহিম খুব মৌজে আছে।

নর্থব্রুক হল রোড দিয়ে ভিক্টোরিয়া পার্কের সামনে এসে দ্যাখে, 'চান্দের রোশনী ছাড়ছে, যেমুন হালায় নহরের পানি ছুটাইয়া দিছে, বুঝলি?' যেদিকে তাকানো যায়, জ্যোৎস্না, কেবল জ্যোৎস্না। আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র আলো করা জ্যোৎস্নায় ইব্রাহিম তার টাটকা একজোড়া চোখে কেবল লাল নীল হলুদ সবুজ গোলাপী ও অপরিচিত বিচিত্র সব নতুন রঙের আলোর স্রোত এবং আলোর ঢেউ দেখতে লাগলো। এতো আলোয় রাস্তাঘাট বাড়িঘর সব একাকার, গাড়ি নিয়ে সে কোনদিকে যায়? রাস্তা ঠাহর করা যায় না, সে গাড়ি চালাবে কোনদিকে? 'গাড়ি লইয়া কি করি, কি করি, ঘোড়ার রাশটি ধইরা রাখছি এক হাতে, আরেক হাতে রইছে চাবুকখান, গাড়ি লইয়া খালি ঘুরতাছি, ময়দানটারে চক্কর দিয়া খালি হালায় ঘুইরা মরি, মগর চুতমারানি রাস্তারে বিচরাইয়া পাই না।' ভিক্টোরিয়া পার্ককে কেন্দ্র করে এরকম কয়েকবার ঘোরবার পর ইব্রাহিম দেখলো, পার্কের রেলিঙ ঘেঁষে একটি যুবতী গাড়ি থামাবার জন্য হাত তুলে তাকে ইশারা করছে। যুবতী 'বহুত খাবসুরাত' এবং মৃদু বাতাসে তার খোলা চুলে জ্যোৎস্না লুকোচুরি খেলে। খানদানি ঘরের সুন্দরী মেয়ে এত রাতে এখানে দাঁড়িয়ে, গাড়ি থামাবে বলে ইব্রাহিম রাশ টানলো। ঘোড়া দুটো রাশ মানতে চায় না। ইব্রাহিম খুব জোরে রাশ টেনে ধরলে সামনের পাগুলো শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে জ্যোৎস্নাবিদারী হ্রেষাধ্বনিতে তারা কেবল না না করে।

গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘোড়া দুটো থামিয়ে ইব্রাহিম গাড়ি থেকে নিচে নেমে এলো। পার্কের এপারে রেলিঙ ঘেঁষে যুবতী দাঁড়িয়ে রয়েছে। খোয়াবিছানো রাস্তায়

মাঝে মাঝে ঘাসের চাপড়া। সবুজ ও হলুদ ঘাস এবং খয়েরি রঙের খোয়ার ওপর আলগোছে পেতে রাখা সুন্দরীর খালি পাজোড়া ফর্সা এবং নীলচে লাল। চামড়া কি পাতলা! নীল আলোর নিচে, স্বচ্ছ ও পাতলা চামড়ার নিচে নীলচে লাল রঙের স্রোত দ্যাখা যায়।

'কেমুন লাগে, বুঝলি, মনে লয় চান্দের রোশনি হালায় পায়ের মইদ্যে না হান্দাইয়া পইড়া অহন আর বারাইবার পারতাছে না।'

ঘোড়া দুটো ছটফট করে। ইব্রাহিম গাড়ির দরজা খুলে দিলো, শাহজাদী তশরিফ নিক। কিন্তু সুন্দরী ইশারা করে, তুমি তোমার হাতের চাবুক ফেলে দাও, তোমার হাতে চাবুক, আমি কি করে তোমার গাড়িতে উঠি? ইব্রাহিম তখন বুঝতে পারে নি, কিন্তু 'বহুত দিন বাদে আমীরে কইছে, চাবুকের লগে লোহা আছিলো তো, হেইগুলি আবার লোহালুহা কি আগুনের চোট সইজ্য করবার পারে না।' চাবুক রেখে দেবে বলে সে ফের গাড়ির ছাদে উঠেছে, ঘোড়াও অমনি ছুটতে শুরু করলো। রাশ টানতে টানতে সে একবার পেছনে তাকায়। এক পলকে সব অন্ধকার হয়ে গেছে। সব অন্ধকার। অন্ধকারে অস্পষ্ট দ্যাখা যায়, একজন কবন্ধ শাহজাদীকে পাঁজাকোলা করে তুলে পার্কের ভেতরে একটি পামগাছের ঝাঁকড়া মাথায় মিলিয়ে যাচ্ছে। তারপর ইব্রাহিমের আর কিছু জানা নেই। পার্কের কোণে পানির ট্যাঙ্কের দারোয়ান দেখতে পেয়ে ঘোড়া সামলে ওকে নিজের ঘরে নিয়ে আসে।

এরপর প্রায় বছর দুয়েক বাড়ির লোকজন ওকে চোখে চোখে রাখতো। এই সময়টায় সে খুব রোগা হয়ে গিয়েছিলো, মাথার চুল সব সময় খাড়া হয়ে থাকতো, মুখ দিয়ে লালাও পড়তো মাঝে মাঝে, পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ বোধ ছিলো না তার এবং সকাল দুপুর বিকাল ও রাত্রির পার্থক্য বুঝতো না। মীরপুর মাজারের পানিপড়া নিয়ে এসেছিলো আমীর আলী। কিন্তু আমীর আলীও খুব আশা দিতে পারে নি, 'পুরা ভালো হ্যায় জিন্দেগীতেও হইতে পারবো না। ক্যামনে হয়? মাহাক্কালে আসর করছে অরে; না মিয়া, শাহ সাবের হেড খাদেমে নিজের জবানে আমারে কইলো, অরে জিনে ধরে নাই; জিনে তো খোদার ইমানদার বান্দা, মাহাক্কাল হালায় ইবলিসের গোলাম। তোমাগো মহল্লার গলাকাটা সৈয়দে তো মাহাক্কাল হইছে। মাহাক্কালে কেউরে ধরলে ছাড়ে?'

তো একটু সেরে ওঠার পর ইব্রাহিম ওর রাজমিস্ত্রী বাপের সঙ্গে যোগানদার হয়ে রইলো কিছুদিন, বাপ মারা গেলে পুরো ওস্তাগর। সেইসব দিনে ওয়ারি, টিকাটুলি, সেগুনবাগিচা, পুরনো পল্টনে নুতন নতুন ঘরবাড়ি তৈরি হচ্ছে, রোজগারের অভাব হয়নি। কেবল বাঁশের মইতে কাজ করতে করতে নিচে তাকালে কখনো কখনো সেই কবন্ধকে দ্যাখা যেতো, দুলতে দুলতে কোথায় চলে যাচ্ছে। একদিন, লারমিনি স্ট্রিটে অতুল গুহ জজসাহেবের বাড়ির দেওয়ালে প্লাস্টার লাগাচ্ছে, মাথার ওপর জ্যৈষ্ঠ মাসের রোদ জ্বলছে দাউদাউ করে, চোখের সামনে কেবল বিন্দু বিন্দু রোদের ঝুলকি।

'ঠাঠা রইদ তামানটা আসমান জুইড়া খালি ঝিলিক মারে আর নিচের দিকে চাইয়া দেহি কি গলাকাটায় হালায় ছেমরিটারে লইয়া কই পলাইয়া যায়।' ইব্রাহিমের বুকের ভেতরটা টিপটিপ করে, 'হালার নাক নাই চোখ নাই, মাথামুথা খোমাউমা কিছু নাইকা, চুতমারানি হালায় ছেমরিটারে কই ফালাইয়া দিবো! ফাল দিলাম এক্কেরে দোতালার কার্নিশের লগের চঙ থাইকা, খানকির পুতে কই মিলাইয়া গেলো বুঝবার ভি পারলাম না।' নিচে স্তূপাকৃতি বালির ওপর পড়ায় সে যাত্রা কেবল ডান হাতের ওপর দিয়েই গেলো। ইব্রাহিমের এই মস্তানি করা নিয়ে খিজির মিস্ত্রী ঠাট্টা করতো, 'বুঝছি! তোমার হালায় বাহাদুর হইবার হাউস হইছিলো। তোমার পেয়ারের ছেমরিরে লইয়া দুষমুনে পলাইয়া যায় আর তুমি হালায় ফাল দিয়া পইড়া হ্যারে ক্যাপচার করবা, না? পঙ্খীরাজ ভি রাইখা দিছিলা একটা, না? রাখছিলা?'

এখনো চাঁদনী রাত হলেই একজোড়া পায়ের পাতায় বন্দী জ্যোৎস্না দ্যাখার লোভে ঘুমের মধ্যে হেঁটে হেঁটে সে ভিক্টোরিয়া পার্কে চলে আসে।

তবে সেই পামগাছগুলোই কি আর এখন পর্যন্ত বেঁচে আছে। লোহার রেলিঙের জায়গায় এখন ছোটো দেওয়াল, কংক্রিটের ফুটপাথ। আর বুকের সঙ্গে তার সাপটে ধরা কোরান শরীফ। তার আবার ভয় কি? কিন্তু : তামান আসমানটা জুইড়া চান্দে হালায় ডিউটি দিবার লাগছে ঠিকই। খিজির মিস্ত্রী বলে, 'আমাগো বাপদাদায় আমাগো বহুত কইছে, রাইত হইলে ঐ ময়দানের বগলেও ভি যাইবি না। আন্টাঘরের ময়দানের মইদ্যে—অহন ভিক্টোরিয়া পার্ক কয় না?—হেই ময়দানের মইদ্যে গাছগুলির লগে লটকাইয়া ফাঁসি দিছিলো সিপাইগো। চান্দের রোশনী ছাড়লেই সিপাইগুলি মাথার লগে লাল নীল লাইট না ফিট কইরা মহল্লা জুইড়া খালি নাইচা বেড়ায়। 'ওর বাপের সঙ্গে ওদের দ্যাখ্যা হয়েছিলো তো এখানেই! এখানে : সিপাইগো বৌ-ঝিয়েরা লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, লাহোর, আগ্রা উগ্রা থাইকা আইয়া অহনো ভি সিপাইগো বিচরাইয়া বেড়ায়। আউজকা ঘরের মইদ্যে শাহজাদীরে দেইখা, দুষমুন কবন্ধটারে দেইখা বাবায় মনে লয় উন্নিশ বচ্ছরের জোয়ান মরদাটা না হইয়া এক্কেরে সিধা খাড়াইয়া পড়বো।

উনিশ বছর বয়সের ইব্রাহিমকে মনে পড়ে যাওয়ায় হানিফের চোখ, মুখ, গাল, কান, নাক, কপাল, এমন কি করোটি ও চুলেও ঝিরঝির হাওয়া বইতে শুরু করে। এই ধরনের স্পর্শের সঙ্গে সে কি পরিচিত? বর্ষাকালে থৈ থৈ জলভরা দোলাই খালে ডুবতে ডুবতে হঠাৎ জেগে উঠে নিশ্বাস নেওয়ার স্মৃতিতে হানিফের নাকমুখ শিরশির করে ওঠে। গ্যাণ্ডারিয়া লোহার পুলের রেলিঙ থেকে ডাইভ দিয়ে কতোবার সে স্পর্শ করেছে জলের তল, ভেসে ওঠবার পরও জলের ভেতরকার শাঁসের বায়ুহীন, আলোহীন আচ্ছন্নতা কিছুতেই ছাড়তে চায়না ওকে, নাকের ডগাটা তখন জ্বলে; অপরিচিত মিষ্টি কষাটে স্বাদে মুখের ভেতরে টাকরায় ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে, মনে হয় পিপারমেন্ট দেওয়া লজেন্স চুষেছে অনেকক্ষণ ধরে। কানের পেছনদিকে ঠাণ্ডা

হাওয়া ধাক্কা দিলে ওপরে তাকিয়ে দ্যাখে লোহার পুলের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে নারায়ণগঞ্জের ঝরঝরে বাস; পেছনে ঘোড়ার গাড়ির ছাদে চাবুক রাখতে উঠে বসছে ইব্রাহিম। শাহজাদীকে রেলিঙের পাশে ফেলে রেখে ঘোড়াদুটো ছুটতে শুরু করলো, ইব্রাহিম পেছনে তাকাচ্ছে, ঘোড়ার গাড়ি গড়িয়ে চলে যাচ্ছে কেশব ব্যানার্জী রোডের দিকে। কিন্তু লোহার পুলের রেলিঙ ধরে খালের জলে ছায়া ও আগুন ফেলে দাঁড়িয়ে থাকে শাহজাদী। কবন্ধ তাকে পাঁজাকোলা করে তুলতে গেলে তার হাত ছুটে রেলিঙ গড়িয়ে শাহজাদী পড়ে গেলো দোলাই খালের ঘোলা জলে। সেখানে হানিফ ও হানিফের সমবয়স্ক ইব্রাহিম দিনমান শুধু সাঁতার কাটে। ডানদিকে বাঁদিকে সটকে পড়বার মতো কোনো গলি নেই, এই খালের কোনো শাখা খাল নেই। সুতরাং ঠাসবুনুনী করোটি নিয়ে প্রায় নাচতে নাচতে হানিফ পৌঁছে যায় নবদ্বীপ বসাক লেনে।

পাঁচভাই ঘাট লেনে ঢোকবার মুখে শ্যাওলা পড়া দীর্ঘ দেওয়াল পেরোবার সময় ওর গা ছমছম করবার কথা, কিন্তু এখন পা তার মাটি ছোঁয় না, ভয় আসবে কোত্থেকে? বুকের সঙ্গে কোরান শরীফ আঁকড়ে ধরে অবশেষে সে তার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো।

বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তো সঙ্গে সঙ্গে মিলিত মনুষ্যকণ্ঠের চিৎকারে ওর জমাট বাঁধা করোটিতে একটি বিস্ফোরণ ঘটলো। হৃদপিণ্ড ছিটকে পড়লো এদিক ওদিক এবং সম্পূর্ণ তছনছ হয়ে গিয়ে হানিফ তার বেঁটে শরীর থেকে প্রায় বেরিয়ে পড়লো।

'বাবা গো!' ফাতেমা হামলায়, 'ও বাবা! কথা কইবা না? আর কথা কইবা না বাবা? ও বাবা গো!' হালিম চিৎকার করে, 'বাবা!'

সুফিয়ার বাক্যহীন রোদন হবিবর আলী মৃধার ভিজে আয়েত-পাঠের সঙ্গে মিশে গিয়ে চপচপ করে। মহল্লার আরো লোকজন এসে পড়েছে। সকলের সম্মিলিত শোকধ্বনি পুলিস সার্জেন্টের পা হয়ে সলিড একটা লাথি মারলো হানিফের পাছায়; সুতরাং আবদুল হানিফ ছুটতে শুরু করলো উল্টোদিকে। এই এক মুহূর্তেই হানিফের সমস্ত শরীরের রক্ত, মাংস এবং করোটির বিন্যাস বড়ো এলোমেলো হয়ে গেলো। সদ্য বিদ্যুৎমুক্ত শিথিল ও অবসন্ন আঙুলের ফাঁক দিয়ে কোরান শরীফ গড়িয়ে পড়লে তার মজ্জাহীন শুকনো হাড়গোড়ে ফাতেমার হাহাকার খটাখট প্রতিধ্বনি তোলে, শূন্য হাতে বিলাপমুখরিত বাতাস কেটে কেটে হানিফ বয়ে চলে সামনের দিকে।

সামনে কি? নবদ্বীপ বসাক লেনের মাথায় এসে দাঁড়ালে চারদিক বড়ো স্পষ্ট হয়ে উদয় হলো। সামনে : 'বঙ্গলক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার/এখানে খাঁটি দুধের ছানায় প্রস্তুত রসগোল্লা, অমৃতি, পান্তুয়া, সন্দেশ প্রভৃতি মিষ্টান্ন পাওয়া যায়/পরীক্ষা প্রার্থনীয়/১১/বি/৩ সুভাষ বোস এভেনিউ/লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা ১।' সাইনবোর্ডের ২ প্রান্তে ২ জন পরী মিষ্টান্নের থালা হাতে মুখোমুখি ওড়ে। 'সোনার বাংলা হার্ডওয়্যার

সাপ্লাই'য়ের 'সোনার বাং' পর্যন্ত ঠিক আছে, কিন্তু 'লা হার্ডওয়্যার সাপ্লাই' দুমড়ে বেঁকে গিয়ে ঝুলে রয়েছে একদিকে। তারপর 'দি সানশাইন লন্ড্রী/ওয়ান ডে সার্ভিস/অটোমেটিক মেশিনে উত্তমরূপে কাপড় ধোলাই করা হয়। প্রোঃ মোছাঃ ছুপিয়া খাতুন/লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা ১/বাংলাদেশ।' এই লন্ড্রীর ভেতরে এখনো আলো জ্বলছে। মিউনিসিপ্যালিটি অফিসের ভেতর প্রাচীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে ৪/৫টা কাঠচাঁপা গাছ। উল্টোদিকে সেন্ট গ্রেগরিস স্কুল; সেন্ট ফ্রান্সিসের কাছে ল্যাম্পোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে ১টা মেয়ে কুকুর এদিক ওদিক দেখছে। আরো একটু এগিয়ে গেলে ভিক্টোরিয়া পার্কের পেছনে বালির স্তূপ। গোটা পার্ক ঘিরে রাত্রি কাটায় সারি সারি অতিকায় ট্রাক। পার্কের পেছনদিকের ফুটপাথে মানুষ, মেয়েমানুষ, কুকুর ও মেয়েকুকুরের অহিংস সহ-অবস্থান। তাদের মলমূত্রের মিলিত ঘ্রাণ লক্ষ্মীবাজারের খানিকটা, একদিকে কলতাবাজার ও অন্যদিকে নর্থব্রুক হল রোডের ১টা অংশকে গেঁথে রেখেছে একসূত্রে।

কান পাতলেই ফাতেমা ও হালিমের বিলাপের ধ্বনি কানের পর্দায় টং করে প্রতিধ্বনি তুললে মনে হয় সেখানে মহরমের ঢাক পেটানো হলছে। হানিফ তখন সুভাষ বোস এ্যাভেন্যু অতিক্রম করে ঢুকে পড়লো শ্যামাচরণ রায়চৌধুরী লেনে। এই রাস্তার শুরুতেই ১টা পানের দোকান। মাথায় ডব্লু. ডি. এ্যাণ্ড এইচ. ও. উইলস কোম্পানীর দেওয়া সাইনবোর্ডে স্টার সিগ্রেটের সবুজ বিজ্ঞাপন। হানিফ একটু দাঁড়িয়ে সেই সাইনবোর্ড পড়তে শুরু করলে ১২/১৩ বছরের ১টি বালক তার কাছে এসে সুর করে বললো, 'মালিশ!' হানিফের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য ফের বলে, 'মালিশ লাগবো?' জবাব না পেয়ে ছেলেটি অন্যদিকে চলে যায়।

এই রাস্তাকে চওড়াই বলা চলে। রাস্তাটা ধরে এগিয়ে গেলে ডানদিকে কে. জি. গুপ্ত লেন, বাঁদিকে পাতলা খান লেন। সোজা চলে যাওয়াই বরং ভালো। সোজা গিয়ে এই রাস্তারই নাম হয়েছে ঈশ্বরদাস লেন। 'বাণী ভবনে'র সামনে ১টা বয়স্ক কুকুর তার পদশব্দে চোখ মেলে তাকিয়ে ৪ বার ঘেউ ঘেউ করে ফের শুয়ে পড়লো। কুকুর শুয়ে পড়লে ভাইবোনের মিলিত বিলাপ ফের তাকে তাড়া করে। দ্রুত প্রবাহিত হয়ে গিয়ে সে গড়িয়ে পড়ে গলির মোহনায়। 'মোছলমানির জন্য আমাকে শরণ করুন/মোঃ এবাদুল্লাহ/৬৯/২/বি নং আলী হোসেন লেন, লালবাগ, ঢাকা বাংলাদেশ (হেনা মেডিকেলের পশ্চিমের গলি)।' দেওয়ালে গাঁথা টিনের ওপর লেখা এই বিজ্ঞাপনের পাশে সিনেমার পোস্টারে হাসছে রাজ্জাক ও কবরী। এই রাস্তা বড়ো আলোকিত এবং খোলামেলা। এমন কি অনেক ল্যাম্পোস্টেও আলো জ্বলছে। মৃত বাপকে জাগিয়ে তোলার জন্য ফাতেমার হামলানো এখানেও ঠিক পৌঁছে যেতে পারে। সুতরাং হানিফ বাধ্য হয়ে রূপচাঁদ লেন ধরলো। বেশ সরু গলি। এখানে এসে বুকে বল পাওয়া যায় : পাইছি। চিপাগল্লি পাইছি একখান!

কিছুক্ষণ পর ২দিকে ২টো গলি ছড়িয়ে দিয়ে ফুরিয়ে গেলো রূপচাঁদ লেন। এই রূপচাঁদ লেন, শুকলাল দাস লেন ও রূপলাল দাস লেনের সঙ্গমে টিনের ড্রামের

ডাস্টবিনে মুখ থুবড়ে আটকে রয়েছে ১টি ধূসর কুকুর। কুকুর মৃত এবং বয়সে নবীন। তার সামনের পাজোড়া আটকনো ডাস্টবিনের মাথায়। হঠাৎ মনে হয়, সামনের ২ পায়ে ডাস্টবিনের দেওয়াল ধরে চাঁদ দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে সে মুখ থুবড়ে মরে গেছে। শুকলাল দাস লেনের বাড়িগুলোর শুরু সরাসরি রাস্তা থেকে। কোথাও কোথাও ২ দিকেই খুব উঁচু বাড়ি। এতো চাপা গলি, এপার ওপারের বাড়িগুলো একটু করে এগিয়ে এলেই তাদের সংঘর্ষের ফলে পথচারীদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। প্রতোকটি বাড়িই স্যাঁতস্যাঁতে, দেওয়ালের রঙ কালচে সবুজ, কোথাও কোথাও ঘন সবুজ রঙের পুরু কম্বল। কোনো কোনো বাড়ির নিচে কাশ থুতু ছিটানো নোঙরা বারান্দা। সমস্ত রাস্তা জুড়ে মাছের আঁশটে ও ভোঁতা গন্ধ। এর সঙ্গে রাস্তার ২ পাশের কালচে সবুজ ও হলদে রঙ শাসিত নালা থেকে উঠে আসা মলমূত্রের তীব্র গন্ধ উড়ে এলে নাকের একঘেঁয়েমি কাটে। ২ দিকে দোতলা তিনতলা থেকে ফেলে দেওয়া আবর্জনায় ছোটো ছোটো খোলা ডাস্টবিন তৈরি হয়েছে। ১টি কালো বিড়াল হেঁটে গেলো ঘুমের মধ্যে, এক ডাস্টবিন থেকে আরেক ডাস্টবিন করতে করতে এর রাত্রি কাটে। কালো বিড়াল দেখে হানিফের গা ছমছম করে উঠলে ওর বাবার গলার ঘর্ঘর আওয়াজ শোনা যায়। সুতরাং ডানদিকে বাঁদিকে ১টা উপগলি শাখাগলি পেলেও চোরের মতো মাথা নিচু করে সে ঢুকে পড়ছে সেখানে। দেবেন্দ্র দাস লেনে চলতেই পায়ের নিচে নরম কি ঠেকলে সে তাকিয়ে দ্যাখে ছেঁড়া বালিশ ফেটে তুলো বেরিয়ে পড়ছে চারদিকে। একটু এগিয়ে গেলে রাস্তা ১ জায়গায় বেশ চওড়া হয়ে গিয়েছে। আরো ২টো গলি এসে মিশেছে এখানে। এই চওড়া তেমাথায় এককালে জমাট আড্ডা ছিলে ডামলালুদের। সেই সময়ের কথা ভালো করে মনে পড়বার আগেই উল্টো দিকের বাড়ির দোতলায় খ্যাঁক করে উঠলো আলো, জানালায় দাঁড়িয়ে কেউ থুতু ফেললো। হঠাৎ করে বাঙলা মদের কড়া গন্ধ নাকের ভেতরে সুড়সুড়ি দিলে ইব্রাহিম ওস্তাগর হানিফের করোটি জুড়ে একটার পর একটা ইঁট গাঁথতে শুরু করে। হানিফের বেঁটে শরীরে বাঁশের মই জুড়ে দিয়ে ইব্রাহিম ওস্তাগর উঠে যাচ্ছে তার মাথায়। এই মই ঝেড়ে ফেলবার জন্য শরীরে ঝাপ্টা দিয়ে হানিফ জোড়ে জোরে পা ফেলে। পা ফেলতে ফেলতে একটু কান পাতলে শোনা যায়, ঝাপশা স্বরের হামলানো পাঁচভাইঘাট লেনের জীত জীর্ণ কোনো উপগলি থেকে বেরিয়ে তার মাথায় ভেতরে স্থায়ী পত্তনি নেওয়ার লোভে আছড়ে পড়ছে তার দুই কানে।

কিন্তু হানিফও চাল্লি কম নয়। একটু বাঁদিক ঘেঁষে জল উপচে পড়া খোলা ম্যানহোল লাফিয়ে পার হয়ে সে দিব্যি পৌছে গেলো ফরাশগঞ্জ লেনে। পানির কলের সামনে রেখে দেওয়া কয়েকটি কলসি লাইনে বসে মুখে কালো করে পানির অপেক্ষা করে। পচা ডিমের গন্ধে ৬টা কি ৭টা পদক্ষেপ শেষ হতে না হতেই গলি ফুরিয়ে গেলো। এখন মদন সাহা লেন। হাতের বাঁদিকে মস্ত বড়ো পুরনো বাড়ি। গভীর রাতে সেই বাড়ির নিশ্বাস প্রশ্বাস এবং ক্লান্ত ১টি রিকশা চলে যাওয়ার স্রাং

স্রাৎ আওয়াজে ফাতেমার বিলাপ জলদে পৌঁছে গেলে হানিফ ছোট্ট ১টি লং জাম্পে আরেকটি খোলা ম্যানহোল ক্রস করলো। বেঁটে পা ২টোকে বেখীট্যাক্সির চাকার মতো গড়িয়ে আর ১ মিনিটে গলির শেষ মাথায় পৌঁছে সে দেখলো, এপারটাকে খালের ওপারে গড়িয়ে দেওয়ার জন্য লোহার পুল উঠে গেছে 'আখেরি চাট্টান' ছবিতে দ্যাখা ঝাপশা পাহাড়ের মতো। এই সেতুর উপত্যকায় শক্ত সমর্থ ও নিশ্চিন্ত শরীর নিয়ে প্রতীক্ষা করে লাল রঙের সূত্রাপুর থানা। খাল থেকে বয়ে আসা শেষ অক্টোবরের মধ্যরাত্রির হিমহিম বাতাস ওর কানের ভেতর দিয়ে ঢুকে পড়ে সমস্ত শরীর জুড়ে তীব্র শীষ বাজায় : আমি যুদি অহন থানার মদ্যে গিয়া দারোগারে ডাইকা কই, 'স্যার, আমার নাম আবদুল হানিফ, আমার বাপের নাম ইব্রাহিম, মরহুম মোহাম্মদ ইব্রাহিম ওস্তাগর, কলতাবাজারের ডামলালু আমার ওস্তাদ লাগে, আমি ডামলালুর পার্টির মানু,' তো হালার খানকির পোলায় আমারে ধইরা রাইখা দিবো না? রাখবো তো?

অন্য ঘরে অন্য স্বর

'আমা পানে চাও, ফিরিয়া দাঁড়াও, নয়ন ভরিয়া দেখি।' শীতকালের জুড়িয়ে যাওয়া পদ্মানদীতে কোন চরের কুলগাছ থেকে ঝরে পড়ছিলো আধপাকা কুল। সেই শব্দে চোখ মেললে প্রদীপের ঘুমের পাতলা সরের ওপর টুপটাপ ঝরে পড়ে পিসীমার মৃদুস্বরে গাইতে থাকা গানের কথা। প্রদীপের ঘুম ভেঙে যায়। তখন মনে পড়ে, অনেকরাত্রি পর্যন্ত তার ঘুম হয়নি। এপাশ ওপাশ করতে করতে এইতো আধঘন্টাও হয়নি সে ঘুমিয়েছে। ঘুমিয়েছিলো সারাটা বিকাল জুড়ে, তাই রাত্রে শুয়ে শুয়ে ঘুম আর আসে না। এর আগের রাত্রি গোটাটাই কেটেছে জেগে। ইদ্রিসের ঘরে বসে গল্প করতে করতে একেকবার বড্ডো ঘুম পাচ্ছিলো তার, ইদ্রিস বার তিনেক চা করে খাওয়ালো। সকালবেলা এদিক ওদিক ঘুরে গুলিস্তান থেকে বাস ধরে প্রদীপ এসেছে নারায়ণগঞ্জ। ফের নারায়ণগঞ্জে খানিকটা ঘোরা হলো একা একা। লঞ্চে এখানে এসে পৌছতে পৌছতে বেলা এগারোটা হয়ে গেলো। তখন ইচ্ছে করে শহরটা ঘুরে দেখলে হতো।

শহর সেরকমই আছে। রাস্তা বলতে গেলে একটাই, ১২/১৩ বছর আগে ১৬/১৭ বছর বয়সে যেমন দেখেছিলো, ঠিক তেমনি রাস্তা। রাস্তার দুই দিকে কোনো কোনো মাঠে কি অফিসের সামনে খালি জায়গার এখন নোংরা বস্তি, বস্তিগুলো আগে ছিলো না। বস্তির কালো ন্যাংটো ছেলে-মেয়ে চলন্ত রিকশার বস্তা থেকে গড়িয়ে-পড়া আটা তুলে নিচ্ছে হাতের তেলোয়, নাকের কালচে নোনতা সিকনি সহযোগে তাই গিলছে গোগ্রাসে—এরকম দৃশ্য আগে কেবল বড়ো বড়ো শহরেই কল্পনা করা যেতো। তবে কি এদের সবেধন নীলমণি ঢাকা শহর এক্সটেণ্ড করতে করতে বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, ধলেশ্বরী অতিক্রম করে যাবে?

আড়তে ননীদা নেই। তাকে নতুন দেখে সবাই তৎপর হয়ে উঠবে—এই ভেবে প্রদীপের বাধো বাধো ঠেকছিলো। কিন্তু তেমন কিছুই হলো না।

একজন কর্মচারী বললো, 'বাবু নাই।'

প্রদীপের কাঁধে ঝোলানো চামড়ার ব্যাগ। দেখেই বোঝা যায় ব্যাগের ভেতর কাপড়চোপড়, টুথব্রাশ, শেভিং রেজার, ২/১টা বই। সেই কর্মচারী শালা তবু 'বাবু

নাই' এই মিতভাষণের পর অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে মাথা নিচু করে হিসাব মেলায়। প্রদীপ ভাবছে তবে এবার ননীদার বাড়িতেই বরং যাই, এমন সময় ১টা রিকশা এসে দাঁড়ালো আড়তের সামনে। রিকশা থামতে না থামতেই লাফিয়ে নেমে [illegible] ১৮/১৯ বছরের ২টো ছেলে; না, ১ জনের বোধ হয় আরো কম, গোঁ [illegible] রেখা দেখে মনে হয় জল খেয়ে মুখ মোছেনি বলে পাতলা সর পড়ে রয়েছে। ওরা ঢুকতেই তোলপাড় পড়ে যায়। হিসাব মেলানো স্বল্পবাক কর্মচারী গদি থেকে উঠে দাঁড়ালো, 'আসেন আসেন, বসেন।'

'নাই?'

'বাবু এট্টু এস.ডু. সায়েবের অপিস গেছে। অক্ষণ আইবো, বসেন।' গোঁফে-জলের-রেখা ছেলেটি বলে, 'বইসা লাভ? কখন আসে কিছু ঠিক আছে।'

'আমি লোক পাঠাই, বাবুরে ডাইকা আনুক। আপনাগো কথা কইয়া গেছে। বসেন।' সে তখন 'ন্যাপাল ন্যাপাল' বলে আর্তস্বরে চিৎকার করে এবং নেপাল এলে তাকে পাঠিয়ে দেয় এস.ডি.ওর অফিসে। নেপালচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ক্যাশবাক্সের আড়াল থেকে 'ডানহিল' সিগ্রেটের প্যাকেট এগিয়ে ধরে মুখটা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে থাকে। ছোকরা ২টোরই চুল খুব লম্বা ও ফাঁপানো। দীর্ঘ জুলফি। ১টার জাপার্টা গোঁফ আর জুলফির সীমা নির্ধারণ করা বেশ কঠিন কাজ। আরেকটার গোঁফ এখনো বলতে গেলে গজায়নি। ২জনেরই বেল বটম প্যান্ট; ১টার প্যান্ট নীল রঙের, সামনে পেছনে জোড়া জোড়া পকেট। তার পরনে কারুকাজ করা গলা-উঁচু পাঞ্জাবি। গোঁফওয়ালার অজস্র বোতাম খচিত, পকেটে-ফ্ল্যাপ পুরু কাপড়ের শার্ট ও খয়েরি রঙের সিনথেটিক কাপড়ের প্যান্ট। কথাবার্তা যাই বলুক, বাঙাল ছোকরাদের কাপড়ের খুব বাহার। প্রদীপ বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলো। প্রদীপের দিকে ১বার তাকিয়ে সেই কর্মচারী বললো, 'বসেন, বাবু আইবো।'

অনেক উঁচুতে কাঠের সিলিঙ, চারদিকে টিনের বেড়া, বেশ মজবুত টিন, টিনের সঙ্গেই কি কায়দা করে কাঠের তাক ঝোলানো হয়েছে। তাকে গণেশের ছোটো মূর্তি; ক্যালেণ্ডারেও গনেশ, গণেশের নিচে কলকাতার কোন ইণ্ডেন্টিং ফার্মের নাম ঠিকানা। এখানকার হার্ডওয়ার ফার্মের নাম লেখা ক্যালেণ্ডারে রবীন্দ্রনাথের ছবি। ছবি তো খুব একটা দিয়ে রেখেছে, জানে নাকি কার ছবি? আরেক দিকে দামী ফ্রেমে বাঁধানো শেখ মুজিবুর রহমান। মাঝামাঝি বাঁশের বেড়া, তার ওপারে মশলার আড়ত, এই ঘরের গন্ধ খুব ভারি, মাঝে মাঝে মিষ্টি ঝাঁঝালো গন্ধওলা বাতাস এসে ঠাসবুনুনী এই গন্ধকে এলোমেলো করে দিচ্ছে।

পনেরো মিনিটের মধ্যেই ননীদা এলো।

'আরে কামাল ভাই, আইছ! আমি এট্টু এস.ডু. সায়েবের অফিস গেছিলাম। কহন আইছ?'

ননীদা প্রদীপকে খেয়ালই করেনি।

'আমি কই আমাগো আইতে কইয়া ননীদা কাইটা পড়লো!'

কামালের কথায় ননীদা হাঁ হাঁ করে ওঠে 'কি যে কও! কি যে কও! আমি কই তোমরা ব্যস্ত মানুষ, কনফারেন্স লইয়া দৌড়াদৌড়ি করো, কহন আইতে পারো কিছু ঠিক আছে নি?'

প্রদীপের দিকে চোখ পড়তেই ননীদা অবাক হয়ে গেলো. 'আরে তুই? তুই কহন আইলি?' একই নিশ্বাসে ননীদা ফের ওদের দিকে তাকায়, 'কামাল, তোমরা চা খাও।' তারপর নেপালচন্দ্রকে ধমকায়. 'চা না দিয়াই আমারে ডাকতে গেলি?'

নেপালচন্দ্রের হাতে ১০ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে একই সুরে বলে. 'অন্নপূর্ণা থাইকা রসমালাই লইয়া আয়।'

দুপুরবেলা রোদে দাঁড়িয়ে টিউবওয়েলের জলে স্নান করে বেগুন ভাজা, পাবদা মাছের দোপেঁয়াজি. আলু বেগুন ট্যাংরা মাছের চচ্চড়ি, ইলিশ মাছ ভাজা. ইলিশ মাছের সরষেবাটা পাতুড়ি. নতুন আলু দিয়ে রাঁধা কৈ মাছের ঝোল. আলু কপির ডালনা ও ঘন করে রাধা মুগের ডাল দিয়ে পেট ভরে ভাত খেয়ে আর নড়াচড়া করা যায় না। বাঙালরা শালা এখনো এতো খায়! বারান্দায় রোদে পিঠ দিয়ে বসে বৌদির সঙ্গে গল্প করতে করতে প্রদীপের খালি হাই উঠতে লাগলো। কলকাতার গল্প শুনতে বৌদির খুব সখ। গোলমালের সময় সবাই পালালো কলকাতা, ননীদা গেলো আগরতলা। এজন্য বৌদির আক্ষেপের আর শেষ নেই। বারান্দার রোদে বড়ি দিতে এসে পিসীমা ধমক দিলো প্রদীপকে, 'খালি হাই তোলোস! যা না, আমার ঘরে গিয়া গড়াইয়া ল।'

তো একবার গড়াতেই সাড়ে ৬টা পার হয়ে গেলো।

রাত্রে খাওয়ার পর গল্প করতে করতে ননীদা বলে. 'কিসের বিজনেস? এই দ্যাশে ক্যামনে থাকি? বিজনেস এট্টু যদি ভালো হইছে তো চান্দা লইয়া লইয়া ব্যাকটি পয়সা খসাইয়া লইবো। এই তো একখান টাউন, আধা ঘন্টা হাঁইটা গেলে এই মাথা ঐ মাথা ফালা ফালা কইরা ফালান যায়! আর দ্যাখ, সপ্তার মধ্যে তিনখান চাইরখান কনফারেন্স, সম্মেলন, সমাবেশ লাইগাই রইছে। পয়সা আদায়ের ফন্দি, বুঝলি না? এই ভাই আইবো, ঐ ভাই আইবো, বাপে আইবো, বন্ধু আইবো! আর কি? ছাড়ো, মালপানি ছাড়ো।'

কলকাতাতেও তো এরাই. এদেরই রাজত্ব ওখানে। তবে এখানে সবই বড়ো খোলাখুলি, কোনো রাখো ঢাকো নেই। এরাও অবশ্য শিখবে; একটু ভদ্রভাবে চুরি ডাকাতি করা, মানুষ মারা—এখানকার বাঙালিরাও শিখবে, একটা জেনারেশন অন্তত যাক. ঠিক শিখে নেবে। ইদ্রিসও কাল সারারাত ধরে এসব নিয়েই বকবক করলো। গোলমালের সময় ইদ্রিস কলকাতা গিয়েছিলো. তখন থেকে প্রদীপের সঙ্গে আলাপ। লোকটা বড়ো বকবক করে। বেশ তোতলা—'ম', 'ব,' 'ল,' 'র'—এই সব অক্ষর দিয়ে শুরু কোনো শব্দ বলতে চোখে জল এসে পড়ে। তবু শালা যা কথাটা বলে! তোতলা না হলে ঐ সময়ের মধ্যে আরো কয়েক হাজার শব্দ নামিয়ে ফেলতো।

বৌদি বললো, 'ইণ্ডিয়ায় কিছুই করলা না। আত্মীয়স্বজন বাড়ি-ঘর বানাইয়া জমাইয়া বইলা, তোমারে লড়াইবো কেডা?'

প্রদীপ একটু নিচের দিকে তাকায়, ওরাও সব কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা।

'আরে যাই কইলেই যাওন যায়, না?' ননীদা হাই তুলতে তুলতে কথা বললে শেষ শব্দগুলো হঠাৎ খুব জোরে উচ্চারিত হয়। 'ইণ্ডিয়ায় গেলে ব্যবসা বাণিজ্য হইবো? ইণ্ডিয়া গিয়া খাইবা কি?' বৌদি এবার সোজা হয়ে বসে, 'তো এহানে খালি খাও দাও আর ঘুম পাড়ো। মাইয়াগো পার করতে হইবো না? মাইয়ারে কলেজে পাঠাইতে পারি না, বিয়া দিবা ক্যামনে?'

তারপর প্রদীপের দিকে তাকিয়ে বৌদি অভিযোগ করে, 'গোলমালের আগে মেট্রিক পাস করলো। তহন তোমার দাদায় কয়, "না, পাকিস্তানে ভর্তি করুম না, কলকাতা পাঠাইয়া দেই, দিদির বাড়ি থাইকা কলেজে পড়বো।" নয়টা মাস আগরতলা থাকলাম; দিদি না, জামাইবাবু না, কেউরো ছায়াও দ্যাখলাম না। পাকিস্তান তো গেলো গিয়া। দ্যাশে আইয়া কলেজে ভর্তিও তো হইলো! কি হইলো? টাকাগুলিন হুদা-হুদি জলে ভাসাইলা। পোলার বয়সের ছ্যামরাগুলিরে তোয়াজ করো, আবার হেইগুলির ডরে মাইয়ায় বারাইতে পারে না। আর কলেজ যাইতে পারবো?' ননীদার মেয়ের কলেজে যাওয়ার অসুবিধাগুলো দুপুরবেলাই বিস্তৃত শোনা হয়েছে।

ননীদা হাই তুলতে শুরু করলে সবাই গল্প শেষ করে শুতে গেলো।

প্রদীপের শোবার ব্যবস্থা হলো পুরনো দালানে। পুরনো দালানে ৩টে ঘর। ১টা পিসিমার। মাঝখানটা ভাঁড়ার ঘর। এর পরের ঘরে নদীদার ছেলে অমিত, এবার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেবে, সে থাকে। অমিত ঢাকার গেছে ক্রিকেট খেলতে। প্রদীপের শোবার ব্যবস্থা হলো অমিতের বিছানায়। নতুন দালানে ননীদা, বৌদি, ননীদার কলেজে-ভর্তি-হওয়া কিন্তু কলেজে-যেতে-না পারা মেয়ে ইন্দিরা, ক্লাস এইটে ২বার ফেল করা ছেলে প্রবীর, ক্লাস ফাইভে পড়া মন্দিরা এবং সচচেয়ে ছোটো মেয়ে মীনাক্ষী থাকে! এই নতুন দালান তৈরি হওয়ার পুরনোটা আড়ালে পড়ে গেছে। তা' বয়সে বয়সে পিসীমাও একটু আড়াল, পিসীমা এখানেই থাকে।

ফর্সা চাদর পেতে দিয়ে গেছে বৌদি। নতুন কাচা মশারি টাঙানো। শীতের সারা বিকাল ঘুমিয়ে উঠে চারদিকে বড়ো ফিনফিনে ঠেকছিলো, তার রেশ এখনো কাটেনি। চাঁদ ওঠা টাইপের ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। এদের সোনার বাঙলায় ঘরের ভেতরেও চাঁদ ওঠে নাকি? মশারির ফাঁক দিয়ে হাওয়া লাগে এসে। ধোয়া চাদরের জলে-ধোয়া ও রোদে-পোড়া সাবানের গন্ধে গলা শুকিয়ে যায়। মাথার কাছে জানলাটা খোলা। জানলার নিচে বারান্দা। পিসিমার ঘরেও বারান্দার দিকের জানলা খোলা। সেখানে থেকে পিসীমার জেগে থাকবার ধ্বনি কানে আসে। শীতের রাতেও ঘরের জানলা খুলে ঘুমানো —এই অভ্যাস ছিলো বাবার। ঠাকুরদারও ছিলো নাকি? নইলে ভাইবোন দুজনেই এই অভ্যাস রপ্ত করলো কোত্থেকে? পিসীমা

বাবার মতোই বড়ো জেদী। বাবাও বাড়িঘর ছেড়ে চলে যায়নি। গলায় ক্যান্সার হয়ে মারা গেলো, তবু অনেকদিন পর্যন্ত কথা বলতো জোরে জোরে, একা একা থাকলেই সন্ধেবেলা রুগ্ন কণ্ঠে কীর্তন গাইতো। অসুখ খুব বাড়াবাড়ি হয়ে পড়লে মেজদা এসে এই পিসীমাকে ধরেই রাজী করিয়ে বাবাকে কলকাতা নিয়ে গিয়েছিলো।

সে একটা সময় গেছে প্রদীপের। রাত্রে বাবার সঙ্গে হাসপাতালে থাকা, সারাদিন পায়ে হাত বুলিয়ে দেওয়া, একটু ভয় পেলেই নার্স ডেকে আনা, বাবাকে পায়খানা পেচ্ছাব করানো—দিনরাত জুড়ে একনাগাড় জড়াজড়ি, লেপ্টালেপ্টি। বাবার মৃত্যুর পর ঝামেলা হয়েছিলো আরো বেশি। শ্লথগতি রক্তের স্রোত উজানে বয়, না ভাটায়,—কিসের অনুকূলে ও কাদের প্রতিকূলে—কিছুই ঠাহর করা যায়নি। বাবার মৃত্যুর পরেকার সেই আড়ষ্ট বুকের খরা স্মৃতিতে প্রদীপের বড়ো তেষ্টা পায়। সে তখন বিছানা থেকে উঠে অমিতের পড়ার টেবিলে পিরিচ দিয়ে ঢাকা গ্লাস ভরা জল ঢকঢক করে খেয়ে শুয়ে পড়ে।

কিন্ত এবার শুয়েছে ধপাশ করে। গুছিয়ে না শোবার ফলে বালিশটা সরে গেলো একটু। বালিশের পাশে, কাঁধের নিচে উঁচু হয়ে থাকা ১টি বস্তু তার শরীরে অস্বস্তি ঘটায়। ভালো করে লেপ টেনে নেওয়ার পরও রেহাই পাওয়া যায় না; কখনো কাঁধের নিচে, একটু সরে এলে শিরদাঁড়ার নিচে সেই বস্তু কেবল আস্তে করে ভোঁতা ভোঁতা খোঁচা দেয়। একবার মনে হলো শরীরের ভেতরেই কোনো রোগ ১টি চারকোণা মাংসের জীব হয়ে একাঁধ ওকাঁধ করছে।

কিন্তু ব্যাপারটা ভেতরের নয়। প্রদীপ উঠে বসে বিছানা হাতড়ালো। বালিশের ধার ঘেঁষে চাদরের নিচে, তোষকের নিচে হাতড়ে দেখলো টিউমার জাতীয় কিছু নয়, পাতলা একটা বই কুঁকড়ে পড়ে রয়েছে তোষকের নিচে। জানলা দিয়ে বাইরের আলো এসে পড়েছে বালিশের ওপর। ফের শুয়ে স্তিমিত আলোতে চোখের সামনে বইটা মেলে ধরলে নীল রঙের আর্ট পেপারের ওপর ১টি মেয়েমানুষের ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১ হাতে তার বেঢপ বড়ো গোলাপী রঙের ব্রামুক্ত স্তনজোড়া মেলে ধরে রূপসী আরেক হাতে তার পেটিকোট সামলাতে ব্যস্ত। পেটিকোটের দড়ি ছিঁড়ে গেছে, পেটিকোট অনেকটা নিচে নেমে যাওয়ায় ফাঁপা থামের মতো উরু বেশ খানিকটা দ্যাখা যায়, কিন্তু আশ্চর্য কোনো নিয়মে পেটিকোটের কোমর থেকে ঝোলানো ছেঁড়া ১ টুকরা ন্যাকড়ার কল্যাণে তার যোনী অদৃশ্য। সবুজ ও গোলাপী রঙের মহিলার পেটিকোটের রঙ হলদে। কিন্তু কাপড়ের ভাঁজ টাজ বোঝাবার জন্য কোথাও কোথাও খয়েরি রঙ ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে ভাঁজ স্পষ্ট হয়নি, বহুবর্ণ ১টি পেটিকোট সেলাই করা হয়েছে। জানলার কাছে তুলে ধরলে ওপরের লেখা পড়া যায় : 'জলভরা তালশাঁস'। নিচে ব্র্যাকেটে লেখা 'নাজমা ভাবীর প্রেমের শাঁস'। শেষ মলাট একেবারে শাদা। আদ্যোপান্ত প্রত্যেকটি পৃষ্ঠার তীরে দুটো ছিদ্র থেকে বোঝা যায় বইটা পিন দিয়ে বন্ধ করা ছিলো। শ্রীমান

অমিতকুমারের নিয়মিত ব্যবহারের ফলে পাতাগুলো মলিন। এই অল্প আলোতে ভেতরের লেখা পড়া যায় না। এ বইতে আরো গোটা তিনেক ছবি আছে, ৮/১০ পৃষ্ঠা পর পর ১টি করে ছবি, এগুলো কালো শাদা; কালি ঠিকমতো পড়েনি বলে অস্পষ্ট। একেকটি ছবিতে একেক জোড়া পুরুষ ও মহিলা বেশ জটিল ও অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে যৌন সঙ্গম করে। আলো থাকলে হয়তো আরো স্পষ্ট বোঝা যেতো। যাই হোক, এইসব দেখে প্রদীপ বেশ কাম বোধ করলো। হয় এই কামের বেগে কিম্বা দুপুরবেলা ঐ মস্তান টাইপের ছোকরা দুটো দ্যাখার পর সলিড কিছু পাওয়া গেলো—এই শিহরণে তার সর্বাঙ্গে ছোটো ছোটো ইঁট পাটকেল ছিটকে পড়ে। আলো জ্বেলে বইটা পড়ে ফেলবে। পড়তে পড়তে বইটার ঠিক ঠিক ব্যবহার করা দরকার। প্রদীপ তাই আলো জ্বালবে বলে নিচে নামবার পথে বিছানায় উঠে বসলো। উঠে বসলো তো নামবে বলেই। কিন্তু নামবার চেষ্টা না করে ভুল করে সে লেপটাকেই আরো জড়িয়ে নিলো। এর ফলে হলো কি, বিছানা থেকে নেমে আলোটা যে জ্বালাবে সে শক্তিটুকু আর রইলো না। ঘাড়ের ওপর খানিকটা ফাঁক রয়ে গেছে সেদিন থেকে সরু শীষের মতো ঠাণ্ডা ঢোকে। পেট, পিঠ, উরুর ওম ও হিম মিশে লেপের ভেতর কি প্রতিক্রিয়া ঘটায়, প্রদীপের একটু একটু ঘুম পায়। ফের ইচ্ছা করে, নেমে আলো জ্বেলে পর্নোগ্রাফিটা পড়ে ফেলি। এরকম দ্বিধার মধ্যে দুলতে দুলতে সে শুয়ে পড়লো। তারপর শীতের থিতিয়ে পড়া পদ্মায় কোন চরের কুলগাছ থেকে আধপাকা কুল ঝরে পড়লে সে বিছানায় উঠে বসে। স্বপ্নের রেশ, ঘুমের রেশ কেটে গেলে বারান্দার আলো বোঝা যায়, পিসীমার গুন-গুন করা ধ্বনি আস্তে আস্তে শব্দ ও সুরে বেজে ওঠে, 'চাঁচের কেশের চিকন চূড়া সে কেন বুকের মাঝে?' পিসীমার গলা এতো মিষ্টি, কৈ কথা বলার সময় তো বোঝা যায় না। 'সিন্দুরের দাগ আছে সর্বদাই মোরা হলে মরি লাজে।' এই লাইনটা গাইবার সময় পিসীমা অনেক কারুকাজ বাদ দিয়ে দিলো; 'সিন্দুরের দাগ' দুবার বললো না, কিম্বা এই কথাটার পর 'বঁধু হে' বললো না। তবু পিসীমার গান ঠিকঠাক গেঁথে যাচ্ছে। 'যদি গোকুলচন্দ্র ব্রজে না এলো, সখীগো, যদি গোকুলচন্দ্র'—এক গান শেষ হতে না হতেই পিসীমা উৎরে যাচ্ছে অন্য গানে। 'জীবন আমার বিফলে গেলো, জীবন আমার বিফলে গেলো, কেনো কাজেই লাগলো না গো, জীবন আমার বিফলে গেলো গোকুলচন্দ্র।' পিসীমার গলা বড়ো ওঠানামা করে, কখনো কখনো কোনো ধ্বনিই কানে আসে না। এইসব উঁচু নিচু শব্দমালা প্রদীপের চোখে টুপটাপ ঝড়ে পড়লে চোখজোড়া হঠাৎ খুব বড়ো ও টাটকা মনে হয়। তার শরীর খুব হাল্কা ঠেকে, পদ্মার জলরাশিতে ভাসমান বাতাবিনেবুর খোসার মতো প্রদীপ কেবল টলমল করে। এরকম হলে ঘরে থাকা বড়ো অসুবিধা হয়। দরজার ছিটকিনি খুলে সে তাই বারান্দায় এসে দাঁড়ালো।

না, বাইরে চাঁদ নেই, বারান্দায় বাল্বের আলো শীতে একটু রোগা। কুয়াশায় ঝাপশা উঠান। উঠানের ওপারে নতুন দালানে ইচ্ছা করলে লঞ্চের কিম্বা জাহাজের

কিম্বা আরো ইচ্ছা করলে তিমিমাছের আকৃতি নিয়ে আসা যায়। কিন্তু পিসীমার গান তখন কুয়াশার স্রোতে ও ঢেউয়ে অস্পষ্ট ও অপরিচিত কোনো মাছের মতো ঘাই দিয়ে বেড়ায়; বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই মাছের ঘাই দেখতে বড়ো ভালো লাগছে প্রদীপের।

'আমি মথুরা নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে যাইব যোগিনী হয়ে।' হঠাৎ করে গান থেমে গেলে তার ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে আসে পিসীমা।

'প্রদীপ? বারান্দায় খাড়াইয়া তুই কি করস বাবা? তর শীত করে না?'

প্রদীপ কিছুই না বলে পিসীমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

পিসীমা বলে, 'আয়, আমার ঘরে আয়।'

পিসীমার ঘরে ধুপধুনো ও কর্পূরের গন্ধ।

'তর ঘুম নাই? রাইতে এহানে খাড়াইয়া রইছস? মন খারাপ করছে?'

'না পিসীমা, ঘুম আসছে না।'

'ক্যান? ঘুম আসে না ক্যান?'

'দুপুরে খুব ঘুমিয়েছি তো।'

'কৈ ঘুমাইলি? তর বাপেরে দেখছি যহন খুশি ঘুমাইতে পারতো।

আবার মন হইলেই বিছনা ছাইড়া উইঠা পড়ছে।'

তারপর পিসীমা ফের বলে, 'তুই কয়দিন থাকবি না? না কাইলই আবার কইলকাতা ছুটবি?'

'না পিসীমা। পরশু যাবো, আগরতলা যাবো পরশু, আগরতলায় কাজকর্ম যদি ঠিকঠাক চলে তো দুদিন পর যাবো শিলং। কয়েকটা দিন ডিব্রুগড়, গৌহাটি এদিক ওদিক করে তারপর কলকাতা।'

'খালি ঘুইরা ঘুইরা জনম কাটাস! এই না ননী কইলো, তুই কয়দিন আগে দিল্লী আগ্রা বেড়াইয়া আসছস!'

প্রদীপ কাজের নাম করেই অবশ্য ঘোরে। বাবা মারা গেলে মেজদা অনেক খেটে খুটে এখানকার ব্যবসার একটা অংশ গুটিয়ে নিয়ে গেলো। বাবার কন্ট্রাকটারি ছিলো, সেটা আর রাখা যায়নি। ভূষিমালের আড়ত, মশলাপাতির আড়ত, আগরতলায় কাপড়ের দোকান, কিছু ইণ্ডেন্টিং—এইসব করে বড়দা, মেজদার সংসার চলে দুধেভাতে, তার নিজেরও দিব্যি চলে যাচ্ছে। আর এমাথা ওমাথা ঘোরাঘুরি—এসব কেউ গছিয়ে দেয়নি তার ওপর, একনাগাড়ে বেশিদিন কোথাও থাকতে ওর অস্বস্তি লাগে। এখন এমন হয়েছে যে কোথাও গেলে পরিচিত লোকজন দ্যাখ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জিগ্যেস করে, 'প্রদীপ, যাচ্ছো কবে?' আগরতলা এবার না গেলেও চলতো। প্রদীপ নিজেই বললো, 'মেজদা, আগরতলার এ্যাকাউন্টস খুব ক্লিয়ার নেই। আমি নিজেই বরং একবার যাই। এবার বাংলাদেশ হয়ে যাবো, এই চান্সে দেশটাও দ্যাখা হবে।'

পিসীমা বলে, 'তর খিদা লাগে নারে? রাইতে প্যাট ভইরা খাইলি না ক্যান?'

'না পিসীমা অনেক খেয়েছি।'

'অনেক খাইছস?' পিসীমা ধমকে ওঠে, 'আমি দেহি নাই, না? জুয়ান মরদ হইছস একখান, খাইবি পক্ষীর আধার। খিদা লাগবো না?'

তারপর পিসীমা মগ্নস্বরে গুনগুন করতে শুরু করে।

ঘরের এদিকে ছোটো কাঠের সিংহাসনে শালগ্রামশিলা। সেদিকে দেখতে দেখতে পিসীমা প্রদীপের দিকে কোনো মনোযোগ দেয় না। কিন্তু তার গুঞ্জন ভালো করে শুনলে বোঝা যায় পিসীমা ঠিক গান করছে না, প্রদীপকে লক্ষ কিম্বা উপলক্ষ করে এলোমেলো বাক্য বুনে যাচ্ছে।

'তর বাবায় তগো বয়সে কি খাইতে পারতো! তিন সের দুধ না জ্বাল দিয়া মাইরা এক সের বানাইয়া, রামপাল থাইকা কলা আসতো, এই বড়ো বড়ো সাগর কলা,বৌদি আমসত্ত্ব রাখছে সর্বদা, বুঝলি, বৌদির আছিলো লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, সেই আমসত্ত্ব দিয়া দুধে কলার মাইখা এই এতোটি ভাত খাইছে।'

পিসীমার ঘরে চন্দনের গন্ধে পাকা কলা ও শশার গন্ধ লুকোচুরি খেলে, এই একবার পাওয়া গেলো তো ফের অনেকক্ষণ কোনো পাত্তা নেই; আবার কোত্থেকে এসে নাকের সামনে খেল দেখিয়ে উধাও হয়ে গেলো কিছুক্ষণের জন্যে।

'প্রদীপ মুড়ি খাইবি?'

প্রদীপ জবাব দেওয়ার আগেই পিসীমা বলে, 'দাদায় খাইতো, খাটতেও পারতো খুব। বাবায় দ্যাহ রাখছে, আমার বয়স তহন সাত আট বছর; দাদাই তো আমাগো বাপ হইছে। কতো খাইটা খাইটা ব্যবসা করছে, বাবার ঋণ শোধ করছে, কমলাঘাটে আড়ত দিলো, রামপালের জমি ছাড়াইয়া লইলো; দিদিরে, আমারে বিয়া দিছে। দিদি মরলে জামাইবাবু বিয়া করছে পর সবিতারে নিজে গিয়া লইয়া আইছে। ক্যান?—না, সৎমায় যাতনা করবো। মেট্রিক পাস করাইয়া সবিতারে বিয়া দিছে। আমার কপাল পুড়ছে পরে নিজে গিয়া আমারে হাধলো, "সাবিত্রি, ল দিদি, তর পোলারে মাইয়ারে লইয়া তর নিজের বাড়িত চল। ঘরে তর রাধাকিষ্ট তরে ডাকছে, ল, বাড়ি চল।" কিন্তু বাক্য সম্পূর্ণ করবার আগেই পিসীমা কেঁদে ফেলে। কয়েক ঢোক কেঁদে মুখ চোখ একটু গুছিয়ে নিয়ে বলে, 'দাদায় যে আমার কি আছিলো ক্যামনে কই? আমারে দ্যাখতো, ভাইগ্না ভাগ্নীরে দ্যাখতো আর চক্ষের জল ফালাইতো। দাদার কাছে রইছি, মনে লইছে কি মায়ের কোলে আইছি। আমার কপাল পুড়ছে পর দাদায় মাছ ছাড়লো। কত কইছি, হুনছে না।'

একটানা গদ্যের গুঞ্জরণে প্রদীপ নিজেই একবার তার বাবার কোলে কখনো বা পিসীমার কোলে দোল খায়। এরকম একটানা দুলুনির ফলে চারদিকের রাত্রিকাল লুপ্ত হয়ে যায়, সিংহাসনে অধিষ্ঠিত শালগ্রামশিলা পাহাড়ের স্মৃতিতে কাঁপে; ছোটো মঞ্চে অষ্টধাতুর রাধাশ্যাম নিজেদের অস্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে পরস্পরকে দ্যাখে। কৃষ্ণের দুষ্টু ঠোঁট ফেটে বেরিয়ে আসে লুকোনো হাসি।

'চল ঐ ঘরে গিয়া মুড়ি লইয়া আহি।'

পিসীমার এই আহ্বান বা দরজা খুলে পিসীমার বারান্দায় চলে যাওয়া—প্রদীপ এসব কিচ্ছু লক্ষ করেনি। রাধাকৃষ্ণের নিস্তরঙ্গ ও বিলাসী নয়নের মুগ্ধ তৎপরতায় সে তার মাথার ওপরের ছাদ, পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণের দেওয়াল এবং নিচের মেঝেকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে কেবল দাঁড়িয়েই থাকে। তার টাটকা সদ্যোজাত চোখে কাজলের মতো জমেছে পাতলা এক পরত স্বপ্ন, প্রদীপ এমনকি তাও টের পায়নি।

'প্রদীপ!'

চমকে উঠে চারদিকের দেওয়াল, ছাদ ও মেঝে যেখানকার যা ঠিকঠাক সাজিয়ে দিয়ে, সমস্ত ঘরময় রাত্রিকাল টাঙিয়ে প্রদীপ বাইরে তাকালো।

বারান্দায় পিসীমা।

'কি পিসীমা?'

পিসীমা পাশের ঘরের তালা খোলবার জন্য চাবি ঘোরাচ্ছে।

'ঘরের মধ্যে একলা খাড়াইয়া কি করস? ঘি দিয়া মুড়ি ভাইজা দেই, বইয়া খাইবি আয়।'

'আমার তো খিদে পায়নি পিসীমা। আচ্ছা ভাজো, না হয় একটু খাবো। তুমি খাবে না?'

'খামু না?'

পিসীমা ফের চাবি ঘোরায়, তালা খুলছে না।

প্রদীপ এগিয়ে এসে বলে, 'পিসীমা, চাবিটা দাও, আমি দেখছি।'

'তুই?' পিসীমার চোখে অবিশ্বাস। ঠিক অবিশ্বাস নয়, অনাস্থা। বাবারও তাই ছিলো। বাবা সকলের জন্যেই খুব করতো, কিন্তু ভরসা ছিলো না কারো ওপর।

'তুই পারবি ক্যান?'

'দেখি না!'

'দ্যাখ!'

অনিচ্ছুক হাতে পিসীমা চাবি তুলে দিলো প্রদীপের হাতে। বাবা হলে কিছুতেই দিতো না। প্রদীপ পিসীমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ভাঁড়ারের তালা খোলে। ঘোলাটে আলোতে পিসীমার শাদা ধুতি তন্দ্রাচ্ছন্ন ঘিয়ে রঙের মনে হয়। পিসীমার শরীরে ধূপ ও শশার মিলিত গন্ধ, মাথায় চন্দনের ড্যাম্প হয়ে যাওয়া লুকোনো সুবাস।

অল্প চেষ্টাতেই তালা খুলে ফেললে পিসীমা বলে, 'পারলি?' বলতে বলতে একটু হেসে ফেলে পিসীমা, 'পারবি না? সইত্য রায়ের পোলায় পারবো না?'

ভাঁড়ার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে পিসীমা বলে, 'কথা যখন উঠাইলি তো কই।'

কথা যে কে ওঠায়!

'দাদায় কোনো কাম ধরছে তো না সাইরা থামে নাই।' আলো জ্বলে উঠতেই তিন চারটে ইঁদুর এদিক ওদিক ছিটকে গেলো। কয়েকটা আরশোলা নিজেদের

অবস্থান পরিবর্তন করলো। ঘরে পুরোনো ভ্যাপসা গন্ধ। সমস্ত ঘরে ছাই রঙের দাপট।

'মুড়ির টিন আবার কৈ রাখছে? একটা জিনিস লইবো, তো রাখনের সময় উল্টাপাল্টা কইরা রাখবো। কি সবাব।' পুত্রবধূর উদ্দেশ্যে গজগজ করতে করতে পিসীমা মুড়ির টিন উদ্ধার করে। ঘিয়ের শিশি হাতে নিয়ে বলে, 'তুই চুলাটা ল তো। আমার ঘরে গিয়া মুড়ি ভাজুম, চল।' প্রদীপের হাতে কেরোসিন স্টোভ, পিসীমার দুই হাতে মুড়ির টিন ও ঘি। দুজনেই ঘরের বারান্দায় এলে পিসীমা বলে, 'তালাটা লাগাইয়া দে।'

এ্যালুমিনিয়ামের কড়াই ছিলো পিসীমার ঘরেই। কড়াই গরম হলে ঘিয়ের আবদেরে কান্না আস্তে আস্তে ফোঁৎ ফোঁৎ করে ওঠে। 'বুঝলি, দাদার কুনো কাম ধরছে তো না সাইরা ছাড়ে নাই।' পিসীমা এখনো তার গল্প ভোলেনি, 'বুঝলি?' দেওয়ালের নিচু তাক থেকে চিনির কৌটো পেড়ে পিসীমা পিঁড়িতে বসলো। 'বুঝলি? একবার, একবার, ঐ ঐহানে এট্টা কুয়া আছিলো না? কি শীতল জল, জল বড়ো মিষ্টি আছিলো রে, নতুন দালানটা বানাইতে গিয়া ননী কুয়াটা নষ্ট করছে। চাপকলের জল খালি কষটা লাগে।' ছেলেকে একচোট বকে নিয়ে পিসীমা ফের বলে, 'আমার হাতে একজোড়া মকরমুইখা বালা আছিলো, একেকটার মইদ্যে দুই ভরি কইরা সোনা, হেই জিনিস অহন তরা কৈ দেখবি? তয়, একখানা বালা তেঁতুল দিয়া মাইজা আমি হাতে লইয়া জল তুলতে গেছি, ওমা! বালা পইড়া গেলো কুয়ার মদ্যে। আমি তহন ছুটো মাইয়া, কাইন্দা মরি। আমাগো সৎমাও আছিলো তো। হে মায় আবার বাবারে কইবো, বাবায় যদি মারে! দাদায় তহন ইস্কুল থন আইছে, আংটা দড়ি লইয়া ছুইটা না আইসা ফাল দিয়া নামছে কুয়ার জলে। আমারে খালি ধামকি দিয়া কইলো, "কান্দিস না, চুপ থাক!" বালা তুইলা উইঠা সান কইরা খাইতে খাইতে এক্কেরে বেলা পইড়া গেছে।'

মুড়ির রঙ আস্তে আস্তে লালচে হয়। পিসীমা খুন্তি দিয়ে মুড়ি নাড়া-চাড়া করে। প্রদীপ চুপচাপ, সিংহাসনের শালগ্রামশিলা চুপচাপ, নিজেরা নিজেরাই মুগ্ধ রাধাকৃষ্ণ চুপচাপ। দেওয়ালের উঁচু তাকে ফ্রেমের কাঁচের সঙ্গে সেঁটে থাকা শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব আসন পেতে বসে মৌন হয়ে পিসীমার মুড়ি ভাজা দেখছে। পরমহংসদেবের গা ঘেঁষে নিজের ছাই রঙের ছোটো ছোটো রোমে নিজেই অভিভূত নেংটি ইঁদুর তার পুঁতির মতো চোখ দুটো দিয়ে চারদিকের জগৎ দ্যাখে। ওর ছোট্টো চোখের রেঞ্জে দেওয়াল আসে না, মেঝেও বোধহয় আসে না। নেংটি ইঁদুর পরম তৃপ্তিতে ধান কাটা হয়ে যাওয়া মাঠ থেকে কুয়াশার সঙ্গে উড়ে আসা মুড়ি ভাজার সৌরভে ছটফট করে।

এদিকে পিসীমা গুনগুন করে, 'যদি গোকুলচন্দ্র ব্রজে না এলো, সখী গো।' পরমহংসদেবের পোষা নেংটি ইঁদুরের পেছনে পেছনে প্রদীপও মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে যাচ্ছে।

'মুড়ি ভাজলে রঙ হইবো এই রহম, তাইলে সেন মুড়ি ভাজা ঠিক হইলো!' মাঠের ওপার থেকে পিসীমা কথা বললো, 'বৌমায় দিনরাইত কাম করে, ঝির লগে চিল্লাইবো, ঠাকুররে বকা দিবো। বৌমার কামের ঢকডিল নাই। তহন তগো মুড়ি ভাইজা দিছে, পুড়াইয়া ফালাইছে।' তাক থেকে রূপোর একটা রেকাবী বার করে মুড়ি ঢেলে পিসীমা প্রদীপের দিকে এগিয়ে দিলো।

'ল খা।

'তুমি খাবে না?'

তুই খা না!'

প্রদীপ জেদ করে, 'তুমিও খাও!'

'পাগলা। আমি ক্যামনে খাই? আমার দাঁত আছে নি? মাড়ির দাঁত পইড়া গেছে কুনদিন।'

পিসীমা বসে বসে প্রদীপের মুড়ি খাওয়া দ্যাখে।

প্রদীপ, শরীলের কি হাল করছস, ক দেহি।' প্রদীপ কোনো জবাব না দিলে পিসীমা বলে, 'তুই এমুন সাধুর মতো থাকস ক্যামনে প্রদীপ?' নাক, মুখ, চোখ এলোমেলো করে প্রদীপ পিসীমার দিকে তাকালো। পিসীমা আপন মনে ফের গুন গুন করে। মুড়ি খাওয়া বন্ধ করে প্রদীপ স্তব্ধ চোখে পিসীমাকে দেখতে থাকে। গুনগুন করতে করতে উঠে দাঁড়িয়ে পিসীমা রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির সামনে ঘুরে ঘুরে হাঁটছে। আবার দ্যাখো, রাধাকৃষ্ণের মূর্তি পেছনে রেখে পিসীমা এখন রামকৃষ্ণদেবের ছবি দেখছে। দেখতে দেখতে পিসীমার মুখ গলে গিয়ে গড়িয়ে পড়তে শুরু করলো। মাংস কি জলে পরিণত হলো? জল থেকে কি ধোঁয়া বেরুবে? রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি এদিক ওদিক তাকিয়ে ফাজিল যুবক যুবতীর মতো দরজা দিয়ে কোথায় পালাচ্ছে? শালগ্রামশিলা উড়ে গেলো সিংহাসনে চড়ে, না কোথাও কোনোভাবেই বাধাপ্রাপ্ত হয়নি, সুন্দর ফ্লাইট। তাকের ওপর পরমহংস বেরিয়ে গেছে তার পোষা নেংটি ইঁদুরটি নিয়ে। মস্ত বড়ো অপরিচিত একটি শূন্যতায় শরীরমুক্ত তরল পিসীমা তার ধোঁয়াচ্ছন্ন কেশরাশি এলিয়ে দিয়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। প্রদীপ একটার পর একটা ঢোক গেলে। মুড়ি খেয়ে জিভ তার শুকনো, গলায় একফোঁটা জল নেই। সেইসব শুকনো ঢোক কণ্ঠ বেয়ে শূন্য বুকে কাঁটার মতো বেঁধে। প্রদীপ চিৎকার করে ডাকে, 'মা!'

পিসীমা চমকে উঠে বলে, 'কি হইলো প্রদীপ? কি? ডরাইলি? কি হইছে?'

ইঁটের ভিত্তিতে ফের ফিরে আসে দেওয়াল, দেওয়ালের ওপর চেপে বসে ছাদ। 'না পিসীমা!'

মঞ্চে আসীন রাধাকৃষ্ণ মুগ্ধ দৃষ্টি প্র্যাকটিস করে। রামকৃষ্ণদেব আসন পেতে বসে খোঁজ করে, পোষা ইঁদুরটা কোথায় গেলো? পিসীমা ঠিক পিসীমা হয়েছে। ঘরের ভেতরে ফিরে এসেছে ঘর, মেঝের জায়গায় মেঝে।

পিসীমা আস্তে আস্তে প্রদীপের মুখে, ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দেয়।

প্রদীপ কেবল পিসীমার ফর্সা গালের কোঁচকানো আঁকিবুঁকিতে নোনা জলের জোয়ার দ্যাখে।

'তর ভঙ্গি আছে প্রদীপ, তর ভঙ্গি আছে। আমার ঠাকুরদায় সাধুগো লগে বারাইয়া গেছিলো, মৃদঙ্গ বাজাইয়া খালি হরিনাম লইতো, হরির নাম করতে করতেই পুরীতে গিয়া দ্যাহ রাখছে।' পিসীমার গলা থেকে গেরুয়া রঙের নোনতা শব্দ বেরিয়ে আসে, 'তর ভক্তি আছে। তর ভক্তি আছে। তরে লইয়া আমি কি করি?'

'না পিসীমা, আমার কিছুই হয়নি। যাই শুয়ে পড়ি।'

'চল, তরে ঘুম পাড়াইয়া দেই।'

'না পিসীমা। হঠাৎ খুব ঘুম পাচ্ছে তো। ঘুমের ঝোঁকে বোধহয় ভয় পেয়েছিলাম।'

'ঘুম পাইছিলো? কি দেখলি? প্রদীপ, কি দেখলি? কইবি?'

পিসীমার আগ্রহ বড়ো তীব্র। প্রদীপ কি দেখলো তাই জানার জন্যে পিসিমার এত লোভ কেন?

কিন্তু প্রদীপ তো কিছুই দ্যাখেনি। পিসীমাকে সে কি বলবে?

অমিতের ঘরের দরজায় এসে প্রদীপ বলে, 'পিসীমা, তুমি যাও। আমি শুয়ে পড়ি। ভোর বোধ হয় হয়েই গেলো। তুমি যাও।'

ঘরের দরজা থেকে পিসীমা চলে যাওয়ার সময় চন্দনের, শশার, কলার ও কর্পূরের ঝাপশা গন্ধ প্রদীপের নাকের সামনে একবার তুড়ি বাজিয়ে পিসীমার চুলের মধ্যে ডাইভ দিয়ে পিসীমার সঙ্গেই ফিরে গেলো।

অমিতের ঘরে খাট, খাটে টাঙানো নোতুন কাচা মশারি, মশারির ভেতর ঢুকলে চারদিকে কেবল মশারির দেওয়াল। বালিশের পাশে রাখা সেই 'জলভরা তালশাঁশ' বা 'নাজমা ভাবীর প্রেমের শাঁস' কাঁধে ঠেকে গেলে প্রদীপ একটু সরে যায়, 'আব্বে স্‌লা তুই আছিস এখনো?' বইটা ফের খিচাং করলো। তার চেয়ে অমিতের টেবিল থেকে পুরনো কাগজ টাগজ এনে তার ওপর মাষ্টারবেশন করে দিলেই বইটাকে একেবারে ঝেড়ে ফেলা যায়।

কিন্তু এখন বিছানা থেকে নামা অসম্ভব। লেপটা কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে রয়েছে পায়ের কাছে। শালার শীতও গায়ে ঠিকমতো লাগছে না। পাজামার দড়ি খুলে ভেতরে নাড়াচাড়া করতে গেলে কুঁকড়ে থাকা ঠাণ্ডা শিশ্ন হাতে ঠেকে মরা বিছের মতো; সমস্ত গা ঘিনঘিন, ছিনছিন করে ওঠে। তখন ডান হাতটা এনে মাথার কাছে রেখে দেওয়া ছাড়া সে আর কি করতে পারে? বাম হাতটা কোথায় রাখলে ভালো হয়—কিছুতেই বোঝা যায় না। এমন সময় পিসীমার গুঞ্জন বারান্দা দিয়ে গুটি গুটি পায়ে এসে এ ঘরেও উঁকি দিয়ে যায়, 'পাগলা, মনটারে তুই বাঁধ।' এখন বোধহয় ভোর হচ্ছে, এই গান যদি ঘরে ভালো করে একবার ঢুকে পড়তে পারে তো

তোলপাড় শুরু হবে—এই ভাবনায় কাতর হয়ে নেভবার আগেকার প্রদীপের মতো এই প্রদীপও লাফ দিয়ে উঠে বসলো। খাটে বসেই জানলা বন্ধ করা যায়। এই নিয়মটা ভালো। আবার নামতে হলো না বলে খুশি হয়ে জানলাগুলো সটাসট বন্ধ করে দিলো। জানলার কপাটের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পিসীমার গান ল্যাজ গুটিয়ে বাইরে চলে যায়।

মধ্যরাত্রির এইসব ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে প্রদীপ বিছানার ওপর একেবারে টানটান শুয়ে পড়লো। জানলা বন্ধ করে দেওয়ায় ঘরে এখন নিভৃত বর্গক্ষেত্রে। ঘরের ৪ দেওয়ালের মধ্যে মশারি। মশারির ভেতর চতুষ্কোণ অন্ধকার। তার ৫ ৪´´ শরীরের ভেতর থেকে নিজের শ্বাস প্রশ্বাসের পরিচিত ধ্বনি এসে অন্ধকারে দানা বাঁধতে শুরু করলে প্রদীপ আস্তে আস্তে থিতিয়ে পড়ে।

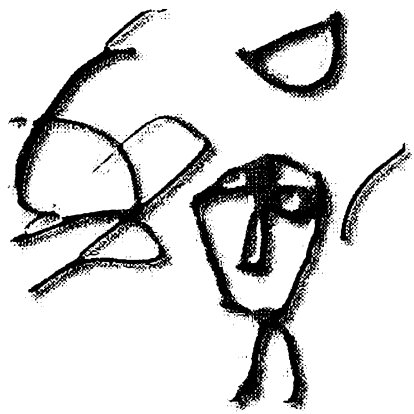

খোঁ য়া রি

খোঁয়ারি

অনেকক্ষণ ধরে কড়া নাড়ার পর ওপরতলা থেকে জবাব আসে, 'আসি!' তারপর আবার কোনো সাড়া-শব্দ নেই; গেটের ওপর মাধবীলতার ঝাড়ে চরে বেড়ায় পোকামাকড়, তাদের চলাচলের ধ্বনি ছাড়া এ বাড়ির কোনো স্পন্দন বোঝা যায় না। মাধবীলতায় ঢাকা উঁচু গেট তেমন চওড়া নয়। গেটের একটা কপাট কেটে আরেকটা ছোটো দরজা। কাঠের সঙ্গে পেরেক মেরে বড়ো গেটটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, অন্তত ২২/২৩ বছর থেকে এরকম বন্ধ। সুতরাং এই বাড়িতে আসতে হলে মাথা নিচু করে ছোটো দরজা দিয়ে না ঢুকে উপায় নেই। ভেতরে ৪/৫ গজ জায়গা পাকা, পাকার ফাটলে রক্তহীন ঘাসের কদমছাঁট চাপড়া। এরপর উঁচু বারান্দা, বারান্দায় মোটাসোটা সব থাম। কখনো কখনো রাত করে বাড়ি ফিরে অমৃতলাল আদর করে জড়িয়ে ধরলে থামগুলো তার হাতের বেড়ে সবটা আসে না। সেই সব থামের ওপর দোতলা, দোতলার রেলিঙঘেরা ছাদ, ছাদের একপাশে চিলেকোঠা—নড়বড় করতে করতে শ'খানেক বছর দিব্যি কাটিয়ে দিলো। ভেতরে প্রাচীরের শ্যাওলায় ও প্রাচীর সংলগ্ন শূন্যতায় তেতো-সোঁদা গন্ধ। মাধবীলতার ফিকে সুবাসের সঙ্গে কাঁঠালিচাঁপা ফুলের ঘন গন্ধ জীবজন্তুর করোটিতে হঠাৎ করে ঢুকে মগজের সাজগোজ এলোমেলো করে দেয়। মাধবীলতা তো গেটের ওপর দ্যাখাই যাচ্ছে। কাঁঠালিচাঁপার ঝাড়টা কোথায়?

'তাইলে আইছো?' দরজা খোলার ক্যাচক্যাচ শব্দের সঙ্গে সমরজিতের কথা শুনলে মনে হয় পুরোনো তক্তপোষে ঘুমিয়ে পাশ ফিরতে ফিরতে স্বপ্নের মধ্যে কেউ গোঙাচ্ছে, 'আমি কই, কৈ জইমা গেছে, আউজকা বুঝি আর আইলা না!'

সমরজিতের বয়স ৪০ ছুঁইছুঁই। তার তামাটে মুখে প্রথমে চোখে পড়ে উঁচু ও তীক্ষ্ণ নাক এবং পিচ-ওঠা সুকলাল দাস লেনের মতো ঠাসবুনুনী ব্রণের দাগে এবড়োখেবড়ো নাকের উপত্যকা। তারপর আস্তে আস্তে ফুটে ওঠে তার বড়ো বড়ো চোখের গভীর কোটর। নাকের ছায়ায় ঠোঁটের ঢেউ বোঝা যায় না; ঠোঁটের ওপর কাঁচা-পাকা গোঁফ বটবৃক্ষের নিচে ঝোপের মতো, বিনয়ে নুয়ে থাকে। এই বারান্দায় কোনো বাল্ব নেই, ডি. সি. লাইনের ৪০ পাওয়ারের আলোর একটুখানি

ময়লা আঁচল এসে লুটিয়ে পড়েছে দরজার পাশে, সেই আলোতে সমরজিৎকে বড়ো রোগা মনে হয়।

'দেরি তো এখানেও হলো দোস্ত! কোড়া নেড়ে নেড়ে হাতে আমাদের কোড়া পড়ে গেলো, তুমি ছিলে কোথায়?'

'ইফতেখার!' সমরজিতের এই বিস্ময়ের জবাবে ইফতিখার হাসে, 'চলে এলাম দোস্ত! ফারুকের সঙ্গে দেখা, তো বললো কে চলো সমরজিতের ঘরে চলো। ব্যস চলে এলাম।' ইফতিখারের সংলাপে উর্দুভঙ্গি স্পষ্ট। এই উচ্চারণে বাঙলা বলে সে এ পর্যন্ত পাঁচজন বাঙালি মেয়েকে কাত করেছে, তাদের মধ্যে দু'জন বিবাহিতা।

'চলো চলো, তাড়াতাড়ি করো', ফারুক তাড়া দিলো, 'রাত এগারোটায় কন্টিতে মানিক ভায়ের সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্ট। তাড়াতাড়ি করো।'

'চলো।' হাই তুলতে তুলতে সমরজিৎ সরে দাঁড়ায় দরজার একপাশে। সবাই ঢুকলে সে এই দরজা বন্ধ করবে। সবার ঢুকে-পড়া সম্পূর্ণ হতে হতে সে আরেকবার হাই তোলে। মুখের সামনে ডান হাতের আঙুলে তুড়ি বাজালে স্পষ্ট আওয়াজ হয় না। দরজা খোলার পর থেকে এই নিয়ে সে তিনবার হাই তুললো, প্রত্যেকের জন্য একটি নীরব অভ্যর্থনা।

এই ঘরে দুটো তক্তপোষ, দুটোই বেশ উঁচু ও পাকাপোক্ত। হাত না দিয়েও বোঝা যায় সলিড সেগুন কাঠের মাল। এর একটিতে শীতলপাটি বিছানো, অপরটিতে সতরঞ্চি পাতা, একপ্রান্তে গুটিয়ে-রাখা তোষকে জড়ানো পুরু বিছানা। তোষকে হেলান দিয়ে অমৃতলাল গুছিয়ে বসছে, অমৃতলালের হাত পা ভিজে ভিজে, বোধহয় এক্ষুণি পায়খানা করে এসেছে। বসতে বসতে তাসের তাড়া হাতে সে পেশেন্স খেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তার মাথার ঠিক ওপরে কাগজের ফুলের মালায় হাবুডুবু খাওয়া শেখ মুজিবুর রহমান উল্টোদিকের দেওয়ালের তাকে দাঁড়ানো মুরলীধরের মুখোমুখি। দেওয়ালে কোনো জুয়েলারী দোকানের ক্যালেণ্ডারে সালঙ্কারা বাঙালি বধূ। দরজায় লক্ষ্মীপূজার সময় টাঙানো সোলার ঝরা। অমৃতলাল কারো দিকে ফিরেও তাকায় না, সে একমনে তাস বাটে। তার লম্বাটে ফর্সা মুখের পেশী একটুও কোঁচকায়নি, কপালের সরু মোটা ঢেউ যা আছে সবই পুরোনো। এই ঘর পেরোলে আরেকটি ঘর, চুন সুরকি ঝরে পড়ায় দেওয়াল একটু ভেংচি কাটে। তারপর সরু প্যাসেজের শেষ প্রান্তে ওপরে ওঠার সিঁড়ি। ফারুক ও ইফতিখার ঐদিকে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই সমরজিৎ বাধা দেয়, 'ঐদিকে না।'

ফারুক জিগ্যেস করে, 'ওপরে যাবে না?'

'এই সিঁড়ির লগের দেওয়ালে কয়দিন হয় একটা চিড় ধরছে। ঐদিক দিয়া আর উঠি না।'

ইফতিখার ও ফারুক আগেও কয়েকবার এসেছে, কিন্তু আর কোনো সিঁড়ির খবর কৈ কোনোদিন শোনে নি তো।

সরু প্যাসেজ পার হলে দরজা, দরজা খুলে ফেললে আবার ঘর। সুরকি-ঝরা দেওয়ালের রঙ তবু ঝাপশা দ্যাখা যাচ্ছিলো, কারণ আলো জ্বলছে তার পাশের

ঘরেই। কিন্তু এই সরু প্যাসেজ, ফের আরেকটি ঘর—এসবের ভিজে ভিজে অন্ধকার ও জড় ভোঁতা গন্ধ ছাড়া আর কোনো পরিচয় বোঝা যায় না। এই ঘরের দরজা ভেজানো ছিলো। ধাক্কা দিতেই কপাট দুটো দুজন অন্ধ ভিখেরির মতো দুদিকে ঢলে পড়ে। এবার কোনো আওয়াজ হয় না। কাত হয়ে অল্প অল্প কাঁপতে থাকা কপাটজোড়ার ভেতর দিয়ে চলে গেলে চওড়া পাকা উঠান। চাঁদের ময়লা আলোতে এই উঠানকে হলদে রঙের নোংরা চাদর-পাতা বিছানা বলে ভুল হতে পারে। কিন্তু এরকম ভুল কেউ করে না।

সমরজিৎ সাবধান করে দেয়, 'এট্টু দেইখা পা ফালাও। জলটল পইড়া এক্কেরে ইসে হইয়া রইছে।'

'আস্তে হাঁটো, আস্তে হাঁটো ইফতেখার। তুমি পড়ে গেলে মীরপুর মোহাম্মদপুরে রি-এ্যাকশান হবে।'

ফারুকের এই ধমকে ইফতিখার মিনমিন করে, 'না দোস্ত! আমি খুব কেয়ারফুলি স্টেপ ফেলছি।'

সমরজিৎ ফের বলে, 'বাপে হালায় ঐদিনকা এই এহানেই পইড়া গিয়া ডাইন পায়ের আঙুল মচকাইয়া ফালাইছে।'

'তোমার বাবা পড়ে গিয়েছিলো?' ইফতিখার জিগ্যেস করে, 'কিভাবে?' 'সমরদা, একটু পেচ্ছার করা যাবে?' প্রথমবারের মতো কথা বললো বলে জাফরের কণ্ঠস্বর ফ্যাসফ্যাসে ও মাঝখান দিয়ে চেরা। এই কণ্ঠস্বর তার বেলবটম, বড়ো কলারের খবর-কাগজ আঁকা শার্ট, গলায় ঝোলানো চেন এবং সদাপ্রস্তুত ও সপ্রতিভ চেহারার সঙ্গে বেমানান।

'এই তো দিন ৫/৬ হইবো। এই জায়গায় খাড়াইয়া বুইড়া গান ধরছিলো, একটা লাইনও পুরা গায় নাই, ব্যাস—' ইফতিখারকে জবাব দিতে দিতে সমরজিৎ মনোযোগ দেয় জাফরের দিকে, 'পেচ্ছাব করবেন? ঐখানে মাইরা দেন।' ঐখানে সারি সারি তিনটে ছোটো ঘর। কোনোটারই ছাদ নেই, কেবল একেবারে বাঁদিকেরটার মাথায় টিনের ওপর হাঁট চাপা দিয়ে ছাদ তৈরি করা হয়েছে। সবগুলো ঘরের দেওয়ালে খিঁচিয়ে-থাকা দাঁতের গোড়ায় ছ্যাতলার মতো হলুদ জ্যোৎস্না।

'এখানে?' জাফর বোধহয় ইতস্তত করছে। সমরজিৎ স্টার সিগ্রেট ধরিয়ে ইফতিখারকে একটা দিলো। ফারুকের হাতে ফিল্টার-টিপ্‌ড।

'এইগুলো কি রে?'

'রান্নাঘর।' সমরজিৎ প্রথমে জবাব দেয় ফারুককে।

'এতো রান্নাঘর কেন? তোদের না জয়েন্ট ফ্যামিলি ছিলো?'

'বাথরুমটা কোনদিকে?' জাফর ছটফট করে।

'বাথরুমে যাইতে পারবেন?' জাফরকে এই পাল্টা প্রশ্ন করে সমরজিতের মুখ ফের ঘুরে যায় ফারুকের দিকে, 'জয়েন্ট ফ্যামিলি অখনো আছে। এতোটি

রান্নাঘর—কোনোটার মইদ্যে আমিষ রান্না হইতো, আবার নিরামিষ হবিষ্যি ঠাকুরের ভোগ রান্দনের আলাদা আলাদা ঘর আছিলো।' তারপর জাফরকে বলে, 'বাথরুমে যাইতে পারবেন না, অন্ধকার। পায়খানা এক্কেরে ঐদিকে, পাঁচিলের লগে। এইখানেই করেন না।' ইফতিখার বলে, 'না দোস্ত। বাবুর্চিখানায় পেশাব করবে কেন? তোমার মা কোলকাতা থেকে ফিরে এলেতো সবগুলো ফের ঠিক করে নেবে, না?' 'আর ঠিক করবে কে? শূওরের বাচ্চারা ন'মাসে বাড়িটার কি অবস্থা করেছে। কে আসবে এখানে?' ফারুক খুব জোর দিয়ে এইসব বললে কাচুমাচু মুখ করে ইফতিখার এদিক ওদিক তাকায়। রান্নাশালার উল্টোদিকে পোড়া একটা ঘর। ইফতিখার বলে, 'এখানে কি ছিলো দোস্ত?', সমরজিৎ তখন জাফরকে ঐ ঘরটাই দেখিয়ে দিলো, 'যান, ঐখানে মাইরা দ্যান।' গুটি গুটি পায়ে জাফর ঐদিকে চলে গেলে সমরজিৎ বলে 'বহুত আগে ঐঘরে ঠাকুরের ভোগ রানতো।'

ওরা তিনজন দাঁড়িয়ে রইলো জাফরের জন্যে। উঠানের এক কোণে গড়িয়ে-পড়া জল দেখে সমরজিতের ফের বাবার কথা মনে পড়ে, 'বাপে হালায়, বুঝলা, বৃহস্পতিবার, না না শনিবার দিন রাইতে খুব মাল টানছে, বহুত দিন বাদে কৈ পাইছিলো, আর চেক করতে পারে নাই। বাসায় আইসা এই জায়গায় না খাড়াইয়া গান ধরছে।'

জাফরের প্রসাবের বেগবান ধারা কোনো টিনের ওপর বৃষ্টিপাত ঘটায়। টিনের ওপর জল পড়ার টং টং ধ্বনিতে সমরজিতের দীর্ঘ সংলাপ বিভক্ত হয় পর্বে পর্বে, 'আমি কই, এই রাইতে চিল্লায় কেঠায়? "মোর প্রিয়া হবে এসো রাণী"—ঘর থিকা বারান্দায় আইলাম, দেখি তো রাজা চুতমারানী হালায় ক্যাঠায়?'

প্যান্টের চেন টানতে টানতে জাফর ফিরে আসে।

সবাই মিলে উঠান পেরোতে শুরু করলে জাফর বলে, 'ঐ ঘরে টিন পাতা আছে নাকি?'

'টিন?' সমরজিতের প্রশ্নবোধক ভঙ্গিতে ক্লান্ত বিরক্তি, 'দূর, টিন কই পাইবেন?' অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে সে খুক করে একটু হেসেও নেয়।

'পেশাব পড়ছিলো তো টিনের ওপরে, দোস্ত। টিনেরই আওয়াজ মনে হলো না?'

ইফতিখারের কথায় সমরজিতের মনে পড়ে, 'টিন? হ। কুয়ার উপরে টিন ফালাইয়া রাখছে।'

'কুয়ো? ওখানে কুয়ো আছে নাকি?'

'আমরা পোলাপান থাকতেই কুয়াটা বন্ধ কইরা টিন চাপাইয়া রাখছে। টিনের উপরে পুরানা কাঠকুঠ, দরজা, ভাঙা কপাট, ভাঙা চেয়ার টেবিল বহুত জমছিলো। নয়মাসে খানকির বাচ্চারা সেইগুলি জ্বালাইয়া ভাত খাইছে, অখন টিনগুলি বারাইয়া পড়ছে।'

'ভাত খাবে কেন? রুটি সেঁকেছে, রুটি।' জাফরের এই সংশোধনী শেষ হতে না হতেই ইফতিখার জিগ্যেস করে, 'ঘরের মধ্যে কুঁয়া কেন দোস্ত?' 'এই ঘরে

ঠাকুরের ভোগ রান্না হইতো তো। এই জল ব্যবহার হইতো ঠাকুরের ভোগ রান্দনের লাইগা।'

দেবদেবীর ভোগ রান্না হতো ঐ কুয়োর জলে। যশোর কালীবাড়িতে দরজা থেকে উঁকি-দিয়ে দ্যাখা মা কালীর ঠাণ্ডা শুকনো জিভ জাফরের শিরদাঁড়া চাটে।

এক বারান্দা থেকে নেমে উঠান পেরিয়ে আরেক বারান্দায় উঠে ফের ঢুকতে হয় আরেকটি ঘরে। এই ঘরে উঁচু ছাদের কাঠের বীম একটা বাল্বের ওপর অস্পষ্ট রেখায় শুয়ে থাকে। বাঁদিকে ওপরে ওঠার সিঁড়ি। সিঁড়ির অনেকগুলো ধাপ, দুবার ঘুরে পৌঁছেছে ওপরতলার বারান্দায়। নিচের ঘরে আলোতে সিঁড়ির ধাপগুলো কেবল উঁচু ও কালচে হলুদ। ওপরে উঠতে উঠতে নিচে তাকালে এই ধাপগুলোকে মনে হয় সর-পড়া ঠাণ্ডা জল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সমরজিৎ বলে, 'আস্তে উইঠো।' সে নিজে অবশ্য তাড়াতাড়ি উঠে বারান্দার লাগোয়া ঘরটিতে সুইচ টেপে, ঘরের আলো বারান্দা পেরিয়ে এদিক আসায় ওপরের পাঁচটা ধাপের ঘুম ভেঙে যায়, ফের ঘুমোবে বলে আলো নেভবার আশায় তারা ঢুলু ঢুলু চোখে ঝিমাতে থাকে। সিঁড়ির দুই দিকেই দেওয়াল, রেলিঙ নয়, দেওয়াল। দেওয়ালে চারবার পাঁচকোণা তাক। এককালে আলো দেওয়ার জন্য এখানে প্রদীপ জ্বালানো হতো। এখন ইলেকট্রিসিটি আসায় সেই ব্যবস্থা উঠে গেছে, কিন্তু সিঁড়ির জন্য নতুন কোনো বাল্বও লাগানো হয়নি।

বারান্দা পেরিয়ে প্রথমে ঢুকলো সমরজিৎ, তারপর ফারুক, ফারুকের পেছনে জাফর ও ইফতিখার। ঘরে একটা সিঙল খাট, খাটের কাছে দুটো হাতলহীন চেয়ার, ক্যানভাস লাগানো ইজি চেয়ার, চুন সুরকির খোলস খুলতে থাকা মোটা দেওয়াল, দেওয়ালে তিনটে ছোটো আলমারি—শীতল শরীরে সবাই নিজ নিজ অবস্থানে স্থির। খাটের পাশে মাঝারী সাইজের একটা টেবিল, টেবিলে স্তূপাকৃতি কাপড়চোপড়।

অর্ধেক ভাঁজ করে ইজি চেয়ার ফের প্রায়-বিছানার মতো পেতে তার ওপর বসলো ফারুক, মাথাটা এলিয়ে দিলো কাঠের ওপর, একটা হাত রাখলো বুকে, আরেকটা চেয়ারের হাতলে। তারপর একটা নিশ্বাস ফেললো, 'আঃ।' তারপর, 'সমরজিৎ, তাড়াতাড়ি করো, টাইম নাই।' কাঠের চেয়ারে বসেছে জাফর, খাটের একপ্রান্তে ইফতিখার। আরেকটা চেয়ার দড়িতে ঝোলানো শার্টের ছায়ায় আধখানা ঢাকা। এটা নিশ্চয়ই সমরজিতের জন্য।

ডানদিক থেকে প্রথম সেলফের কাঠের পাল্লা খোলার জন্য সমরজিৎ চাবি বার করে দ্বিতীয় শেলফ থেকে। এই শেলফটা খোলা, এর ছোটো দরজা দুটো কেউ খুলে নিয়েছে, এর তিনটে তাকে আবোল তাবোল করে রাখা রাজ্যের জিনিস। এই এলোমেলো জিনিসের ভেতর থেকে এক নিমেষে চাবি খুঁজে পাওয়ায় সমরজিতকে ইফতিখার মনে মনে বাহবা দিলো। প্রথম শেলফের তালায় সে চাবি ঢুকিয়েছে, ফারুক বলে, 'তালাচাবি দিয়ে রাখো?'

'নাইলে থাকতো?'

'তোমার ঘরে এ্যালকহলিক চোর আসে নাকি?'

'তো কি?'

'কে আসে দোস্ত?' ইফতিখারের প্রশ্নের ভঙ্গি থেকেই বোঝা যায় জবাবটাও তার জানা।

'আসে না? চান্স পাইলেই বাপে হালায় বোতল ধইরা কয়টা সিপ মাইরা দিবো।'

সবাই হেসে ফেললেও সমরজিতের গম্ভীর মুখ ও কোঁচকানো কপাল অপরিবর্তিত রয়ে যায়। পাতলা কাগজে জড়ানো চারকোণা লম্বা একটা বোতল বার করে সে রেখে দেয় টেবিলের ওপর। তার বাঁ হাতের এক ধাক্কায় কাপড়েচোপড় সব গড়িয়ে পড়ে বিছানায়। আধখানা শুয়ে ফারুক বোতলটা দ্যাখে, 'জনি ওয়াকার? গুড!'

ওদিকে ঘরের কোণে রাখা পেতলের কলসি থেকে প্লাস্টিকের নতুন জগে জল ঢালে সমরজিৎ। জল গড়াবার ঢকঢক আওয়াজে ঘর সঙ্কুচিত হয়। অবশ্য মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে। কারণ কলসির শেষ ধারা স্রিৎ স্রিৎ করে উঠলে সেই আওয়াজ মনে হয় আসছে অনেক দূর থেকে। তার রোগা হাতে চারটে বিভিন্ন আকৃতির গ্লাস ও প্লাস্টিকের জগ টেবিলে রাখতে গিয়ে সমরজিৎ দ্যাখে, জায়গা কম হচ্ছে। সুতরাং জগ রেখে দিতে হয় মেঝেতে। এরপর বেশ আয়েশ করে সে বসে খালি চেয়ারটায়। শার্টের ছায়া চেয়ার ছেড়ে এবার তার কোলের ওপর। বোতলের পাতলা কাগজের আবরণ আস্তে আস্তে ছাড়াতে গেলে কাগজটা এক জায়গায় এসে বড়ো ছটফট করে, তখন সে একটু থামে। বোতলের মাথা ধরে আস্তে টান দিলে আবরণ নিচে খসে পড়ে। সমরজিৎ তখন গলায় কামবোধ করে। কামবোধ তীব্র হয়ে ওর জিভ ও টাকরা পর্যন্ত ছড়ায়, বোতলের গ্রীবায় এক হাত ও কটিতে এক হাত দিয়ে ধরে মালটাকে সে তুলে ধরে সকলের সামনে। জনি ওয়াকার রেড লেবেল হুইস্কির টিম্বার রঙের স্বচ্ছ রক্তে কম ভোল্টেজের আলো গাঢ় ও ঘন সেডিমেন্ট ফ্যালে। বোতল খুলতে খুলতে সমরজিতের কপালের কোঁচকানো সব রেখা সমান হয়, তার চোখ দুটো এখন ফুটে উঠেছে সম্পূর্ণ ও স্পষ্ট হয়ে। বিগলিত মুদ্রায় উপুড় হয়ে সমরজিৎ বোতল প্রতিষ্ঠা করে টেবিলের ঠিক মাঝখানে। প্রতিষ্ঠা-পর্ব সম্পন্ন হলে সে গদগদ চোখে ফারুকের রূপ দ্যাখে, 'ঢালো।'

'তুমিই ঢালো না!' ফারুক শুয়েই থাকে।

বড়ো পেগের পরিমাণে হুইস্কি ঢেলে দিলে দুটো নীল, একটি সবুজাভ ও একটি ঘোলাটে গ্লাসে মদের রঙ পাত্রের দ্বারা প্রভাবিত। ঘরের পুরনো, ভ্যাপসা ও ভিজে ভিজে গন্ধে হুইস্কির ঝাঁঝ মিশলে সকলের মাথায় সুড়সুড়ি লাগে। সমরজিৎ জলের জগ হাতে নিলে ফারুক বলে, 'বরফ নেই?'

'না দোস্ত। বরফ কৈ পাই?'

ফারুকের হাতে সবুজাভ গ্লাস, তার মুখে ইংরেজি বাক্য, 'ফার্স্ট সিপ শুড বি এ স্ট্রেট ওয়ান।'

সমরজিৎ তখন তার নিজের ও ইফতিখারের গ্লাসে জল ঢেলে তাকায় জাফরের দিকে, 'আপনার?'

'খুব অল্প।'

ফারুক 'চিয়ার্স' বলবার সঙ্গে সঙ্গে চারজনের হাতে চারটে গ্লাস শুন্যে টুং টাং বেজে ওঠে, এই ধ্বনিতে ঘর প্রসারিত হয়। সমরজিতের কপালের নিচে তখন রক্তের প্যারেড, লেফট রাইট লেফট রাইট লেফট! তার লম্বা চুমুকে প্রায় দেড় আউন্স পরিমাণ হুইস্কি গলায় গিয়ে ফের ওপরে উঠে করোটির ময়লা সাফ করে। ফারুকের জিভ দিয়ে তরল আগুন গড়িয়ে পড়ছে বলে ওর ঠোঁটের দুই কোণ ও গাল আঁচ লেগে একটু কোঁচকানো। আধশোয়া অবস্থাতেই সিগ্রেটের জন্য সে এদিক ওদিক হাতড়াতে শুরু করলে ইফতিখার একটু নিচু হয়ে মেঝেতে গাড়িয়ে-পড়া ডানহিলের লাল প্যাকেট কুড়িয়ে তার দিকে এগিয়ে ধরে। কিন্তু সিগ্রেট জ্বালাবার জন্য ফারুকের কোনো উৎসাহ নেই। ডানহিল শুয়ে থাকে ইজিচেয়ারের হাতলে। ইফতিখারের চোখের কোণ ও নাকের দুই পাশ এখন একটু বাঁকা। একটি চুমুকের ভগ্নাংশ টেনে মেয়েদের তেঁতুল খাওয়ার সময় সুখ প্রকাশের ভঙ্গিতে টাকরায় জিভ দিয়ে সে ছোট্টো করে বাড়ি দেয়। ঘোলাটে গ্লাস তার ভাঙাচোরা গালের সঙ্গে ঠেকিয়ে বলে, 'আঃ! সেভেনটি ওয়ানের পর হুইস্কি আর চোখেই দেখিনি দোস্ত!'

'সেভেনটি ওয়ানে খুব খেতেন, না?' জাফরের এই প্রশ্ন ইফতিখারের কানেই যায় না, সে মগ্নস্বরে গুনগুন করে, 'মেরে ইস্কাচ, মেরে পেয়ারে!'

'কোথায় খেতেন?' জাফরের ফর্সা মুখে তেতো হাসি, 'ক্যান্টনমেন্টে খেতেন নাকি?'

ফারুক বলে 'আঃ। বাদ দাও।'

এই ছোট্টো ধমকে ইফতিখার বল পায়, 'আমি ভাই এখানে খেয়েছি, আপনি খেয়েছেন ওপারে। কোলকাতায় কোতো ভালো ভালো বার, বোড়ো বোড়ো হোটেল!'

'আমি কোলকাতা ছিলাম না।' চিবিয়ে চিবিয়ে বলে জাফর নির্জলা কয়েকটা ধ্বনির ছিবড়ে ছুঁড়ে দেয়, 'আমি ছিলাম ফ্রন্টে। এই হাতে তিনজন পাঞ্জাবি সোলজার মেরেছি, দালাল সাফ করেছি এ্যাট লীষ্ট হাফ এ ডজন। মদ খেতে আর মিটিং করতে তো আর দেশ ছাড়িনি।'

ফারুক অতিরিক্ত মনোযোগ দিয়ে সিগ্রেট ধরায়। গ্যাস লাইটারের দীর্ঘ নীলাভ শিখায় তার মুখের আঁকাবাঁকা রেখা বড়ো চঞ্চল। লাইটার ধরে-থাকা ডান হাত দিয়ে কিংবা এমনি খালি বাঁ হাতে জাফরের গালে গোটা দুয়েক চড় দিতে পারলে এখন সুখ পাওয়া যায়। শুওরের বাচ্চা! খুব ফ্রন্টের গরম দ্যাখাস, তোর

বাপ মানিক ভাই ফ্রন্টে গেছে কখনো? লীডাররা ফ্রন্টে যাবে তো অর্গানাইজ করবে কারা? তোমার মতো নতুন বাল-গজানো মস্তান? মানিক ভাইয়ের সামনে এসব চটাং চটাং কথা একবার উচ্চারণ করো তো দেখি?—গ্যাস লাইটার ফারুকের এ হাত ও হাত ঘোরে, কখনো ডানহাত খালি হয়, কখনো বাঁ হাত। কিন্তু জাফরকে চড় মারা আর হয়ে ওঠে না। এই সব নবজাগ্রত তরুণ মস্তানদের কিছু বলবার জো আছে? মানিক ভাই কাকে যে কার পেছনে লেলিয়ে রেখেছে, কেউ বলতে পারে না। সিগ্রেটে বড়ো বড়ো টান দিয়ে ফারুক খানিকটা সামলে নেয়। ঘরের বাইরে দক্ষিণ দিকের বারান্দা থেকে আসছে গোলাপের ছেঁড়া-ছেঁড়া গন্ধ; অবশ্য খুবই মৃদু, পাওয়া যায় কি যায় না। বারান্দার টবে ফুলগাছ পোষে কে? অমৃতলাল, না সমরজিৎ? সিগ্রেটের ধোঁয়ার সঙ্গে গোলাপের টুকরো বাইরে উড়াল দিলে ফারুক বলে, 'জনি ওয়াকার বলো আর ভ্যাট বলো আর ডিম্‌পল বলো,—শিভাজ রিগালের মতো কিছু হয় না।'

'শিভাজ রিগাল? নাম শুনছি খুব কোনোদিন চোখে দেখি নাই। ডি লাস্ক হুইস্কি, না?'

'দেখি, মানিক ভাইয়ের সেলার থেকে যদি ঝেড়ে দিতে পারি তো একদিন নিয়ে আসবো একটা।' বলতে বলতে ফারুক সোজাসুজি জাফরের মুখের দিকে তাকায়—নীল গ্লাস, চকোলেট রঙের পানীয় ও ঘোলাটে আলো ভেদ করে জাফরের মুখের কোনো রেখাই স্পষ্ট দ্যাখা যাচ্ছে না, তার ঠোঁটে ধরা রয়েছে গ্লাস, সে একটি দীর্ঘ চুমুক দিতে মগ্ন।

ময়লা জমে ভোঁতা-হয়ে-যাওয়া এককালের গোলাপী জিভটাকে ভালো করে ঝাঁকাবার জন্য সমরজিৎ হুইস্কির একটা পাতলা লেয়ার বিছিয়ে রাখে তার ওপর, প্রত্যেকটা ঢোক গেলার আগে ভালো করে ভিজিয়ে নিচ্ছে একবার। বাঙলা মদ গিলে গিলে জিভের ওপর শ্যাওলা জমে গেছে। স্কটল্যাণ্ডের তরল রোদ একেক বার গড়িয়ে যেতেই জিভ শুকিয়ে খটখটে হয়ে যাচ্ছে। পোড়া পোড়া গন্ধের সঙ্গে তেতো কষাটে স্বাদ ঠিক পৌঁছে যায় গলার খাঁজে। গলা থেকে পেটে পৌঁছবার আগে একটা টাল খায় বুক ও পেটের মাঝামাঝি এসে। এখন মনে হয়, জলের ভাগ নিচে পড়ে গেলো, নীট মালটা গলা পর্যন্ত এসে স্পিরিটের মতো ছড়িয়ে পড়লো শরীরের উর্ধ্বাংশে। এই সময় শরীরকে তার ভুলে যাওয়ার কথা, সমরজিৎ কিন্তু ভোলে না।

ফারুকের দিকেও তার মনোযোগ অখণ্ড।

'তুমি তো হালায় খাইতেও পারো!' এই সংক্ষিপ্ত স্তুতিতে ফারুক তার ডান পায়ের ওপর বাঁ পা রেখে একটু একটু নাচায়।

দ্বিতীয় পেগে চুমুক দিতে না দিতেই ইফতিখারের কণ্ঠে সংগঠিত ধ্বনি গুনগুন করে উঠলো। 'না কিসিকা আঁখ কা নূর হুঁ'—তার ভরাট গলা থেকে বাহাদুর শাহ্ জাফরের গান ফুটে বেরিয়ে সোজা উড়াল দেয় ওপরের দিকে এবং পারে তো

কড়িকাঠের ওপর থেকে সেতারের ১০০ বছরের লুকোনো ছেঁড়া ধ্বনি টেনে এনে বিঁধিয়ে দেয় সকলের বুকে ও পিঠে। সমরজিৎ বড়ো ছটফট করে। এই ছেঁড়া ছেঁড়া ধ্বনি হয়তো তার পায়ের পাতায় সুড়সুড়ি দিচ্ছে, দাঁড়াবার জন্য উঠতে গিয়ে সে ফের বসে পড়ে। ইফতিখারের স্বর এখন আরো স্পষ্ট ও স্বচ্ছ। সমরজিতের গ্লাসের হুইস্কির ওপর সেতারের টুংটাং নুড়ি ঝরে পড়ে কড়িকাঠ থেকে; তার আর উপায় থাকে না, সে সোজা উঠে দাঁড়ায়। প্রথম স্টেপ ফেললে বারান্দার রেলিঙ দ্যাখা যায়। আরেকটি স্টেপে টবে রাখা গোলাপগাছ এবং তৃতীয় স্টেপে পাশে গজিয়ে-ওঠা রোগা গাঁজার চারা চোখে পড়ে। এই দ্যাখা সাঙ্গ হলে হঠাৎ কি যেন তার মনে পড়েছে—শরীরের এই ভঙ্গি করে সে গিয়ে দাঁড়ায় দেওয়ালের বাঁদিক থেকে প্রথম শেলফের সামনে। শেলফ থেকে কাগজের দুটো প্যাকেট নিয়ে এসে টেবিলের ওপর রেখে দিলে একটা প্যাকেট আপনাআপনি খুলে গেলো। খোলা প্যাকেটে ঘোলাটে শাদা রঙের গোলগাল পনিরের অর্ধেকটা টুকরো। অন্যটা কাগজের ঠোঙা, খোলার আগেই বোঝা যায় ভেতরে চানাচুর কিংবা তেলে-ভাজা চিনেবাদাম। এদিকে ইফতিখারের স্বর কিংবা নির্বাসিত সম্রাটের আক্ষেপ কিম্বা কড়িকাঠ থেকে ঝরে পড়া সেতারের নেপথ্য আলাপের ভিড়ে সকলের শরীর ও করোটিতে ট্রাফিক জাম হওয়ায় রক্ত চলাচল বন্ধ। এই জাম কাটাবার জন্য কিম্বা দেশপ্রেম, কি অন্য কোনো আবেগে চাঙা হয়ে উঠে জাফর শিস দিতে শুরু করে, 'বাঙলার মাটি, বাঙলার জল।' এই গান ইদানীং এখানে খুব প্রচলিত। নইলে তার শিসের কল্যাণে এই সুর 'আরমান' কি 'দামান' ছবির গানের সুর বলে ভুল হতে পারতো। শিস দেওয়ায় সে একেবারেই পটু নয়, শিস দিতে গেলে ঠোঁট ব্যথা করে, ঠোঁটের ভেতরটাও শুকিয়ে যায়। কিন্তু ইফতিখারকে থামিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তার শান্তি নেই। ফারুক ভাইয়ের সঙ্গে কতো মক্কেলের যে লাইন! মাঝে মাঝে মনে হয়, এই পুরনো ঘিঞ্জি শহরের সবাইকে ফারুক ভাই চেনে। তার সঙ্গে এসব জায়গায় তিন পা হাঁটো তো থামতে হয় দু'বার। মানিক ভাই খুব এ্যাপ্রোপ্রিয়েট নাম দিয়েছে, 'টাউন সার্ভিস'। এই যে মাউড়া শালা সেঁটে রয়েছে জোঁকের মতো, সে কি এখন থেকে? বেলা ১২টার দিকে দ্যাখা, না,—তখনো ১২টা বাজেনি, ঠাঠারি বাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে শালা খুব উর্দু মারছিলো আরেক জাতভায়ের সঙ্গে। ফারুকভাই গ্যাঁক করে ব্রেক কষলো। এই যে যেখানে সেখানে গাড়ি থামানো, হুট করে নেমে পড়া, যখন তখন গলিতে তস্যগলিতে ঢুকে পড়া—এসবের কোনো মানে হয়? চারদিকে এনিমি। দেশ কি আর এতো সহজে শত্রুমুক্ত হয়? এতো সোজা? টার্মিনালে, ফুটপাশে, স্টেডিয়ামে, রেলস্টেশনে এতো লোক গিজগিজ করে, লজ্জা শরমের বালাই নেই, কাপড়চোপড়ের ধার ধারে না, এমন কি শালাদের গায়ের চামড়াও কি সিনথেটিক ফাইবারে তৈরি? —কি ট্রান্সপারেন্ট—শরীরের ভেতরের হাড়হাড়ডিও সব দ্যাখা যাচ্ছে। এরা সবাই সুবোধ দেশপ্রেমিক বাঙালি কে বললো?

'আরে ইফতেখার। তুম সালা জিন্দা হো?'

এই বাক্যের জবাবে তাকে জড়িয়ে ধরে ইফতিখার হো হো হাসতে শুরু করে। পানের পিকে তার মুখ ভর্তি, নিচের ঠোঁট উঁচু করে পিক সামলাতে হয় তাকে, সে পিকও ফ্যালে না, ফারুকের এই সামান্য রসিকতা কি এমনি সাদা প্রশ্নবোধক বাক্যে তার হাসিও থামে না। তারপর শুরু হয় তাদের অবিরাম কথাবার্তা। বেশ বোঝা যায়, তাদের বহু কালের খাতির, দু'জনের মুখে নতুন রাস্তার নাম, লোকজনের নাম, রেস্টুরেন্টের নাম শুনতে শুনতে জাফরের মাথা ধরে যায়, এর মধ্যে ওর সেই জাতভাই কেটে পড়ায় ইফতিখারও এখন ফারুক ভাইয়ের গাড়িতে। ব্যাটা কাজ করতো ব্যাঙ্কে, স্বাধীনতার পর কয়েকটা দিন গা ঢাকা দিয়েছিলো, চাকরিটা সুতরাং নট। মীরপুরে বাড়ি করেছে কয়েক বছর হলো সেখানে বড়োভাই থাকতো, বাড়ি এখন অন্য লোকের দখলে। মানিক ভাইকে ধরে ফারুক যদি বাড়িটা উদ্ধার করে দেয় তো সেটা ভাড়া দিয়েও পেটটা চলে। পাখা ইস্ত্রি চেয়ার টেবিল খাট পালং সব বিক্রী হয়ে গেছে। আজ রেফ্রিজারেটর বিক্রি করেছে শুনে ফারুক বলে, 'ফ্রিজ কাঁহা সে মিলা থা দোস্ত? খোদ তুম কবজা কিয়া আওর কোই কর্ণেল সাব তোহফা ভেজা থা?' ইফতিখার মাতৃভাষা বলবে না কিছুতেই, 'কি যে রং কোরো দোস্ত! ফ্রিজ আমার বোড়োভাই কিনেছিলো সিক্সটি এইটে।' ফারুক ভাইও চালু কম নয়। ফ্রিজ বিক্রী করেছে শুনে ইফতিখারকে আর ছাড়তে চায় না। ফ্রিজের অর্ধেক টাকা তো খসালো ফারুক ভাই। পূর্বাণীতে বিয়ার। পূর্বাণীতেই ফারুক বলে, 'লাঞ্চ কাঁহা করোগে?' ইফতিখার তো সদা প্রস্তুত, 'কোথায় যাবে? দিল্লী মুসলিম চলো। ওদের পুরানো বাওর্চি ফিরে এসেছে, ফার্স্ট ক্লাস বিরিয়ানি চলবে, চলো!' কিন্তু ফারুক ভাই ওমুখো হয় না, গাড়ি থামায় ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে। কন্টিতে হেভি লাঞ্চ, লাঞ্চের আগে লাইম জিন। ওখান থেকে বেরিয়ে গাড়িতে পেট্রল নেওয়া—সেও ইফতিখারের পয়সায়। তবু ফারুক যদি মানিক ভাইকে বলে মীরপুরের বাড়িটা উদ্ধার করে দেয়। ওর বড়ো ভাইয়ের হার্ডওয়ারের দোকান ছিলো নবাবপুরে, দোকান সীল করে দিয়ে গেছে, ওটা যদি ঠিকঠাক করা যায়, ইফতিখারের ব্যাঙ্কের কাজও যদি ফের মেলে তো বেঁচে থাকা যাবে। মানিক ভাই পর্যন্ত না গেলেও চলে ফারুকের। খবরের কাগজ খুললেই তো ফারুকের নাম, ফারুকই বা কম কিসে? কিন্তু ফারুক ভাই এসব কথায় তেমন পাত্তাই দেয় না, কোনো রকম কথা দেওয়ার মধ্যে সে নেই, ফারুক ভাই অতো কাঁচা ছেলে নয়। বায়তুল মোকাররমে নেমে সবাই মিলে কোকাকোলা খাওয়া হলো, সেই একবারই পয়সা ছাড়লো ফারুক। ইফতিখার দামী একটা টাই কিনে দিলো ফারুককে। এমন কি গুলিস্তানের সামনে এক শেডী ক্যারেক্টারের কাছ থেকে এ্যাকশনের ছবি ভরা বিদেশী পর্ণোগ্রাফী কিনলো পঁয়ষট্টি টাকায়—সেও ইফতিখারের ওপর। জাফরের এসব ভালো লাগে না। রঙবাজি করে আর কতোদিন? চারদিকে খালি শত্রু, যেখানে যাও একটা না একটা ঘাপলা। অথচ কোনো সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবে না এরা, এদিকে ওয়ার্কিং কমিটিতে ঢোকার

জন্য সব অস্থির। এতো বড়ো একটা ওলটপালট ঘটে গেলো, এদের কোনো চৈতন্যোদয় হলো? আড্ডা দিতে শুরু করলো তো পার্টি, কাজের কথা একেবারে ভুলে গেলো। জাফর তাই সমরজিতের সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা মনে করিয়ে দেয়, 'আপনার ফ্রেণ্ড সমর দাসকে তখন ফোন করলেন, যাবেন না?'

'সমর দাস না, সমরজিৎ, সমরজিৎ রায় চৌধুরী।' ফারুক তার বন্ধুর নাম সংশোধন করে দেয়, তারপর ইফতিখারকে বলে, 'চলো সমরজিতের বাড়ি চলো, যাবে?' এ শালা তা হলে সমরজিতেরও বন্ধু, খসে পড়ার আর কোন সম্ভাবনাই রইলো না।

কিন্তু একটা লোক এতক্ষণ ধরে ঝুলে থাকলে কাঁহাতক আর সহ্য করা যায়? সুতরাং আরো তীব্র শব্দ করে শিস দেওয়া ছাড়া জাফরের কোনো উপায় থাকে না। তার অম্ল শিসের এলোপাথাড়ি চড় থাপ্পড়ে গজলের মগ্নস্বর, ধমক খাওয়া শিশুর মতো, কি আর করে, ঘরের কড়িবর্গা ও দেওয়ালের ঝরে পড়া চুন সুরকিতে সেতারের টুটাফাটা বোল খুঁটে বেড়ানো ছেড়ে ইফতিখারের গলার চাপা গলি দিয়ে টলতে টলতে ফিরে যায় উল্টো দিকে এবং শেষ পর্যন্ত মুখ গুঁজে পড়ে থাকে তার পাকস্থলি কি তলপেটের জলকাদাময় নিভৃত কোণে। সেই শিশুকে ঘুম পাড়ানো দরকার। ইফতিখার তাই একটু ঝুঁকে জংধরা ছুরি দিয়ে পনিরের এবড়োখেবড়ো স্লাইস করে। তারপর একাই পুরু দুটো স্লাইস মুখে দিয়ে লম্বা এক চুমুকে গ্লাসের মদ শেষ করে ফেলে। সমরজিতের হাতেও পনিরের স্লাইস। চানাচুরের ঠোঙায় জাফরের ডান হাতের দুটো আঙুল চিনেবাদাম খোঁজে। ফারুক এসব স্পর্শও করে না। হঠাৎ করে সে বলে, 'আচ্ছা সমরজিৎ, ঐটার কি করলে?' প্রশ্নবোধক মুখে সমরজিৎ তাকালে ফারুক হাসে, 'ঐ যে তোমাদের পাড়ার ছেলেদের একটা আবদার ছিলো।' এখন সমরজিতের মুখে কোনো প্রশ্নবোধক চিহ্ন নেই। তার কপালের পাশে একটা রগ একটু টানটান হয় এবং সে এদিক ওদিক দ্যাখে। ফারুকের আঙুলে পনিরের একটি ভগ্নাংশ। 'আমাদের ছেলেরা তোমার বাবার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছিলো। উনি বোধ হয়, বোধ হয়, আই মিন আমাদের পারপাজটা ঠিক ধরতে পারেন নি।'

এই পর্যন্ত বলে সে ফের গ্লাসে চুমুক দেয়। পনিরের পাতলা টুকরো তার আঙুলের ফাঁকে নড়াচড়া করে, কখন যে মুখে উঠবে?

'না বাবায় তো ভাড়া দিতে চায় না, আমারেও কইছে, দিবো না।' সমরজিৎ কথা বললে পনিরের ভগ্নাংশ অবশেষে ফারুকের জিভে প্রতিষ্ঠিত হয়।

'তোমাদের এতো বড়ো বাড়ি, এখন লোক বলতে তো তুমি আর তোমার বাবা। বাড়িটা খালি পড়ে আছে, ধরো টাকা পয়সাও তো তোমাদের দরকার।'

'আমার কাকা, কাকীমা, কাকার দুই পোলা, জ্যাঠাইমা'—

'আমি জানি তো', ফারুক থামিয়ে দেওয়ায় সমরজিতের তালিকা আর দীর্ঘ হতে পারে না, 'তোমার কাকা না সিক্সটি ফোরে চলে গিয়েছিলো, আবার ফিরে এসেছে?'

'না সিক্সটি ফোরে কৈ গেলো? গেছিলো আমাগো লগেই। সিক্সটি ফোরে আমাগো বাড়ির কেউ যায় নাই। কিছু ভাগছে ফিফটিতে, আরগুলিতো রইয়াই গেলো।'

'আরে জানি তো। কাগজীটোলার খবর আমি জানি না?' ফারুক একটু বিরক্ত হলো।

'এখন এই এরিয়ার স্পোকসম্যান প্র্যাকটিকালি ফারুক ভাই একাই। পার্টি মিটিঙে সবসময় খালি ওল্ড সিটির কথা বলে।' শিস দিয়ে ইফতিখারের গজল বন্ধ করার পর জাফর এই প্রথম মুখ খুললো। তার মন্তব্য সম্পূর্ণ করতে দিয়ে ফারুক বলে, 'তোমার কাকারা না ঐদিকে থাকে?'

'অখন আর ক্যামনে থাকে? ঐদিকটায় চিড় ধরছে একটা। বিল্ডিঙের একদিকের ইটাউটা খুইলা হালারা কিছু রাখছে? বিল্ডিঙ হালায় কখন পড়ে কখন পড়ে!' সমরজিতের কথার তোড়ে ফারুকের মুখ গম্ভীর। মুখের চামড়ায় বোধহয় টান পড়েছে কোথাও, রগটগ সব আড়ষ্ট, সে নিজেই বোতল থেকে মদ ঢালে।

'এইবার আইসা তো এইবাড়িতে উঠতে পারি নাই। আট নয়টা মাস বাড়ির কিছু রাখছে নাকি? মারে আনলাম না, ঠাকুরমারে আনলাম না,—বাড়ির কি হাল হইছে না দেইখা ক্যামনে আনি? আমরাও তো এইবার আইসা একটা মাস থাকলাম গ্যাণ্ডারিয়া প্রবীরগো বাড়ি। প্রবীরগো বাড়ি থাইকা—'

'প্রবীরকে আসতে বললে না কেন? প্রবীর শালা থাকলে খুব জমে।'

'প্রবীর তো কলকাতায়।'

'কবে গেছে?'

'প্রবীর তো ইণ্ডিয়া গেলো গোলমালের পিরিওডে', ইফতিখার চাঙা হয়ে উঠলো, প্রবীরের কলকাতা-গমনে সে বেশ সুখী, বসেছে ঋজু হয়ে, একটু জড়িয়ে গেলেও তার প্রত্যেকটি শব্দ স্পষ্ট, 'এরপর কি আর ফিরে এসেছে?' সে নিজেই ফের এই প্রশ্নের জবাব দেয়, 'না, আর ফেরেনি।' ফারুকের মোটা ও কালচে ঠোঁটের কোণে হাসির একটি কুচি খেলে যায় এবং খুক করে আওয়াজ করে সমরজিতের করোটিতে সে একটি টোকা দেয়।

'কলকাতা থেকে আসবে কবে?'

'অকুপেশন পিরিওডে চাকরি পাইছিলো কর্পোরেশনে', সমরজিৎ একটু নুয়ে পড়ে, 'লিবারেশনের পর ফেরে নাই।'

'চাকরির খবর তো জানতাম। স্বাধীনতার পর সবাই ফিরে এলো। যারা অনেক আগে গিয়েছিলো তারাই এলো, আর প্রবীর তো গেলো সেভেনটি ওয়ানে।' ফারুক কথা বলছে আর সমরজিতের মাথায় ট্রাফিক জাম হয়ে পড়ায় ঘরের গন্ধ ও আয়তন ক্রমেই চাপা হয়ে আসছে। মাথায় হাওয়া খেলবার মতো স্পেস নেই। তার আশা ঃ গ্লাসে বেশি করে জল দিই তো মাথার জামটা কাটে।

'বাঙলাদেশের জন্যে সকলের ফিলিং তো আর জেনুইন না।' এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবার সময় কণ্ঠ থেকে ক্রোধ ছেঁকে ফেলবার জন্য জাফরের কোনো

চেষ্টাই নেই, 'ইণ্ডিয়া গেলো প্রাণ বাঁচাতে, চাকরি পেলো তো দেশের পাছায় লাথি দিয়ে বিদেশেই থেকে গেলো। আবার এদিকে দ্যাখো, আরেক দল পাকিস্তানে টাকা-পয়সা সোনা-দানা সব পার করে দিয়ে ওয়েট করছে, কবে রেডক্রসের ক্লিয়ারেন্স আসে।' গলার তেজটা ঝরে পড়লে এমনি সাদা কণ্ঠে বলে, 'কিছু মনে করবেন না সমরদা। চারদিকে এনিমি। আমরা করবো কি? মানিকভাই সব সময় বলে, পার্জিং দরকার, পার্জিং!'

ইফতিখারের দুটো চোখই পড়ে থাকে বোতলের সোনালি বর্ডার দেওয়া লাল লেবেলে। বোতল আস্তে আস্তে ঝাপশা হচ্ছে। ফারুক একটু হাসে, 'ইফতেখারের এসব প্রব্লেম নেই। কি দোস্ত? তুমি তো শালা হাফ বাঙালি হয়ে গেছো!'

কিন্তু জাফরের লক্ষ পূর্ণতার দিকে, 'উই নীড সেন্ট পার্সেন্ট বেঙ্গলীজ।' কেবল বাঙলা শিখলেই চলবে? না নিজের মাতৃভাষা ভুলে যেতে হবে?—পূর্ণ বাঙালি হওয়ার নিয়ম-কানুন জেনে নেওয়ার জন্য ইফতিখার উদগ্রীব হলো। কিন্তু এই কথাটা কিভাবে জেনে নেওয়া যায়—এই ভাবতে না ভাবতে ফারুক তাড়া দেওয়ার ভঙ্গিতে সোজা হয়ে বসে, 'না দোস্ত। আমাদের একটু কুইক করতে হয়। ফরেন পার্টির সঙ্গে ডীল, খুব টপ লোকের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে মানিক ভাই এ্যারেঞ্জ করে দিলো। এদিক ওদিক হলে মানিক ভাই টলারেট করবে না।' সমরজিতের বড়ো ইচ্ছা করে, যাই না, বারান্দায় গিয়ে একটু দাঁড়াই! 'তো তুমি কি ডিসাইড করলে? তোমাদের বাড়িটা আমাদের দরকার।' কিন্তু বারান্দায় দাঁড়াবার জন্য সমরজিৎ উসখুস করে।

দক্ষিণের এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিচে তাকালে চোখে পড়ে ইট-পাটকেলের ছড়ানো স্তূপ। এককালে ওর ঠাকুরদার নাটমন্দির ছিলো এখানে। সমরজিতের ছেলেবেলাতেও পূজার সময় গলির এমাথা ওমাথা জুড়ে মেলা বসে যেতো। চামারটুলির ঐ কোণের দোতলা বাড়ি থেকে আসতো যমুনাবালা, বছরে ঐ একবারই এই বাড়ির একেবারে ভেতরে ঢোকবার অধিকার ছিলো তার। সন্তোষ কাকা ছিলো যমুনাবালার লোক, ছেলেবেলায় কতবেল কি বিলেতি আমড়া চুরি করতে সমরজিৎ কখনো কখনো ওদের বাড়িতে গিয়েছে। যমুনাবালা তাকে দেখতে পেলে বরং ডেকে ঘরে বসতে দিতো। অপরিচিত গন্ধে ঝাপশা-হয়ে-আসা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা সেই ঘরে কার্পেটের আসনে বসে দুধমুড়ির ফলার খেতে খেতে সমরজিৎ যমুনাবালার মুখে কত গল্প শুনেছে। সন্তোষ কাকার গল্প, তাদের পূর্বপুরুষের গল্প। মা জানতে পারলে রাগ করতো, কিন্তু ঠাকুরমা কোনোদিন কিছু বলেনি। ঠাকুরমা কতো বড়ো ঘরের মেয়ে, ভাগ্যকূলের কত মানী লোক ওরা। ঠাকুরদার বাবা ঠাকুরদার বিয়ের সময় সমস্ত ঢাকা শহর মাৎ করে দিয়েছিলো। এমন কি নবাব বাহাদুরও কিছুক্ষণের জন্য এসে একগ্লাস সিদ্ধির সরবত খেয়ে যায়।

'ছেলেরা কি বলেছে তোমার বাবা ঠিক বুঝতে পারেননি। একটু বেয়াদবী হয়তো করেছিলো, তা উনি তো বকেই দিয়েছেন। ঠিকই তো, গুরুজনদের সঙ্গে বেয়াদবী করবে কেন?'

'বেয়াদবী করলো কে?' জাফর খুব তীব্র কণ্ঠে ফারুকের প্রতিবাদ করে, 'উনিই তো খুব মেজাজ করছিলেন। ফর নাথিং মেজাজ করার মানে কি?—আমার বাড়ি আমার বসতবাড়ি ছাড়বো কেন? যারে তারে বাড়ির মইদ্যে ঢুকতে দিমু ক্যান?'—শেষের দিকে সে অমৃতলালের—বাচনভঙ্গি পর্যন্ত ভ্যাংচাতে চেষ্টা করে।

'আঃ! চুপ করো না!'

জাফরকে ধমক দিয়ে ফারুক সমরজিৎকে বোঝায়, 'আরে ছেলেদের কথা ছাড়ো। যে ছেলেরা তোমার বাবার কাছে এসেছিলো অল অফ দেম আর ভেরি নাইস বয়েজ। আমার পাড়ারই ছেলে সব। আজকালকার ছেলে, আমাদের সঙ্গে ঠিক কম্যুনিকেশন হয় না, আর এ তো বুড়ো মানুষের ব্যাপার, জেনারেশন গ্যাপ।' সমরজিতের মুখের দিকে দীর্ঘ একটা দৃষ্টি ছেড়ে সে বলে, 'নিচের তলাটা দিয়ে দাও দোস্ত। তোমার বাবা একা থাকেন, তুমি থাকো অফিসে, কখন কি হয়, দিয়ে দাও!'

যমুনাবালা, চামারটুলির বড়োবাড়ি, ছোটোবাড়ি, সন্তোষকাকা—ডান হাতে সবাইকে ঠেলে দিয়ে বাঁহাতে সমরজিৎ নিজের মাথা চুলকায়, 'বাবায় এক্কেরে রাজী হইতে চায় না। মায়ে আইসা পড়বো, ঠাকুমায় আইবো, আমার ছোটোবোনটা ম্যাট্রিক পাশ করছে গোলমালের আগে, অরে কলেজে ভর্তি করতে হইবো,—সকলে তো বাড়িতেই থাকবো, ক্যামনে ভাড়া দেই কও?'

জাফরের পক্ষে মেজাজ ঠিক রাখা ক্রমেই কষ্টকর হচ্ছে। খুব সাধারণ একটা জিনিষ বুঝতে এদের এতো সময় লাগে কেন?

'তখন দ্যাখা যাবে। আপনাদের বাড়িতে অফিস করতে পারলে কাগজীটোলা, সূত্রাপুর, বাঙলাবাজার, ওদিকে ফরাশগঞ্জ শ্যামবাজার—হোল এরিয়াটা কনট্রোল করা যাবে। প্রব্লেমটা বুঝতে পারছেন না কেন?'

ওদের সমস্যা সে অনুধাবন করতে পেরেছে—এই রকম ভঙ্গি করে সমরজিৎ ঘাড় নাড়ে, 'বুঝলাম, কিন্তু—!'

'শুধু নিজের নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন না। নিউ সিটির জন্য আমরা কেয়ার করি না, বাড়ি চাইলেই পাওয়া যায়, আমরা ভাড়া যা দেবো অতো টাকা আর কে দিতে পারবে? ট্রাবল আপনাদের এইসব রটন এরিয়ায়। ব্যাক ডেটেড সব ফালতু ভ্যালুজ নিয়ে এখনো ডাঁট মারে।' জাফরের বাচনভঙ্গিতে ফারুকের সামনে ভেসে ওঠে মানিক ভাই। সুতরাং তার বুকের বাঁ কোণটা একটু জ্বলে। ঠোঁটের সঙ্গে গ্লাস চেপে ধরলে নাকটা ঢুকে পড়ে গ্লাসের গর্তে। দীর্ঘ ও প্রবল এক চুমুকে তার গ্লাসের তলানিটুকুও শেষ হয়ে যায়।

'তুমি বোধহয় ভয় পাচ্ছো, না? ছোকরারা এসে ঝালেমা করতে পারে, এইতো?'

'না, ঠিক ভয় না, ঠিক—।'

'এনিওয়ে' ফারুক বসে পড়লো একেবারে সোজা হয়ে, 'আমাদের তো আর রাজনৈতিক সংগঠন নয়, আমাদের ভয় পাওয়ার কি আছে? আমাদের পিওর উউথ

ফ্রন্ট, আমরা মন্ত্রিত্ব চাই না. এমন কি উই রিফিউজ এ সীট ইন দ্য পার্লামেন্ট। আমরা শুধু দেখবো সাব ভারসিভ এলিমেন্টস বিপ্লবের নাম করে কিংবা গভর্মেন্টের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দেশকে ধ্বংস করতে না পারে। নট ওনলি দ্যাট, আমরা এ্যালার্ট থাকবো যাতে কোরাপ্ট লোকজন আমাদের ন্যাশনাল অর্গানাইজেশনে ঢুকে রেইন করতে না পারে। একজনের কেরিশমার চান্স নিয়ে দশজনে লুটে পুটে না খায়।' এই পর্যন্ত বলে আড়চোখে সে জাফরকে দ্যাখে।—না, জাফরের মুখে অভিনন্দনসূচক কোনো অনুমোদন নেই। কিন্তু ফারুকের ফ্লো বন্ধ করা এখানে অসম্ভব। সে তার বক্তৃতার উপসংহার টানে, 'মানিক ভাই আমাদের ইয়াং জেনারেশনের আনলিমিটেড এনার্জিকে ঠিকভাবে চ্যানেলাইজ করতে চায়। তোমরা যদি কো-অপারেট না করো— ।' এই সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা ও কর্তব্যপালনজনিত অবসাদ ও সুখে তার নিশ্বাস এখন দ্রুত ও দীর্ঘ। তার হুইস্কি ঢালার হাতও বেশ ক্লান্ত।

গলা খাঁকারি দিয়ে বারান্দায় এসে রেলিঙ ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে ইফতিখার। এক পেগ পেটে গেলে সে শুরু করেছিলো বাহাদুর শাহ্ জাফরের গজল। এটাই তার নিয়ম। অনেক আগে সে শুরু করতো নওশাদকে দিয়ে, মাঝখানে মেহদী হাসান ছিলো ওর সবচেয়ে প্রিয়। কিন্তু শুরু যাকে দিয়েই হোক না, 'দো গজ জমিন ভি না মিলা কোয়ে ইয়ার মে'—বাহাদুর শাহ্ জাফরের এই জায়গায় পৌঁছলে সে বেশ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করবে। দু'তিন পশলা কাঁদবার পর চোখের নোনা ভাবটা কেটে গেলে স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে সে সবাইকে দেখবে এবং একটু পর শুরু হবে তার অবিরাম স্মৃতিচারণ, খুব জোরে ধমক দিয়ে থামিয়ে না-দেওয়া পর্যন্ত এরকমই চলবে। কিন্তু আজ সে একেবারে চুপ। তার কোন শৈশবে দ্যাখা কি কোনোদিন না-দ্যাখা লক্ষ্ণৌ শহর; লক্ষ্ণৌ শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে বারবাঙ্কভা গ্রাম; তাদের গ্রামের অতুল ঐশ্বর্য, তার পরিত্যক্ত ধনসম্পদের পরস্পরবিরোধী হিসাব দাখিল; দিল্লী লাহোর—এবং নেশা আরো ভালো জমলে লণ্ডন-প্যারিসে বসবাসকারী তার এম. এসসি ও পিএইচ. ডি করা ভাইবোনদের রূপগুণের দীর্ঘ তালিকা প্রকাশ; কোনো কোনোদিন নবাব ইসমাইল বা চৌধুরী খালিকুজ্জামান এবং আরো ঘন মুডে থাকলে নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের সঙ্গে নিজেদের আত্মীয়তা স্থাপন; ছেলেবেলায় তার বীরত্ব ও মেধায় মুগ্ধ রূপসীদের অস্থিরচিত্তের দীর্ঘ বিবরণ—সবরকম বাখোয়াজি এখন তার বন্ধ। তার মাথাটা নিচের দিকে ঝুলছে; নিচে দাঁড়িয়ে ওপরের এই বারান্দার দিকে তাকিয়ে তাকে দেখলে মনে হবে, মন খারাপ করে নিজেকে সে প্রত্যাহার করে নিতে চাইছে, কিন্তু প্রত্যাহার করবার পদ্ধতি কি, প্রত্যাহার করতে হবে কেন—এইসব ব্যাপারে তার স্পষ্ট কি অস্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। এইসব জটিলতা ছাড়াও মনে মনে সে ভয়ানক আফসোস করে ঃ কতোকাল পর স্কচ হুইস্কি পাওয়া গেলো, সঙ্গে দু'জন বন্ধুও আছে, অথচ কোনো কাজেই লাগলো না। তার গলায় পড়ে পাহাড়ী

শিশির, ফোঁটায় ফোঁটায় নয়, একেকটা ঢোঁকে ঢল নামে, কিন্তু বুকে পড়তে না পড়তে সবটা শুকিয়ে খটখটে হয়ে যাচ্ছে। আজকাল তার গলায় ও বুকে এক ধরনের কাশি লেগেই থাকে। শুকনো কাশি, অনেকক্ষণ ধরে গলা খাঁকারি দিলে ব্যাণ্ডেজের তুলোর ছেঁড়া টুকরোর মতো কফ বেরিয়ে আসে। হায়রে, এই শুকনো গলা ও ব্যাণ্ডেজের তুলো-তুলো কফ কি পাহাড়ী শিশির বিন্দু সব একেবারে শুষে নিলো?

'উঠি সমরজিৎ।' ফারুক এবার সত্যি সত্যি উঠে দাঁড়ায়, 'তুমি ভেবে দ্যাখো। এসব ব্যাপারে কো-অপারেট না করা'—

'সাবভারসিভ। যেখানে আপনার সুযোগ আছে, আপনি দেশের ন্যাশনাল ইউথ অর্গানাইজেশনকে হেল্প না করে বরং অপোজ করছেন কেন? আপনি আমাদের কমপেল করছেন টু টেক—।'

মেঝের দিকে তাকিয়ে সমরজিৎ জাফরের উত্তেজিত বাক্যের জবাব দেয়, 'না, না, অপোজ করার প্রশ্নই উঠতে পারে না—।'

ফারুক বলে, 'এনিওয়ে, জাফর একদিক থেকে রাইট। ধরো আমি না হয় তোমাদের ভালো করে চিনি। অকুপেশন পিরিওডে তোমাদের সাফারিঙের কথাও তো জানি। মেশিনগানের গুলির নিচ দিয়ে পালানো—ওঃ হরিবল্! কিন্তু—।'

ফারুকের কথা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই সমরজিতের শরীরের রক্ত উজান উঠে বসে তার করোটির ছাদে, ছাদের বীমে এবং মেঘ হয়ে কিছুক্ষণ থমকে থেকে অবশেষে বৃষ্টিপাত শুরু করে। এই বৃষ্টির উৎস করোটির মেঘ, করোটির মেঘের উৎস তার শরীরের রক্ত। সুতরাং বর্ষণের রঙও লাল, অবিরাম লাল বৃষ্টিপাত চোখের সামনে একটি সীমাহীন জলপর্দা টাঙিয়ে দেয়। পর্দায় দ্যাখা যায়, হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে সমরজিৎও পালিয়ে যাচ্ছে। ঢাকা থেকে পালিয়ে প্রথমে কমলাঘাটের কাছে এক গ্রাম, শটি বাড়ি। প্রথম কয়েকটা দিন কাটলো কানাই ঘোষের পেঁয়াজ, রসুন ও শুকনো লঙ্কার আড়ত আছে, সেখানে। তারপর জামদিয়ার আরব আলী সিকদারের বাড়ি। ঢাকা থেকে বেরিয়ে এতো লোকজনের সঙ্গে এঘাট ওঘাট করা,—নৌকায়, হেঁটে, রিকশায় করে কমলাঘাট যাওয়া—কোনো কিছুর রূপ দ্যাখা যায় না, যদিও পর্দায় প্রত্যেকটি পদক্ষেপই স্পষ্ট। কেবল বৃষ্টি, বৃষ্টির বিশাল পর্দা। কিন্তু মনে তো আছে সবই। সবাইকে নিয়ে রামচন্দ্রপুরের লঞ্চে ওঠা, হিন্দু যাত্রী বহন করতে সারেঙের ক্রমাগত 'না না', জ্যাঠাইমার কাছ থেকে দেড় ভরি সোনার বালা নিয়ে সারেঙকে ঘুষ দেওয়া, অলঙ্কারশোকে জ্যাঠাইমার ইনিয়ে বিনিয়ে কান্না; তিন মাইল যাওয়ার পর বাঁদিকের কাটাখালে সেনাবাহিনীর গানবোট চলে গেলো পশ্চিমদিকে, সাত আট মাইল পর নদীর দক্ষিণ পাড় জুড়ে দগ্ধ জনপদ, ঝলসানো গাছপালা, নদীতে গুলি-বিদ্ধ ফেঁটে-ওঠা লাশদের জলকেলি—সব মনে আছে। কিন্তু হলে কি হবে, বৃষ্টির ঘন পর্দায় সব ছায়া ফ্যালে সিল্যুয়েটের মতো। কানের পাতলা পর্দায় ঢাকের

মতো বাজে কেবল ঝড়ের মধ্যে প্রবল বৃষ্টিপাত। সন্ধ্যার দিকে রামচন্দ্রপুর পৌঁছবার কথা। কিন্তু তার আগেই লঞ্চের টিকেট মাস্টার এসে অমৃতলালকে আস্তে আস্তে জিগ্যেস করে, 'কর্তা, যাইবেন তো হেইপার, না?' কর্তা কোনো কথা না বললে তার দাড়ি-না-কামানো মুখ প্রবলভাবে কাঁপতে শুরু করে।

সমরজিৎ বলে, 'আর কৈ?'

'তে আপাগো এট্টা কথা কই।' টিকেট মাস্টারের হলদে-দাঁতে-গিজ-গিজ-করা মুখ এখন সমরজিতের মুখের কাছে, 'রামচন্দ্রপুর নাইমেন না।'

'ক্যান?'

'আরে কইলাম তো গোয়ালঘুর্ণী নাইমা পইড়েন!'

গোয়ালঘুর্ণীর টিকেট দিয়ে লোকটা অন্যদিকে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর খুচরো পয়সা ফেরত দিতে এসে সে ফিসফিস করে, 'আসাদুল্লারে দেখছেন? লঞ্চে উঠছে, দেখছেন?'

'হ দেখছি।'

'অরে চিনেন না?'

'চিনি না? মহল্লার মানুষ, চিনুম না?'

'আমিও তো আপনাগো মহল্লার মানুষ আছিলাম', টিকেট মাস্টারের গলা একটু চড়া, 'আমারে চিনছেন?'

লোকটা তাদের পাড়ায় রেশনের দোকানে ক্যাশ-মেমো লিখতো, সমরজিৎ ঠিকই চিনেছে! সে কথা বলে আর লাভ কি?

লোকটা তার গলা একেবারে খাদে নিয়ে আসে, 'আসাদুল্লায় রামচন্দ্রপুর যায়। আগরতলার পাসিঞ্জারগো লুট করনের তালে আছে, বুঝলেন? আপনারা গোয়ালঘুর্ণী নাইমেন, রাইতটা কাটাইয়া দিয়া বিয়ানে উইঠা যাত্রা কইরেন, ঐদিকেও বর্ডার আছে, দুই চাইর মাইল বেশি হাঁটতে হইতে পারে।'

কিন্তু গোয়ালঘুর্ণী ঘাটে নামতে না নামতেই মেঘ করে এলো। সমরজিৎরা এতগুলো লোক এখন যায় কোথায়? সমরজিৎ নিজে, তার ঠাকুরমা, সমরজিতের বাবা, মা, বিধবা জ্যাঠাইমা, সধবা কাকীমা, সদ্য টাইফয়েড-ফেরত মেজকাকা, সেজকাকার তিন ছেলে, দুই মেয়ে ও এক জামাই,—জামাইটা গাধা, ঠিকমতো কথা বলতে পারে না, তোতলায়, অথচ বিয়ে করলো বিশটি হাজার টাকা নিয়ে—সমরজিতের নিজের বোন দুটো, কলকাতাবাসী মেজদির বিধবা শাশুড়ি ও সেই শাশুড়ির মেয়ে—রঙ চাপা হলেও ফিগার ভালো,—পিসীমার এক ননদ—সেই ননদ ছিলো বিধবা পিসীমার একমাত্র সঙ্গী, এবং পিসীমার মৃত্যুর পর তার যাবতীয় অলঙ্কারের মালিক—কলকাতাবাসী বড়দার সম্বন্ধী মশায়ের উন্মাদ স্ত্রী—এদের কোনো ছেলেমেয়ে নেই,—সমরজিতের বাড়ির কাজের মেয়ে জগতের মা,—এতগুলো লোক এখন যায় কোথায়? কেবলি ফুলতে-থাকা পোয়াতী মেঘের নিচে হাঁটতে হাঁটতে যদিও বাড়ি একটা পাওয়া গেলো,—পাকা বাড়ি, গ্রামের

সবচেয়ে বড়োলোকের বাড়িই হবে,—তো কোনো লাভ হলো না। বাড়ির লোকদের বড়ো ভয়, 'না বাবা, আমাগো মাফ করতে হইবো। খবর পাইছি আমরা, এদিকে মিলিটারী আইছে। দশ বারোদিন আগে গাঙের হেইপার চাইর পাঁচখান গাঁও জ্বলাইয়া খাক করছে, একখান পোকও যদি বাদ রাখছে! হেই উত্তরে যান, হাইস্কুলের লাল বিল্ডিং আছে, আপনাগো ব্যাকটির ইন্থান হইবো।' ঐ বাড়ির একজন বুড়োমানুষ সান্তনা দেয়, 'আরে ডরান ক্যান? এই ম্যাগে পানি আইবো না।' সবাই মিলে সামনের দিকে কয়েক পা ফেলেছে এমন সময় ব্রহ্মাণ্ড তোলপাড় করে মোটা স্বরে গর্জে উঠলো বিদ্যুৎ। আকাশের এমাথা ওমাথা জুড়ে দীপ্ত শিখায় জ্বলে উঠলো চরাচর। সেই সঙ্গে অনেক লোকের সমবেত চিৎকার। এ গ্রাম, ও গ্রাম, নদী, মাঠ—সব জায়গায় ফেটে ওঠে মানুষের কণ্ঠে অর্থহীন উদ্দাম উচ্চধ্বনি; যেদিকেই কান পাতা যায়, কেবল অবিন্যস্ত এলোমেলো শব্দমালা। এক পলকের জন্য মনে হতে পারে যে বিদ্যুতের হুঙ্কারে এই অঞ্চল বোধহয় এইভাবে সাড়া দিচ্ছে। কিন্তু আসলে নদীর উল্টোদিকে আরো দুটো ঘাট পেছনে মথুরাপাড়ায় তখন সেনাবাহিনীর গানবোট ভিড়েছে। কি গুলির শব্দ, কি মানুষের চিৎকার—বাতাসে ছেঁকে আসতে আসতে সবই পরিণত হয় ভয়-দ্যাখানো ধ্বনিতে। আর বৃষ্টি নামে বড়ো বড়ো ফোঁটায়, আর সেই সঙ্গে প্রচণ্ড বেগে বাতাস। গজগজ করতে করতে ঠাকুরমা তবু যাহোক হাঁটছিলো, এখন তার হাঁটাও বন্ধ। তাকে এখন ধরে কে? অমৃতলালের হাতে চামড়ার ব্যাগ, ব্যাগে অমৃতলালের ঠাকুরদার উইল, বাড়ি ও সম্পত্তির দলিল দস্তাবেজ,—হাত খালি করার জন্য সেটা তো আর কারো হাতে দেওয়া যায় না। কাকীমার কোমরের কোনো এক নির্ভৃত কোণে গোঁজা রয়েছে তার সমস্ত গয়নাগাটি, তার একটা হাত সবসময়ই রেখে দিতে হয় কোমরেই, কাকীমা ঠাকুরমাকে আর ধরে কি করে? জ্যাঠাইমার হাতে, মার হাতে নিজের নিজের পুঁটিলি। সকলেরই হাত জোড়া। সুতরাং সমরজিৎ কি আর করে, বড়দার সম্বন্ধীর হাতে বাক্সটা তুলে দিয়ে পাঁজাকোলা করে তুলে নেয় ঠাকুরমাকে। তবে ঠাকুরমার যতো দোষই থাক, বুড়ির ওজন খুব হাল্কা। হঠাৎ করে বাতাসের বেগ ভয়ঙ্কর বেড়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে চারদিকে অন্ধকার। তীব্রবেগে বৃষ্টি পড়ে। সমরজিতের খয়েরি-সাদা-কালো চোখে এই তুমুল বৃষ্টিপাত পাকা লাল রঙের দাগে স্থায়ী হয়ে আছে। নয়নের মাঝখানে ঠাঁই নেওয়ায় এই দাগ সব সময় দ্যাখা যায় না, কিন্তু একটি বালুকণার মতো চোখে কেবল খচখচ করে। অনেক দূরে চলছে গুলিবর্ষণের সঙ্গত, আর এখানে বাতাস ও জলের সম্মিলিত ধ্বনির পেছনে 'ও মা' 'ও সমর', 'ও সমইরা', 'মাগো', 'রাধেশ্যাম,' 'রাধেশ্যাম,' 'ভগবান', 'ভগবান গো', 'সুভাষ', 'সুভাষরে', 'চিত্ত', 'অমৃত', 'অমৃতরে', 'কাকা',—এইসব আহ্বানকে একনাগাড় গুলিবর্ষণের সঙ্গে ঘর-বাড়ি পোড়াবার আওয়াজ ও আলুথালু মানুষের বিলাপ বলে ভুল হয়। এখন সন্ধ্যাকাল না গভীর রাত্রি? এটা কি নগরীর রাজপথ না নিভৃত বাঙালি গ্রাম? বৃষ্টি না ট্যাঙ্ক? বাতাস না মর্টার? উত্তর দক্ষিণে কি গাছপালা না

সেনাবাহিনী? মাঠ না ক্যান্টনমেন্ট? মগজে এইসব ঘাপলা, কোলে ঠাকুরমা। যতো হাল্কাই হোক না, ঠাকুরমাকে নিয়ে আর দৌড়ানো যাচ্ছে না। বৃষ্টির তোড়ে কেউ কাউকে দেখতে পায় না। প্রত্যেকে ভাবছে, আর সবাই আছে একসঙ্গে, হায়রে দলছুট হয়ে পড়েছি কেবল আমিই। এদিকে এতো শোঁশোঁস্রাৎস্রাৎছলছলআঁআঁ বিক্ষোভ ও কাৎরানির মধ্যে ঠাকুরমা অবিরাম ঘ্যানঘ্যান করে, 'রাধাশ্যামের বিগ্রহ ফালাইয়া আইলি? অষ্টধাতুর বিগ্রহ—হ্যার অমর্যাদা করলি, এ্যাঁ? তরা তগো বাড়ির স্বত্ব হারাইলি রে সমর, অহন বাস করবি কৈ? ঠাকুরে—তর বাপের ঠাকুরদায়—সম্পত্তি লেইখা দিছে রাধাশ্যামের বিগ্রহরে, তরা তারে ডাকাইতের হাতে সমর্পণ করলি? অহন কি হইবো রে সমইরা? অহন কি হয়? 'বৃষ্টির তোড়ে তার একটানা বাক্যপ্রয়াস ধুয়ে ধুয়ে যায়। এরই মধ্যে চলে এলোপাথাড়ি দৌড়ানো। ঠাকুরমা আস্তে আস্তে চুপচাপ। অন্ধকারে কিছু দ্যাখা যায় না। বাতাস জল গাছপালা ও বিক্ষুব্ধ ধ্বনিপুঞ্জ পরিণত হচ্ছে একটি সঙ্ঘবদ্ধ গর্জনে। বাতাস ও জল উথালপাতাল মাথা কোটে; এরা এখন কোনদিকে যায়? সমরজিৎ তখন ক্ষণে ক্ষণে কেবল আকাশের দিকে তাকায়, তার ভরসা আকাশের এমাথা ওমাথা ছিঁড়ে ফেলে বিদ্যুৎ জ্বলে ওঠে তো রাস্তাটা অন্তত ঠাহর করতে পারে। কিন্তু কিছুক্ষণ আগেকার হুঙ্কার করে-ওঠা বজ্র আত্মসমর্পণ করলো এই বিরূপ আকাশেরই কোনো নিভৃত খাপে, এই ঘোর ঘনঘটায় তাকে পাওয়া যায় কোথায়?

'কিন্তু হোয়াট এ্যাবাউট আদার পিপল?' এই ইংরেজি বাক্য শোনা গেলো আকাশের নিভৃত খাপ থেকে—এই ভয়ে সমরজিৎ চমকে উঠে দ্যাখে, না, কথা বলছে ফারুক, 'কিন্তু অন্যদের আমি বোঝাবো কি করে? মানিক ভাইকে নিয়ে প্রব্লেম হলো এই যে ইডিওলজির জন্য উনি যে কোনো অপ্রিয় কাজও করতে পারেন। তুমি আমাদের সঙ্গে কো-অপারেট করতে রিফিউজ করেছো শুনলে হি মে পুট ইউ ইনটু ট্রাবল।' কতোদিনের ওপার, বুড়িগঙ্গা ধলেশ্বরী শীতলক্ষার ওপার গোঁয়ালঘুর্ণী ঘাটে বিদ্যুৎ চমকায়। মানুষের সমবেত চিৎকারের ধ্বনি সমরজিতের পাছায়, সমরজিতের বুকে লাথি মারে। 'আমি বলি দোস্ত, বাড়িটা ছেড়ে দাও। নিচের তলা ভাড়া দিয়ে ওপরে থাকতে তোমাদের যদি খুব অসুবিধা হয় তো বলো, তোমাকে আরো ভালো বাড়ি রিকুইজিশন করে দিই, চাও তো ওয়ারি এলাকায় বাড়ি দিচ্ছি, এ্যাবানডণ্ড বাড়ি এখন কতো! তোমাদের এই বাড়িটা আমাদের দরকার।'

ঝড়-বৃষ্টি ও গোলাগুলি থিতিয়ে এলে সমরজিতের ফের ঝিমুনি ধরে। হাই তুলতে তুলতে সে মুখের সামনে তুড়ি বাজায়, 'বাবায় রাজি হইতে চায় না।'

সমরজিৎ হয়তো আরো বলতো, কিন্তু জাফর তাকে থামিয়ে দেয়, 'লেট্‌স গো।'

'ইফতেখার কোথায় গেলো? ইফতেখার?' ফারুক বারান্দার দিকে তাকায়।

ইফতিখার তো এখনো রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়েই রয়েছে। সে বার বার গলা খাঁকারি দিচ্ছে, কিন্তু গলার জমে থাকা কফ আর কিছুতেই বেরোয় না। ভালো করে

কাশতে গেলে বমি বমি লাগে। এই ধরনের বিবমিষা তার আগে ছিলো না, আগে মদ খেতে খেতে অনেক সময় হড়হড় করে বমি হয়ে যেতো। আর এখন গলায় শিরশির করে, ফাইনাল বমি আর হয় না। অনেকক্ষণ ধরে গর্জাবার পর বড়োজোর পানসে-তেতো ও পানসে-টক ছটাকখানেক আঠালো লালা গড়িয়ে পড়ে ঠোঁটের দুই পাশে ও চিবুকে। আজকাল প্রায়ই দাড়ি কামানো থাকে না তার, তাই লালা গড়ালেই খোঁচাখোঁচা দাড়িয়ে লেগে বিশ্রী লেপ্টালেপ্টি। সমস্ত মাথা জুড়ে তার অস্পষ্ট আওয়াজ, ফলে চুলটুল বড়ো এলোমেলো। কতোকাল পর আজ টাকা পাওয়া গেলো কিছু, এই টাকার অর্ধেকটা পাঠানো দরকার তার আম্মাকে। একে ওকে ধরে, এক মিনিস্টারের চামচাকে আম্মার গয়নাগাটি উপহার দিয়ে বড়োভাইয়ের সঙ্গে আম্মাকে কলকাতা পর্যন্ত পাচার করা গেছে। কলকাতায় আত্মীয়-স্বজন যারা আছে, সবাই খুব দূর-সম্পর্কের, তাদের ওপর আর কতোদিন? টাকাটা কোনোরকমে হাতে পেলে ওর আম্মা লক্ষ্ণৌ চলে যেতো। সেখানে যারা আছে, তারাই কি আর খুব খুশি হবে? তবে মামুদের অনেকেই তো এখনো ওখানে বসবাস করছে, আম্মা কোনোরকমে পৌঁছতে পারলে ব্যবস্থা একটা হতোই। এদিকে চাল, ডাল, আটা, আলু কিনে রাখলেও কয়েকটা দিন নিজেদের ভাতটা রুটিটা মিলতো। মাঝখানে দিন যা গেলো! ঘরের ফার্নিচার উর্নিচার বেচে দেওয়ার জন্য বাইরে বার করবে তারও কি জো ছিলো? কোনোভাবে গন্ধ পেয়েছে কি ঘরের মধ্যে পাবলিক জমে গেলো। তারপর একটানা ভনভনানি, 'এ টেবিল কোথায় পেলেন ভাই?' 'আমার ড্রেসিং টেবিল বেচবেন আমারই কাছে?' 'এই তো আমারই আলনা।' রেফ্রিজারেটরটা অবশ্য অল্প দামেই পাওয়া গিয়েছিলো, ঠাঠারি বাজারের ইসরাইল জোগাড় করেছিলো কোত্থেকে, এক কিস্তী দাম দেওয়ার পর ব্যাটা কোথায় সাফ হয়ে গেছে, আর টাকা দিতে হয়নি। কিন্তু একটু ভালো দামে বেচে আজ লাভটা কি হলো? দালালকে দেওয়ার পর তার প্রায় সবটাই খসলো ফারুক আর জাফরের পেছনে। ফারুক তো এখন ওপরের লোক। মাদারচোদ কাম কি করবে কে জানে?

সমরজিৎ ডাকে, 'ইফতেখার!'

ইফতিখার ঘরের ভেতর এসে দাঁড়ালে কম ভোল্টেজের আলোতেও তার চোখে একটু ধাঁধা লাগে। ফারুক বলে, 'চলো তোমাকে নামিয়ে দেবো।' কিন্তু ইফতিখারের ইচ্ছা অন্যরকম, 'তোমরা তো কন্টিতে যাবে? চলো, আমিও যাই। মানিক ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও না! আমার চাকরির কথাটা না হয় বলি।'

'আজ মানিক ভাই খুব বিজি থাকবে। আপনি অন্য একদিন এ্যাপয়েন্টমেন্ট করবেন।' জাফর এবার পা বাড়ায়, 'চলেন ফারুক ভাই।'

আবার সেই দোতলার প্যাসেজ, গুহার ভেতর এলোমেলো প্রস্তরমালার মতো সিঁড়ির উঁচুনিচু ধাপ, নিচের অন্ধকার ও আলোগ্রস্ত ঘরবারান্দা, দরজার দুর্বল পাল্লা,

হলদে উঠান, দাঁত-খিচিয়ে-থাকা দেওয়াল, আবার দেওয়াল, তারপর আবার দেওয়াল পেরিয়ে ওরা চারজন অমৃতলালের ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে দ্যাখে বাইরের বারান্দায় জলচৌকিতে কার্পেটের আসন পেতে বসে রয়েছে অমৃতলাল নিজে। পায়ের অবস্থান পাল্টিয়ে সে বসেই থাকে। কেবল জলচৌকির তলায় একটা বোতল সরিয়ে রাখতে গিয়ে ঠুনঠুন আওয়াজ হয়।

নিচু হয়ে ছোটো দরজা পেরোবার সময় জাফরের মাথায় কাঠ ঠেকে গেলো। এসব বড়ো বিরক্তিকর। 'বড়ো গেটটা খুলে দিলেই পারেন। এসব বন্ধ করে দুর্গের মধ্যে থাকেন কেন? এখনো সবাইকে শত্রু ভাবেন নাকি?'

'এট্টু অসুবিধাই হইলো আপনার!' সমরজিৎ বেশ সঙ্কুচিত।

'অফিস ওপেন করার আগে আপনাদেরই সব ঠিকঠাক করে দিতে হবে।' জাফরের হিমস্বরে ফারুকের পদক্ষেপ ধীরগতি হয় এবং সমরজিতের কানের কাছে সে মুখ বাড়ায়, 'রাজি হয়ে যাও সমরজিৎ। তোমার ভালোর জন্যেই বললাম। এরপর কোনো অসুবিধা হলে আমি হেল্প করতে পারবো না। কইতেও পারবো না, সইতেও পারবো না।'

'বাবায় রাজী হইবো না।'

সেই সন্ধে থেকে এক কথা। এতো করে বোঝানো হলো, কয়েকটা পেগ পেটে পড়লো, তবু একই জবাব।

'তোমার ভালোর জন্যই বললাম। আর লাভ কি? বাদ দাও। যাক, আরেকটা পেগ হলে জমতো, না?'

'জিন খাইবা? এক্সপোর্ট কোয়ালিটি রইছে এক বোতল, খাইবা?'

'কেরুর?'

'আর কি পাই? একটা সিপ মাইরা দিয়া যাও।' কিন্তু সমরজিতের আহ্বান বড়ো আড়ষ্ট। জাফরও ঐরকম কাঠ-কাঠ, 'আরে চলেন, কন্টিতে মানিক ভাই ওয়েট করছে। ফরেন পার্টি কি খাওয়ায়, দেখবেন।'

গাড়িতে উঠতে উঠতে ফারুক একটা চামড়া খোলে, 'সমরজিৎ, কন্টি ফন্টি আর ভাল্লাগে না। হোটেল, ক্লাব, এমব্যাসি, পশ এরিয়ায় আর পোষায় না দোস্ত! আমাদের হাক্কা কতো ভালো ছিলো! কি কোজি, কি ইন্টিমেট! ঐ হাক্কা শালার জয়েন্টে পিপুল গাছের নিচে বেঞ্চে বসে আস্তে আস্তে সিপ মারা—এরকম সুখ আর কোথাও নেই!' ফারুকের এই দীর্ঘ সংলাপে ইফতিখারের শরীরে বড়ো কোলাহল শুরু হয়। তার গায়ের সিক্সটিফাইভ-থার্টিফাইভ শার্ট ফুলে ওঠে বেলুনের মতো। মধ্যরাত্রির নবাবপুরকে জায়গা করে দেওয়ার জন্যে তাকে একটু সরে বসতে হয়। মধ্যরাত্রে বন্ধুদের সঙ্গে মেহবুব আলী ইনস্টিট্যুট এলাকা থেকে বেরিয়ে নবাবপুর অতিক্রম করা; নবাবপুরের কামুক গন্ধ, পানের দোকানের সামনে অন্তরঙ্গ ভীড়, ঠাঠারি বাজারের মোড়ে কোনো বন্ধ দোকানের রকে বসে মুখের ভেতরকার পানের পিক নিচের ঠোঁট দিয়ে উঁচু করে আটকে রেখে বলকানো বাক্যে আড্ডা দিচ্ছে

কয়েকজন বয়স্ক লোক; আমজাদিয়ায় কয়েক রাউণ্ড চা মেরে দক্ষিণের কোনো রেস্টুরেন্টের দিকে চলে যাচ্ছে কালো ঋজু ও দীর্ঘদেহী শান্ত পুরুষ, তাকে ঘিরে কয়েকজন চঞ্চল যুবক; কোনো কোনো রাতে 'নিগারে'র সামনে সমস্ত রাস্তা জুড়ে ছড়ানো কাওয়ালির আসর; মাইকে আল্লা, রসুলুল্লা ও খাজা মঈনুদ্দিন চিশতীর প্রশস্তি; রাস্তার ধার ঘেঁষে লোহার তোলা উনুনে সেঁকা হচ্ছে শিককাবার, শিককাবাবের গন্ধে সাড়া পড়ছে পেটের ভেতর-বাড়িতে; রথখোলার মোড়ে ভুট্টা ভাজা হচ্ছে; কান্দুপট্টির গলির মাথায় তিনজন ফাইটিং মাতাল; ইফতিখারের ভরা গলায় মোহাম্মদ রফি কি মেহেদী হাসান; এরই মধ্যে আখতার বকে চলেছে চির্কিন খাঁর পদ্য। কোনো কোনোদিন খালেদ মোহাম্মদের তোতলা শায়েরী, 'ইয়ে নবাবপুর রাত হ্যায়, আসমানমে চাঁদ হ্যায়, মিঠি মিঠি বাত হ্যায়',—শুনে সকলের একটানা বিরতিহীন হাসি, এর সঙ্গে মিলিয়ে সমরজিতের ঠাট্টা, 'সামনে বড়া গাত হ্যায়, গিরনে সে বরবাদ হ্যায়'; নবাবপুর পার হলে সমকামী বালকদের 'মালিস' বলে ডাক দিয়ে যাওয়া—নস্টালজিয়ায় কাত হয়ে ইফতিখারের বমি বমি লাগে, গলার টক স্বাদ ফুসফুসে হাওয়া চলাচল বন্ধ করে দিতে পারে, তাতে এমন কি একটা স্ট্রোকও হতে পারে। সুতরাং সে উচ্ছ্বাস ও বাক্য দমন করে। কথা বলে সমরজিৎ, 'খালি হ্যাংওভার হয়, মদ খাইলেই হ্যাংওভার, ছাড়তেও পারি না, কি যে করি? খোঁয়ারির মধ্যে রাত কাটে, সারাটা সকাল জুইড়া খালি খোঁয়ারি, অফিসে বইসা ঝিমাই, ভাল্লাগে না।' সমরজিতের বকা শেষ হতে না হতে ওদের গাড়ি চলতে শুরু করে এবং সমরজিৎ ঘরে ফেরে।

অমৃতলাল তখন বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে উঁচু প্রাচীর ও বারান্দার মাঝখানে স্পেসের ওপর জ্বলতে-থাকা চাঁদ দেখতে চেষ্টা করছে। মোটা গলায় একটানা গুনগুন পুলক, সে বেশ টলোমলো। সমরজিৎ তার বাপকে এড়িয়েই ওপরে উঠে যেতো, এতেই সে অভ্যস্ত, কিন্তু অমৃতলাল গম্ভীর গলায় ডাকে, 'সমর।'

বাপের ভরাট স্বর নস্যাৎ করে দিয়ে সমরজিৎ জবাব দেয়, 'কি কও?'

'হ্যারা বাড়ি লইতে চায়, না?'

'অগো তুমি কি কইছ?'

'কি কইছি?' অমৃতলাল হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়লে তার চোপসানো গালের ভেতর দিয়ে একটা ঢেকুর বেরিয়ে আসে। ঢেকুরপ্রয়োগের পর তাকে কাশতে হয় প্রায় মিনিটখানেক। তারপর ঘর-কাঁপানো আওয়াজ করে থুতু ফেললে সেটা বারান্দা অতিক্রম করতে পারে না। অথচ আগে এমন ছিলো না। আগে এখান থেকে একটু স্পিডে কাশ থুতু ছুঁড়লে বারান্দা তো পেরোতোই, এমন কি এই স্পেস ডিঙিয়ে গিয়ে সেঁটে থাকতো দেওয়ালের সঙ্গে। বয়সের ভারবোধ তাকে একটু নীরব করে, কিংবা এই ক্লান্তির সুযোগে সে বাক্য গোছায়, কিন্তু ছিমছাম কথা তার মুখ পর্যন্ত আর আসে না, বলে, 'কি কইছি? কইছি নিজেগো বসত-বাড়ি ভাড়া দিমু না, তো কি হইছে?'

'নাঃ কি হইবো?' সমরজিৎ খুব পরিণত দুঃখের হাসি ছাড়ে, 'কি আর হইবো? মানুষ চিনো না, কারে কি কও।'

'চিনুম না ক্যান, বেশি ছটফট করছে তো আসাদুল্লার পোলায়, খচ্চইরা ছ্যামরাটা। আসাদুল্লার বাপে কতো পইড়া রইছে এই বারান্দার মইদ্যে, ঘরে ঢুকবার সাহস করছে? তর ঠাকুরদার পায়ে ধরছে—কি?—না কর্তা, আমারে আপনার ফিটনটা চালাইতে দ্যান।—বাবায় দেয় নাই। ক্যামনে দেয়? বাবার ফিটন চালাইছে ফালুমিয়া। বাবায় মানুষ রাখছে বাইছা বাইছা, ফালুর ভায়রা আছিলো নবাববাড়ির খানসামা, বুঝলি?' অমৃতলাল বেশ ফর্মে এসে গেছে, এতো অল্পেই ঠিক কাজ করে লোকটার, 'আমাগো এই বাড়ির মইদ্যে নবাব সাহেব আহে নাই? আহে নাই? আমার জন্মের আগে, তর ঠাকুরদার বিয়ার মইদ্যে আইছিলো নবাবসাব নিজে, বুঝলি? আর আমি দেখছি নবাব ইউসুফরে, হ্যাও নবাব, নবাব সাবের মাউসা না পিসা, হ্যারা খালুমালু কি কয়—হ্যারে দেহি নাই আমি? দেহি নাই? সিদ্ধি বানাইছিলো মধু বোষ্টমী, কুলপীর মইদ্যে সিদ্ধি, খাইয়া নবাব সাবে হাইস্যা বাঁচে না!' সমরজিৎ আস্তে আস্তে সরে যায়, দরজায় আওয়াজ করে উঠানের দিকে হাঁটে, অমৃতলাল তবু ক্ষান্ত হয় না। 'তে হ্যায় আর ওঠে না, লক্ষ্মী থাইকা বাইজি আইছিলো, নবাব সাবে খালি মধু বোষ্টমীর লগেই ফুসুর-ফাসুর করে, 'চলো, তুম মেরে সাথ পরীবাগমে চলো।' মতিবাবু, সনাতনবাবু, ধানকুরা, মুড়াপাড়া—কুনো বাবু রাজা মহারাজা বাদ পড়ছে নাকি? বাদ পড়েছে? তরা কি দ্যাখছস? কি দ্যাখছস তরা? আমরাই কি আর দেখছি?'

না দেখেই যা—সমরজিৎ ঘরের পর ঘর, বারান্দা, উঠান, সিঁড়ি পেরিয়ে যায়—দেখলে না জানি কি হতো! বাবার প্রলাপ এখান থেকেও শোনা যায়, 'আরে কুসুমবালার সেতারের বোল শুনছে তো'—কুসুমবালার সেতার শোনার জন্য অমৃতলাল তার বহু-ব্যবহৃত কানজোড়া আবার কুমারী করার চেষ্টা করে, এদিকে সমরজিতের কানের পর্দায় কাগজের পুরু প্লাস্টার সাঁটা, সেই প্লাস্টার এখন খোলে কে?

নিজের ঘরের বারান্দায় ইজি চেয়ার পেতে বসে সমরজিৎ পকেট থেকে গাঁজার পুরিয়া বের করলো। গোবিন্দ শালা দু'টাকার গাঁজা দিয়েছে, আগে চার আনাতেও এর চেয়ে বেশি পাওয়া যেতো। আবার দ্যাখো, এইটুকু মালে বিচি কতো! এরকম ফেলে-দেওয়া কোনো বিচি থেকে রজনীগন্ধার টবে এই গাঁজার গাছ গজিয়েছে। মাঝখান থেকে রজনীগন্ধার চারাটা মরে গেলো। এ গাঁজার চারাও কোনো কাজে আসবে না। জল টল দিয়ে এতো বড়ো করলো তো দ্যাখো শালার পাতায় পাতায় পোকা ধরে গেছে। স্টার সিগ্রেটের তামাকটা ফেলে দিয়ে খোলটার মধ্যে গাঁজা ঢুকিয়ে জ্বালিয়ে নিয়ে একটা সুখটান দিলে বারান্দার রেলিঙ একটুখানি কাঁপে। তারপর আবার সেই একই অবস্থা। সমরজিতের চোখ একেবারে খটখটে, শূন্য।

সেখানে একটু ধোঁয়া কি কোনো রঙিন পর্দা কি এমনি ব্ল্যাক এ্যাণ্ড হোয়াইট ছবি—কিছুই দ্যাখা যায় না। পেটের চিনচিন-করা ব্যথা একবার ওঁয়া করে কেঁদে ফের ঘ্যানঘ্যান করে গোঙাতে শুরু করে। ওদিকে হৃষিকেশ দাশ রোডে যানবাহন চলাচলের আওয়াজ কমে আসছে। কাগজীটোলায় এককালের গুণ্ডা ও এখনকার দেশপ্রেমিক আসাদুল্লার বাড়ির ছাদে টেপরেকর্ডার বাজছিলো আর্তস্বরে—একবার চলছিলো 'ববি' ছবির গান, একবার নেতার বজ্র-হুঙ্কার—এখন তাও বন্ধ। কলকে ধরার ভঙ্গিতে গাঁজা-পোরা সিগ্রেট জাপটে ধরে আরেকবার খুব জোরে টান দিলে সমরজিতের করোটির দেওয়ালে জোরে জোরে টোকা পড়ে। এইবার আশা করা যায়। এইবার নেশা হবে। এইতো মগজে তোলপাড়, পাঁজরায় তোলপাড়। এইবার হবে! আশায় উত্তেজনায় সমরজিৎ রেলিং ধরে দাঁড়ায়। চোখের সামনে সানগ্লাসের মতো পাতলা মেঘ ভেদ করে সে দ্যাখে, নিচে কে যেন চাঁদের ভগ্নাংশ খুঁজে বেড়াচ্ছে খুব মনোযোগ দিয়ে। কে সে? কিন্তু বড়োজোর এক মিনিট, এই মেঘ ছিঁড়ে উড়ে চলে যায় এবং সমরজিৎ দ্যাখে, গেটের মাধবীলতার ঝাড় ও বারান্দার হৃষ্টপুষ্ট থাম পর্যন্ত স্থূলকেলি করে বেড়াচ্ছে অমৃতলাল। তার কণ্ঠে একটানা গড়ানো নেশা, 'মোর প্রিয়া হবে এসো রানী' কিংবা 'বলেছিলে চিঠি দিও' কিংবা 'প্রেম নহে মোর মৃদু ফুলহার।' কিন্তু পুরনো বাড়ি, একতলা দোতলায় দূরত্ব অনেকখানি। গাঁজার ধোঁয়া মগজে ছোটো ছোটো রোঁয়া হয়ে মাথায় কুটকুট করে, চোখের নির্মেঘ খরা আর কাটে না। সমরজিতের পাশে গাঁজা গাছের ঝাঁঝরা পাতা থেকে গড়িয়ে পড়ে নেশাগ্রস্ত পোকামাকড় হেঁটে বেড়াচ্ছে পা টিপে টিপে। তাদের টলোমলো পদক্ষেপ ও এলোমেলো পদধ্বনির ভেতর দিয়ে উঁকি-দেওয়া 'মোর প্রিয়া হবে এসো রানী' কি 'যদি দিতে এলে ফুল হে প্রিয়' তার কানের পর্দায় পাঁচড়ার মতো চুলকাতে শুরু করলে ইজি চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়া ছাড়া সমরজিৎ আর কি করতে পারে?

১৯৭৫

অসুখ-বিসুখ

'অ সোভান, কৈ যাস? সুলতান ডাক্তাররে কইয়া আউজকা দাওয়াই আনতে পারবি? আমি তো আর খাড়াইতে পারি না বাবা, অ সোভান, হুনলি? মাথামুথা খালি ঘুরান দিতাছে, ডাক্তাররে খবর দিবি?'

পেছন থেকে মায়ের ডাক শুনে সোবহান দরজা থেকে ফিরে আসে, কিন্তু আতমন্নেসার ঘরে না গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে হাঁক ছাড়ে 'আলমের মাও, এক গিলাস পানি দিয়া যাও তো!'

বারান্দায় ঘরের দেওয়ালের সঙ্গে পেতে-রাখা বেঞ্চ, বসবে বলে সোহবান পাছা ঠেকায় বেঞ্চের ওপর। কিন্তু সারা শরীর তার ছটফট করে, তাই একবার বসে তো দুবার দাঁড়ায়। এই ব্যায়াম করতে করতে সে অবিরাম বিড়বিড় করে, 'কৈ যাওনের টাইমে খালি পিছে ডাকবো, খালি পিছু-ডাক দিবো। কাম হয় ক্যামনে? দুনিয়ার মাইনষে হালায় কামাইয়া লাল হইয়া গেলো, আমাগো হইবো ক্যামনে?' ওদিকে ঘরের ভেতর আতমন্নেসার গোঙানি এখন স্থগিত। তক্তপোষের তলা থেকে চিলমচি টেনে নেওয়ার শব্দ আসে, থুক করে পানের ছিবড়ে ফেলে আতমন্নেসা চিলমচি ফের নিচে ঠেলে দেয়।

সিতারা তখন উঠানের এক কোণে উপুড় হয়ে দাঁড়িয়ে ছেলের পাছায় পানি ঢেলে দিচ্ছে, রাস্তার ধারের নালা থেকে আলম এক্ষুণি পায়খানা করে এলো। সিতারা ওখান থেকেই জবাব দেয়, 'পাকঘরে সুরাই থাইকা ঢাইলা খাও।'

পানি না খেয়েই সোবহান সশব্দ পা ফেলে বেরিয়ে যায়। পিপাসাও ছিলো না তার, মায়ের পিছু-ডাক শুনে বাইরে গেলে ময়দার পারমিট পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায় বলে ঘরে এসে সে ফের প্রথম থেকে যাত্রা করলো।

আতমন্নেসা ফের মুখ খোলে, 'অ মতি, দেখলি তোর ভাইয়ে এক গিলাস পানি ভি খাইয়া যাইতে পারলো না, দেখলি?' মেয়ের দিক থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে সে এবার সরাসরি কথা বলতে চায় বৌয়ের সঙ্গে, 'অ বৌ, আমার পোলাডারে তুমি এক গিলাস পানি ভি দিবার পারো না? এই রইদের মইদ্যে হুকনা মুখ লইয়া পোলায় বারাইয়া গেলো, এ্যাঁ?'

কিন্তু বৌয়ের দিক থেকেও কোনো সাড়া নেই।

'রাও করবার পারস না বৌ? অ আলমের মাও, হুনলি?' বিছানায় কাত হয়ে নতুন করে পান সাজাতে সাজাতে আতমন্নেসা চিৎকার করে, 'পোলায় আমার পানি না পাইয়া বাড়ি থাইকা বারাইয়া যায়, খানকি মাগী তুই পানি না দিয়া ভাতাররে বাইর কইরা দিলি? ঘরটারে কারবালার ময়দান বানাইবার হাউস করছস, এ্যাঁ?'—এই যে তৃষ্ণার্ত ঠোঁটে, শুকনো গলায় রোদের ভেতর বাইরে চলে গেলো তার ছেলে সোবহান, সে যদি আর ফিরে না আসে তো খানকি মাগীটার উচিত শিক্ষা হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে যদি খবর আসে যে গলি থেকে বেরিয়ে আলুবাজারের বড়ো রাস্তায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোবহান একটা ট্রাকের তলায় পড়ে গেছে মুখ থুবড়ে, শেষবারের মতো দেখতে চাইলে সবাই মেডিক্যাল কলেজ চলো, তো এই শয়তান বৌটার বাপের বাড়ি পর্যন্ত উদ্ধার না করে আতমন্নেসা ছাড়বে না। পুত্রবধূকে যথোচিত শিক্ষা দেওয়ার উৎসাহে আতমন্নেসা বিছানায় উঠে বসে। মনে হলো মাথাটা বোঁ করে ঘুরতে শুরু করলো। জানলা দিয়ে দ্যাখে উঠানের একদিকে পায়খানার চটের পর্দা খুব দ্রুতগতিতে একবার সামনে আসছে একবার পেছনে যাচ্ছে। এরকম হলে তার খুব ভয় হয়। শুয়ে পড়তেও ভয় হয়। অনেক সময় ছাদটা এমন বোঁ বোঁ করে ঘোরে যে মনে হয় চুন-সুরকির ছেড়াখোঁড়া কাঁথাকম্বল ভেদ করে ছাদের এই বিশাল বপু বুঝি তার ঝরঝরে গতরে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। তবে মাথাঘোরার প্রাথমিক ধাক্কা সামলাতে পারলে সমস্ত জগতের গতি আস্তে আস্তে কমে আসে, চারপাশ তখন ধীরে ধীরে দোলে। কিন্তু আতমন্নেসার এসব কথায় কান দেয় কে? তবু চিঁহি চিঁহি করে তার মেয়েকে ডাকে, 'মতিবানু, অ মতি! আমারে এট্টুখানি দুধ দিবার পারস? মাথাটা কেমুন চক্কর দিয়া উঠলো। অ মতি!"

সকালবেলা জ্বর আসেনি বলে মতিবানু রান্নাঘরে ঢুকছে, রাত্রের ঠাণ্ডা ভাত খাবে, একটু বাসি তরকারির জন্য সে এখন এ-তাক ও-তাক হাতড়াচ্ছে, মায়ের ডাকে মনোযোগ দিলে সিতারা এসে তরকারির বাটি লুকিয়ে ফেলতে পারে। ভাবীটা কি তার কম দজ্জাল?

আতমন্নেসা শেষ পর্যন্ত ধর্ণা দেয় বৌয়ের কাছে, 'অ বৌ, অ আলমের মাও, আমারে দুধ দিবা এট্টু? আমার মাথাটা কেমুন ঘুরান দিতাছে, অ বৌ!'

আলমের উরু, পায়ের পাতা সব জায়গায় গু লেগে ছিলো। এসব ভালো করে ধুতে গেলে সে চেঁচিয়ে ওঠে, সিতারা তার দুই গালে কষে চড় লাগায়। পায়খানার চটের পর্দা ধরে আলম আর্তস্বরে কাঁদতে শুরু করলে সিতারা ধীরে সুস্থে বারান্দায় আসে। শাড়ির আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বলে—'দুধ পাই কই?'

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আতমন্নেসা নানাভাবে তার চোখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করে, 'আমি মইরা যামু বৌ, দুই চোক্ষে খালি আন্ধার দেহি, আমারে এক পেয়ালা দুধ দিবি?

"দুধ নাই কা!"

সিতারার এই সংক্ষিপ্ত জবাবে আতমন্নেসা মুষড়ে পড়ে।—কি একখান বৌ লইয়া আইছে তার পোলায়, হায়রে রাও করবো না, বাত করবো না। একটা কথা কইবো মনে লয় বাপের বাড়ির সোনাদানা হীরা জহরতের হিসসা দিতাছে।

'ঐ দিনকা মতির জামাই লাইন দিয়া খাড়াইয়া বড়ো টিন লইয়া আইছে না একটা? ব্যাকটি খাইছো?'

'ঐ দুধ দিলে মতিবিবিরে কি দিমু? ডাক্তারে অরে দুধ খাইতে কইছে না?'

'হায়রে আমার কপাল।' নিজের কপালে একটা চড় মারতে গিয়ে আতমন্নেসার ডান হাত বুক পর্যন্ত উঠে ফের পড়ে যায়, কপালের সঙ্গে যেকোনো সামান্য সংঘর্ষে তার মাথাঘোরা বেড়ে যেতে পারে। 'বিমার খালি মতিবানুরই হইছে? আমি বলে মইরা যাই,—হায়রে চুকি মাইরাও যুদিল কেউ দ্যাহে।'

আধঘণ্টা পর সিতারা ঘোলাটে রঙের কাঁচের চায়ের গ্লাসে দুধ গুলে আতমন্নেসার সামনে ধরলে সে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে। শান্ত গলায় সিতারা বলে, 'দুধ খাইবেন কইলেন না?'

'না আমারে কি দুধ দিবা?' আতমন্নেসার স্বর জলীয় ও নিচু। তার চোখের পাতা নোয়ানো। 'আমি দুধ খামু ক্যান? আমার কি বিমার হইছে?'

'বিমারের লগে দুধ খাওনের কি কথা হইলো? হাউস হইছে দুধ খাইবেন, তে খান!' ততোক্ষণে দুধের গ্লাস আতমন্নেসার হাতে চলে এসেছে। তার চোখের ঘোলা মণিতে দুধের ছায়া পড়ে কি পড়ে না! গোটা গ্লাসটা এই খানকিটার মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলে চিৎপটাং হয়ে শুয়ে বাড়ি মাথায় করে চ্যাঁচাতে পারলে এখন সুখ পাওয়া যায়। কিন্তু সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তার বাড়াবাড়ি মানে বৌয়ের জিত। সুতরাং দুধটা তাকে খেয়েই ফেলতে হয়।

আলমের কান্না থামাবার জন্য আরেকটা চড় মারা দরকার, সিতারা তাই চলে যায় উঠানে। বিছানার ওপর শূন্য গ্লাস হাতে বসে আতমন্নেসা তার রোগের উপসর্গসমূহ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দ্যাখে। তার ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে। মাথা তুললেই দুনিয়া কেবল ঘোরে। তার না আছে গতরের আরাম, না আছে জানের শান্তি। তামাম জিন্দেগী ভর তার দিকে কেউ খেয়াল করেনি। তার পোলাপানের বাপ সারা জীবন নিজেই ছিলো হাঁপানির রোগী। সারাটা শীত খক খক করে কাশতো, হাঁসফাঁস করে নিশ্বাস নিতো। একটু বৃষ্টি হলো কি একটু গরম পড়লো, ব্যস শুরু হলো সোবহানের বাপের হাঁপের টান। তখন রাতে ঘুম থেকে উঠে চুন দিয়ে তেল গরম করো, বুকে পিঠে মালিশ করো, রসুন ছেঁচে গলায় পট্টি লাগাও, এটা করো, সেটা করো—এই করেই তো তার কাটলো। না, এমনি লোকটা তার সঙ্গে কখনো খারাপ ব্যবহার করতো না,—মিছা কথা কইলে গুণা, দিলের মইদ্যে রাখলে ভি গুণাই হইবো, হইবো না?—সোবহানের বাপ বৌকে মারধোর করতো না, বিয়ের পর বছর চার পাঁচ একটু আধটু যা করেছে তা ঐ চড়টা-চটকানাটার ওপর দিয়েই গেছে। অথচ আতমন্নেসার ভাসুর তিনজনের সকলেরই পরিবার ছিলো দুটো করে,

সেজো ভাসুর তো কুমিল্লা না পাবনা—জায়গার নাম কি ছাই মনে থাকে—কোথায় গিয়ে আরেকটা বিয়ে করে সেখানেই বাস করতে শুরু করে। সোবহানের বাপ ছিলো কলেজিয়েট স্কুলের দপ্তরি, ভালো ভালো লোকের সঙ্গে তার ওঠাবসা—না ঐসব খাসলত তার একেবারেই ছিলো না। কিন্তু তার দোষের মধ্যে ঐ—মত্ত থাকতো খালি নিজের অসুখ নিয়ে। সপ্তাহের কম করে হলেও দুটো দিন কোনো না কোনো ওষুধ ঘরে আসতোই। হেকিমি হোক, কোবরেজি হোক, হোমিওপ্যাথি হোক, ডাক্তারি হোক, গাছ-গাছড়া, টোটকা—রোজই কোনো না কোনো ভাবে নিজের পরিচর্যা করতো। অথচ দ্যাখো—, চোখ থেকে পানির বিন্দু গড়িয়ে পড়লে আতমন্নেসার দুটো চোখই খচখচ করে—অথচ কৈ তার জন্যে তো এক ফোঁটা ওষুধ কোনোদিন আসেনি। আতমন্নেসার শরীরটা ভালো ছিলো। বড্ডো বেশি রকমের ভালো। তা হোক,—শরীর লোহার হোক কাঠের হোক—রোগ ব্যারাম ছাড়া কি মানুষ বাঁচে? অবেলায় গোসল করে আতমন্নেসার যদি কখনো গা গরম করেছে সে আর বলা হয়নি। এই না-বলাটাই হয়েছে তার কাল। এতে সকলে ভাবতে শুরু করলো কি বৌয়ের গতর হইল লোহার পিঞ্জর একখান। পানি হাওয়া রইদে এ্যারে কিছুই করবার পারে না—সবাই ভাবতো, সোবহানের মায়ের শরীর একেবারে নীরোগ। হায়রে কপাল তার, ছ'টা সাতটা ছেলেমেয়ে হলো,—সন্তানের সংখ্যা তার ভালো করে মনেও পড়ে না,—মনে করার জন্য চোখ বন্ধ করে নিবিষ্টচিত্ত হতেও তার ভয় করে পাছে মাথাটা চক্কর দিয়ে ওঠে,—একবার মনে হয় আটটা, সবচেয়ে বড়োটার কথা মনে পড়ে, সেটা ছিলো ছেলে, সাত আট মাস বোধহয় বেঁচে ছিলো,—তারপর বোধহয় নুরুন্নেসা—তার জীবিত সন্তানদের মধ্যে বড়ো। তারপর কে? সোবহান। না, সেই মরা ছেলেটা!—কি জানি? এখন আর মনে করে লাভ কি? তখনই কেউ খেয়াল করলো না! না, পোয়াতির শরীরের দিকে কেউ দ্যাখেনি। প্রত্যেকবার গর্ভ যখন পূর্ণ হয় হয়, 'না, অহন ফুলজানেরে লইয়া আহি'—এই কথা বলে সোবহানের বাপ চলে যেতো নাজিরা বাজার। নাজিরা বাজার থেকে আসতো তার ননদ ফুলজান। ঘোড়ার গাড়ি বোঝাই হয়ে আসতো। তার পাঁচটা ছ'টা ছেলেমেয়ে, তার কাঁথাবালিস, তার মাদুর, তার পানের ডিবে, তার বেতের বাকসো, টিনের বাকসো। আর আসতো তার এক গাদা ওষুধপত্রের একটা ঝুড়ি। নাও, এইগুলোকে এখন সামলাও। এইটুকু বাড়ি, মানুষে মানুষে গিজগিজ করতো। এরই মধ্যে ননদের এটা ওটা বায়না। তার এ রোগ, সে রোগ। সে এটা খাবে না, ওটা খাবেনা। তার ওপর সূতিকা রোগী সে, যখন তখন পায়খানা যায়, মাটিতে হাত না ঘষেই ভাত বাড়ে। উঠানে, বারান্দায়, রান্নাঘরে ছেলেমেয়েগুলো যখন তখন বসে সের সের চালের ভাত উজাড় করে দেয়। আর ননদ এসেছে তার দ্যাখ্যাশোনা করতে, তার নিজের জ্বরজারি নিয়েই সে ব্যস্ত থাকতো বেশি। গায়ের তাপ বাড়তো, মুখও ছুটতো ফুলজানের। মুখটা তার বড়ো খারাপ ছিলো, একবার ছুটতে শুরু করলে ছেলে-মেয়ে, ছেলে-মেয়ের বাপ, নিজের

ভাই ভাবী এমন কি বাপ মা পর্যন্ত রেহাই পেতো না। আর দ্যাখো, আতমন্নেসার প্রসবের ব্যাপারটি কারো কাছে কিছুই না। না ডাক্তার, না কোনো ওষুধ, না বিশেষ কোনো পথ্যি। সাবিত্রী দাই তো কাছেই থাকতো, মহল্লার মেয়েদের প্রসবের আগে তাদের পেট মালিস করে দিতো,—না সোবহানের বাপ তাকেও যদি একবার ডাকতো! আতমন্নেসা একেকটা বাচ্চা বিয়াতো, সোবহানের বাপ পাশের ঘরে তার কাশিতে একটু বিরতি দিয়ে জিগ্যেস করতো, 'কি হইলো? অ ফুলজান, কি হইলো?' যদি জবাব আসতো 'পোলা হইছে মিয়াভাই' তো তক্ষুণি বিছানা থেকে উঠে বংশালের ওজিউল্লা মৌলবিকে ডেকে দিয়ে ফের বাইরে চলে যেতো। ভাঙা গলায় কাঁদো কাঁদো সুরে ওজিউল্লা মৌলবির আজান শেষ হতে না হতে সোবহানের বাপ ঠিক ফিরে এসেছে। তার দুই হাত জুড়ে কাঁঠাল-পাতা ও কাগজের ঠোঙায় লাড্ডু, নিমকপারা, বাকেরখানি। এই পর্যন্তই। একবার উঁকি দিয়ে দ্যাখেওনি বৌটা মরলো কি বাঁচলো। প্রসবের পর আতমন্নেসার খুব খিদে পেতো, প্রচণ্ড ক্ষুধা। ফুল খসাতো তার ননদ, এই কাজে তার জুড়ি ছিলো না। পর পরই তার জন্যে গামলা ভরে ভাত এনে দিতো। মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে ভাত। আতমন্নেসার ইচ্ছা করতো, মাখামাখা করে রাঁধা গলদা চিংড়ির ঘন সুরুয়া দিয়ে ভাতটা মেখে নেয়। সোবহানের বাপের চিংড়ি নিষেধ, ঐ জিনিস তাই ঘরে কখনো আসেনি। ওষুধ না দিক, চিকিৎসা না হোক,—কেবল তারই জন্যে কোনো একটা পথ্য যদি কোনোদিন আসতো! এখন, হ্যাঁ এক্ষুণি এই বিছানায় এমনি কাত হয়ে শুয়ে চিংড়ির ঘন সুরুয়া দিয়ে ঝরঝরে চারটে ভাত খাওয়ার জন্যে আতমন্নেসার প্রাণটা আইঢাই করে। তার পান-চুন-খয়ের দোক্তার পলেস্তারা-পড়া পুরু জিভে কতোকাল আগে মায়ের রান্না করা ঝাঁঝালো গন্ধের ঝাল চিংড়ির ঘন স্বাদ পুনরুদ্ধার করবে বলে সে একাগ্রচিত্ত হয়। এই স্বাদের খানিকটা হয়তো উদ্ধার হতো, কিন্তু এই সময় 'আলম আলম' ডাক শুনে জানালা দিয়ে বারান্দায় তাকালে সুরুজ মিয়াকে দ্যাখা যায়। সুরুজ মিয়ার হাতে খাকি কাগজের ঠোঙা দেখে আতমন্নেসার জিভ, টাকরা, ঠোঁট সব ফের ছড়িয়ে পড়ে। গলদা চিংড়ির স্বাদ কোথায় পালায়!

সুরুজ মিয়া থাকে ডেমরার ওপার। ডেমরা ঘাটে শীতলক্ষা পার হয়ে তারাবো, তারপর আরো খানিকটা গেলে বোলতা। সেই গ্রামে ওদের বাস। সুরুজ মিয়া আজকাল সুতার ব্যবসা করে অনেক টাকার মালিক, শ্বশুরবাড়িতে খালি হাতে কখনো আসে না। হাঁপানির চিকিৎসা করতে বাপের বাড়িতে এসেছে তার বৌ, তা মাস তিনকে তো হতেই চললো। সুরুজ মিয়া প্রায় একদিন পর পর বৌকে দেখতে আসে। তার হাতের ঠোঙায় হয় ফলমূল নয়তো ওষুধপত্র থাকে। মতিবানুর কি এমন অসুখ করলো যে দুদিন পর ডাক্তার, একদিন পর পর ওষুধপত্র নিয়ে আসতে হবে? পেটের মেয়ে হলে কি হয়, এই যে রোগ-বিমারের নাম করে মতিবানুর কথায় কথায় বাপের বাড়ি আসা, সব সময় গা এলিয়ে থাকা এসব তার একটুও ভালো লাগে না। মেয়ে তো তার আরো আছে। নুরুন্নেসা থাকে লালবাগে,

সেতো কাছেই, কৈ বছরেও তো একবার আসা হয় না তার। ঐ জামাইটার বয়স একটু বেশি, সোবহানের বাপের কাছাকাছিই হবে। নুরুন্নেসা তার তৃতীয় পরিবার। কিন্তু কম বয়সের বৌয়ের কাছে লোকটা ভাউরা হয়ে যায়নি। তার অবশ্য খানদান অনেক ভালো, লালবাগের সর্দারদের সঙ্গেও তার রিশ্‌তা। তাদের আচার আচরণও অনেক শরীফ।—কিন্তু এবার অন্যরকম ঝামেলা আতমন্নেসার মগজে কাঁটা বেঁধায়; বড়ো মেয়েরই বা এ কিরকম আচরণ? মানী মানুষের বিবি হলে কি নিজের মাকে ভুলে যেতে হবে? তার সব কটা মেয়ে বড়ো বাপসোহাগী। বাপের কাশি আর হাঁপানির পরিচর্যা করে বাপের বাড়ি থেকে বিদায় নিয়েছে, বিয়ের পরও এখানে এলে খালি বাপের কথাই বলে। বাপ মারা যাওয়ার আগে নুরুন্নেসা মাঝে মাঝে আসতো। অন্তত ঈদের পরদিন সকালবেলা ও শবেবরাতের রাত্রে আসাটা বাঁধা ছিলো। বাপ মরলো, কিসের ঈদ আর কিসের শবেবরাত! মায়ের কথা কি মেয়েটার মনেও পড়ে না? দুলামিয়া এতো বড়ো ঘরের মানুষ, প্রায়ই শোনা যায় মেম্বার টেম্বার কি সব হচ্ছে! কিরকম চাপদাড়ি তার, মাথায় সর্বদা কিস্তিটুপি। সব সময় তার পাশে লোকজন,—এ বিচার সে বিচার, এই স্কুল ঐ মাদ্রাসা, গোরস্থান মসজিদ এতিমখানা। এতো যে খেয়াল করে বিধবা শাশুড়ির কথাটা তার একবারো মনে হয় না কেন? আ-র জামাই! মেয়েই যদি মাকে ভোলে তো পরের ছেলেকে দোষ দিয়ে লাভ কি?

'আলম, আলম শুইনা যাও তো বাবা।'

সুরুজ মিয়ার আহ্বানে আলম আস্তে আস্তে তার সামনে দাঁড়ায়। সুরুজ মিয়া কাগজের ঠোঙা থেকে একটা কমলালেবু বার করে দিলে ছোঁ মেরে নিয়ে আলম চলে আসে আতমন্নেসার ঘরে। বারান্দায় বেঞ্চে বসে সুরুজ মিয়া জোরে জোরে বলে, 'ও ভাবী কি পাকান?'

রান্নাঘর থেকে সিতারার জবাব আসে, 'বহেন, ডাইল্‌ভাত খাইয়া যাইয়েন।' ঘরের ভেতর থেকে আতমন্নেসা এসব স্পষ্ট শুনতে পারে। জানলা দিয়ে তাকালে দ্যাখা যায় মতিবিবি বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। দ্যাখো, সোয়ামী আসতে না আসতে ছেমরির মুখ কেমন ধুকধুকে হয়ে উঠলো! এই মুখ দেখলে কে বলবে যে আধঘন্টাও হয় নি, মেয়েটা তেলে-ভাজা লাল লঙ্কা, পেঁয়াজ, রসুন ও তেল দিয়ে এক থাল ভাত সেঁটে দিয়েছে! আর এখন দ্যাখো না, তার গলায় জোর নেই, সে এই হাঁটতে পারে কি পারি না! রাত্রের ঠাণ্ডা বাসি জ্বরকে সরবাটার মতো সে মেখে রেখেছে তার মুখে, গালে ও চোখের কোণে। এই সব ভড়ং করেই তো স্বামীটাকে সে তুর্কিনাচন নাচাচ্ছে। জামাইটাই বা কিরকম পুরুষমানুষ যে বিয়ের পর চার বছর বাচ্চা হয় না, এখনো অন্য বিয়ে করার নাম পর্যন্ত করেনা। আবার ডাক্তার দ্যাখায়। বলে কি হাঁপানি ভালো হলে মতিবিবির বাচ্চা হতে পারে। কতো রঙের কথাই যে এরা জানে! নিজে পারো না, মাইনা কইরা ডাক্তার রাইখা পোলা পয়দা করবা, না? রাগে আতমন্নেসার মুখ খারাপ করতে ইচ্ছা করে।

'দাদী, একটা পান দাও।'

কমলালেবু পকেটে রেখে আলম আতমন্নেসার পানের ডিবেতে হাত দেওয়ার জন্যে অনেকক্ষণ ধরে একনাগাড়ে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ছ'টা পায়ার নিচে তিন ছয়ে আঠারোটা ইঁট দিয়ে উঁচু করা এই তক্তপোষে ওঠার জন্যে পেছন থেকে, সামনে থেকে, পাশ থেকে নানাভাবে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে তাকে সরাসরি আতমন্নেসার শরণাপন্ন হতে হয়। কিন্তু নাতি পান চাইলেই কি সঙ্গে সঙ্গে দিতে হবে?

'কমলা খা গিয়া।'

'না আমারে পান দাও।'

'তর মায়ে কি করে রে?'

কিন্তু আলমকে ভোলানো অতো সহজ নয়, 'না আমারে পান দাও।'

'তর মায়ে কি করে দেইখা আয় না!'

'মায়ে পাকঘরে বইসা না খালি পানি ফালাইতাছে আর আমারে আমড়া দিবার চায় না। মায়ে না চামিচ ফালাইয়া দিছিলো।—কইছি। অহন পান দাও।'

'পান দিমু। তর ফুফু কি করে দেইখা আয়।'

'না যামু না। তুমি আমারে পান দাও।'

'যা না ছ্যামরা, পান দিমু তো কইলাম। তর ফুপায় কি দাওয়াই লইয়া আইছে দেইখা আয়, যা! তরে দুই আনা পয়সা দিমু, যা!'

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে আলম ফিরে আসে।

'দাদী, ফুফু না কমলা খাইতে চায় না। ফুপায় একটা কোয়া লইয়া ফুফুর মুখের মইদ্যে হান্দাইয়া দিছে তো ফুফু থুক কইরা ফালাইয়া দিলো। ফুফু কয়, জ্বরের মুখে কমলা তিতা লাগে! হি হি! কমলা তিতা হইতে পারে, এ্যাঁ?'

হায়রে, যতো অসুখ-বিসুখ কি কেবল তাদের কপালেই জোটে! আর আতমন্নেসার শরীরের দিকে কেউ একবার এতোটুকু খেয়াল পর্যন্ত করে না? মেয়ের এসব খুনসুটিতে আতমন্নেসার কোনো আগ্রহ নেই, তার জানা দরকার ওষুধপত্রের কথা।

'দাওয়াই দেখলি?'

'দেখছি না?' স্মার্ট ভঙ্গিতে আলম সোজা হয়ে দাঁড়ালো। সে একটু হিমসিম খায়, বলতে কি কমলালেবু দেখে ওষুধের কথা তার মনেই ছিলো না, কিন্তু সে কথা তো স্বীকার করা যায় না। ওষুধের ওপর দাদীর টানের কথা সে ভালো করে জানে।

'দাওয়াই দেখছি তো! ঠোঙার মইদ্যে কি সোন্দর ওষুধ দাদী, কতো বোতল, কতো বাকসো!'

'ও ভাবী যাই গিয়া।'—জোরে জোরে এই কথা বলে সুরুজ মিয়া বারান্দায় এসে দাঁড়ায়।

'আম্মারে কইয়া যাই।' গলা খাঁকারি দিয়ে সুরুজ মিয়া আতমন্নেসার ঘরে ঢোকে। জামাইকে দেখে আতমন্নেসা জড়সড় হয়, শুয়ে শুয়েই মাথায় আঁচল চড়ায়, সমস্ত শরীর গুছিয়ে নিতে গিয়ে তার ডান পায়ের হাঁটুতে শাড়ি উঠে আসে। মায়ের পায়ের কাছে বসে মতিবানু মায়ের শাড়ি টেনে দিলো।

'আম্মা কেমুন আছেন? শরীর কেমুন?' যতো দোষ থাক, সুরুজ মিয়ার গলায় বড়ো মায়া।

'আর বাবা শরীল!'

'আম্মার শরীল মাশাল্লা খুব ভালো। আমরা কুনোদিন আম্মার জ্বর ভি হইতে দেহি নাই।'

মতিবানুর এই মাতৃস্তুতিতে আতমন্নেসার একটু আগে গোছানো শরীর ফের এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, জামাইয়ের সামনে না থাকলে সে হয়তো বিছানা থেকে গড়িয়েও পড়তে পারতো। পানের ছিবড়ে আটকানো প্রায়-ভাঙা গলায় সে হঠাৎ গোঙাতে শুরু করে, 'না বাবা শরীলের মইদ্যে আমার কিছু নাই। বল পাই না বাবা! কিছু খাইতে পারি না, ভাত দেখলে মনে লয় বমি কইরা ফালাই, কি কই বাবা, তোমারে কই, এই দুইটা চোক্ষের মইদ্যে নিন্দের একখান দানা ভি নাইকা, রাইতে একবার জাগনা পাইছি তে তামানটা রাইত চোক্ষের পাতা আর এক করবার পারি না।'

'না আম্মা, বিমার তোমার মনের মইদ্যে। বয়স হইছে, সংসারের মইদ্যে সুখ শান্তি পাইবা না তয়,' মতিবানু আড়চোখে রান্নাঘরের দিকে একবার দ্যাখে, 'শরীল আর ক্যামনে ঠিক থাকে? আম্মার বিমারি তার মনে, তার শরীল মাশাআল্লা বহুত ভালো।'

এই নতুন একটা রঙের কথা পেয়েছে এরা, আতমন্নেসার পুত্র-কন্যার দল। তার রোগ নাকি তার মনের, তার মনের খবর তার চেয়ে এরাই ভালো জানে! এদের বাপই কোনোদিন জানতে চেষ্টা করলো না, আর এরা কিনা আজ আতমন্নেসার মনের সুখ-শান্তি নিয়ে আচার-বিচার করে! এইসব বড়োলোকি বচন এই বাড়িতে চালু করে আতমন্নেসার মেজো ছেলে। মাস ছয়েক আগে নতুন-বিয়ে-করা বৌ নিয়ে বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার আগে বাড়ির সকলের বিশেষভাবে তার মায়ের সুখ-দুঃখ, রোগ-শোক ও অসুখ-বিসুখের একেবারে চূড়ান্ত পরিচয়টি উদ্‌ঘাটন করার জন্য খোরশেদ তৎপর হয়ে ওঠে। সুযোগ করে নিয়ে প্রায়ই বলতো, 'আব্বায় তো জিন্দেগী ভইরা খালি খক খক কইরা কাশছে আর তার খেদমত করতে করতে আম্মার তামাম লাইফটা ইম্পয়েল হইয়া গেছে। আম্মার মনের মইদ্যে কুনো শান্তি নাই, বুঝলা না, আম্মার পুরাটাই হইলো মনের বিমার।' সে আমলই দেয় না যে তার মায়ের শরীরের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে, পেটের ওপরের দিকে দিনরাত অস্বস্তিকর ঠেকে, চোখে ঘুম নাই! ছেলেটা বিশ্বাসই করে না। অথচ, নিজের পেটের পোলার গিবত কইতে হয় না,—দুঃখে আতমন্নেসার পেটের

অস্বস্তিকর পিন্ড ভেঙে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে! বাপ মারা যাওয়ার পর খোরশেদের লেখাপড়া চালাবার জন্য তাকে কতো ঝামেলাই না পোহাতে হয়েছে! প্রতি মাসেই তখন সোবহান ওর লেখাপড়ার খরচ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেয়। আতমন্নেসার তখন কতো কান্নাকাটি, সোবহানের বাপের নাম করে বানোয়াট সব সংলাপ ছাড়া,—এইসব করেই তো খোরশেদের লেখাপড়া এতোটা হলো! নইলে এই বংশে কেউ কোনোদিন স্কুল-কলেজে গেছে? লেখাপড়ার জোরে খোরশেদ বিয়েও করলো ভালো ঘরে, মেয়ে নিজেও ম্যাট্রিক ফেল। খোরশেদের বন্ধু-বান্ধব সব শিক্ষিত সমাজে, ভালো এলাকার লোক না হলে খোরশেদ মেলামেশা করতে চায় না। কিন্তু লেখাপড়া শিখলে যে মানুষ এতো রঙ্গর কথা বলে সে কথা আগে জানলে কি আর—!

'না আম্মা, ভাইবেন না। আপনের বিমার ঠিক হইয়া যাইবো ইনশাল্লা। এট্টু হাইটা-হুইটা বেড়ায়েন। চলাফিরা না করলে শরীল ঠিক থাকে না। বুঝেন না?' তারপর সেই নির্লজ্জ জামাই শাশুড়ীর সামনেই বৌকে সোহাগী ধমক দেয়, 'আম্মার শরীলখান দ্যাহো তো! এই বয়সেও কি আছে, এ্যাঁ? আর তোমার? তুমি তো মায়ের কিছুই পাইলা না!' মায়ের পাবেটা কি? মায়ের জন্য মতিবানু করলো কি যে মায়ের কিছু পাবে? আতমন্নেসা বিড়বিড় করে, 'মাইয়া আমার বাপসোহাগী আছিলো, বাপে তারে দিয়াও গেছে। সোনাদানা, ঘরবাড়ি, খাটপালঙ্ক তো আর দিয়া যাইতে পারে নাই, বিমারটা দিয়া গেছে মতিবানুরে।'

'হেইডা তো ঠিকই।' সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিলো সুরুজ মিয়া। কি নিমকহারাম জামাই, বছরের ছ'টা মাস বৌকে রেখে দেয় তার বাপের বাড়ি; কোনো খরচপাতি না, পয়সা-কড়ি না। আর দ্যাখো, আতমন্নেসা কি বলতে কি বলেছে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো, "হেইডা তো ঠিকই!" তবে এই কথা বলার পর মতিবানুর চোখের ধমকে বাঁ হাতের মৃদু কোনো ইঙ্গিতে সে ফের প্রথম থেকে নামতা পড়ে, 'আম্মা, আপনে এট্টু চলাফিরা করেন। বুকের মধ্যে বল রাইখেন, দেইখেন আপনের বিমারী-উমারী কৈ যাইবো গিয়া! আমার ফুফুরে তো দ্যাহেন নাই, না?' এবার শুরু হয় তার ফুফুর বৃত্তান্ত, 'আমাগো বাড়ির কাছেই বিয়া হইছে। তয় ফুফুর এই ব্যারাম, বুঝলেন? ডাক্তারে, হেকিমে, কবিরাজে ছেইচা খাওয়াইছি। না কিছুই হয় না—ক্যামনে হয়? ব্যারাম তো তার মনের মইদ্যে!' এরকম কতো ফুফু আর খালা আর দাদী আর নানীর গল্প আতমন্নেসার শোনা হয়েছে। এসব আর ভাল্লাগে না। রাতে বলে তার ঘুম নেই, হাতে-পায়ে দিনরাত জ্বালা, মনে হয় হাতের তালুতে পায়ের তালুতে লঙ্কাবাটা লেপে দেওয়া হয়েছে আর এরা কেউ আমলই দেয় না। আর কতো? কখন সুরুজ মিয়ার গল্প শেষ হয় বোঝা যায় না। সুরুজ মিয়া চলে গেলে মতিবানু ভেতরের বারান্দায় গিয়ে আলমের খোঁজ করে। বারান্দা থেকে চিৎকার করে কথা বলে সিতারার সঙ্গে, 'ও ভাবী, নিমকপারা খাইবা? আলমরে পাঠাইয়া মোচড়ের দোকান থাইকা আট আনার নিমকপারা লইয়া আহি!

খাইবা?'—বারান্দা আর রান্নাঘর—কটা হাত আর তফাৎ, এর জন্য এতো চেঁচিয়ে কথা বলার দরকার কি? গলায় এতো সুখের জোর এরা পায় কোত্থেকে? আতমন্নেসার চোখের সামনে হঠাৎ ঝাপশা ঠেকে। আজকাল প্রায়ই এরকম হয়। সে তখন কাত হয়ে শোয়। বালিশের পাশে রাখা ন্যাকড়ায় জড়ানো পান বের করতে করতে বালিশ থেকে মাথাটা একটু তুলতেই চোখের সামনে সব কিছু দুলে ওঠে। তার বুক ও পেটের মাঝখানে জোড়া স্তন যেখানে বিভক্ত হয়ে ঝুলে গেছে নিচের দিকে, তারও একটু নিচে একটা মাংসপিণ্ড ঠেলে ঠেলে কেবল ওপরের দিকে উঠে আসছে। তার একেকটা ধাক্কায় পেটের তরল পদার্থ সব গলার দিকে ছোটে! গলার কাছটা তেতো ঠেকে। তাড়াতাড়ি একটা পান খাওয়া দরকার। চোখ বন্ধ করে সে পানের একটা ছোটো টুকরো ছেঁড়ে। আরেক হাতে চুনের কৌটা খুলতে গিয়ে বোঝে যে এটা খোলাই ছিলো। ডান হাতের তর্জনী দিয়ে পানের টুকরায় সে চুনকাম করে। কুচি-করা সুপারি আছে কাগজের বাক্সে, পান চুন সুপারি মুখে দিয়ে চিবোতেও তার ভয়, কি জানি এই ঘর ফের দুলে ওঠে। সাজা-পান দাঁতের দুই পাটির মাঝখানে ফেলে চাপ দিলে একটু একটু ঝাঁঝালো রস তার গলার নল বেয়ে সেই দুষ্টু মাংসপিণ্ডের নিচে ও ওপরে গড়িয়ে শেষ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে তার পাকস্থলীতে। বমি বমি ভাবটা এখন কম, জানলা দিয়ে বাইরে তাকানো যাচ্ছে। জানলার ওপারে সরু বারান্দার পর ছোটো রোগা উঠান। এই উঠানে কোনো একটা জায়গা নেই যেখানে নির্ভেজাল মাটি পাওয়া যায়। সব জায়গায় সুড়কি সিমেন্টের গুড়ো ছড়ানো। আজকাল চোখের কি হয়েছে, এই বালু কি সিমেন্টের গুড়োর দিকে তাকালেই চোখ খচখচ করে। উঠানের একপ্রান্তে বাজে কাঠ ও কেরোসিন টিনের ঘেরাও দিয়ে এক চিলতে রান্নাঘর, রান্নাঘরের দরজায় পিঠ দিয়ে বসে মতিবানু গল্প করছে। সিতারার সঙ্গে মতিবানুর কি এতো সোহাগের কথা?

'দাদী, ও দাদী, একটা রিকসা না একটা টেরাকের লগে বাড়ি খাইয়া এক্কেরে ছেঁইচা গেছে।' আলমের কথা শুনে আতমন্নেসার মাথার ভেতরে আবার নতুন বিন্যাস শুরু হয়।

'দাদী আমারে পান দিলা না?' পানের ডিবে চোখে পড়ায় ট্রাক ও রিকশার সংঘর্ষের কথা আলম ভুলে যায়।

'তরে না কইলাম তর ফুফুর ঘরে গিয়া দেইখা আয় দাওয়াই কই রাখছে! যা!'

'তাইলে আমারে দুই আনা পয়সা দিতে হইবো।'

'দিমু। যা!'

মতিবানুর ওষুধপত্র থাকে তার টিনের সুটকেসের ওপর। কিন্তু আতমন্নেসা একদিন তার মেয়ের এক বোতল বি-কমপ্লেক্স গিলে ফেলার পর থেকে মতিবানু ওষুধপত্র রাখে সুটকেসের আড়ালে। আলম সেই জায়গাটাও চেনে। কিছুক্ষণের ভেতর আলম ফিরে আসে খাকি কাগজের ঠোঙা হাতে। ঠোঙা দেখে আতমন্নেসার প্রায়-তোবড়ানো গালের ভাঁজে ভাঁজে রক্ত ছলকে ওঠে, তার বুক কাঁপে,

অগোছালো হাত সে বাড়িয়ে দেয়, 'এক্কেরে লইয়া আনছস! দে! আরে আমার ভাইধন!' 'ফুফুর দাওয়াই ব্যাকটি লইয়া আইছি। দুই আনা না দিলে দিমু না।' রান্নাঘরের দরজায় বসে নিমকপাড়া খেতে খেতে মতিবানু সিতারার সঙ্গে গল্প করে।

আতমন্নেসা চাপা গলায় নাতিকে ধমকায়, 'চুপ কর ছ্যামরা।' বালিশের নিচে একটু হাতড়াতে কয়েকটা মুদ্রা পাওয়া যায়। দুটো দশ পয়সা আলমের হাতে তুলে দিলে সে ফের ঘ্যানঘ্যান করে, 'চাইর আনা দাও দাদী, একটা আইসক্রীম খামু।' আতমন্নেসার তৃপ্ত হাতের উদার ফোকর গলে দশ পয়সার আর একটি মুদ্রা আলমের হাতে পড়লে সে বাইরে চলে যায়।

আতমন্নেসার কাঁপা-কাঁপা আঙুল ও তালুতে ধরে রাখা এখন কতো ওষুধ। আহা, মতিবানু কতো কিসিমের দাওয়াই খায়। যৌবন তো একদিন আতমন্নেসারও ছিলো। হয়তো হাঁপানি হয়নি, যক্ষা কালাজ্বর পায়ে-পানি -ধরা কলেরা আমাশা—এইসব রোগ তাকে চিরকাল অচ্ছুত মনে করে তার ধারে কাছে ঘেঁষেনি। কিন্তু কখনো কখনো গা-গরম তো করতোই। করতো না? ভরপেট সেহরি খাওয়ার ফলে সারাটা রমজান মাস ধরে সকালবেলা তার চোয়া ঢেকুর উঠতো, বুকটা জ্বলতো,—কৈ এক ফোঁটা দাওয়াই তো তার জন্যে ঘরে আসেনি। তার হাতে এখন একটা স্বচ্ছ খয়েরি রঙের ছোটো শিশি,—শিশির ভেতরে সাদা তুলোর নিচে দুই রঙের লম্বাটে বড়ি, আহা রঙের কি বাহার! কিন্তু এই ওষুধ বার করা যাবে না, মতিবানু এটা একবারো ব্যবহার করেনি, এর মুখটা এখন পর্যন্ত টাইট করে সাঁটা। একটা আঠার মতো তরল ওষুধের শিশি, এই শিশিটাও বেশ সুন্দর।—মাথার কাছে সাজিয়ে রাখলে কি সুন্দর লাগে!—ওষুধ শেষ হলে দুটো শিশিই সে চেয়ে নেবে মতিবানুর কাছ থেকে। ছোটোটায় জরদা রাখবে, বড়োটা কিভাবে ব্যবহার করা যায় তাই নিয়ে সে ভাবনায় পড়ে। ওষুধ আরো আছে, শক্ত রাঙতা পাতায় খচিত বড়ো বড়ো ট্যাবলেট, দশটা ট্যাবলেট। এরকম একটা পাতা শিয়রের কাছে রাখলে কতো সুখ! আর একটা কাগজের পেট-উঁচু খাম। খুলতে গিয়ে বেকায়দায় কয়েকটা ছোটো ট্যাবলেট গড়িয়ে মেঝেতে ও চিলমচির প্রান্তে পড়ে যায়। কয়েকটা ট্যাবলেট তার হাতে। এইসব ট্যাবলেট হঠাৎ তার হাতে এবং ক্রমে মাথায় আবাবিল পাখির মতো ঠোকরাতে চায়, প্রায় লাফ দিয়ে সে উঠে বসে বিছানার মাঝখানে। এই তো সেই ছোট্টো ট্যাবলেট, তার স্বামী সারা জীবন কেবল একা একা ভোগ করে গেছে, তার কপালে একটা দানাও জোটেনি কোনোদিন। সোবহানের বাপকে মনে হয় এই ট্যাবলেটই সে দিতো রোজ রাত্রে। এতোকাল পর সেই বড়ি ফের তার হাতে এসেছে। না, এই সুযোগ নষ্ট করা যায় না। পাশে জানালার তাকে সকাল থেকে রাখা আছে আধ গ্লাস পানি। আতমন্নেসা ডান হাতের ট্যাবলেট বাঁ হাতে চালান করে ডান হাতে সেই গ্লাস ধরে। বিড়বিড় করে 'বিসমিল্লা' বলে এক ঢোক পরিমাণ পানি মুখে নিলো, তারপর জরদা মুখে দেওয়ার মতো চার পাঁচটা ট্যাবলেট ঝেড়ে ফেললো মুখের ভেতর।

এরপর ভালো করে শুয়েছে কি শোয়নি, বালিশে মাথাটা তেমনভাবে পড়েও নি, তার চোখের সামনে থেকে মতিবানু ও সিতারাকে নিয়ে রান্নাঘরের দরজা, বাসন-কোসন, নালা, নালার পাশের ময়লা ও সুড়কি ও সিমেন্টের গুঁড়োময় উঠান এবং বারান্দার প্রান্ত একসঙ্গে উধাও হয়ে গেলো। এইসব পরিচিত দৃশ্য চলে যাওয়ার পর সেই শূন্যতা আর পূর্ণ হলো না। সুতরাং তার চোখের সামনে কেবলি অন্ধকার। কোথাও কোনো সাড়া নেই। আরো কয়েকটা পলক কেটে গেলে মনে হয় পেটের সেই ছোট্টো দলাটা যেন পাকস্থলির গভীর ভেতর থেকে আস্তে আস্তে ওপরে ভেসে উঠছে। খুব ধীরে ধীরে কি যেন তার পেটের ওপর দিকটায় দুলছে। একবার দোলে ডানদিকে, একবার তার গতির বৃত্ত ছিঁড়ে ওপরের দিকে উঠে আসতে চায়। সে সময়টা পেট জুড়ে জানান দিয়ে যায় তীব্র ব্যথা। ফের তার নিজস্ব বৃত্তে ধীর গতিতে সে দুলে দুলে ফিরে আসে। আরো পলক কাটে। সেই মাংসপিণ্ড এখন কেবলি বুকের দিকে আসছে। আতমন্নেসার চোখের সামনে জগৎ তীব্র গতিতে ঘুরতে শুরু করে। এ কি তার বুক বেয়ে গলার নল বেয়ে তিরতির করে একেবারে মুখে চলে আসবে? এই ঘোরতর অন্ধকার এবং মহাদোলনের ঝোঁকেও বহুকাল আগেকার খুব কচি একটা মুখ একেকবার ভেসে ভেসে ওঠে। মতিবানুর পর একটা ছেলে হয়েছিলো আতমন্নেসার, সেই ছেলেটা পেটে থাকতে তার এরকম হতো। মনে হতো পেটের শিশু এবার বোধহয় হামাগুড়ি দিয়ে ওপর দিকে উঠছে। তখন তার কথাকে কি কেউ পাত্তা দেয়? ননদকে একদিন বলেছিলো, তা ফুলজান হেসেই অস্থির, সোবহানের বাপকে ডেকে বলে, 'অ মিয়াভাই, হুনছো? ভাবীর প্যাটের মইদ্যে কোন পীরসাব না শা'সাবে আইয়া খানকা বানাইছে! হুনছো? পীরসাব নিচ দিয়া বারাইবার চায় না। পীরসাবে ভাবীর সিনার মইদ্যে না উইঠা একখান ফাল পাড়বো তে এক্কেরে বারাইয়া পড়বো ভাবীর মুখের মইদ্যে দিয়া! আল্লারে আল্লা!'

—তা ননদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুনতে শুনতে তার খুব গোপন একটা সাধ হয়—এইবার ছেলে হলে তাকে মৌলবি বানাবে। কিন্তু সেবার পেট থেকে নিচে দিয়ে নামলো একটা মৃত শিশু। সেই শিশুর অনুচ্চারিত ওঁয়া ওঁয়া ধ্বনি কোন দূর পরপার থেকে তার কানে বাজে। এবার সেই রকম আওয়াজ করতে করতে পেটের দলাপাকানো বস্তুটি হুড়হুড় করে চলে আসছে ওপরের দিকে। এইতো এখন তার বুকে, বুকের ন্যাতানো স্তনে ঢেউ খেলে যায়, তারপর এইতো এখন তার গলার নিচে, এইবার—। এবার মাংসপিণ্ড বেরিয়ে আসছে গলা বেয়ে। বমি করার জন্য নিচু হয়ে চিলমচি টানতে যাবে, আতমন্নেসা চিলমচি আর হাতড়ে পায় না। সামনে এখন অন্ধকার,—ঘুরঘুইট্টা আন্ধার! তার চারদিকে পানির মতো চাপবাঁধা বাতাস। বাতাস কি পানিতে পরিণত হলো? পানি কি পাথর হয়ে জমে গেছে? নিশ্বাস নেওয়ার জন্য বাতাস পাওয়া যায় না। একটা শ্বাস এই নিলো তো সহজে ছাড়া যায় না, নাকের সামনে পাথর। আর কিছু দ্যাখা যায় না। চারদিকে পাথরে জমা

অন্ধকার ঘুরছে, অন্ধকারের ভেতর অন্ধকার। তার বলহীন হাত পা মাথামুণ্ডু বুক পিঠ-এপাশে ওপাশে ছড়িয়ে পড়ছে, অন্ধকারের নিচে আরো অন্ধকার গহ্বরে আতমন্নেসা ডুবে যায়।

শীতলপাটির নিচে চুনসুড়কির এবড়োখেবড়ো মেঝে পিঠে লাগে। এদিক ওদিক পানির ঝাপটা। তার চার-পাশে এতো লোক কেন? এসব কারা? চোখ সম্পূর্ণ খোলাও যায় না যে ভালোভাবে দেখে নেয়। বিছানার সঙ্গে জানলা কোথায়? জানলার ওপারে বারান্দা কোথায় বারান্দার ওপার উঠান পর্যন্ত আতমন্নেসা মনে করতে পারে না। তাকে চোখ মেলতে দেখে ফোঁপানিরত মতিবানু হাউমাউ করে ওঠে, 'জেতা রইছো, আম্মা জিন্দা রইছো, জিন্দা আছো গো আম্মা?'

'চিল্লাও ক্যান? চুপ করো।' সুলতান ডাক্তারের ধমক খেয়ে মতিবানু ফের ফোঁপানিতে ফিরে আসে। আতমন্নেসার চোখজোড়া আস্তে আস্তে সব দেখতে শুরু করে। এতো লোক কারা? এতো লোক কেন? এরা কারা?—হ্যাঁ, এইতো তার মেজো ছেলে খোরশেদ,—সুলতান ডাক্তারের কানের কাছে মুখ নিয়ে কি বলছে। এইতো বড়ো ছেলে সোবহান, আলমের কাছ থেকে একটা কাঁচের গ্লাস কেড়ে নিচ্ছে,—আঃ! পিচ্চিডার লগে কি করে!—সুলতান ডাক্তার কেন? মতিবানুর হাঁপানির টান কি বাড়লো? না কি তার নতুন কোনো উপসর্গ দ্যাখ্যা দিলো? না, মতিবানু তো তার কপালে হাত রেখে ফোঁপাচ্ছে। পাশে দাঁড়িয়ে হাসান আলি ওস্তাগার, তার পাশে আমীর পাগলার বৌ, পায়ের কাছে আহসানুল্লার মেয়ে ছুটকি। এতো লোকজন দেখতে দেখতে তার চোখ হয়রান হয়ে ঘুমে জড়িয়ে আসে। এরই ভেতর নিজের কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নেওয়ার জন্য আতমন্নেসার হাত এদিক ওদিক করে। কিন্তু শিথিল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বশে আসতে চায় না।

আতমন্নেসার জ্ঞান ফিরে আসার পরও সুলতান ডাক্তার নানাভাবে তাকে পরীক্ষা করে। ওষুধপত্র অসাবধানে রাখার জন্য মতিবানুকে সে একটু বকলো। মানুষের বার্ধক্য ও শৈশবের সাদৃশ্যের ওপর একটি বক্তৃতাও সে দিয়ে ফেলতো, কিন্তু আতমন্নেসার শরীরের বিভিন্ন খাদ, অভাব ও ঘোরতর অনিয়ম দেখে তার নিজেরই অবস্থা কাহিল। এই মহল্লায় তার প্র্যাকটিস আজ বহুদিনের; প্রথম দশ পনেরো বছর ছিলো ন্যাশনাল-পাশ মন্মথ ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার, মন্মথ বসাক ইণ্ডিয়া চলে গেলে সে পুরোপুরি ডাক্তার হয়ে বসেছে,—তা সেও বিশ বছরের কম নয়। এদের সবাইকে সে চেনে এদের জন্ম থেকে। সোবহান ও খোরশেদকে আড়ালে ডেকে সে বলে, 'তোমাগো মায়েরে একবার মেডিক্যাল লইয়্যা যাও!'

'ক্যান?' সোবহান বেশ বিচলিত হয়, 'মতির ওষুদ যা খাইছিলো ব্যাকটি না বারাইয়া গেছে।'

'এটা কোনো প্রবলেম না। মনে হয় তোমাগো মায়ের কঠিন ব্যারামে ধরছে।'

'কি ব্যারাম?'

'টেস্ট না কইরা কিছু কইতে পারি না। আমিও তোমাগো লগে মেডিক্যাল যামু। বড়ো ডাক্তারগো লগে কথা কইতে হইবো।'

ডাক্তার চলে যাওয়ার পর সিতারা এক গ্লাস গরম দুধ নিয়ে এলে আতমন্নেসা বড়ো কাচুমাচু হয়ে বলে, 'আমার লাইগা আবার দুধ লইয়া আইছো ক্যান?' অপরাধে সে একেবারে নুয়ে পড়ে, 'মতিবানুর লাইগা রাখছো? আলমে খাইবো কি?'

পরপর কয়েকটা দিন একবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, একবার বাড়ি—এই করে কাটে ওদের। সোবহান মেডিক্যাল কলেজ যায় সকালে, আটটার আগেই মাকে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে। একটু বেলা করে যায় খোরশেদ, সোবহান তখন ফেরে ওর বেকারিতে। ডাক্তারদের তোয়াজ করা, নার্সদের সামলানো—এসব দ্যাখে খোরশেদ। তারপর সোয়া দুটো আড়াইটের দিকে নিজেই একটা রিকশা করে মাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যায়। পয়সা বেরিয়ে যাচ্ছে পানির মতো। কতোরকমভাবে আতমন্নেসার পরীক্ষা চলছে। তার বুকের ভেতরকার রহস্য এবং তার পেটের অন্তর্গত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কুশল জানবার জন্য ছবি তুলতে তাকে নিয়ে গিয়েছিলো একটা একটু-অন্ধকার ঘরে। সেই ঘরের বারান্দায় বেঞ্চে বসে থাকে সারি সারি রোগী। আর ঘরে যন্ত্র লাগিয়ে আতমন্নেসার ভেতরকার ছবি তোলা হয়। তার হৃদপিণ্ডের মাপ নেওয়ার জন্য তার বুক পিঠ হাত পা সব ফিতে দিয়ে বেঁধে ওরা কিসব করলো। আতমন্নেসা ঠিক সাজিয়ে বলতে পারে না, একটার সঙ্গে আরেকটা বড্ডো গুলিয়ে ফেলে। বাড়ি ফিরে সে হাঁপাতে হাঁপাতে গোঙায়, 'মতি, অ মতি, কি করস? অ বৌ, কি করো? আউজকা না আমারে একটা ঘরের মইদ্যে লইছে, বুঝলি, ঘুরঘুইট্টা আন্ধার বুঝলি?—একটা বেটায় না কয়, আপনের রক্ত লমু। আমি না ডরাইয়া গেছি! আমার খালি গতর কাঁপে!' মেলা-দেখে-আসা ছোটো মেয়ের মতো কোনটা আগে বলবে সে বুঝতে পারে না, 'অ মতি, আউজকা না খোরশেদে আমারে একটা ঘরের মইদ্যে লইয়া গেছে, বুঝলি? হি হি, কিসব ফিতাফুতা দিয়া আমার বুক বান্দে, পিঠ বান্দে, হাত পাওয়ের উংলি ভি বান্দে, কি করবো? না, আমার কলিজার মাপ লইবো! হি হি!' খুশিতে আতমন্নেসার নিশ্বাস নিতে রীতিমতো বেগ পেতে হয়।

ডাক্তাররা শেষ পর্যন্ত জানায় যে অপারেশনের সময় পার হয়ে গেছে; না, টিউমার না, টিউমারের বাবার বাবা, ক্যান্সার। এখন কিছু করার নেই, মাঝে মাঝে হাসপাতালে নিয়ে রেডিও থেরাপির ফুঁ দিয়ে মরণকে যতোদিন ঠেকানো যায়!

বাড়িটা রাতারাতি মন্থর হয়ে গেলো। সিতারার নীরব ও সরব মুখ ঝামটানি আপাতত স্থগিত। মতিবানুর রঙ-ঢঙ সোহাগীপনা সব শেষ। মেয়েটা কেবল কথায় কথায় ফুঁপিয়ে কাঁদে, 'অ আম্মা, আম্মাগো, কি বিমারি ধরলো তোমারে!'

'আমি কই নাই?' গোঙাতে গোঙাতে জবাব দেওয়ার সময় আতমন্নেসার পান-খেতে-না-পারা ফ্যাকাশে ঠোঁটের কোণে ছোটো একটু গোলাপি মিষ্টি হাসি চিকচিক করে, যেন বাজি রেখে সে জিতে গেছে, 'আমি তগো আগেই কইছিলাম!'

খবর পেয়ে বড়োমেয়ে তার নিজের ও তার সতীনের এক গাদা ছেলেমেয়ে নিয়ে এসে হাউমাউ করে খানিকটা কাঁদলো। আতমন্নেসা বলে, 'অ নুরু, তর জামাইরে আইতে কইস! খানদানী ঘরের মানুষ, দাওয়াইগুলি চিনবো, কতো দাওয়াই দিছে, দ্যাখস না?'

দিনে দিনে পেটের ব্যথা বাড়ে। রোজ কয়েকবার বমি হয়। বেশি পরিমাণে বমি হলে পেটের ব্যথা থিতিয়ে ভোঁতা হয়ে আসে। পাতলা তন্দ্রায় তখন শরীর শিথিল হয়। পেটের অবাঞ্ছিত মাংসপিণ্ডের হৃদস্পন্দন অনুভব করার জন্য কিংবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আতমন্নেসা নিজের পেটে আস্তে আস্তে হাত বুলায়। প্রথমবার যখন সে গর্ভবতী হলো সোবহানের বাপ তখন কোনো কোনো রাত্রে এমনি করে হাত বুলিয়ে দিয়েছে, কি জানি হয়তো একদিন দিয়েছিলো কিংবা দু'দিন—মনে নাই। সে যে কতোদিন হয়ে গেলো, কতোকালের কথা! সময়টা কিছুতেই ঠাহর করা যায় না, মেলে না, কোনো হিসাব মেলে না। বছরের হিসাব মেলাতে গেলে তার মাথা ঘোরে, বমি বমি লাগে, বমি করার পর ঘুম পায়। ঘুমের মধ্যেও তার এক হাত থাকে নিজের পেটের ঐ জায়গায়। হাত মাঝে মাঝে সরে যায় কিংবা কাঁপে—। সোবহানের বাপ তার পেটে হাত বোলাতে বোলাতে—পেটে না পিঠে?—একটা শাড়ি ঘেরা রিকশায় করে তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে—রূপমহল না মায়া—কি একটা হলের নাম ছাই মনেও থাকে না, কি একটা খেল দেখতে। কি খেল? না মনে নাই। ইণ্টারভ্যালের সময় মেয়েদের ক্লাসের আয়া এসে হাতের ভেতর চিনেবাদামের ঠোঙা গুঁজে দিলো,—'আলুবাজার থন আইছো না? তোমারে পাঠাইয়া দিছে।'—শুনে আশেপাশের মেয়েদের কি হাসি।—ছবি শেষ হলে বাড়ি ফেরার সময় সোবহানের বাপ জিগ্যেস করে, 'হায় হায় একটা বাদাম ভি খাও নাই?' 'অতোগুলি মানুষের সামনে ক্যামনে খাই?' 'হায় রে, মানুষ কই দেখলা, তোমার আগেপিছে ব্যাকটি তো মাইয়ামানুষ! হায়রে বিবি আমার, বাঙ্গুবিবি একখান!' 'হ বাঙ্গুই তো, বাঙ্গুই ভালো!'—ঘুমের মধ্যে সোবহানের বাপ পেটে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে পাছার নিচে থেকে রিকশার সিট কখন সরে যায়, এখন ঘোড়ার গাড়ি করে সদরঘাট থেকে ফিরে যাচ্ছে আলুবাজারের দিকে।—জানলার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে রাস্তা দেখছে আতমন্নেসা। সোবহানের বাপ চিনিয়ে দেয়, 'এইটা চিনো? ঐটা চিনো?' কোন একটা হলের সামনে কোন বায়োস্কোপের মস্ত বড়ো ছবি। একটা মেয়ে মস্ত বড়ো গাছের সঙ্গে দোলনা বেঁধে দোল খাচ্ছে। এতবড়ো মেয়ে, লজ্জা-শরম যদি একটু থাকে। মেয়েটা দোলে। এদিক দোলে ওদিকে দোলে, এই দ্যাখা যায় একেবারে আতমন্নেসার মুখের সামনে, আবার সরে যায় খানিকটা দূরে। দুলছে, দুলতে দুলতে মেয়েটা দুলছে—।

'আম্মাগো, যাই গিয়া, অ মা!' বড়োমেয়ের ভিজে কণ্ঠস্বরে আতমন্নেসা ঘুম থেকে তন্দ্রায় আসে।

'যাওন নাই!' নিজের খসখসে স্বরে তার তন্দ্রাও ছিঁড়ে যায়, কিন্তু ঘোর কাটতে চায় না। জড়ানো চোখ মেলে ডানদিকে তাকায়, ডানদিকে একটা টুল। টুলের ওপর ওষুধপত্রের লম্বা রোগা মোটা ও বেঁটে শিশি বোতল, ট্যাবলেটের পাতা, টয় গ্লাস, থার্মোমিটার, হটওয়াটার ব্যাগ, আইস ব্যাগ। আতমন্নেসা নিজের অবাধ্য চোখজোড়া প্রায় ধাক্কা দিয়ে সম্পূর্ণ খুলে দ্যাখে, না সব ঠিক আছে। ঐ এক পাশের শিশিটা কি সুন্দর! ওটা একেবারে ধারে রেখে দিলো কে? কার হাত লেগে পড়ে যাবে, দ্যাখো তো! তবু সারি সারি ওষুধ কি সুন্দর দ্যাখায়! না, সব ঠিক আছে! কিন্তু পোড়ার চোখ কি বশে থাকে? কিছুতেই খোলা রাখা যায় না। ওষুধের দিকে দেখতে দেখতে তার চোখ বুঁজে আসে, অন্ধকার জগৎ ফের দুলতে শুরু করে। নিজেই দোলনায় দুলতে দুলতে জড়ানো গলায় আতমন্নেসা জামাইয়ের প্রতি সাদর নিমন্ত্রণ পাঠায়, 'অ নুরু! দামানরে আইতে কইস! কইস আমার বহুত কঠিন বিমার হইছে, একদিন আইয়া দেইখা যাইবো। বহুত কঠিন বিমার!'

১৯৭৫

তারা বিবির মরদ পোলা

ভেতর থেকে তারাবিবির একটানা সংলাপ কানের ফুটো দিয়ে মাথায় ঢুকে এলোমেলোভাবে আঁচড়াতে শুরু করলে গোলজার আলির সাজানো গোছানো রাত্রিবেলাটা একেবারে তছনছ হয়ে গেলো।

অথচ সন্ধ্যা থেকেই চারদিকে সব ভালোই ঠেকছিলো। আজ তার দোকান বন্ধ। মাইক-টাইক যা আছে এক কলেজের কি একটা ফাংশনে সব ভাড়া করে নিয়ে গেছে। দুপুরে ভাত খাওয়ার পর লম্বা একটা ঘুম দিয়ে ও গেলো ফকিরচাঁদের আজাদ রেস্টুরেন্টে। শীতের সন্ধ্যায় ঘুম-দিয়ে-ওঠা টাটকা চোখ-মুখ আবার কবে পাওয়া যায় কে জানে! ঘুমভাঙা মুখে কড়া-সেঁকা দু'টো শিককাবাব খেয়ে বেশ আয়েস করে চা খাচ্ছে, দোকানে ঢুকলো আসাদুল্লা। পিরিচে চা ঢেলে ঠোঁটের কাছে পিরিচ তুলে আসাদুল্লা বলে, 'জলদি খা, তরে আমি বিচরাইয়া মরি। চল মুন সিনেমায় যাই।'

মুন সিনেমা থেকে বেরোবার সময় গোলজার আলি একেবারে পূর্ণ শরীর নিয়ে পা ফেললো। এরকম ছবি সে অনেকদিন দ্যাখেনি। ইংরেজি ছবি—কথাবার্তা কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু মুখের ভাষায় কি এসে যায়? কথা যা হলো সব হাত দিয়ে। খালি ঘুষি আর হাতাহাতি। একেকটা ব্লো দ্যাখো, হাজার টাকা, লক্ষ টাকা দাম। নিজে সে মারামারিতে পটু নয়, কিন্তু যাদের সঙ্গে দিনরাত তার ওঠা-বসা তারা প্রায় সবাই ঐ লাইনের। আজকাল রিভলভার আর স্টেনগানের যুগে তাদের সেই দিনও নেই, সেই হাতও আছে কি-না সন্দেহ। কিন্তু এই ছবিতে মানুষের হাতের যে ওস্তাদি দ্যাখা গেলো তাতে সে একেবারে অভিভূত। হাঁটতে হাঁটতে বড়ো রাস্তায় পা দিয়ে আসাদুল্লা বলে, 'ল, গঙ্গাজলিটার মইদ্যে একটা পাক দিয়া যাই। আউজকা তরে বউনি করাইয়া দেই।'

'না ওস্তাদ।'

'তে চল, এ্যাম্বে বইয়া থাকবি, এক বোতল মাল টানবি, আমি কাম সাইরা বারাইয়া আহুম চল।'

'না ওস্তাদ।'

'যা, ঘরে গিয়া বৌয়ের বুনি চোষ গিয়া।' আসাদুল্লা চটে যায়, 'তরে মানুষ করতে পারলাম না গোলজার!'

মানুষ হওয়ার তেমন ইচ্ছাও গোলজারের আছে কি-না সন্দেহ। আসাদুল্লা চলে গেলে সে সোজা পথ ধরে হাঁটতে লাগলো। সত্যি, এরকম ঘুষির দৃশ্য,—সে এতোকাল ছবি দেখে আসছে তার বেশির ভাগই তো ফাইটিং খেল—কিন্তু না, এরকম কোনোদিন দ্যাখেনি। একটা ব্লো আরেকটার সঙ্গে ধাক্কা খায়, ঘন ঘন সংঘর্ষ হচ্ছে, কেবল টক টক টক টক আওয়াজ। ঘরে গিয়ে সখিনার সামনে কি করে এই ঘুষিসমূহের একটা বায়বীয় প্রদর্শনী দ্যাখাবে সেই নিয়ে সে নানারকম ফন্দি আঁটে আর যতোবার একটু ওপরে তাকায় দ্যাখে সমস্ত আকাশ জুড়ে সিনেমাস্কোপের পর্দা টাঙানো, সেখানে শক্ত-সমর্থ সব জোড়া জোড়া হাত ঘুষির মুদ্রা করে নাচন দ্যাখায়। এমনি করে ঘুষির নৃত্য ও টকটকাটকটক সঙ্গীতে আপ্লুত হয়ে গোলজার তার বাড়ির সামনে চলে আসে। তাদের বাড়ির সামনে খসে খসে পড়া পাতলা ইটের ফ্রেমে মস্ত বড়ো কাঠের দরজা। এই দরজা খুব মোটা, খুব পুরনো ও ছিদ্রসমৃদ্ধ। একটি অন্যতম ছিদ্রে মুখ লাগিয়ে সে স্ত্রীকে ডাকতে যাবে, এমন সময় তার কানে আসে তারাবিবির দীর্ঘ ক্ষোভধ্বনি, 'তুমি তো একখান মরা মানুষ! তামামটা জিন্দেগী ভইরা খালি বিছানার মইদ্যেই পইড়া রইছো, একটা দিন বুঝবার পারলা না আমি ক্যামনে কি পেরেশানির মইদ্যে ঘরবাড়ি চালাই। কি একখান পোলারে প্যাটে ধরছিলাম, হায়রে আল্লা, হাসরের দিন আমি আল্লারে কি জবাব দিমু? রাইত হইছে বারোটা না একটা, ঘরের মইদ্যে অরে পাইবা না। কৈ কৈ কার লগে রঙ কইরা বেড়ায়, আমি জানি না, না?' এই সংলাপে গোলজার আলির সারাটা সন্ধ্যা, ব্লো-ফাটানো রঙিন চলচ্চিত্র, রাস্তায় নিয়নের আলোতে ঘুষির নাচন—সব একেবারে ঘোলা হয়ে যায়। নিজেকে আর নিজের দখলে রাখতে ইচ্ছা করে না, নিজের বিবেচনা ও সুখ-দুঃখের সমস্ত দায়িত্ব অন্ধকার ল্যাম্পোস্টের নিচে হলদে-কালো নালায় গড়িয়ে দেওয়ার জন্য সে আকুপাকু করে।

'আলি হোসেনের বৌ—এক্কেরে বেশরম মাগীটা—অর লগে কিসের গুজুরগাজুর, ফুসুরফাসুর, আমি বুঝি না, না?' অপরিসর উঁচু বারান্দায় বসে মা জননী তার ফের নতুন বাক্য গঠন করে, একেকটা বাক্য আরেকটার চেয়ে তীক্ষ্ণ, প্রত্যেকটি পরবর্তী-বাক্যে মায়ের সন্দেহ প্রবণতা প্রায় প্রমাণে পরিণত হয়।

'কামের মাতারি রাখবা তো দিনরাইত খালি তার লগেই রঙ, তার লগেই কথা। "সুরুজের মাও, পানি লও; সুরুজের মাও, আমার গাঞ্জি কই? সুরুজের মাও, নাশতা দাও।"—ক্যান?—অর বৌ আছে না?'

আর কতো? বুকে হাত দিয়ে দরজার একটা ফুটোয় মুখ রেখে গোলজার তার স্ত্রীকে ডাকে, 'সখিনা।' একটু পর 'কে?' বলে উত্তরের অপেক্ষা না করে সখিনা এসে দরজা খুলে দেয়। দরজা খুলে সে একটুও দাঁড়ায় না। এই দরজার পর কয়েক হাত ঘাসগজানো কাঁচাপাকা জায়গা, তারপর উঁচু বারান্দা। বারান্দা একেবারে

স্তব্ধ। গোলজার আলি এখন দরজা বন্ধ করছে বলে তার পিঠ বারান্দার দিকে ফেরানো। দরজা বন্ধ করতে যতোটা সময় নেওয়া যায় ততোই ভালো। খিল লাগিয়ে একবার খুলে ফের লাগাচ্ছে। সমস্ত বাড়িতে এখন কেবল দরজা বন্ধ করার আওয়াজ। এই কাজ শেষ হলে মুখ ঘুরিয়ে গোলজার দেখলো বারান্দা জনশূন্য। ভালোই। মায়ের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার সময় আরো খানিকটা পিছিয়ে গেলো। কিন্তু বারান্দায় ওঠবার পাঁচটা ধাপ দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যায়। এরপর একটা উঁচু দরজা দিয়ে ঘরটায় ঢুকে তারাবিবিকে অতিক্রম করে তাকে নিজের ঘরে যেতে হবে। তারাবিবির ঘর বেশ লম্বা। অন্ধকার বারান্দা থেকেও তার আলোকিত ঘর ঘোলাটে হলুদ মনে হয়। ঘরে ঢুকে প্রথমে চোখে পড়ে উঁচু ছাঁদের অনেক নিচে অন্ধকার বলে যে জায়গাটাকে বস্তুহীন খাদ বলে ভুল হয় সেখানে কাঠের ল্যাম্পোস্টের মতো এবড়োখেবড়ো ও বাঁকাচোরা শরীর কাঁপাতে কাঁপাতে পাশ ফিরছে রমজান আলি। পাশ ফিরতে ফিরতে তার আশি কি বিরাশি বছরের ঝরঝরে কাঠামোর ভেতর থেকে অপরিশোধিত কাশির একটা দমক বয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু সেরকম কিছু হয় না। আলো তার সহ্য হয় না, তাই ঝুলন্ত বাল্বের একটা দিক কাগজ দিয়ে ঢাকা। ঘরের উল্টো কোণে জলচৌকিতে বসে পান সাজছে তারাবিবি। তার গা ঘেঁষেই গোলজার নিজের ঘরে যায়। ঘরের বিপরীত প্রান্তের তক্তপোষ থেকে রমজান আলির শ্লেষ্মার পরতে জড়ানো কণ্ঠস্বর সমস্ত ঘর জুড়ে ঘর্ঘর করে ওঠে, 'খিড়কি-উড়কি লাগাইছো?'

'তোমার কইতে হইবো?' তারাবিবির এই জবাব শেষ হতে না হতে গোলজার নিজের ঘরে পৌঁছে যায়।

'পালাঙের তলা দেখছো?' রমজান আলীর দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব শোনবার আগেই গোলজার আস্তে করে দরজা বন্ধ করে দিলো।

গোলজারের ঘরের মেঝেতে লাল শালুর বর্ডার দেওয়া ছেঁড়া শীতলপাটিতে ভাতের গামলা, তরকারির বাটি ও একটা পিরিচে আলুভর্তা, কাঁচামরিচ ও নুন। শীতলপাটিতে বসে ভাত-তরকারি খেতে খেতে গোলজার বলে, 'মায়ে খুব চালাইলো, না?' জবাব না দিয়ে সখিনা বিছানার মশারি টাঙায়, বালিশ সাজায় এবং একই চাদর শতবার সোজা করে। সখিনার প্রায়-ফর্সা ও গোল মুখ বড়ো থমথমে। সেই মুখে যদি একটু রোদ খেলানো যায় এই আশায় গোলজার আলি বলে, 'তুমি আমার লগে এট্টু খাইবা?' জবাবের আশা না করেই সে খলসে মাছের কাঁটা বাছে। বাছতে বাছতে বলে 'মাছটা নরম হইয়া গেছিলো, না?' কিন্তু নরম মাছে তার অরুচি দ্যাখা যায় না। সে অনেকক্ষণ ধরে খাচ্ছে। মাথা নিচু হতে হতে বুকের ওপর এসে ঠেকেছে, খাটের স্টাণ্ড ধরে দাঁড়িয়ে সখিনা আড়চোখে তাকায়, খেতে খেতে গোলজার কি ঘুমিয়েই পড়লো নাকি? মাগরেবের নামাজ পড়ে জায়নামাজ ভাঁজ করতে করতে তারাবিবি সেই যে শুরু করেছিলো, আল্লারে আল্লা! সেই একটানা বকে যাওয়া শেষ হলো এই একটু আগে। বড়ো রাস্তায় বাস চলার

ধ্বনি কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে মোড়ের রেস্টুরেন্টে বাজতে-থাকা গান আরো বিকট হয়, এগারো নম্বর বাড়ির খাদেম পাগলার বিরতিহীন চিৎকার এবং সর্বোপরি এই অঞ্চলের হৃৎস্পন্দন—কোনো কিছুই আর স্পষ্ট ও আলাদা করে ঠাহর করা যায় না।

গোলজার বলে, 'মায়ে খুব প্যাচাল পাড়ছে, না?'

গোলজার আলি ফের বলে, 'মায়ে তোমারেও কিছু কইছে?'

'আমারে তুমি মীরকাদিম রাইখা আহো। নাইলে মিয়াভাইরে সোম্বাদ দাও, আইসা লইয়া যাইবো।'

খাওয়া হয়ে গেলেও ভাতের কয়েকটা দানা নিয়ে গোলজার আঙুলে আঙুলে নাড়াচাড়া করে। সখিনা বলে, 'আমার আর ভালো লাগে না। আর কতো সইজ্য করুম?'

সখিনার এই কথায় এক ধরনের অভিমান গোলজারের বুকে পাতলা শ্লেষ্মার মতো জমে ঃ তার মায়ের এই ব্যবহারে সবচেয়ে ভোগান্তি হওয়ার কথা তো তার নিজের, গোলজার আলির। তার নিজের বৌও তার কষ্টের ভাগ নিতে অস্বীকার করে। এই নতুন প্রতিক্রিয়ায় তার আড়ষ্টতা কাটে। খাটের তলা থেকে চিলমচি টেনে হাত-মুখ ধোয়, খক খক করে গলা পরিষ্কার করে, তারপর পা ঝুলিয়ে বিছানায় বসে সখিনার হাত থেকে পান নেয়। সখিনা এঁটো থালাবাসন নিয়ে জমা করছে ঘরের এককোণে। এই কাজের মধ্যেই নিচু ও তীব্র খাদে তার মুখ চলে, 'আমরা গেরাইম্যা মাইয়্যা, ছোটো লোকগো ঘর থন আইছি, তোমাগো খান্দানী ঘরের জামাইরে বাইন্দা রাখি ক্যামনে?'

তার স্ত্রী যে গ্রামের মেয়ে এজন্য গোলজার আলির কোনো দুঃখ নেই, কিন্তু তার মায়ের এই কথাটা বলার মধ্যেও সে আপত্তির কোনো কারণ দেখতে পায় না। তবে তার স্ত্রীকে বিরূপ করার একটু ইচ্ছাও তার কোনোদিন হয় না। চেষ্টাচরিত্র করলে সন্ধ্যাবেলাটা এখনো জোড়াতালি দিয়ে নিয়ে আসা যায়।

'তোমার জামাইরে বান্দবা কেমুন? আমি কি তোমারে ছাইড়া দিছি? তুমি কইতে পারলা না?'

'কি কই?'

সখিনা তার শাশুড়িকে কি বলতে পারে? গোলজার আলি সখিনাকে বহুদিন আগেই জানিয়ে দিয়েছে সে সন্দেহপ্রবণতা তার মায়ের অনেকদিনের অভ্যাস। সখিনার এই অভিজ্ঞতা প্রথম হয় বিয়ের মাস তিনেক পরই। একদিন এই ঘরে গোলজার, সখিনা এবং গোলজারের বন্ধু আলি হোসেন ও আলি হোসেনের বৌ রাবেয়া সারাটা বিকাল জুড়ে খুব গল্পগুজব করে। যেমন আলি হোসেন, তেমনি তার বৌ—দু'জনেই খুব জমাতে পারে। আলি হোসেন মানুষের বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি নকল করতে ওস্তাদ—তোতলা মানুষের কথা, শিশুর কান্না, কুকুর-বিড়ালের ডাক এমন কি বোতলের ছিপি খোলার শব্দ, ঘড়া থেকে পানি গড়াবার আওয়াজ—সব দ্যাখাতে পারে। রাবেয়াও খুব সপ্রতিভ মেয়ে। একবার আলি হোসেনকে থামিয়ে

সে গোলজারকে বলে, 'অ গোলজার ভাই, অহন আপনের দোস্তের নাক ডাকাটা দ্যাখাইয়া দেন তো!' তারপর সে নিজেই তার স্বামীর নাক ডাকা থেকে শুরু করে কলা খাওয়ার ভঙ্গি পর্যন্ত দেখিয়ে দিলো। সখিনা তার জীবনে এই প্রথম একনাগাড়ে এতক্ষণ ধরে হাসে। হাসতে হাসতেই সন্ধ্যা হয়, সন্ধ্যার পর রাবেয়া বোরখা পরে আলি হোসেনের সঙ্গে বাড়ি চলে গেলো। গোলজারও ওদের সঙ্গে বাইরে যায়। ওদের চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারাবিবি সখিনাকে ডাকে, 'অ বৌ! এতো হাসি কিয়ের?'

আলি হোসেন ও রাবেয়ার বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি মনে করে সখিনা মুখে আঁচল দিয়ে ফের হেসে ফেলে, 'আম্মা ঐ বৌটায় যে কেমুন করে না! দেইখা হাইসা বাঁচি না!'

কিন্তু তারাবিবির মুখ খুব গম্ভীর। সে বেশ কালো, বেশ লম্বা ও মোটা। তার পরনে তখন কোনো জামা নেই, শাড়িটা বুকে পেঁচিয়ে পরা। গরমে সে হাঁসফাঁস করে। একটু পর সখিনা টের পায়, এই হাঁসফাঁসটা সম্পূর্ণ গরমের জন্য নয়, তারাবিবি খুব রেগে গেছে।

'বৌ, খাল কাইটা কুমীর ডাইকা আইনো না, বুঝলা?'

'জী?'

'খাল চিনো না?' তারাবিবি অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে 'গেরাইম্যা মাইয়া তুমি খাল চিনো না? খালের ধারে হাগামোতা কইরা মানুষ হইছো, আউজকা খাল চিনবার পারো না?'

এরকম অপ্রাসঙ্গিকভাবে তাকে ছোটো করার পর তারাবিবি আসল কথা পাড়ে, 'ঐ বেশরম মাইয়াটারে চিনো?'

'আলি হোসেন ভায়ের বৌ।'

'আরে আমারে চিনাইতে চাও? খাদেম পাগলার মাইয়ারে আমি চিনি না, না? আমার গোলজারের লগে লাগাইয়া দিবার লাইগা খাদেম পাগলার ভাই কতো তদবির করছে। গোলজারের নজরখানও তো আছিলো ঐদিকেই। দেইখো বৌ, নিজের লোকসান কইরো না। দেখলা না, বেগানা মরদের লগে কেমুন হাইসা হাইসা কথা কইলো, দেখলা না?'

সেই রাত্রি গোলজারের জন্য খুব খারাপ। সখিনা কোনো কথা বলে না, কোনো কথাতে তার কোনো সাড়া নেই। বিছানায় ফেলে অনেক কষ্টে গোলজার তাকে চুমুটুমু খাওয়ার পর সে কাঁদতে শুরু করে। কাঁদতে কাঁদতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে সখিনা তার বিবাহিত জীবনের প্রথম আঘাতের কথা বললো।

'তুমি আমার কপালডা পুড়াইবা? আমার বাপজানে বহুত হাউস কইরা বিয়া দিছে, তুমি এইগুলি কি করো, এ্যা?'

সখিনার কথার ফাঁকে ফাঁকে গোলজার জিগ্যেস করে, 'তোমারে আম্মায় কইছে?'

'হ।'

'আমায় কি কইতে কি কইছো! তুমিও একটা পাগলি কি বুঝছো!' কিন্তু এতে কোনো কাজ হয় না। অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে গোলজার দ্যাখে, বালিশে মুখ গুঁজে, কখনো খাটে বসে দুই হাঁটুতে মুখ ঢেকে সখিনা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তাকে জেগে উঠতে দেখে সখিনা অন্যদিকে মুখ করে শোয়। তার পিঠ ফুলে ফুলে উঠছে, তার পিঠে শাড়ি নেই, ঘামে ব্লাউজ ভিজে চপচপে। সেদিকে দেখতে দেখতে হঠাৎ অবিরাম একটা আওয়াজ কানে এলে সমস্ত শরীরকে একটিমাত্র অবিভাজ্য অঙ্গে পরিণত করে গোলজার লাফ দিয়ে উঠলো। তারাবিবির কান্নার শব্দ দেওয়াল ও দরজা ছুঁয়ে এই ঘরে এসে পড়ছে। পা টিপে টিপে গোলজার ঘরের আরেক মাথায় গিয়ে আস্তে আস্তে দরজা খুললে সেই শব্দ গলগল করে ঘরে ঢোকে। তারাবিবি গভীর ঘুমে অচেতন, তার নাক ডাকার শব্দ একটি নিয়মিত ধ্বনিপ্রবাহ হয়ে এই ঘরে আসতে আসতে একটি অবিচ্ছিন্ন বিলাপে পরিণত হয়েছে। দরজা বন্ধ করে গোলজার ফের শুয়ে পড়ে। তারাবিবির কান্নায় সমস্ত ঘরের শূন্যতা ফের লবণাক্ত হয়। গোলজারের একঘেয়ে জীবনের শৈশবের শেষ ভাগ, কৈশোরের পুরোটা, এমন কি যৌবনকালের প্রথম অংশ তো তারাবিবির কান্না দিয়েই বিরতিময় ছিলো। বাকিটা? পাশে-শোয়া সখিনার ফোঁপানি কমে এসেছে। গোলজারের ভয় করে, তার জীবনের বাকিটাও কি কান্নাকাটি দিয়েই চিহ্নিত হবে? সখিনার ভিজে পিঠে হাত রাখলে গোলজারের ভয় খানিকটা কমে। তার পাশে সুখদুঃখসমৃদ্ধ রক্ত-মাংসের একটা মেয়েমানুষ। এখানে আগে ছিলো পাতলা তোষকের ওপর ময়লা সবুজ চাদর। ওপরে মস্ত উঁচু ছাদ, ছাদের নিচে গভীর খাদের মতো বেঢপ আকারের বড়ো এই ঘর। ঐ ছাদের ওপর আগে আরো ঘর ছিলো। গোলজার আলি খুব ছেলেবেলায় সেখানে গেছে বলে আবছা আবছা মনে পড়ে। কিন্তু ওপরতলায় হাঁটলে মেঝে কাঁপে বলে গোলজার আলির জন্মের আগে থেকেই সেখানে কারো বসবাস নেই। দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির ওপরকার কয়েকটা ধাপ খসে পড়ায় ওঠার পথও বন্ধ। ওপরতলায় এখন পোকামাকড় ও ইঁদুর-ছুঁচোর একচ্ছত্র অধিকার। কোনো কোনো রাতে এইসব জীবজন্তুর ব্যস্ত ও দ্রুত চলাচলের সরসর শব্দ ছাদ বেয়ে বৃষ্টির ধারার মতো পড়তে থাকে। এই নির্জলা বৃষ্টিধারার সঙ্গে পাশের ঘরের তারাবিবির বিলাপ, কিছুক্ষণের জন্য রমজান আলির ধমক ও তারাবিবির গোঙানি একাকার হয়ে রূপলাভ করতো একটি অখণ্ড বস্তুতে এবং তার ধাক্কায় গোলজারের শরীরের নিচেকার খাট, তার চারপাশের দেওয়াল, শরীরের ওপরকার মশারি ও ছাদ কোথাও সরে গিয়ে গোলজারকে একেবারে নিরাশ্রয় করে দিতো। গোলজারের রক্ত ও মেদ শুকিয়ে তার শরীরটা পড়ে থাকতো একটি ছায়ার মতো। তার ছায়া-শরীরের চারপাশে কোনো বস্তু নেই, কেবল ছায়া। ওপরে মশারি, মশারির ওপর ছাদের ছায়া, পাশে দেওয়াল ও শূন্যতার ছায়া, রাত্রিকাল ও অন্ধকারে ছায়া—এই সমস্ত ছায়া তাকে সম্পূর্ণ কব্জা করে ফেললে গোলজার আলী ফের ঘুমিয়ে পড়েছে। আবার কোনো কোনো রাত্রে

তারাবিবির বিছুটি পাতার মতো খসখসে কণ্ঠস্বরে তার ঘুম ভেঙে গেছে, অনেকক্ষণ জেগে থেকে সে বুঝতে পারে, তারাবিবি রমজান আলিকে জাগাবার চেষ্টা করছে, 'অ গোলজারের বাপ! এক্কেরে লাশটা হইয়া রইছো, না? আরে বুইড়া মরদ, খাটিয়ার লাশটাভি লড়েচড়ে, তোমার লড়ন নাই? বিছানা জুইড়া ভ্যাটকাইয়া রইছো, অ গোলজারের বাপ!' এরপর রমজান আলি হয় চুপ করে থাকবে, নইলে উঠে তার বালিশের কাছ থেকে হাতপাখাটা নিয়ে বৌকে পেটাতে শুরু করবে. 'খানকি মাগী, তর মরদানি দ্যাখনের খাউজানি উঠছে, না? র। তরে মরদ দ্যাখাই। তর হাউস মিটাইয়া দেই, আয়।' রমজানের দাঁত-পড়া, ঘুম ভাঙা মুখের বাক্য ভালো করে তেতে ওঠবার আগেই মিইয়ে পড়ে, তার হাড্ডিসার হাত দেখতে দেখতে ক্লান্তিতে নুয়ে আসে। তখনি তার বয়স পঁয়ষট্টির ওপর। সারাটা দিন তার অনেক খাটাখাটনি। তাদের ওপরতলায় আর ভাড়াটে বসানো যায় না; মেরামত করবে, সে পয়সাও নেই। তার একমাত্র ভাই মহরম আলি তাদের পৈতৃক আরজু ডেকোরেটার্স দখল করে বসেছে. একমাত্র সম্বল তার মাইকের দোকান—মাইক, রেকর্ড ভাড়া দিয়ে ভালোই চলছিলো, কিন্তু আজকাল এসব দোকানের লেখাজোকা নেই, ঘোরাঘুরি না করলে খদ্দের পাওয়া যায় না। রমজান আলির শরীর টেকে কি করে? কখনো কখনো গোলজারের রাগ হতো, বুড়ো বয়সে বৌ মরলে রমজান ফের বিয়েটা না করলেই পারতো। তারাবিবি রমজান আলির দ্বিতীয় স্ত্রী, আগে তার কি ধরনের শালী হতো। আগের পক্ষের মেয়েরা তারাবিবিকে এখনো খালা বলে ডাকে। গোলজারের ঐসব সৎ বোনদের ছেলেরা গোলজারের সামনে ঠাট্টা করে, 'অ মামু,' তাদের তিনজনই গোলজারের বড়ো, দুজনের জন্ম তারাবিবির বিয়ের আগে, 'মামুজান, নানায় হালায় এই বিয়া যহন করছে তহনই তো ষাইট বছইরা বুইড়া। পঁচিশ বছরের ছেমরিটারে লইয়া বুইড়ার বহুত মুসিবত, না মামু? বহুত মেহনত হয়, না?' এই বিয়েটা না করলে রমজানের এই রাত্রিবেলার ভোগান্তিটা হতো না। অনেক রাত্রে তারাবিবি যখন তার মাঝখান-দিয়ে-চেরা গলায় একাই কোরাস-স্বরে চিৎকার করতো, 'আরে বুইয়া মড়াটা! এক্কেরে কব্বরের মইদ্যে ঢুকছো? আরে খাড়াও, জানাজাটা পইড়া লই, জানাজা না লইয়া কব্বরে যাইবা, আজাব হইবো না?'—গোলজারের হৃৎপিণ্ডটা তখন ছিটকে পড়তো চারিদিকে ঃ বাপে হালায় বুইড়া হইয়া বিয়াটা না করতো তে জিন্দেগীতে দুনিয়ার মইদ্যে পয়দাই হইতাম না!—পৃথিবীতে কোনোদিন না আসবার সেই সুখ থেকে তাকে বঞ্চিত করাটাও বাপের পক্ষে খুব অন্যায় কাজ হয়েছে। সেই অজ্ঞাত অবস্থা সে কোনোদিন কল্পনাও করে দ্যাখেনি। কিন্তু তারই জন্য তার আক্ষেপ ঃ হায়েরে সেই কপাল কি আর আমাগো হইবো? কিন্তু এখন স্ত্রীর পাশে শুয়ে কোনোদিন-না-জন্মাবার কপাল পাওয়ার জন্য গোলজার আলির কোনো আগ্রহ হয় না। বরং সখিনার ভিজে পিঠে হাত রাখলে তার হাতের রেখায় রেখায় মেয়েলী ঘাম বয়ে যাওয়ার কুলু কুলু ধ্বনি শুনতে শুনতে সে ঘুমিয়ে পড়ে।

পরদিন সকালে দোকানে যাওয়ার আগে গোলজার তার মাকে বলে, 'আম্মা, তুমি তোমার বৌরে কি কইছো, আর উই কি বুঝছে, রাইত ভইরা কাইন্দা মরে।'

'কি কইছি?' তারাবিবি বারান্দায় ঝোলানো দড়িতে কাচা-কাপড় মেলে দিচ্ছিলো, কাজে একটুও বিরতি না দিয়ে বলে, 'কান্দনের কি হইছে?' 'আলি হোসেনের বৌ-এর লগে,' বলে গোলজার কি বলবে কি বলবে করতে করতে তারাবিবি একটা চাদর মেলে দিলো, তারপর নিজেই ছেলেকে উদ্ধার করে, 'কইছি, বৌটা এক্কেরে বেশরম। বেগানা মরদের লগে কেমুন ছিনালি করে, দ্যাহস না? অর লগে তর শাদীর কথা ভি কইছিলো।'

'কৈ, আমারে কও নাই তো!'

'ক্যান? তুই জানস না? খাদেম পাগলার ভাইয়ে তর বাপেরে বহুত ধরছিলো। পয়গাম পাঠাইবার কথা ভি হইছিলো।'

'আমি জানি না তো!'

'ক্যান? খাদেম পাগলার বাড়ির মইদ্যে না তর যাওয়া-আসা আছিলো।'

মায়ের মুখে এই কথাটা শুনে গোলজার লজ্জা পাবে কি, দরজার কপাট-ধরে-দাঁড়ানো সখিনাকে দেখে তার মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে যায়। একই গলিতে বাড়ি, ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলাধূলা করেছে—এ সবই সত্যি। কিন্তু একটু বড়ো হয়ে যাওয়ার পর ছ'মাসে দ্যাখা হতো কি না সন্দেহ। বরং সেলাই করাবার জন্য কি আচার দেওয়ার জন্য তারাবিবিই রাবেয়াকে ডেকে পাঠাতো এই গোলজারকে দিয়েই। বড়ো হবার পর গোলাজারের একটু লজ্জাই করতো, নিজে ওদের বাড়ির ভেতরে না গিয়ে ওর ভাইকে দিয়ে মায়ের কথাটা জানিয়ে দিতো। কিন্তু গোলজারের এই মেয়েসুলভ লজ্জা নিয়ে তারাবিবি কতোদিন রাগারাগি করছে। আর এখন তারাবিবি বলে, 'আমরা কই, তুই অর চাচারে দিয়া তর বাপেরে কওয়াইছস।'

'না আম্মা আমি কিছুই জানি না।'

'অ।' বলে তারাবিবি কলপাড়ে চলে যায়।

তবে সখিনাকে মেরামত করে নিতে গোলজারের খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। মেয়েটা তারাবিবির কথা যেমন অবলীলাক্রমে বিশ্বাস করে, স্বীমার ওপর আস্থাস্থাপনেও তেমনি তার দেরি হয় না। সখিনা প্রায় সর্বদাই হাসিখুশি, বাইরে বেরুলে তার কৌতূহলের সীমা নেই, সমস্ত শহরটাকে একদিনে চিনে নেওয়ার জন্য সে অস্থির।

কিন্তু মুখ ভার করতেও সময় লাগে না। এরপর দেড় মাসও যায়নি, একদিন বেলা আড়াইটে-তিনটের দিকে গোলজার ঘরে ফিরতেই সখিনা জিগ্যেস করে, 'এতো বেলা করলা? রথখোলা গেছিলা, না?' 'হ, তোমারে কইলাম না? ঐ পাট্টি হালায় আউজকাও টাকা দিলো না। চুতমারানি বহুত খাচরামি করতাছে!'

কিন্তু সখিনা ফের বলে, 'রথখোলা কৈ গেছিলা? বিনয়গো বাড়ি?'

কৈ?'

'বিনয়গো বাড়ি! হ্যার বইনের লগে গল্প কইরা আইয়া, না? হিন্দুগো বাড়ি তোমার এতো যাওয়া-আসা কিয়ের লাইগা আমি বুঝি না, না?'

গোলজার খুব বিরক্ত হয়। রথখোলায় ঘণ্টা দু'য়েক ঘুরেও তার বহু দিনের প্রাপ্য টাকাটা পাওয়া যায়নি। আর বিনয়দের বাড়ি সে যায় না সে বোধহয় আড়াই বছরেরও ওপর।

'ছোটোলোকের লাহান কথা কইও না।'

এইবার সখিনার কান্না শুরু হলো। কাঁদতে কাঁদতেই সে বলে, 'আমি তো ছোটোলোকগো ঘরের মাইয়া। তোমার মায়েই না কইলো, "রথখোলা গেছে? বিনয়ের বইনের লগে বইছে, রাইত না কইরা উই আইবো না।"—আমি কি করুম?'

গোলজার সেদিনই একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতে চায়। সোজা চলে গেলো তারাবিবির ঘরে। রমজান আলি তার বিছানায় বসে হাঁটু পর্যন্ত লুঙ্গি তুলে তার হাড়্ডিসার পায়ে হাত বুলাচ্ছে। মেঝেতে বসে স্বামীর জন্য পান ছেঁচছে তারাবিবি।

গোলজার বলে, 'আম্মা, বিনয়ের বইনরে লইয়া তুমি অরে কি কইছো?'

'কি কইছি?'

'কি কইছ, তুমিই জানো।'

'বৌরে কি কইছি, বৌ তরে গিয়া কি লাগাইছে, ক্যামনে জানুম?' বলে হামান দিস্তা থেকে হাত উঠিয়ে নিলো তারাবিবি। রমজান আলি তার পোড়া বাঁশের মতো হাতটা সেদিকে বাড়াতেই তারাবিবি হামান দিস্তা সরিয়ে রাখলো, 'দেরি আছে!' মনে হয় তারাবিবি গোলজারকেও ধমক দিলো। গোলজার তবুও দমে না, 'তুমি ঝুটামুটা কি কি বানাইয়া কইবা আর আমার জিন্দেগিটা এক্কেরে জ্বালাইয়া খাইবা, না?'

'আমি কই ঝুটামুটা?' তারাবিবি সোজা হয়ে বসে, 'বিনয়ের বইনের লগে তর কিয়ের খাতির?'

গ্র্যাজুয়েট স্কুলে গোলজারের সহপাঠি ছিলো বিনয়। বারদুয়েক ম্যাট্রিক ফেল করে গোলজার লেখাপড়া ছেড়ে দেয় আর দ্বিতীয়বার কোনোমতে পাস করে বিনয় চলে যায় কলকাতা। আগে বছর বছর ঢাকায় এলে গোলজারের সঙ্গে ওর দ্যাখা হতো। গোলজার ওদের বাসায় যেতো কেবল সেই সময়েই। কয়েক বছর থেকে বিনয়ের এদিকে আসা একরকম বন্ধই, গোলজারও আর ওদিকে যায় না। তবে বিনয়ের বাবা রাধাকৃষ্ণ বসাক লোকটা বেশ ভীতু, কোনোরকম গোলমালের আভাস পেলেও কাউকে দিয়ে গোলজারকে ডেকে পাঠায়, মিষ্টিটিষ্টি খাইয়ে বলে, 'বাবা, তোমাগো মায়ায় পইড়া মাতৃভূমি ত্যাগ করতে পারি নাই। এট্টু দৃষ্টি রাইখো।' কিন্তু আড়াই বছর, তিন বছর হতে চললো রাধাকৃষ্ণ বসাক ওকে ডেকে পাঠায় না, ওরও আর যাওয়া হয়নি।

তারাবিবির গোটা মনোযোগই এখন গোলজারের দিকে ন্যস্ত। মেঝেতে সে বসেছে পা ছড়িয়ে। তার দুই পায়ের পাতাই এপ্রিঠওপিঠ সম্পূর্ণ দ্যাখা যাচ্ছে। ডান পায়ের ওপরের পাতায় এগজিমার ঘা: এগজিমাটা মনে হয় তার পোষা, অবসর মতো চুলকায়, সেটা কখনো বাড়ে, কখনো কমে। এখন তার বাড়ার ঋতু। ছড়ানো পায়ের পাতা থেকে মায়ের প্রিয় ঘায়ের একটি কি দু'টি পুঁজের বিন্দু গোলজারের দিকেই তাকিয়ে আছে। তারাবিবির মাথার কাপড় তার খোঁপার সঙ্গে আটকে গেছে, তার ছোটোখাটো গর্তে উঁচু-নিচু ভরাট লম্বা কালো মুখ, চওড়া ও রেখাহীন নির্বিকার কপালের ওপর সাদা কয়েক গোছা চুলের নিচে কালো চুলের রাশি এবং তার ছোটো আকারের চোখ জোড়া গোলজারের চোখের সামনে ঝলক দিয়ে উঠলে সে একেবারে নিভে গেলো। তার দোকানের পিচ্চি মেকানিকটা কোথায় কোন্ সুইচে হাত দিয়েছে, এ্যামপ্লিফায়ারের কোন্ পজিটিভ-নিগেটিভে গোলমাল হয়েছে যে মনে হয়, কথা বলেও কেনো লাভ নেই, কিছুই শোনা যাবে না। তবে রমজান আলির শরীরটা আজ একটু ভালো, বহুদিন পর গুক্কুর মাহমুদের দোকানের তেহারি দিয়ে সকালবেলার নাশতা হয়েছে, গোলজারের ওপর আজ সে বেশ প্রসন্ন, তারাবিবিকে আস্তে আস্তে বলে, 'পোলায় বিয়াশাদী করছে, তোমার মুখ অহন ভি দস্তুর হইলো না। কহন কি কও, কথাবার্তা—।'

বাক্য অসম্পূর্ণ থাকতেই তার বুক থেকে ঘর্ঘর শব্দ বেরিয়ে আসে এবং পেটে হাত দিয়ে সে কাশতে শুরু করে।

'তুমি কব্বরের মড়া পইড়া রইছো, কব্বরের মইদ্যেই থাকো। তুমি কি বুঝবা? তিরিশ বচ্ছর হইলো তোমার ঘর করি, একদিন তোমারে সিধা হইয়া হাঁটবার ভি দ্যাখলাম না। আর এই জমানার জুয়ান পোলাগো বদ খাসলৎ তুমি কি বুঝো?' রমজান আলির কাশির সঙ্গতে তারাবিবির সংলাপ বাপ ও ছেলের জন্য ধিক্কার বাজাতে থাকে। তারাবিবি তার অনেক-দেখে-পাকা চোখজোড়া দিয়ে গোলজারকে বিঁধে ফেলতে চায়, 'আমি কই ঝুটা কথা? তবে জিগাই, বিনয়ের বইনের বিয়া হইছে হিন্দুস্থান, আর বচ্ছরের আষ্টটা মাস উই পইড়া থাকে বাপের বাড়ি, ক্যালায়? তবে জিগাই, ক্যালায়?'

কয়েকবার ঢোঁক গিলে গলার তারটার পজিটিভ-নিগেটিভ সব ঠিক করে গোলজার বলে, 'তুমি কার লগে কি লাগাও? হেইটা তো তিন-চাইর বচ্ছর পার হইয়া গেছে। পাসপোর্ট-উসপোর্টের কি ঝাপলা আছিলো, বহুতে দিন যাইতে পারে নাই।'

'পাচকোট!' দীপালীর পাসপোর্টের ব্যাপারটা তারাবিবি লুফে নেয়, 'আরে পাচকোট তো অছিলা! পাচকোটের নাম কইরা তর এই ঘরের মইদ্যে দুইটা ঘন্টা বইসা গেছে না? এইগুলি বুঝি না, না?'

এই বাড়িতে দীপালী এসেছিলো একবারই। পাসপোর্টের ঝামেলা মেটাতে কার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য গোলজারকে তার দরকার হয়। সে তো চার বৎসর হতে চললো। দীপালী এখানে এলে তারাবিবিই তাকে সঙ্গে করে গোলজারের ঘরে

পৌঁছে দেয়, 'অ গোলজার, দ্যাখ বিনয়ের বইনে আইছে।' নিজের ঘর থেকে সে একটা চেয়ার এনে দিলো। তারপর 'তোমরা কথা কও, আমি আহি।' এই বলে সেই যে রান্নাঘরে ঢুকলো আর বেরোয় না। পনেরো-বিশ মিনিট পর চলে যাওয়ার জন্য দীপালী বারান্দায় পা দিয়েছে, রান্নাঘর থেকে দেখতে পেয়ে তারাবিবি বলে, 'এট্টু বইসা যাও। আমি চা বানাই।' গোলজারের ঘরে দীপালী আরো প্রায় আধঘণ্টা বসার পর গোলজারকে ডেকে তারাবিবি চা পাঠিয়ে দেয়। গোলজার এক ঘণ্টা ধরে দীপালীর সঙ্গে গল্প করে। তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু দীপালীর স্বামী, বিনয় এবং বিনয় ও গোলজারের শৈশবকাল। তার নির্জন ঘরে দীপালীর সঙ্গে এক ঘণ্টা কাটাবার এই স্মৃতি মাঝে মাঝে চেয়ে দেখতে গোলজারের ভালোই লাগতো, কিন্তু এর ফলে তাকে কখনো বিনিদ্র রজনী কাটাতে হয়নি।

নিজের রাগ দমাবার জন্যে কিম্বা বেছে বেছে ঠিক কথাটি প্রয়োগ করবে বলে তারাবিবি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলে, 'এই যে বেলা তিনটা পর্যন্ত বেজাত মাগীটার লগে বইয়া রইছস, তর বৌ আছে না? দুই দিন বাদে তর পোলা হইবো না? তর শরম নাই? তর শয়তানীর চোট এমুন—আমার ঘরে ফেরেস্তা আইবো কুনোদিন? পোলায় গুণা করলে বাপ-মায়ের এবাদত-বন্দেগী আল্লায় কবুল করে?'

তারাবিবির এই আপোষ-আপোষ স্বর গোলজারকে স্তিমিত করতে পারে না। বরং মায়ের শিথিল কণ্ঠ তাকে আরো বল দেয়। কিছুক্ষণ রমজানের মরচে-পড়া চোখজোড়ার দিকে তাকিয়ে সে সেই মাথা নোয়ানো বুড়োর নিঃশেষিত শরীরের ভিতরবাড়ি থেকে ভিটামিন শুষে নেয়। এইভাবে বাপের পুষ্টি ও মায়ের শিথিলতা থেকে শক্তি অর্জন করে গোলজার বলে, 'আম্মা এই কথাগুলি কুনো মায়ে তার পোলারে কইতে পারে না। তোমরা আমার বিয়াশাদি দিছো, আমার খাসলতের মইদ্যে বুরাথুরা কিছু থাকলে উই দ্যাখবো। উই কিছু জানলো না, আর তুমি কৈ একটা রাডার ফিট কইরা রাখছো, মিনিটে মিনিটে তোমার রাডার কাঁইপা উঠবো আর তুমি খালি ফাল পাইড়া উঠবা!'

'আল্লা রে আল্লা! আমার নসিব! পোলারে বিয়া করাইয়া আনছি, পেরাইম্যা মাইয়া, হাবাগোবা একখান, উই যুদিল বুঝবো তয় আমার এই হাল হইতে পারে?' তারাবিবি ক্রমেই থিতিয়ে আসছিলো। একটু থেমে সে ফের নতুন উদ্যমে শুরু করে, 'বৌয়ের যুদিল অতই বোধশোধ থাকবো তয় এই কামের মাতারির লগে তোমার রঙ করা উই বহুত আগেই ধইরা ফালাইতো। পারতো না?'

এ কথার আর কি জবাব দেওয়া যায়?

সেদিন থেকে বাড়ির ঠিকা ঝিই হলো তারাবিবির মতে গোলজারের প্রধান আকর্ষণ। অথচ এই সুরুজের মায়ের সঙ্গে সারাদিন কতক্ষণের জন্যেই বা দ্যাখা হয়? সে আসে ভোর ছ'টার আগে, সকাল ন'টা-সাড়ে ন'টার চলে যায়। বেলা একটায় এসে ফের আড়াইটে-তিনটে পর্যন্ত কাজ করে। সকালে ঘুম থেকে উঠে গোলজার তাকে ঘণ্টাখানেক দেখতে পায় এবং বিকালে আরেক ঘন্টা। সারাটা দিন

খাটনির ওপর আছে বলে মেয়েটার শরীর বেশ আঁটোসাঁটো। তা, এরকম ভালো শরীরের মেয়ে না রাখলেই হয়। রমজান একদিন এই প্রসঙ্গ তুলেও ছিলো, 'যদি সন্দ করো তো মাতারিরে বিদায় করলেই হয়।'

'ক্যান? মাতারিরে বিদায় করুম ক্যান? আরেকটা রাখতে হইবো না? তোমার পোলায় কেউরে ছাড়বো?'

তবে আজকাল তারাবিবি গোলজারের সামনে এই সব কথা সচরাচর পাড়ে না। কিন্তু গোলজার বাইরে গেলেই শুরু করবে। এই আজ ছবি দেখে ফিরতে একটু রাত হচ্ছে, চান্স পেয়ে অমনি ধোলাই দিলো।

সখিনা এখন চুপচাপ বসে রয়েছে। একটু আগে তারাবিবির কল্যাণে গোলজারের বুকে যে কাঁটাগুলো বিঁধেছিলো, ভাত-তরকারি খাওয়ার পর সেগুলো পেটের কোথাও চাপা পড়ে গেছে। তার খুব ঘুম পায়। কিন্তু এখন ঘুমিয়ে পড়লে সখিনার অপমানের ভাগ নেওয়া হয় না। গোলজার আলি সুতরাং সখিনার পাশে বসে বলে, 'তোমার মিয়াভাইরে একটা চিঠি লেইখা দেই, মিয়াভাই আইলে তুমি মীরকাদিম যাও গিয়া, আমিও দেখি, একটা ঘর বিচারাইয়া লই। ভাড়া-উড়া ঠিক হইলে আমি গিয়া তোমারে লইয়া আসুম!'

এরকম প্রস্তাবে বরাবরই কাজ হয়।

বিছানায় শুয়ে গোলজারের ইচ্ছা হয় সমস্ত খাট জুড়ে শরীর বিছিয়ে শুয়ে থাকে। কিন্তু এই বিছানা তাকে আরেকজনের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হয়।

পরদিন বেলা আড়াইটের দিকে বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে গোলজার শোনে তারাবিবি ও সখিনা দু'জনেই বাইরে। তার ফুফাতো ভাই বাদশার গায়ে-হলুদ আজ দুপুরে, তার ফুপা নিজেই এসে দু'জনকে নিয়ে গেছে। রমজান বলে, 'মাগরেবের বাদে তুই গিয়া লইয়া আহিস।'

রান্নাঘরে তারাবিবি নেই, তার নিজের ঘরে নেই সখিনা।—'হ্যায় আপনা দিল' গানটা পরিবর্তিত সুরে গুণগুণ করতে করতে জামাকাপড় না খুলেই গোলজার হাত-পা বেশ করে ছড়িয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

ঘরে এসে ঢোকে সুরুজের মা, 'অহন শুইলেন? ভাত দেই?'

'ভাত দিবা?' গুণগুণ করাটা থেমে গেলেও তার চোখে-মুখে গানের সুর সাঁটা।

'এট্টু গড়াইয়া লই।'

'না ওঠেন, আপনের খাওয়া অইলে আমারে বাসন মাইজা খাইতে হইবো না?'

কথা বলতে বলতে সুরুজের মা বুকের ওপর শাড়ির আঁচল গুছিয়ে রাখে। সেদিকে চোখ পড়তেই হঠাৎ কি হয়, গোলজারের চোখ, মুখ ও গলার হাল্কা সুর ভাঁজা একেবারে উবে যায়। সেই সুরের জায়গায় তার ইচ্ছা-নিরপেক্ষ বোঁবোঁবো ধ্বনির এলোমেলো চলাচলে ওর করোটির ভেতরটা একেবারে ঠাসা হয়ে যায় এবং সমস্ত শরীরের রক্ত সেদিকেই উজান বইতে বইতে বিপদসীমা অতিক্রম করে। খাটের স্ট্যাণ্ড ধরে দাঁড়িয়ে আছে সুরুজের মা। নিজের মাঝারি দৈর্ঘ্যের শ্যামবর্ণের

শরীরটা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে গোলজার প্রায় একটি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় মেঝের ওপর। সুরুজের মা কপালের একটুখানি ও ভ্রূর সবটা কুঁচকে তাকে দেখছে। তার কপাল ও ভ্রূ ফের সম্প্রসারিত হতে হতে গোলজার তার ডান হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে তাকে সামনে নিয়ে আসে। তার বুকের সঙ্গে লাগানো সুরুজের মার মাথা, মাথার লালচে কালো চুলে পুরনো পচা নারকেল তেলের গন্ধ। সুরুজের মা ফিস ফিস করে বলে, 'হাত ছাড়েন।'

সঙ্গে সঙ্গে গোলজার তার হাত ছেড়ে পেছনে সরে আসে। আরো এক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে সুরুজের মা হঠাৎ ভেতরের বারান্দা দিয়ে দ্রুত চলে যায় রান্নাঘরের দিকে। বারান্দা থেকে এ্যালুমিনিয়মের বদনা গড়িয়ে পড়ায় টং আওয়াজে গোলজার আলির মাথায় বেলা তিনটে হওয়ার সময় সঙ্কেত বাজে, সে ফের তার ঘরের আরেক কোণে গিয়ে তার গামছা, লুঙি এইসব সংগ্রহ করে।

গোসল করে ফিরে এসে গোলজার দ্যাখে মেঝেতে ছেঁড়া শীতলপাটি পাতা, তার ওপর সরপোষে ঢাকা ভাত-তরকারি। খাওয়ার পর আলনা থেকে আণ্ডারওয়্যার ও প্যান্ট নিয়ে ফের রেখে দেয়।

প্রায় পনেরো মিনিট পর সুরুজের মা ঘরে ঢুকে বলে, 'আমি যাই, আপনে দোকানে যাইবেন না?'

শুয়ে শুয়েই গোলজার জবাব দেয়, 'তুমি যাও। আমি এট্টু পরে যাই।' সুরুজের মায়ের হাত ধরে ফেলার ব্যাপারটা ঝেড়ে ফেলার জন্যে সে সপ্রতিভ হতে চায়, 'এট্টু পরে গিয়া আম্মাগো লইয়া আসুম।'

'তাগো আইতে দেরি আছে।'

'অ!'

সুরুজের মা তার খাটের স্ট্যাণ্ড ধরে ফের দাঁড়িয়ে থাকে। পাশের ঘরে রমজান আলির ধীর লয়ে নাক ডাকার শব্দে গোলজার তার শরীরের দখল ফের হারাতে আরম্ভ করে।

'আমারে দশটা টাকা দিবেন? আম্মারে কইয়েন না, আমার পোলারে ডাক্তার দ্যাখাইতে হইবো। দিবেন?'

গোলজার আলি নিঃশব্দে বালিশের নিচে রাখা পার্স থেকে পাঁচ টাকার দুটো নোট নিয়ে ডান হাতটা বাড়িয়ে ধরলো। সুরুজের মা এসে দাঁড়িয়েছে তার বিছানার ঠিক পাশেই। এখন এই টাকা-ধরা হাত দিয়েই মেয়েটাকে টেনে একেবারে বিছানায় ফেলা যায়। ঘরের আরেক প্রান্তে পাশের ঘরে যাবার দরজা। একবার সেদিকটা দ্যাখা দরকার। কিন্তু সুরুজের মা দরজা বন্ধ করেছে কখন? দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। গোলজার একেবারে নিভে গেলো। তার বিছানার পাশেই দাঁড়িয়ে সুরুজের মা, গোলজার সোজা তাকিয়ে রইলো নিজের পায়ের দিকে। তার নখগুলো কাটা দরকার। অনেকদিন তার নখ কাটা হয়নি। তার পায়ের পাতায় স্যাণ্ডেল পরার দাগ। আঙুলের ভাঁজে ভাঁজে কালচে পুরু ময়লা। গোসল করার

সময় কতো দিন সে পায়ের আঙুল ঘষে ঘষে ময়লা তোলেনি। তার পায়ের পাতার নিচেও ময়লা, হঠাৎ কিসের শব্দে সেই ময়লা ধূলো-বালি ঝুরঝুর করে ঝরে পড়তে শুরু করে। পাশের ঘরে রমজান আলি কেশে উঠলো। কাশির ফাঁকে ফাঁকে সে যেন কাকে ডাকছে। গোলজারের উঁচু-করে-ধরা ডান হাতের বোঁটা থেকে পাঁচ টাকার নোট দুটো খসে পড়লো নিচে। হাত-জোড়া এখন তার দু'দিকে দু'টো মরা লতার মতো নেতানো।

'আব্বায় ডাকে না?' গোলজার আলি অনেকক্ষণ পর স্বাভাবিকভাবে নিশ্বাস ফেললো।

'না, ঘুমায়।' সুরুজের মার এই জবাব শেষ হতে না হতে বাইরের সদর দরজায় খুব জোরে কড়া নাড়া ও পাশের ঘরে রমজান আলির তীব্র চিৎকারে গোটা বাড়ি দুলে ওঠে। সেই দুলুনিতে সোজা-দাঁড়িয়ে-থাকা সুরুজের মাও ঝুঁকে পড়ে মেঝের ওপর। বিছানা থেকে একটা ও মেঝে থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট কুড়িয়ে নিয়ে সে একটু দাঁড়ালো। তারপর গোলজারের মণিছেঁড়া চোখের দিকে তার চোখ সঙ্কুচিত করে তাকালো এবং 'হুঃ'—এইরকম ধ্বনিতে হাসির খুব ছুঁচলো একটি খুচরাংশ ছুঁড়ে ফেলে দরজা খুললো। দরজার মস্ত ফোকর দিয়ে রমজানের ঘোলাকণ্ঠের চিৎকার ছলকে ছলকে এসে গোলজারের ঘর থিকথিক করতে থাকে, 'কতোক্ষণ হয় তরে ডাইকা মরি। খানকি মাগী তুই ঘরের মইদ্যে খিল লাগাইয়া ঠাপ লাগাস?'

সুরুজের মার সদর দরজা খোলার শব্দ ও তারাবিবির আবির্ভাব টের পাওয়া যায়। তারাবিবি বলছে, 'তরা ব্যাকটি মরছস? আমি চিল্লাইয়া মরি। হারামজাদী!' তারপর সদর দরজা নিজেই বন্ধ করে সে বলে, 'তুই যাস নাই অহনো? গোলজারে খাইয়া গেছে?'

সুরুজের মা বলে, 'খাইছে।'

'তুই যাস নাই ক্যান? চাইরটা বাইজা গেছে না? কি করস?'

'যাই' বলে সুরুজের মা চলে যেতে উদ্যত হলে তারাবিবি বলে, 'ভাত লইয়া গেলি না?'

রমজান আলির উদ্দেশ্যে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে তারাবিবি ঘরে ঢোকে, 'তুমি মরছো তো এক্কেরে মইরাই রইছো? আমি তোমারে ডাইকা মরি, মহল্লার ব্যাকটি মাইনষে জড় হইল, তোমার হুঁস নাই।'

রমজান কেবল বলে, 'বৌ কৈ?'

'বৌ আইবো রাইতে। দোকান থাইকা গোলজারে গিয়া লইয়া আইবো। গোলজাররে কও নাই?'

রমজান আলি বিছানার ওপর উঠে বসে, পাশের ঘরের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলে, 'গোলজার ঘরে।'

'দোকানে যায় নাই? ক্যান? আমি এতো চিল্লাই, উই ভি হুনবার পারে নাই?'

'ক্যামনে হুনবো?' রমজান আস্তে আস্তে জবাব দেয়, 'ক্যামনে হোনে? উই তো এই দরজা বন্ধ কইরা খান্‌কিটারে লইয়া বইয়া আছিলো, উই হোনে ক্যামনে?'

তারাবিবি তার লম্বা-চওড়া কালো শরীরটা নিয়ে রমজান আলির বিছানার এক প্রান্তে বসে পড়ে।

'আমি তো মইরাই রইছি! তোমরা তো আর আমারে জিন্দা দ্যাখবার চাও না!' রমজান আলির ঘিঞ্জি চোখ দিয়ে ঘন অশ্রু বেরিয়ে আসে, মনে হয় ঘায়ের ওপর রস জমছে। সে আস্তে আস্তে বলে, 'নিজের বাপেরে বগলের কামরায় রাইখা দুয়ার লাগাইয়া খান্‌কি লইয়া বইয়া থাকে আমার নিজের পোলায়! আমারে তোমরা মাইরা ফালাও!' তারাবিবি তার মস্ত কালো মুখে অজস্র রেখা-উপরেখা তৈরী করে বুইড়া মরদার কান্না দ্যাখে। রমজান আলির চিমসে মুখে এক ফোঁটা রক্ত নেই, তার মুখের চামড়া বোধহয় শুকনো ঘায়ের ওপরকার চটা, এককোণ ধরে একটু খুলে ফেললে গোটাটা আপনিই খসে পড়ে। উত্তেজনায় রমজানের মাথা ঘামে ভিজে গেছে। তার স্যাঁতসেতে মাথার ওপরকার লালচে শাদা কয়েক গাছা চুল আমের শুকনো আঁটির আঁশের মতো লেপ্টে আছে।

'আমি যাই।' মায়ের দিকেও না, বাপের দিকেও না, কোনো দিকে না তাকিয়ে গোলজার বলে, 'আমি যাই, দরজা বন্ধ কইরা দাও।'

স্বামীর মুখ থেকে চোখ ফিরিয়ে তারাবিবি ছেলেকে দ্যাখে। গোলজারের চুল আঁচড়ানো নেই, মাথাটা নোয়ানো বলে কপাল বেয়ে, কানের ওপর দিয়ে চুলের গোছা ছড়ানো। তারাবিবি বলে, 'লালবাগে তর ফুফুর বাড়ি গিয়া মাগরেবের বাদ বৌরে লইয়া আহিস।'

জবাব না দিয়ে বারান্দা পার হয়ে গোলজার সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে। সিঁড়ির একধাপ থেকে আরেক ধাপে নামবার সময় তার ঝাঁকড়া চুল বাতাসে-উতলা মগডালের পাতার স্তূপের মতো কাঁপে। কিন্তু সিঁড়ির পাঁচটা মোটে ধাপ। দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যায়। ছেলের কাঁপানো কেশরাশি দ্যাখার জন্য তারাবিবি তার মুখের সমস্ত রেখা কুঁচকে মাথা উঁচু করলো।

'ঘরের মইদ্যে গুণা, ঘরের মইদ্যে শয়তানী। নামাজ-বন্দেগী আমাগো ক্যামনে কবুল হয়?' চোপসানো গলায় রমজান আলী ফ্যাসফ্যাসে শব্দ করে, 'আমাগো কুনো উন্নতি নাই,—ক্যান? ঘরের মইদ্যে আমাগো শয়তানের কারখানা। বারোটা মাস আমি বিছানের উপরে পইড়া থাকি,—ক্যান? হারামজাদা আহুক, আউজকা রাইতেই অর পাছার মইদ্যে লাথ মাইরা যুদিল খ্যাদাইয়া না দেই!'

'হইছে!' তারাবিবি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে স্বামীকে থামিয়ে দেয়, 'এমুন চিল্লাচিল্লি করো ক্যালায়? গোলজারে কি করছে? পোলায় আমার জুয়ান মরদ না একখান? তুমি বুইড়া মড়াটা, হান্দাইয়া গেছো কব্বরের মইদ্যে, জুয়ান মরদের কাম তুমি বুঝবা ক্যামনে?'

পিতৃবিয়োগ

সুর্মা দেওয়া চোখ, কপালের ভাঁজ খুলে যাওয়ায় ফর্সা চামড়া এখন পাথরের মতো মসৃণ। শাদা কাপড়ে লোবান ও আতরের গন্ধ। শিয়রে ও পায়ে ধুপকাটি পোড়ে, মনে হয় ধোঁয়াটাও শরীরের ভেতর থেকে আসছে। আর যা সব আগের মতোই। মাঝখান দিয়ে আঁচড়ানো ছোটো করে ছাঁটা চুলে শাদা রেখা যা ছিলো তাই আছে। পাছে তার আঙুলগুলো কোন ফাঁকে ঐ চুলে বিলি কাটতে শুরু করে এই ভয়ে ইয়াকুব নিজের হাতজোড়া সরিয়ে রাখে। খাড়া নাকের নিচে গোঁফের ঝোপে শাদা কাঁটার সংখ্যা বোধ হয় একটিও বাড়েনি। গালের নীলচে আভাটা নেই, গালে অতি সংক্ষিপ্ত চিবুকে দাড়ির অঙ্কুর, তার বেশ কয়েকটির রঙ শাদা। ফ্যাকাশে ঠোঁট একটির ওপর আরেকটি টাইট করে আঁটা, চিরকাল এমনি ছিলো। চোখের ওপর শোয়ানো চোখের পাতা। ভেতরের মণির রঙ কালো কি গাঢ় খয়েরি জানা নেই। ঐ মণির দিকে কি কখনো সরাসরি তাকানো গেছে? এখন মণিজোড়া একেবারে আড়ালে চলে গেলো। চোখের পাতা আর কোনোদিন নিজে নিজে খুলবে না।

আর সামলানো যায় না। ইয়াকুবের মাথা নুয়ে পড়ে নিচের দিকে। চোখ জুড়ে মেঘ নামে। লাশের মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে নেওয়ার পর তার সারা শরীরে যে গা-এলিয়ে-দেওয়া অবসাদ নেমে এসেছিলো তা কেটে যাওয়ায় মাথা, চোখ ও গলাকে এখন স্পষ্ট অনুভব করা যাচ্ছে। চোখ দিয়ে অঝোরে পানি ঝরতে শুরু করলে ইচ্ছা হয় 'আব্বা' বলে খুব জোরে একবার হামলে উঠি। কিন্তু জীবিত আশরাফ আলির গম্ভীর ও শীতল মুখের কথা ভেবে, তার আকাঙ্ক্ষিত পিতৃ-সম্বোধন দাঁত ও নোনা জিভের চাপে বেরিয়ে আসে ফোঁপানির মধ্যে। সামনে সব ঝাপশা।

'দেখতেছেন?' কে যেন পাশ থেকে কথা বলে, তাকেও দ্যাখা যায় না, 'ভালো করি দেখি নেন বাবা! আর কোনোদিন দেখতি পাবেন না!'

'একটা দিন আগে আসলিও তো দেখতি পারতেন! কপাল!' 'আরে একটা দিন আগে আসলি উনার বাপে মরে? ছেইলে এখেনে থাকলি পর ডাক্তারে কি তারে বগলদাবা করি নিয়ে মাল টানতি পারে?'

'আস্তে-আস্তে! ছেইলে তো বাপু! তিনি ছেলেন মাটির মানুষ, যে-যেখানে ডেকিছে গেছেন!'

'ঐটে কোনো কতা নয়। কপাল! অদ্দেষ্ট। শ্যাষ পর্যন্ত ছেইলেরে দেখতি পারলো না!'

'ছেইলির জন্যি শ্যাষে দেখলে না কেমন মাথা বেঁকিয়ে দুই চোখের নাটা দুইখান ঘুরোয়ে ঘুরোয়ে দেখতিছিলো, মন্তাজ ভাই খেয়াল করিছো?'

'করি নাই? আমারে কয়, ও মন্তাজ, একমাত্তর ছেইলে তারে দেখতি পালাম না! খপর দিও!'

'ও মণি! তুমি এইডে কি কও? তার কি আর কতা কওয়ার হুশ ছেলো?'

'আহাহারে! একমাত্তর সন্তান! মরার আগে তার হাতে এক ঢোঁক পানি খাতি পারলো না।'—এইসব সংলাপের শব্দ ইয়াকুবের কানে আসে, কিন্তু বাক্যে বাঁধা পড়বার আগেই গড়িয়ে নিচে পড়ে যায়। ছেলের হাতে পানি খেয়ে মরা কি, ছেলের উপার্জনে ভাত খাওয়ার আয়োজনও তো ইয়াকুব করে ফেলেছে। তার ধীর-স্থির বাবা আর একটা বছর ধৈর্য ধরতে পারলো না? তেইশটা বছর একেবারে একা একা কাটালো। কোথায় এই দক্ষিণের গ্রাম, এখানে কে তাকে দেখতো, কে খাওয়াতো, আদর-যত্ন করতো কে? এসবের জন্য তার পরোয়াও ছিলো না। চার মাস আগেই তো রিটায়ার করার কথা, এক্সটেনশন হলো এক বৎসরের জন্য। ইয়াকুব তখন চাকরি পেয়ে গেছে, বাপের এখন চাকরি করার দরকারটা কি? না, তার এক কথা, দিলো যখন আর একটা বছর কাজ করি। ইয়াকুবের চাকরি হয়েছে গোপালপুর শুগার মিলে, পোস্ট ছোটোখাটো, কিন্তু পারচেজে আছে, কাঁচা পয়সার জায়গা। মিলের বাড়ি পেয়েছে, হার্ডবোর্ডের সিলিং-দেওয়া দুটো টিনের ঘর, ছোট্টো উঠান, বাতাবিনেবু গাছের নিচে পাকা কলপাড়, টিউবওয়েল, কলাগাছের ঝাড়, দুটো পেঁপে গাছ। দূরত্ব যাই হোক এখান থেকে ট্রেনে চাপলে বদলাবদলি নেই, এক নাগাড়ে পাঁচ ঘণ্টা সাড়ে পাঁচ ঘন্টা চললেই গোপালপুর।

কিন্তু নমাস চাকরি হলো তার, আশরাফ আলিকে একটি বারের জন্য নিয়ে যেতে পারলো না। দুই মামাকে দিয়ে বললো, চিঠি লিখলো দুবার। দুবারই তার একই জবাব, 'কর্মজীবনের প্রান্তে অনাবশ্যক ছুটি লইয়া কর্তব্যে অবহেলা ঘটাইতে চাই না।' চিঠির কপালেও ভাঁজ, ভুরুতে ডবল গেরো। তার পোস্টকার্ড আসতো মাসের মাঝামাঝি, পিপঁড়ের সারির মতো গুটি-গুটি অক্ষর, তাতেই উপদেশ, শ্বশুরবাড়ির সকলের কুশল জিজ্ঞাসা এবং নাম ধরে ধরে 'শ্রেণীমত সালাম ও দোয়া' জ্ঞাপন করা। দিন যায়, সালাম পাওনাদারদের সংখ্যা কমে, দোয়াপ্রার্থীরা বাড়তে থাকে, যথাস্থানে ঠিক ঠিক লোকের নাম লিখতে আশরাফ আলির কখনো ভুল হয় না। মাসের প্রথমদিকে বরাদ্দ ছিলো মানি অর্ডারের টাকা, মানি অর্ডারের কুপন জুড়ে পিপীলিকা বাহিনীর পুনরাবির্ভাব, ফের উপদেশ, ফের কুশল জিজ্ঞাসা এবং সালাম ও দোয়া নিবেদন। কি পোস্টকার্ড কি মানি অর্ডার কুপন—প্রত্যেকটির

কপালে ভাঁজ, খাড়া ও কাঁটা কাঁটা গোঁফের নিচে বন্ধ পাতলা ঠোঁট। মামারা যে তার বাপের শালা তাদের সামনে পর্যন্ত সেই ঠোঁটজোড়ার কষ একটুও ঢিলে হতো না। মামাদের মধ্যে মেজোমামাটারই ভাগ্নের দিকে টানটা বেশি। আবার আদর করে ওকে এখানে-ওখানে নিয়ে গেলে ইয়াকুব কারো সঙ্গে তেমন কথা বলতে পারতো না বলে বাড়ি ফিরে মেজোমামা মাঝে মাঝে বকতো, 'তোর বাপ হলো হাঁড়িমুখো পোস্টমাস্টার, চিঠিতে সীল মারতে মারতে মুখখানাকেও সীলের ডিজাইনে নিয়ে এসেছে! তারই তো ছেলে, তুই আর লোকের সঙ্গে কথা বলবি কি?' নানী তখনো বেঁচে। ছেলের এই একটি বাক্য তার সারাদিনের প্যাচালের উৎস খুলে দিতো ঃ 'তাই ভালো। বেশি রসকস থাকলে ছেলেটা সৎমায়ের হাতে পড়তো না? ভাগ্নেকে টাকা পয়সা খরচা করে মানুষ করার ক্ষমতা তোমাদের আছে? নিজেদেরগুলোই টানতে পারে না আবার ভাগ্নেকে লেখাপড়া করাতো, এ্যাঁ? বাপ টাকা না পাঠালে এই ছেলে কোথায় ভেসে যেতো!'

টাকাটা আশরাফ আলি পাঠাতো খুব নিয়মিত। টাকা আসার সঙ্গে সঙ্গে জোহরা বিবির কন্যাশোক উথলে উঠতো, 'বিয়ের পর আঠারোটা মাসও কাটলো না! ফিরোজা, মা আমার, কি কপাল করে এসেছিলি মা'রে, ছেলেকেও ভালো করে দেখতে পারলি না! একুব, ভাইরে কি কপাল করে এলি রে ভাই, মাকে একবার দেখতেও পারলি না!'

কিন্তু নানীর কাছে, খালাদের কাছে, মামাদের কাছে গল্প শুনতে শুনতে মাকে তার একরকম দ্যাখাই হয়ে গেছে। মায়ের রঙ ছিলো চাপা, কালোর দিকেই বলা যায়, ইয়াকুব পেয়েছে মায়ের রঙ। ইয়াকুবের স্বভাবও অবিকল তার মায়ের স্বভাব। সে কারো সঙ্গে চড়া গলায় কথা বলতে পারে না, যে যা-ই বলুক না, 'না' বলার শক্তি তার নেই। কিন্তু আশরাফ আলির রগ অন্যরকম। আর বিয়ের সময় তার শ্বশুরের ইসলামপুরে কাটা কাপড়ের জমজমাট কারবার। তার শালাদের বয়স তখন কম, শ্বশুর কতোবার তার ব্যবসায়ে ঢুকতে বললো। তার এক কথা, 'না'। শ্বশুর শেষ পর্যন্ত না পেরে কলেজে পড়া চালিয়ে যাওয়ার খরচ দিতে চাইলো। তাতেও 'না'। কারো কথায় কান না দিয়ে আশরাফ আলি প্রাণান্ত পরিশ্রম করে এই চাকরি জোগাড় করলো, নতুন বৌ নিয়ে ড্যাং-ড্যাং করে রওয়ানা দিলো খুলনা না যশোর জেলার কোন গ্রামের দিকে, সেই গ্রামে সে হলো পোস্টমাস্টার। সাহসটা দ্যাখো! কয়েক মাস পরে পোয়াতি মেয়েটা আসে বাপের বাড়ি। সময়মতো ব্যথা উঠলো, মেয়ে গেলো হাসপাতালে, সেই তার শেষ যাওয়া। তার বদলে ঘরে এলো তার ছেলে। তা আশরাফ আলি ছেলেকে নিজের কাছে রেখেই মানুষ করতো, সে যা একরোখা লোক, তার পক্ষে সবই সম্ভব। কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর ব্যাপারটা ভালো করে বোঝার আগেই তার হাতে-পায় ধরার উপক্রম করে জোহরা বিবি, বড়ো মেয়ের একমাত্র স্মৃতিটাকে সে কোলেপিঠে করে রাখতে চায়।

আশরাফ আলির তখন যা বয়স তাতে তার বিয়ে না করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তার ওপর 'রাজপুত্র জামাই আমার, মিছে কথা বলবো কেন?—মেয়ের তুলনায়

জামাই আমার অনেক সুন্দর! তুই তো হয়েছিস একটা ছুচো! একে তো কালো হলি মায়ের মতো, আবার বাপের মতো যদি একটু উঁচা-লম্বাও হতিস!' সেই ফর্সা-লম্বা আশরাফ আলি মা-মরা ছেলেকে রেখে ফের চলে যায় পোস্টমাস্টারি করতে, কতো জায়গায় যে ঘুরলো, এই কুষ্টিয়া, এই যশোর-খুলনার গ্রামেই বেশি। ডুমুরিয়া, বাহিরদিয়া, দিয়ানা, নলতা, নাভারন, নীলমণিগঞ্জ, আলমডাঙা—নিজেরই হাতে মারা কতো ডাকঘরের সীল যে তার-লেখা পোস্টকার্ডে থাকতো! এর কয়েকটি জায়গায় ইয়াকুবও গেছে। আশরাফ আলি নিজেই একবার নিয়ে গিয়েছিলো। তখন এ্যানুয়াল পরীক্ষা শেষ, শীতকাল ছিলো। ইয়াকুব তখন ক্লাস সেভেনে পড়ে। আলমডাঙা, কুষ্টিয়া জেলার সাব-পোস্টঅফিস। তারপর আর একবার ডুমুরিয়া গিয়েছিলো ছোটোমামার সঙ্গে। আশরাফ আলির অসুখের খবর পেয়ে জোহরা বিবি দুজনকে পাঠিয়ে দিয়েছিলো।

কিন্তু রোগশয্যায় শুয়ে আশরাফ আলি ভ্রু কোঁচকায়, 'আমার অসুখ? কে বললো?'

'আপনার চিঠিতেই তো ছিলো।' মা বললো। ছোটামামা মিনমিন করে, 'ইয়াকুবকে বোধ হয় লিখেছিলেন।'

টাকা পাঠাতে সেবার একটু দেরি হয়। তাই মানি-অর্ডারের কুপনের এক কোণে হঠাৎ লেখা হয়ে গিয়েছিলো, 'শারীরিক দুর্বলতার দরুন পত্র দিতে বিলম্ব হইল।'

আশরাফ আলির মুখ লাল হয়ে যায়, 'ব্যস, এই জন্যে দু'জনে ড্যাংড্যাং করে চলে এলে? স্কুল-কলেজ থেকে নাম কাটানো হয়ে গেছে?'

ছোটোমামা তখন নতুন-নতুন কলেজে ভর্তি হয়েছে, তার খুব রাগ হয়েছিলো। ঢাকায় ফিরে রাগ ঝাড়লো মায়ের ওপর, 'অসুখের খবর শুনে গেলাম। মনে হয় মার্ডার করে তার কাছে গিয়েছি শেলটার নিতে! আরে, মানুষের রোগে মানুষ যাবে না? অসুস্থ লোককে দেখতে গেলেই তার প্রেসটিজ পাঙচার হয়ে গেলো?' ছোটোমামার কথা শুনে রাগে ইয়াকুবের গা জ্বলে যায়, কিন্তু কাউকে চড়া করে কথা বলা তার সাধ্যের বাইরে। সুতরাং মনে মনে কেবল ফোঁসে, আমার বাবা কি তোমাদের মতো মাগী টাইপের? তোমাদের মতো নাক দিয়ে দু'ফোঁটা জল পড়লেই ফোঁৎ ফোঁৎ করে রাজ্যময় ন্যুমোনিয়ার বিজ্ঞাপন দিয়ে বেড়ায় না। স্যাতঁসেঁতে কথাবার্তা শুনতে তার বাপের ঘেন্না হয়। ইয়াকুবের নিজেরই কতোবার বাবার সঙ্গে সোহাগ করতে ইচ্ছা করেছে, আশরাফ আলি আমল দেয়নি। ওর বড়োমামা অফিস থেকে ফিরলে বড়োমামার ছেলেমেয়েরা বাপের সঙ্গে কি জড়াজড়িটাই না করে! বড়োমামা কেমন দিব্যি এই টুকুকে চুমু খাচ্ছে, খুকুকে নিয়ে লোফালুফি করছে। আর মেজোমামা তো দোকান বন্ধ করে বাড়ির কাছাকাছি এসে 'আমার আব্বুজান', 'আমার বাপপুজান' বলে চ্যাঁচাতে শুরু করে। অনেকদিন পর একবার আশরাফ আলি বাড়ি এসেছে। ইয়াকুব এক দৌড়ে দরজায় গিয়ে 'আব্বু'

বলে বাপের বুকে উঠে গলা জড়িয়ে ধরলো। আশরাফ আলি আস্তে আস্তে তার হাত দিয়ে ছেলের হাত দুটো খুলে তাকে মেঝের ওপর দাঁড় করিয়ে রেখে বলে, 'বয়স হলে ন্যাকামো শোভা পায় না।'

আর একবারের কথা খুব মনে পড়ে। দুতিনদিন পরপর স্বপ্নে মসজিদের মতো একটি জায়গার সামনে দাঁড়ানো অস্পষ্ট নারীমূর্তির হাতছানি দেখতে পেয়ে ভয়ে ইয়াকুবের জ্বর এসে গিয়েছিলো। তখন খুব ছোটো নয়, বারো তেরো বছর বয়েস। জ্বরের ঘোরে তার প্রলাপ বকা শুনে জোহরা বিবি ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে আর মৃত কন্যার উদ্দেশ্যে বিলাপ করে, 'মাগো, ছেলেকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে হাত বাড়ালি? মারে, তোর ছেলেকে এতোটা বড়ো করলাম, কেন নিবি মা?' টেলিগ্রাম পেয়ে বেনাপোল থেকে বাবাকে চলে আসতে হয়। শাশুড়ির কাছে পুত্রধনের স্বপ্নদর্শনের কথা শুনে তার চাপা ঠোঁট আরো সেঁটে যায়। ফিরে গিয়ে পাক্ষিক পত্রে আবার ভ্রূ-কোঁচকানো উপদেশ ঃ 'জাগ্রত অবস্থায় তরল বিষয়ের প্রতি অবাঞ্ছিত মনোযোগ ও অহোরাত্র লঘু কল্পনার জগতে অনুচিত বিচরণই এইরূপ স্বপ্নদর্শনের কারণ। চিত্ত উচ্চস্তরের চিন্তা দ্বারা শক্তিশালী হইলে এইরূপ কলঙ্ক ঘটিবার সম্ভাবনা রহিত হয়।'

'কতোক্ষণ ধরি গল্পগুজব করলে! উজির আলি সরকার এলো, তার সাথে কতো ঠাট্টা-ইয়ের্কি, কতো হাসাহাসি!' এই পর্যন্ত বলার পর লোকটার গলায় কাঁদো-কাঁদো স্বর ফোটে, 'এতো হাসিখুশি মানুষ, এরকম কাউরি কিছু না বলি চেরটাকালের মতো বিদায় নিয়ে যায়, এ্যাঁ? মন তো শান্তি পায় না বাবা, মনকে বুঝ দিতি পারি না!' ইয়াকুবের পিঠে হাত রেখে বলে, 'আমারে তুমি চেনো না বাবা! আমার নাম এহোসান আলি, ডাক্তারি করি, বাজারে ডিসপেন্সারি আছে। এহোসান ডাক্তারের দোকান বললি কাপপক্ষীও চেনে। তোমার আব্বার বন্ধু বলো আত্মীয় বলো ছোটোভাই বলো—আমাদের ওঠা বসা খাওয়া-দাওয়া সব এক সাথে ছেলো, বুঝেছো? আমি রয়ে গেলাম মানুষের নাড়ি টিপতি, আর যে মানুষ সদাসর্বদা হাসিয়ে রাখতো, হাস্যরসে সর্বজনেরে মাতিয়ে রাখতো, সেই কিনা সবারে কাঁদায়ে চলি গেলো। এ্যাঁ?' লোকটার কথা সব স্পষ্ট শোনা গেলো। নোনতা জল ভরা চোখ ও বাষ্পাচ্ছন্ন মাথাতেও ইয়াকুবের অস্বস্তি লাগে। লোকটা কে?—গ্রামের ডাক্তার, এহসান ডাক্তার। কার সম্বন্ধে কথা বলছে?—বাবার সম্বন্ধে? বাবার মুখটা ভালো করে দ্যাখা দরকার। হ্যাঁ, সেই আশরাফ আলিই বটে! সেই ছোট্টো চিবুক, সেই গাল এবং পান-না-খাওয়া ও বিড়ি-না-টানা চাপা ঠোঁট। এইসব মিলেই গম্ভীর মুখমণ্ডল, মামারা খালারা যাকে বলতো পোস্টঅফিসের সীল। বড়োখালার রিপোর্ট অনুসারে আশরাফ আলির টাইপটা শুরু থেকেই এ রকম।

আশরাফ আলি পড়াশোনা করতো ফিরোজার মামার বাড়িতে থেকে। সে মামাবাড়ি ওদের একই রাস্তায়, বেচারাম দেউড়ির এমাথাওমাথা। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে খড়ম পায়েই সে মিটফোর্ড হাসপাতাল পর্যন্ত দুটো চক্কর দিয়ে

আসতো। এই প্রাতঃভ্রমণ করতে করতে নিমের দাঁতনে মেসওয়াক করা। ফজরের নামাজ পড়ে মাথার কিস্তি টুপি না খুলেই ফিরোজার মামাতো ভাই-বোনদের সে কড়াকিয়া শতকিয়া মুখস্থ করাতো। সাড়ে নটার দিকে তার পরনে পাজামা-শার্ট, অর্থাৎ এখন তার কলেজে যাওয়ার সময়। আশরাফ আলি থাকতো একটা ঘরে একাই। তার ঘরে কোনো টেবিল ছিলো না। তোষকটা ছোটো থাকায় তক্তপোষের একদিকে বেরিয়ে পড়তো। ওখানে আশরাফ আলির বইপত্র সাজানো থাকতো। তক্তপোষের নিচে সে রেখে দিতো পুঁটলিতে বাঁধা চিঁড়ে-গুড়। আর ছিলো কাগজে জড়ানো চিরতার কাঠি। খিদে পেলে দরজা বন্ধ করে আশরাফ আলি শুকনো চিঁড়ে খেতো। 'বুঝলি না, তোর বাবা ছিলো পুরো গাঁইয়া, তোরা আজকাল "খ্যাত" বলিস না—সেই মাল।' বড়োখালাম্মার কথাবার্তা ভয়ানক কাটা-কাটা, শুনতে একটুও ভালো লাগে না, 'তোর বাবা কলেজে গেলে কি মসজিদে গেলে আমরা তার ঘরে ঢুকে চিঁড়ে খেয়ে ফেলতাম, চিরতার কাঠি ফেলে দিতাম, আর তোর বাপ ফিরে এসে সবই বুঝতো, রাগে গজগজ করতো, মেয়েদের ঠাট্টা বোঝার ক্ষমতাও তার ছিলো না।' মেয়েদের দিকে তাকানো তো দূরের কথা, পাড়ার ছেলেদের সঙ্গেও তার বলতে গেলে কোনো সম্পর্কই ছিলো না।

বাবা থাকতো তার পড়াশোনা নিয়ে, অঙ্ক-বাঙলা ভালোই জানা ছিলো, দিনরাত্রি হয় লেখাপড়া নয় কোরান তেলাওয়াৎ। ইংরেজিটা রপ্ত করতে পারেনি বলে আই. এ আর পাস করা হয়নি। খালাম্মা বলে 'বিয়ে হলে আমরা ভাবলাম আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। হায়রে কপাল! কিসের কি? একটা ইঞ্চি যদি বদলায়!'

অতো সোজা! তার বাবা তো বদলাবার লোক নয়। বিয়ে তো তুচ্ছ কথা, মরণের পরও আশরাফ আলি একটুও বদলায়নি। সেই টাইট করে সাঁটা ঠোঁট, সেই কাঁটাঝোপের গোঁফ। তার মাজা ছিলো সোজা, পায়ের পাতায় জোর ছিলো, তাই নিয়ে হেঁটে বেড়িয়েছে, কাউকে পরোয়া করেনি। দ্যাখো না কেমন উঁটসে শুয়ে রয়েছে। তোমরা একবার দ্যাখো না! এই মুখে হাত বুলিয়ে দেওয়ার জন্য ইয়াকুবের দুই হাতের আঙুল নিসপিস করে! কিন্তু না। একটুও বিরক্ত করতে সাহস হয় না।

'বাবা, এসেছো?' দরজার ওপার থেকেই মেজোমামার ভেঙে-পড়া গলা শোনা যায়। মেজোমামা এসে ইয়াকুবকে জড়িয়ে ধরে, 'নাই! নাই! নাই! এতিম হয়ে পড়লি বাবা! তোর মামী শুনে কাঁদতে কাঁদতে গড়ায় আর বলে একুব এতিম হয়ে গেলো।' এই শোকাহত আলিঙ্গনের ফলে মেজোমামার বুকে ইয়াকুবের মুখ, মেজোমামার বুকের শক্ত মাদুলিটা তার নাকে বড়ো কঠিন লাগে, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই মেজোমামা ইয়াকুবকে ছেড়ে 'দুলাভাই! দুলাভাই!' বলে চশমা খুলে খাটিয়ার দিকে এগিয়ে গিয়ে আশরাফ আলির বুকে নিজের মুখ ঘষতে

শুরু করে। মেজোমামার এসব কাজ অনুমোদন করা যায় না। এই মাখো-মাখো ভাব আশরাফ আলির অসহ্য। আশরাফ আলি মরতে না মরতে এই লোকটা কি তার স্বভাব একেবারে ভুলে গেলো?

এহসান ডাক্তার এসে মেজোমামাকে ধরে বাইরে নিয়ে যায়, 'আপনে এমন ভেইঙে পড়লি চলবে কেনে? ভাইগ্নেরে বুঝোয়ে সুজোয়ে থামান। বাদ জোহর জানাজা পড়ি আসরের আগেই দাফন সেরি ফেলতি চাই।'

এহসান ডাক্তার বাইরে গেলে স্বস্তি পাওয়া যায়। আব্বা বোধহয় এই ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করাতো। আব্বার কি রোগ? তবে দুজনের মধ্যে সম্পর্ক নিশ্চয়ই খুব ভালো ছিলো? মনে হয় আশরাফ আলির জন্য শোকটা বেচারার চামড়া ফুঁড়ে আরেকটু ভেতরে বিঁধে গেছে। তাই কার সম্বন্ধে কি বলছে ঠিক ঠাহর করতে পাচ্ছে না।

ফের ভেতরে এসে মেজোমামা আলগোছে ওর পিঠে হাত রাখলে শিরদাঁড়া শির শির করে ওঠে, বলতে ইচ্ছা করে, 'মেজোমামা, আর একটা বছর বাঁচলে আব্বা আর আমি এক সঙ্গে থাকতে পারতাম! সারাটা জীবন আব্বা একা থাকলো, আব্বার জন্যে কিছুই করতে পারলাম না!' কিন্তু বলা হয় না। আশরাফ আলির কাফন-মোড়া লাশ লোবান-ধূপের গন্ধের তর্জনী তুলে আদিখ্যেতা করতে বারণ করে। মোজোমামাকে বাইরে ডেকে নিয়ে কারা যেনো বাঁশ-চাটাই কেনার টাকা চেয়ে নেয়। আবার সে যেনো বলে, 'হাট ছাড়া চাটাই পাওয়া যাবে না।' হাট কোথায়?—হাট কাছেই, দেড়ক্রোশ পথ, কিন্তু বৃহস্পতিবার ছাড়া হাট বসবে না। ডাক্তার পরামর্শ দেয়, 'দ্যাখো তো কুসুমহাটিতে যাও দিনি, মুকুন্দ সাহার গদিতে চাটাই থাকতি পারে।' 'মুকুন্দ সাহা খুচরো বেচপে?'

'শালা চামার! বেচতে চাইবে না। দুটো পয়সা বেশি দিলি পরে শালার বাপে ঘাড়ে করি এইনে দিয়ে যাবেখন।'

আধ ঘণ্টার মধ্যেই আর একজন কে চলে এলো, ঢুকতে ঢুকতেই বলে, 'কখন হলো? কিভাবে হলো? কি হয়েছিলো বলো দিনি? এ্যাঁ? এখন গফুর পিওন গিয়ে বলে, ও বাবু, মাস্টার সাহেবের জন্যি চাটাই কেনবো।—চাটাই ক্যানে? চাটাই দিয়ে কি হবে?—না, মাস্টার সাহেব মরি গিয়েছে, কব্বরে চাটাই লাগবে!' বেঁটে ও কালো লোকটা ধুতির খুঁট দিয়ে চোখ মোছে, ধরা গলায় বলে, 'আমারে কেউ খবর দিলে না, এ্যাঁ! পেরায় হাটে আমার গদিতে গিয়ে হাঁক দিতো, ও সাহামশায়!—ব্যস তেনি ঘরে ঢুকলেন তো আমরা কাজকাম বন্ধ করি তারেই ঘিরি বসলাম। মাস্টার সাহেব এলি পরে কিসের হিশেব-নিকেশ, কিসের বেচা-কেনা। এই বয়সে কতো পোস্টমাস্টার দ্যাখলাম, বিটিশ আমল, পাকিস্তান—কতো দ্যাখলাম। এরকম মাটির মানুষ কোনোদিন এই পোস্টঅফিসে আসে নাই। কি রসিক মানুষ, একবার গল্পগুজব শুরু করলো তো রাত দশটাই কি আর বারোটাই কি?'

ইয়াকুব বেশ ঝামেলায় পড়ে, তার মাথার গাঁথুনি শিথিল হওয়ার উপক্রম হচ্ছে। ছবিতে স্মৃতিতে, চোখে ঠোঁটে চিবুকে, প্রোফাইলে প্রোট্রেটে আশরাফ আলিকে যেভাবে সে গড়ে তোলে, এই সব সংলাপের তোড়ে সবই দারুণরকম টাল ধায়।

'সেদিন কি করিছেন, জানেন? কবে? গত হাটের দিন এট্টু দেরি করি গেছে। হাট ভেঙি গিয়েছে, রাত্রি সোয়া আটটা হবে। আমি খবর শুইনে রেডিও বন্ধ করি দিয়ে গদিতে বসিছি তো মাস্টারসায়েব গিয়েই বললেন, ও মুকুন্দবাবু, নীলমনিগঞ্জ ইস্টিশনের কাছে বড়ো এ্যাকসিডেন হয়ি গেলো, খবরে বলে নাই?—না তো। কোয়ানে?—আরে এই তো নীলমনিগঞ্জ—আহা কোমল হিরদয়ের মানুষ, বলতি বলতি কেঁইদে ভাষায়!' তার কথা শেষ হতে না হতে ধূতি পরা আর একজন লোক বললো, 'সোমবার সন্ধ্যায় হাই ইস্কুলের ফিল্ডে বসি ঐ এ্যাকসিডেন নিয়ে কতো আক্ষেপ করলে, কতো দুঃখ করলে! বলে, নিতাইবাবু, ঐ গাড়িতে আমিও থাকতি পারতাম না? আমার ছেইলে চাকরি করে গোপালপুর, রাজশাহী জেলা, তো তার ওখানে যাতি হলি তো আমার ঐ লাইনেই যাতি হবে, আমিও তো থাকতি পারতাম!—বলেন আর কাঁদেন। আমরা বলি মাস্টার সাহেব নরম মানুষ তাই সতি পারতিছেন না। আসলে কি? মরন তারে জানান দিয়ে গেছে, বুইলেন না?'

এসব উক্তি কার সম্বন্ধে করা হচ্ছে? সামনে শোয়ানো কাফন-ঢাকা মৃতদেহ ভালো করে দ্যাখা দরকার। মুখের কাপড় তুললেই তো দ্যাখা যায়। ভরসা হয় না। সেই গম্ভীর চেহারা ভেদ করে যদি কারো হাসিখুশি মুখ ভেসে ওঠে, তাহলে?

তবে নিতাই কুণ্ডুকে দ্যাখাবার জন্য গফুর পিওন কাপড়টা তুললে ইয়াকুবও ঝুঁকে পড়ে। না, কোথায়? এসব লোক কি বলছে? বাবার সেই মুখ, সেই আটকানো ঠোঁট। সেই ঠাণ্ডা কপাল। এমনকি প্রাণপণ মনোযোগে খুঁটিয়ে দেখলে শুকিয়ে যাওয়া জলের রেখার মতো বিরক্তির পাকা দাগটাও পাওয়া যেতে পারে। বোধহয় আর আধ ঘন্টাও থাকবে না। এই তো শেষ। এর মধ্যেই যা দ্যাখার শেষবার দেখে নাও। এই তো তার বন্ধ দুটো চোখ, চোখের ভেতরে মণি দুটো দ্যাখা যায় না। কপালের ভাঁজ খসে পড়ছে, একটু আগে অস্পষ্ট যে রেখার অনুসন্ধান চলছিলো তার সমস্ত সম্ভাবনা মসৃণ ফর্সা চামড়ার নিচে অস্ত গেছে। দুই ঠোঁটের টাইট গাঁথুনি কি আলগা হয়ে আসছে? এইবার এই ঠোঁটজোড়া কি অট্টহাসির ওজন নিয়ে গড়িয়ে পড়বে তারই মাথার ওপর? নিজের মাথায় হাত রেখে ইয়াকুব আরো তীক্ষ্ণ চোখে তাকায়, এই কি আশরাফ আলি? এই তো তার বাবা?

'কলেমা শাহাদৎ পড়েন, সকলেই পড়েন?' যিনি নির্দেশ দিচ্ছেন তিনি হলেন সাব রেজিস্ট্রার, এক্ষুণি এলেন, এসেই কবরযাত্রীদের নেতৃত্ব ও লাশের খাটিয়ার একটি অংশ তার পাঞ্জাবী আবৃত স্কন্ধে তুলে নিলেন।

'আশহাদো আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আশাহদো আন্না মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ।' পালাক্রমে সবাই লাশ বহন করে। ইয়াকুব একেকবার তার বেঁটে ঘাড় পেতে দিলে ঘাড়ের ওপর খুব হাল্কা ঠেকে। তার পা জোড়া টলমল করে ওঠে ঃ খাটিয়া কি শূন্য? আশরাফ আলি জীবনে কোনোদিন ভালো করে কথাও বললো না, মরণের পর তার এ কিরকম আচরণ? এই আচরণ বুঝতে না বুঝতে শবযাত্রা গ্রামের গোরস্তানে পৌঁছে যায়। জানাজার পর সাব রেজিস্ট্রার বলে, 'তোমার বাবার হয়ে মাফ চেয়ে নাও। পোস্টমাস্টার সাহেব ছিলেন সদাহাস্য সদাপ্রফুল্ল ব্যক্তি। সকলেই তাঁকে ভালোবাসতো। আপনারা তাঁর ওপর কোনো দাবি রাখবেন না।'

ডাক্তার বলে, 'মাফ চাও বাবা?'

'কেন?'

মেজোমামা বলে, 'মাফ চাও। তুমি তাঁর একমাত্র সন্তান।'

ডাক্তার প্রম্পট করে, ইয়াকুব বলে, 'আপনারা, আপনারা, আপনারা আমার বাবাকে মাফ করে দেবেন।'

লাশ নামাবার জন্যে কবরে তিনজন লোক দরকার। প্রথমে নামলো মেজোমামা, তারপর গফুর পিওন। ইয়াকুব নামবার উদ্যোগ নিতেই মেজোমামা বলে, 'তুমি নেমো না বাবা, তুমি ধরতে পারবে না।' তারপর সকলের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আপনাদের একজন নামেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, পাক-সাফ থাকে—এমন কেউ আসেন।' কিন্তু ধার্মিক ও পবিত্র কেউ নামবার আগেই ইয়াকুব নেমে পড়লো।

'মুর্দার মুখ পশ্চিম দিকে করে দাও, কেবলামুখী করো।'

'একবার মুখের ঢাকনা খোলো, সবাইকে দ্যাখাও বাবা।'

ইয়াকুব নিজেই ভালো করে দেখতে চায়। কিন্তু চোখের সামনে নোনাজালের জাফরি কাটা পর্দা। বাবার ঠোঁটের কোণে কি তার চোখের জল ঢেউ খায়? ফর্সা রঙের শান্ত কপালে একটা পেন্সিলের রেখা এঁকে দিলেই বাবার পরিচিত বিরক্ত মুখটা দ্যাখা যেতো। এখানকার লোকজন কি এই দাগটা কোনোদিন দেখতে পায়নি? নাকি এটা অন্য কারো মুখ? নাকি সে এতোকাল অন্য কাউকে দেখে এসেছে? কাকে?—নিশ্বাস নেওয়ার জন্য ইয়াকুব ওপরের দিকে মুখ তোলে।

আসরের নামাজের পর সবাই স্কুলের মাঠে বসলো। হেডমাস্টার, সাব রেজিস্ট্রার, স্টেশন মাস্টার, রেলওয়ের এক গার্ডসায়েব, এহসান ডাক্তার, করিম গাজী, রজব আলি সানা—এরা সবাই চায় যে কুলখানিটা এখানেই হোক। ইয়াকুবদের কোনো অসুবিধা হবে না, খাটাখাটনি যা সব এরাই করবে। তিনদিন পর অনুষ্ঠান শেষ হলে ইয়াকুব ও তার মামা ফিরে যাবে।

সাব রেজিস্ট্রার লোকটার গঠনমূলক উপদেশ দেওয়ার বাতিক, 'দ্যাখো, বেশি খরচ করো না, ফকির মিসকিন খাওয়াও, ম্যাক্সিমাম ২৫/৩০ জন, কোরান খতম করাও, মিলাদ পড়াও, তাহলে তোমার আব্বার রুহের শান্তি হয়।'

'কার?'

ইয়াকুবের এই প্রশ্নে তার বিচলিত চিত্তের কথা ভেবে লোকজন আরো অভিভূত হয়। করিম গাজী বলে, 'আহা রে, বাপের মতো নরম স্বভাব পেইয়েছে! মাটির মানুষ বাবা, তিনি ছেলের মাটির মানুষ। আমার মেইয়ে, বুয়েছো, এই এতো বড়ডি হইয়েছে' করিম গাজী মাঠে আসন পেতে বসেই হাত উঁচু করে মেয়ের বয়স বোঝাবার চেষ্টা করে, কিন্তু তাতে কেবল তার আড়াই হাত উচ্চতাই বোঝা যায়, 'তো সে মেইয়ে জামগাছ থেকে পড়ি জখম হয়েছে। তাই সে আসতি পারলে না, মাস্টার সাহেবের খবর শোনবার পর থেইকে সে কেইন্দে-কেইটে একাকার।' বলে করিম গাজী নিজেও ফোঁৎ-ফোঁৎ করে নাক ঝাড়ে এবং খোনা গলায় কোঁকায়, 'জামগাছ থেইকে পড়ার পর মেইয়ে আমার খালি চেঁচায়, খালি কান্দে, দুতিনদিন তার খাওয়া দাওয়ার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। তার মা কেইন্দে মরে, একটা দানা যদি মেইয়ের মুখি দেওয়া যায়! শেষ মেষ মাস্টারসাহেব দেখতি গেলো—নিজে হাতে মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে ভাত মেইখে তার মুখি তুলি দেয়, তবে তার পেটে অন্ন পড়ে। মাস্টারসাহেব বলে, 'ও মনি তুমি না খাও তো তোমার এই বুড়ো ছেলিটা না খেয়েই মরবে।'

এদিকে ইয়াকুবের পাশে বসে গফুর পিওন মেজোমামার কানে ফিস-ফিস করে, 'শালার এহোসান ডাক্তারই মাস্টারসায়েবরে খেলো, বুইলেন? শালা পেত্যেক দিন নিজির দোকানে বসি ওঁয়ারে মৃতসঞ্জীবনী খাওয়াতো। বাঞ্চোৎ কিপ্টের একশেষ, নিজেও ওঁয়ার পয়সায় বোতল বোতল মাল গিলতো। মাস্টার সাহেবের বুকির ব্যথা হলো মাল খেতি খেতি! এই মাটির মানুষটারে, শালা শেষ করি ফেললো!' মেজো মামা শুনে ভয়ে অস্থির, 'থাক বাবা এসব কথা এখন থাক।' গফুর পিওন থামতে চায় না। কিন্তু করিম গাজীর কথা তখন বক্তৃতায় গড়িয়ে পড়েছে, সুতরাং মেজোমামার অখণ্ড মনোযোগ এখন সেই দিকেই। 'বুঝলেন, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ, ধনী-নির্ধন, হিন্দু-মুসলমান সকলেই তার উন্নত চরিত্রের কথা মনে করিয়া মুগ্ধ হইত—।' মনোযোগী জনতা দেখে করিম গাজীর গলা চড়ে। সাব রেজিস্ট্রার তখন সভাপতিসুলভ ভঙ্গিতে বলে, 'অনেকেই অনেক কথা বলবেন। তাঁর কথা বলে শেষ করা যায় না। তবে আমার মনে হয়, আমি বলতে চাই যে, তাঁর রসবোধ বা হাস্যরস বা রসিকতাই তাঁহার চরিত্রের সর্বপ্রধান গুণ। এখনো আমার চক্ষু দুইখানি বন্ধ করলে তাঁর হাসিমুখের প্রসন্ন মূর্তিখানি আমার সামনে প্রতিভাত হইয়া ওঠে।'

রাত্রে পোস্টঅফিস সংলগ্ন আশরাফ আলির বাসগৃহে আশরাফ আলির চওড়া তক্তপোষে শুয়ে মেজোমামা হু-হু করে কাঁদে। লোকটা বড্ডো কাঁদতে পারে। নানীর মৃত্যুর পর এক মাস ধরে এক নাগাড়ে কান্নাকাটি করেছে। একটু বিরতি দিয়ে সে ডাকে, 'গফুর!' গফুর পিওন বারান্দায় মশারি টাঙাচ্ছিলো। সে এলে মেজোমামা বলে, 'এক গ্লাস পানি খাওয়াও তো ভাই।'

হ্যারিকেনের সলতে বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে ঘরের দেওয়াল, বিছানা, টেবিল, আলনা, জলের কুঁজো, দড়িতে ঝোলানো গামছা, লুঙি সব দুলে উঠলো। পানি-খাওয়া ঠাণ্ডা গলায় বলা মেজামামার কথাও শিরশির করে কাঁপে, 'দুলাভাই এখানে খুব পপুলার ছিলো, না রে?' শুয়ে পড়তে পড়তে মেজোমামা ফের বলে, 'হ্যারিকেন কমাবার দরকার নেই।'

এই ঘর, দেওয়াল, বিছানা, দেওয়ালের ছায়া—সবই ইয়াকুবের অপরিচিত। আশরাফ আলি এই ঘরে পাঁচ ছয় বৎসর কাটিয়ে দিয়েছে, তেইশটা বছর সে এইভাবে জীবন যাপন করেছে। এই বিছানায় শুয়ে থাকতো। শালার মেজোমামাকে হটিয়ে এখানে আশরাফ আলিকে দিব্যি শুইয়ে দেওয়া চলে। কিন্তু বাবার মুখটা এই সময় হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। কবরে নামাবার পর চোখের পাতা খুলে মণি দুটো ভালো করে দেখে নিলে হতো। যে বালিশে আশরাফ আলির মাথা রাখার কথা তার একটি কোণে আঙুল দিয়ে ঘষলে তার চোখের পাতা ওপরে ওঠে এবং অপরিচিত চোখের-মণি ভালো করে মেলতে না মেলতে বুঁজে যায়। লণ্ঠনের আগুন, কেরোসিন ও ধোঁয়ার মিলিত গন্ধে ইয়াকুবের নাক খচখচ করে। ফলে তার নিজেরই তৈরি বিভ্রম ভেঙে গেলেও সে মন খারাপ করার সুযোগ পায়না।

এই চেয়ে বাবার ওপর রাগ করতে পারলে বরং একটু স্বস্তি পাওয়া যায়। আব্বার ওপর রাগ করার কারণ কাছে বৈ কি? না জীবনে, না মরণে—লোকটা কোনোদিনই তাকে পাত্তা দিলো না। এদিকে দ্যাখো, এহসান ডাক্তারের সঙ্গে ভাগাভাগি করে বোতল ওড়ায়। কার না কার মেয়ে জামগাছ থেকে পড়ে ঠ্যাং ভাঙলে কোন অজপাড়াগাঁয়ে গিয়ে মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে তার জন্যে ভাত মাখে।—কিন্তু বাবাকে শালা জুৎ করে কোথাও বসানো যাচ্ছে না। দেখতে না দেখতে সব হাওয়া হয়ে যায়। দরজায় লম্বা একটি ছায়া পড়লো, সেদিকে ভালো করে তাকাবার ভরসা হয় না, পাছে নতুন কাউকে দ্যাখে। বুকে বল ধরে ইয়াকুব যদি বা মুখ ফেরালো তো দ্যাখো কোথায় কি? কেউ নেই, কিচ্ছু নেই।

বাবাকে না পেয়ে তার ওপর রাগ করার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। বাবাকে খুঁজতে খুঁজতে মাথা নিচে নেমে আসে, দুই হাঁটুর মধ্যে কখন মাথা গোঁজা হয়ে যায়। তিন মিনিটের তন্দ্রায় একটা মাঠে বসে কয়েকজন গল্পগুজব করে। এটা কোথাকার মাঠ?—কোন মাঠ, কোন মাঠ—ঠাহর করতে করতে উচ্চকণ্ঠ হাসির দমকে মাঠটা ছড়িয়ে পড়ে বিশাল প্রান্তরে, সেখানে মাঠের কোনো চিহ্নই আর বাকি থাকে না। এমন করে হাসে কে?

সন্ধ্যাবেলার ময়লা শূন্যতা ঝোলে, তার ফাঁকে ফাঁকে হেডমাস্টারকে দ্যাখা যায়, তার পাশে সাব রেজিস্ট্রার। এহসান ডাক্তার আছে, করিম গাজী আছে, জামগাছের ভাঙা ডাল থেকে নিচে পড়ে যাচ্ছে তার আড়াই হাত লম্বা মেয়ে। কিন্তু

আশরাফ আলি কোথায়? এরকম জোরে জোরে হাসছে কে? আশরাফ আলির হাসি ইয়াকুবের অপরিচিত। তাকে সনাক্ত করে কি করে? ফের দমকা একটা হাসি বেজে উঠলে তার তন্দ্রা একেবারে তছনছ হয়ে যায়। চোখ মেলে ইয়াকুব শূন্য ঘর দ্যাখে। বাবা কোথায়? নেই।

ভোর হবার আগেই মেজোমামাকে ডেকে ইয়াকুব বলে, 'মেজোমামা, ছ'টার ট্রেনে আমি চলে যাই।'

দরজা খোলা, বারান্দায় গফুরের মশারি হাওয়ায় কাঁপে। ভোরবেলায় বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। মেজোমামা পিঠের নিচে থেকে বিছানার চাদর তুলে গায়ের ওপরে চড়িয়েছে। জড়োসড়ো হয়ে বসে মেজোমামা বলে, 'কি?'

'আমার অফিসে অনেক কাজ, আজ বরং আমি চলে যাই।'

কিছুক্ষণ পর মেজোমামা উঠে দাঁড়ায়, 'কেন? কুলখানি না পরশু!'

'আপনি ম্যানেজ করে নেবেন।'

মেজোমামা ফ্যালফ্যাল করে তাকায়, 'ভয় করে? স্বপ্ন দেখেছিস?'

'নাঃ! ভয় কিসের?' প্যান্টের ভেতরে শার্ট গুঁজে দিতে দিতে ইয়াকুব বলে, 'যাই মামা।'

'খারাপ লাগছে? একা একা আরো খারাপ লাগবে। কুলখানির পর আমিও তোর সঙ্গে যাবো। তোর অফিসারকে বলে সপ্তাহখানেকের সি. এল নিবি, তারপর একসঙ্গে ঢাকা যাবো, তোর মামানীও বলে দিয়েছে।'

এই লোকটা বৌয়ের রেফারেন্স ছাড়া কথা বলতে পারে না।

'শোন ইয়াকুব, আমার কথাটা রাখ। কুলখানি সেরেই যা।'

'কার?'

ইয়াকুবের জন্য মেজোমামার খুব খারাপ লাগে। ছেলেটা এতিম হয়ে গেলো। আস্তে আস্তে বলে, 'লোকজন মাইণ্ড করবে। তোর বাবাকে এখানকার লোক খুব ভালোবাসতো।'

'কাকে?'

লোকজন কাকে ভালোবাসতো? বাবার মুখটা সম্পূর্ণ নিয়ে আসার জন্য ইয়াকুব আরেকটা এ্যাটেম্পট্ নিলো। গম্ভীর একজন লোক একবার হাতের নাগালে আসে তো আরেকজনের গ্লাস থেকে ঢালা মদের ছলকে সমস্ত গাম্ভীর্য মুছে যায়। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি হাসিখুশি মুখ করে একটি বালিকার জন্য মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে ভাত মাখে। দেখতে দেখতে ভাতের থালা তার সামনে থেকে সরে যায়, লোকটা চিঠি লিখতে বসে, তার টাইট মুখের নিচে ও তার শক্ত আঙুলের ঠিক তলায় বেরিয়ে আসে পিপঁড়ের সারি, তার ভ্রূর গেরো কঠিন হতে থাকে। এই পরিচিত লোকটিকে তার চোখের মণিতে এঁটে রাখবার জন্য ইয়াকুব মনোযোগী হতে না

হতে নীলমনিগঞ্জে রেল এ্যাকসিডেন্টের খবরে কাঁদতে থাকা লোকটির চোখের জলে সব ধুয়ে যায়। না, কেউ থাকে না, দুজনের একজনও নেই।

মেজোমামা ফের মিনতি করে, 'ভেঙে পড়িস না বাবা! আজ বাদজোহর মৌলবি আসবে, কোরান খতম হবে; কবর জিয়ারত করবি না?'

'কার?' ইয়াকুবের মাথা ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে, শূন্য চোখে সে মামার দিকে তাকিয়ে থাকে।

মেজোমামার মন ফের খারাপ হয়ে যায়। সারারাত ছেলেটার ঘুম হয়নি। ঢাকায় নিয়ে ভালো করে আদরযত্ন করা দরকার।

কিন্তু ভোরের আলো ভালো করে ফুটে ওঠার আগেই ইয়াকুব দরজার কাছে দাঁড়ায়, 'যাই মেজোমামা, স্লামালেকুম।'

'আরে দাঁড়া, রাস্তাঘাট চিনিস না, সঙ্গে গফুর যাক না!'

কিন্তু অপরিচিত রাস্তা পার হওয়ার জন্য ইয়াকুব একা একাই রওয়ানা হলো।

১৯৭৯

গল্প

দুধ ভাতে উৎপাত

মিলির হাতে স্টেনগান

'ও মা এখনো দাঁড়িয়ে আছিস!'

এর পরও মিলি দাঁড়িয়ে রইলো। জানলা বন্ধ করার জন্যে অনেকক্ষণ থেকে তার ডান হাত জানলার বাঁদিকের পাল্লায় রাখা, আরেকটা হাত জানলার শিকে। দুটো হাতই ভিজে যাচ্ছে, পানির ঝাপ্টা এসে পড়ছে চুলে ও মুখে। সামনের রাস্তা, রাস্তার ওপাশে ল্যাম্পোস্ট ও তার পাশে ঝাঁপ-ফেলা পানের দোকান এবং গলির নালা ও পানির মিলিত গন্ধ এই কড়া, এই হালকা। স্পষ্ট শোনা যায় কেবল আব্বাস পাগলার ধমক। আকাশের দিকে তাকিয়ে আব্বাস পাগলা একনাগাড়ে চিৎকার করে, তার চিৎকার তেপান্তরের মাঠে ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা আওয়াজের সঙ্গতে ডাকাতের-হাতে-পড়া পথিকের আর্তনাদের মতো কড়াৎ করে বাজে। মিলির মা মনোয়ারা হ্যাঁচকা টানে জানলা বন্ধ করে। জানলার পাশে বিছানায় বালিশ ভিজে গেছে, বালিশের অড় খুলে মনোয়ারা মশারি টাঙাবার দড়িতে ঝুলিয়ে দেয়। জানলার তাকে বি. এস. সি. ক্লাসের কেমিস্ট্রি বইয়ের ধুলোপড়া মলাটে পানির থ্যাতলানো ফোঁটা। হাল্কা নীল রঙের শাড়ির আঁচল দিয়ে বই মুছতে মুছতে মনোয়ারা বলে, 'কখন থেকে বলছি জানলা বন্ধ কর, জানলা বন্ধ কর! রানা আসুক, মজাটা বুঝবি!' মিলি খুব মনোযোগ দিয়ে আব্বাস পাগলার একটানা ধ্বনিকে শব্দে ভাগ করার চেষ্টা করে। রানাকে তার ভয় পাবার কিছু নাই, এইসব ফিজিক্স কেমিস্ট্রির জন্যে রানার বয়েই গেলো।

ভেতরের বারান্দা থেকে তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকলো মিলির বড়ো ভাই, এরই নাম রানা। ঢুকেই বললো, 'চিরুনিটা দেখি।'

'টেবিলে দেখো।'

ঘরের একমাত্র টেবিলে রাজ্যের জিনিস। এক পাশে ক্লাস এইটের বইপত্র, মিলির ছোটোবোন লিলি বছর দুয়েক ধরে ঐ ক্লাসেই পড়ছে; বইপত্রের পাশে আয়না, চিরুনি, পাউডার কেস, স্নোর কৌটা, তেলের বোতল, সেফটিপিন, শ্যাম্পুর বোতল। গতকাল পর্যন্ত অনেক-আগে-শেষ শ্যাম্পুর খালি বোতল এবং স্নোর খালি কৌটাও ছিলো। রানা আজকাল এইসব ফালতু জিনিস দেখতে পারে না

বলে মনোয়ারা ওগুলো কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। তবে টেবল কখনো এলোমেলো থাকে না, মনোয়ারা বা লিলি যে যখন আসছে একবার গুছিয়ে রেখে যাচ্ছে। সুতরাং এক সেকেন্ডে চিরুনি পাওয়া যায়। ক্লাস এইটের মলাট-লাগানো বইয়ের স্তূপে আয়না ঠেকিয়ে তক্তপোষে বসে রানা ধীরেসুস্থে চুল আঁচড়ায়। রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে মনোয়ারা মিলিকে ডাকে, 'হাতে হাতে কাপ পিরিচগুলো ধুয়ে ফেল তো।'

'আসি আম্মা!' কিন্তু মিলি ফের জানলা একটুখানি ফাঁক করে দাঁড়ালো। বৃষ্টি বেশ চেপে এসেছে। পানির ঠাসবুনুনি ধারার তোড়ে আব্বাস পাগলার মুখ কান নাক মাথা আলাদা হতে পারে না। ওর বলকানো ছাদে রিবাউণ্ড হয়ে বৃষ্টির মোটা ধারা মিহি হয়ে সাদা ধোঁয়ার মতো ছড়িয়ে পড়ছে। বিদ্যুৎ চমকাবার জবাবে আব্বাস পাগলা গর্জন করে উঠলে তার মস্ত হাঁ মশালের আলোয় উদ্ভাসিত পাহাড়ের গুহার মতো প্রতিধ্বনিময় হয়ে ওঠে। সেই বিদ্যুৎ ফের আকাশের মুখে থুতুর মতো ছুঁড়ে দিতে দিতে সে যা বলে কিছু ঠাহর করা যায় না। আরেকটু মনোযোগ দিলে বোঝা যাবে এই ভরসায় মিলি একটু গুছিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আব্বাস পাগলার শব্দ চাপা পড়ে রানার কথায়, 'মিলি, চা দে।'

মিলি বিরক্ত হয়, 'এইতো সবাই চা খেলো। চা খাওয়ার সময় তুমি রোজ থাকো কোথায়?'

ভেতর থেকে আম্মা ডাকে, 'মিলি, রানার চা নিয়ে যা।'

চায়ের পেয়ালার পিরিচে ঝোলা গুড় মাখানো দুটো টোস্ট বিস্কিট। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে টোস্ট শুদ্ধ পিরিচ রানা ফিরিয়ে দিলো।

'খাবে না?'

নাক কুঁচকে রানা বললো, 'এসব খাওয়া যায়?'

মিলির কিন্তু খুব খেতে ইচ্ছা করে। বিকালবেলা চায়ের সঙ্গে কিছু থাকে না। রানার জন্যে আম্মা কোত্থেকে কি বার করে দেয়। গুড়-মাখানো টোস্টে কামড় দিতে দিতে ফের জানলা খুলতে গেলে রানা বলে, 'খুলিস না।'

'বৃষ্টি কমে গেছে, খুলে দিই?'

'না থাক।'

'গরম লাগছে তো।'

'আঃ!' রানা ধমক দেয়, 'ঐ পাগলা শালা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে।' জানলার দিকে পিঠ ফিরিয়ে রানা বালিশে ঠেস দিয়ে বসলো, 'শালা চেচায় কী! ইনটলারেবল বাস্টার্ড!' মিলি তখন বন্ধ জানলা থেকে রান্নাঘরে চলে যায়। রানার কথা আর শেষ হয় না, 'কাল ইভনিংটা স্পয়েল করে দিলো।' তারপর জোর দিয়ে সংকল্প জানায়, 'আজ আসুক শালা! ঘাড় ধরে বের করে দেবো।'

কিন্তু বের করে দেওয়া কি এতো সোজা? কাল সন্ধ্যায় সোহেল না সিডনি না ফয়সল কি নাম, ফর্সা—রোগা ছেলেটা,-বলছিলো, 'দেখো, এসব লোক দেখতে

পাগল পাগল হলে কী হবে, এই বেটাদের সঙ্গে একটু রেসপেকট করে কথা বলা ভালো। কার ভেতর কী পাওয়ার আছে কে বলতে পারে। রিস্ক নিয়ে লাভ কি? কেয়ারফুল থাকাই ভালো।' ছেলেটা কিন্তু নিজেই একটু অসাবধান টাইপের; বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে টেলিভিশনের জন্য প্লাগ-পয়েন্ট লাগাচ্ছিলো, বাঁদিকে ঝোঁকটা এমন ছিলো যে একটু এদিক-ওদিক হলেই পড়ে যেতো। রানারা পঞ্চপাণ্ডবের চারজন মিলে বিকালবেলা কোত্থেকে একটা টেলিভিশন নিয়ে আসে, সেটা চালু করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে গেলো।

এদিকে রানার ঘর মানে ওর বাবারও ঘর। ছেলে সেখানে সবান্ধব টেলিভিশন ফিট করায় ব্যস্ত। বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সরু গলিতে ঘোলা সূর্যাস্ত দেখা ছাড়া আশরাফ আলীর আর কোনো কাজ থাকে না। আবার বারান্দায় এসে জুটেছিলো আব্বাস পাগলা। তাই নিসর্গে সম্পূর্ণ মগ্ন হওয়া আশরাফ আলীর পক্ষে সম্ভব হচ্ছিলো না, কারণ আব্বাস পাগলার তক্ষুনি একটা স্টেনগান দরকার। রানাকে বলে দশটা না পাঁচটা না, একটা স্টেনগান জোগাড় করে দেওয়ার জন্য আশরাফ আলীকে সে খুব বিনীত অনুরোধ জানায়। দুটো তিনটে বিনীত বাক্য প্রয়োগের পর তার গলা চড়ে গেলে মগরেবের নামাজ পড়তে আশরাফ আলী ভেতরে ঢোকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রানাদের মধ্যে প্রবেশ ঘটলো আব্বাস পাগলার।

সোহেল না সিডনি না ফয়সল,—ফর্সা-রোগাটা বাঁদিকে ডানদিকে সমান ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আব্বাস পাগলাকে সম্মান জানায়। তার দেখাদেখি রানা এবং আরেকজন—সোহেল না সিডনি না ফয়সল—এটা অবশ্য কালো-লম্বা-সেও দাঁড়ায়। বাকি রইলো একজন। এর একটি গাড়ি আছে বলে তবু একে একটু আলাদা করা যায়। তো এই সর্বশেষ যুবকটি,—সোহেল না সিডনি না ফয়সল—নাম তিনটে এই তিনজনেরই, কিন্তু মিলির কাছে এদের সবাইকে একই রকম মনে হয়, এদের আরেকজন বন্ধু আছে, সে আজ আসে নি, এমন হতে পারে যে এই তিনটে নামের মধ্যে তার নামটিও রয়ে গেছে, সেদিক থেকে বিবেচনা করলেও সুনির্দিষ্ট নামে এদের একেকজনকে সনাক্ত না করাই ভালো,—সেও বসে থাকা অবস্থাতেই একটু সোজা কিম্বা একটু বাঁকা হলো। কিন্তু এতো লোকের অবস্থানের অদলবদল, আনকোরা নতুন টেলিভিশন সেট—আব্বাস পাগলার গায়ে এসব একটুও আঁচড় লাগাতে পারলো বলে মনে হয় না। রানার সামনে সে হাত পাতে, 'রানা, স্টেনগান দিলি না?' টেবিলে রাখা ফাইভ ফিফটি ফাইভের প্যাকেট থেকে সিগ্রেট বের করে আব্বাস পাগলা ঠোঁটে দিতে না দিতে ফর্সা-রোগা দেশলাই জ্বালিয়ে তার সামনে ধরে। কিন্তু সিগ্রেটের মাথায় আগুন স্পর্শ করার মুহূর্তে কাঠি নামিয়ে নেয়, 'উল্টো হলো তো!' ফিল্টারের দিকটা আব্বাস পাগলার ঠোঁটে নেই, সামনে। সিগ্রেট ঠিক না করেই আব্বাস পাগলা হাত থেকে জ্বলন্ত কাঠি নিয়ে ফিল্টারে আগুন ধরাবার চেষ্টা করে। দেশলাই-কাঠির আগুন আব্বাস পাগলার আঙুল পর্যন্ত এসে পড়ায় মিলির ডান হাতের বুড়ো আঙুল ও তর্জনী একটু

একটু জ্বলছিলো। কিছুক্ষণ পর না-ধরানো সিগ্রেট আব্বাস পাগলা খুব কষে টান দিতে শুরু করে।

তিনটে চেয়ার ও দুটো তক্তপোষে সবাই ভাগাভাগি করে বসলে ফর্সা-রোগা ঝুঁকে জিগ্যেস করে, 'কেমন আছেন?' চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আব্বাস পাগলা মহাসুখে নাধরানো সিগ্রেট টানে, তার চোখে ধোঁয়া লাগার অস্বস্তি পর্যন্ত ফোটে। মিলি নিজের চোখজোড়ায় সেই অনুপস্থিত জ্বালা অনুভব করার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। ফর্সালম্বা বসেছিলো তক্তপোষের এক ধারে, আরো খানিকটা ঝুঁকে গলা আঠালো করে নিবেদন করে, 'কাল পরশু একটা পারমিট পেতে পারি।' জবাবে আব্বাস পাগলা 'হোগার মইদ্যে ব্যাণ্ডেজ বান্দলে সিগারেটের স্বাদ থাকে? বলে ফিল্টার টিপড সিগ্রেট জানলার দিকে ছুঁড়ে মারে, শিকের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে অক্ষত সিগ্রেট ট্রাঙ্কের আড়ালে পড়ে রইলো। আজ সকালবেলা মিলি ওটা কুড়িয়ে নিয়ে গন্ধ শুঁকে আবার ওখানেই রেখে দিয়েছে। 'কাল একটা পারমিট পাবো' ফর্সা-রোগা আরো ঝুঁকে পড়েছিলো, 'মজনু ভাই ওয়ার্ড দিয়েছে ম্যানেজ করে দেবে।'

'কী?'

ফর্সা-রোগা দ্বিগুণ উৎসাহে বলে, 'মজনু ভাই ওয়ার্ড দিয়েছে। আহসানুল হক মজনু। ভালো পার্টি পেলে ছেড়ে দেবো, না ইউটিলাইজ করবো? আপনি যা হুকুম করবেন তাই করবো।' চেয়ারের ওপর দুই ঠ্যাং তুলে আব্বাস পাগলা হুকুম করে রানাকে, 'স্টেনগান দে।'

টেলিভিশনের পর্দায় পুরুষ ও মেয়েদের তোড়ে দেশাত্মবোধক গান করা দেখতে দেখতে গাড়িওয়ালা বিড়বিড় করে, 'ইভনিংটা স্পয়েল করে দিলো।' এরপর গত ২৪ ঘণ্টায় রানা এই বাক্যটি কয়েকবার রিপিট করেছে।

আব্বাস পাগলা ফের হাত পাতে, 'কইলাম, আমারে একটা স্টেনগান দে! একটা স্টেনগান পাইলে ব্যাকটিরে আমি পানির লাহান ফালাইয়া দিবার পারি!' স্টেনগান কোথায়? আমি কি—?' রানা বিরক্ত হতে শুরু করেছিলো, কিন্তু ফর্সা-রোগার চোখে চোখ পড়তেই কথাটা আর শেষ করতে পারে না। রানার সমস্যার আর অন্ত নাই। কার দিকে টেনে সে কথা বলে? একজন শালা গাড়ির মালিক। ওর বাপও টপ লেবেলের এম. পি.। আবার সেক্রেটারিয়েট আত্মীয়-স্বজনে ভরা। ওদিকে বিজনেস বলো এ্যাকশন বলো—সব ধরনের ব্যাপারে ফর্সা-রোগোর মাথা একেবারে পরিষ্কার। সুতরাং কারো দিকে পক্ষপাত না দেখিয়ে রানা ভেতরে গেলো এবং কয়েক ফোঁটা পেচ্ছাব করে এবং মাকে অনাবশ্যক নির্দেশ দিয়ে ফিরে এলো। আসতে না আসতে আবার আব্বাস পাগলা। 'কাল রাইতে একটা চানাস্ পাইছিলাম। রাইত ভইরা চাঁদনি আছিলো না? আসমান এক্কেরে ধবধবা, ইট ওয়াজ ক্লিয়ার লাইক, এ লাইক এ. লাইক এ!' জুতসই উপমা খুঁজে না পাওয়ার ভাঙা রেকর্ডের মতো সে একই কথা কয়েকবার বলে। কয়েক

বছর আগে স্কুলে মাস্টারি করার সময়ও সে প্রচুর উপমা দিয়ে পড়া বোঝাতো এবং উপমান ও উপমিতের সন্তোষজনক সামঞ্জস্য না ঘটা পর্যন্ত উত্তেজিত হয়ে কয়েকবার 'লাইক এ' বলতো। এই কারণে ছাত্রদের মধ্যে সে 'লাইকে স্যার' উপাধি অর্জন করে এবং নামের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে পাগলা কথাটি যুক্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত রোকনপুর, একরামপুর এমন কি লক্ষ্মীবাজারের একটি এলাকা জুড়ে ঐ নামেই পরিচিত ছিলো। হঠাৎ উপমা জুটে গেলে আব্বাস পাগলার একই শব্দের পুনরাবৃত্তির অবসান ঘটে, 'লাইক এ হোয়াইট শিট অফ পেপার। একটা পিচ্চি মেঘ ভি আছিলো না। এক মিনিট বাদে বাদে কল আসতাছে, এ্যালার্ট থাকো, এ্যালার্ট থাকো। গেট প্রিপেয়ার্ড ফর দি ফাইনাল এ্যাকশন!' একটু বিরতি দিয়ে সে একটা হুঙ্কার ছাড়লো, 'আমার ভি আছে, ব্যাকটি বানাইয়া ঠিক কইরা থুইছি! ফাইনাল মেসেজ আইয়া পড় ক, আমি স্ট্রং কানেকশন কইরা রাখছি, ইন্সট্রাকশনের লাইগা ওয়েট করতাছি, দেহি!' দিনরাত চেচামেচি করার ফলে তার গলা সবসময় ভাঙাভাঙা, ভাঙা গলা পেরিয়ে এবড়োথেবড়ো ধ্বনি বেরিয়ে এসে শ্রোতাদের কানে খোঁচা মারে। এইসব খোঁচাখুঁচি সামলে নিতে নিতে ফর্সা-রোগা জিগ্যেস করে, 'কার ইন্সট্রাকশন?'

রান্নাঘর থেকে মনোয়ারা ডাকে, 'মিলি!'

দরজার আড়াল থেকে ওদের দেখা বাদ দিয়ে মিলিকে মায়ের কাছে যেতে হয়। রান্নাঘর থেকে ট্রে নিয়ে ফের রানাদের ঘরে যাচ্ছে, আশরাফ আলী জায়নামাজ গোটাতে গোটাতে বলে, 'রনি নিয়ে যাক না।'

'না মিলি যাক।' পেছনে মনোয়ারা। ট্রের ওপর ভালো করে দেখে আশরাফ আলী কপাল কোঁচকায়, 'এতো প্যাটিস খাবে কে?'

রান্নাঘরে ফিরে যাবার আগে ট্রের ওপর একটি চায়ের কাপ থেকে সরের টুকরা তুলে মনোয়ারা মেঝেতে ফেললো। আম্মার পেছনে রনি ঘুরঘুর করছে আর ঘ্যানঘ্যান করছে, 'আম্মা, প্যাটিস দিলে না, আম্মা প্যাটিস দিলে না?' আম্মা বলছে 'আর নেই!' রনি বলছে, 'দাও না! ভাইয়া কতো বড়ো প্যাকেট নিয়ে ঢুকলো!' আম্মা বলছে, 'থাকলেই একবারে সব খেতে হবে, না? কাল সকালে নাশতা করিস!' রনি বলছে, আম্মা বলছে, রনি বলছে, আম্মা বলছে!—রানাদের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে আম্মা ও রনির বলাবলি আড়াল হয়ে যায়।

রানা ওর পড়ার টেবিল রেখে দেয় সবার মাঝখানে। মিলিয়ে সঙ্গে মুখোমুখি হতে ফর্সারোগার মাখোমাখো মার্কা চোখে মুখে লাল রঙ ক্যাট-ক্যাট করে ওঠে, এই জিনিস মিলি আগেও লক্ষ করেছে। কালো-লম্বা এক্সট্রা স্মার্ট হয়, 'রানা কাল বিকালে ঢাকা ক্লাবের প্রোগ্রামটা মিস কইরো না! ফাইভ থার্টি শার্প!' তার মুখটা মিলি ভালো করে দেখে নেয়। অতো ছটফট করার দরকার কী বাপু? প্রেম ট্রেম করতে চাইলে সরাসরি বললেই পারে। এরা তো সব একই টাইপের, মিলি কী বাছাবাছি করতে বসবে, না তাই করা তার পোষায়? তবে গাড়িওয়ালা কিন্তু যেমন

ছিলো, তেমনি রইলো। হায় রে, আম্মার টার্গেট তো এই গাড়িওয়ালাই। কিন্তু মিলির দোষ কী? বড়ো লোকের ছেলে, কতো ভালো ভালো মেয়েমানুষ দেখে, এদেরে চোখে পড়া কি তার মতো মেয়ের কম্ম?—নইলে মিলির আপত্তি কী? সব তো একই।

আব্বাস পাগলা বলে, 'খুব ভোরের দিকে হালাগো আর্টিলারি—এ্যাট লিস্ট এ হান্ড্রেড টু এ থাউজ্যান্ড, এক লাখও হইতে পারে, আর্টিলারি পাস করলো, আমি সিগন্যালের লাইগা বইসা রইছি।' একটু থেমে ফিসফিস করে, 'ট্রেটরগুলি কম্যুনিকেশন ডিসরাপ্ট কইরা দিলো।'

ট্রে থেকে এক এক করে প্যাটিস, ফিরনি, চানাচুরের প্লেট ও চায়ের পেয়ালা নামে। সেদিকে আব্বাস পাগলার কোনো মনোযোগ নাই। 'রাইত তহন কিছু বাকি রইছে। চান্দে হালায় তহন ভি পুরা ফোকাস মারতাছে। একবার উপরে চাইয়া দেখি, ঐগুলি কী? আসমানের মইদ্যে উঁচানিচা এগুলি কী? গাত মালুম হয় না?—হ, তাই তো! এন্টায়ার স্কাইস্কেপ হ্যাজ বিন রেপড মিজারেবলি! খালি বাঙ্কার, ট্রেঞ্চ, এইখানে গর্ত, ঐখানে খন্দ! —এক্কেরে ঝালাঝালা কইরা ফালাইছে, বুঝলি না?' এর মধ্যে খুক করে ছোট্টো একটু হেসেও নিলো, 'তগো কী কই? আমি তো হালায় ঠিক দেখতাছি, কারা আহে, কেল্লায় আহে—লগে লগে বুইঝা ফালাইছি! মগর—।' এবার তার আকাশচিত্রবর্ণনা এতো দ্রুত হয় যে শব্দবিন্যাসে ঘোরতর অনিয়ম দেখা দেয়, তখন তাকে ঠিকঠাক অনুসরণ করা বেশ মুশকিল। তবে একনিষ্ঠ মনোযোগ দিয়ে শুনলে তার ব্যাকরণ মোটামুটি আয়ত্তে আসে এবং কুচি কুচি ছবিগুলো সম্পাদনা করলে জানা যায় যে শত্রুর যুদ্ধকৌশল সবটাই আব্বাস পাগলার নখদর্পণে এবং তাদের বিনাশ করার চূড়ান্ত নির্দেশের জন্যে অস্থির হয়ে সে একটু চোখ ফিরিয়েছিলো, তক্ষুনি হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে ছিন্নসম্পর্ক হয়ে পড়ে। একটি মাত্র অস্ত্র হাতে থাকলে আব্বাস পাগলা কি হেড কোয়ার্টারের অর্ডারের জন্য প্রতীক্ষা করে? 'একটা স্টেনগান থাকলে হু বদারস ফর দি ফাইনাল মেসেজ?'

'কী মেসেজ?' ফর্সা-রোগা খুব ব্যাকুলভাবে জিগ্যেস করে, 'কী মেসেজ হুজুর?'

আব্বাস পাগলা হঠাৎ চাঁদের চেয়ে ধারালো কোনো গ্রহ, এমন কী, বলা যায় কোনো নক্ষত্রের মতো ওর দিকে সোজাসুজি ফোকাস মারে। তার দুটো চোখের ঘোলাটে জমিতে কেবল কাটাকুটি। চোখজোড়া সঙ্কুচিত হয়ে তীক্ষ্ণ ও ছুঁচলো হলে চারজন বন্ধু নিজনিজ নিতম্ব ও আনুমানিক শিরদাঁড়ায় প্রায় স্থির হয়ে পড়ে। হঠাৎ করে চোখজোড়া সম্পূর্ণ খুলে ফেলে আব্বাস পাগলা হুঙ্কার ছাড়ে, 'হু আর ইউ?' তোপধ্বনির মতো দ্বিতীয় হুঙ্কার বাজে, 'টেল মি হু আর ইউ!'

মিলি ছিলো দাঁড়িয়ে। পায়ের পাতায় চাপ দিয়ে আওয়াজটা সামলে নিলো। ফর্সারোগার মুখ একেবারে তেলজলরসশূন্য অক্ষরহীন দোমড়ানো সাদা কাগজের

মতো পড়ে আছে ধড়ের ওপর, আর একটি হুঙ্কারেই উড়ে যেতে পারে। গাড়িওয়ালা বারবার দরজার দিকে দেখছে; হঠাৎ যদি আব্বাস পাগলার এ্যাকশন শুরু হয় তো প্যাটিস চানাচুর ফিরনির প্লেট চায়ের পেয়ালা এ্যাশট্রে প্রভৃতি বোঝাই টেবিল সরিয়ে, নতুন টেলিভিশন সেটের গা ঘেঁষে মেঝেতে রাখা ট্রাঙ্ক টপকে এবং লাস্ট বাট নট দি লিস্ট আব্বাস পাগলাকে ওভারটেক করে তবে কিনা বেচারা পৌঁছুতে পারবে দরজার কাছে। আর গাড়িতে পৌঁছুতে ওর ঢের দেরি, গাড়ি রেখে এসেছে বড়ো রাস্তায়। লম্বা-কালো উঠে দাঁড়িয়ে পকেটে হাত ঘষছে, বেচারার হাতের ঘাম কিছুতেই মোছা যাচ্ছে না।

কিন্তু সম্ভাব্য আক্রমণ প্রত্যাহার করে নিয়ে আব্বাস পাগলা দরজার দিকে চলে গেলো। 'চুতমারানি, খানাকির বাচ্চা, তগো ব্যাকটিরে আমি চিনি। আমার পেটের মইদ্যো থাইকা ইনফর্মেশন বাইর কইরা এনিমি ফ্রন্টে পাঠাইবার তালে আছো, না? ইস্পাইং করনের আর জায়গা পাইলি না?' তারপর বারান্দায় গিয়ে 'ও আশরাফ সাহেব, এনিমির ইস্পাই ছ্যামরাগো এ্যাসাইলাম দিয়ে বহুত মৌজ মারেন, না?' বলতে বলতে সে বেরিয়ে যায়। এতোক্ষণ দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকার পর আব্বাস পাগলার পেছনে পেছনে মিলি বারান্দায় গেলো। একটু পরে মনোয়ারা এসে বলে, 'একি মিলি! এখানে কী?'

'দেখো না!' মিলি আঙুল দিয়ে দেখায়, পানের দোকানের সামনে হাত পা নাড়িয়ে আব্বাস পাগলা খুব চ্যাঁচাচ্ছে।

আম্মা বিরক্ত হয়েছে, 'যা, রানা ওদিকে কখন থেকে চিনি চাইছে, দেখ!'

কিছুক্ষণ পর নিজেদের ঘরের জানলায় দাঁড়ালে আব্বাস পাগলাকে মিলি আর দেখতে পায় না। জানলায় দাঁড়াবার একটু পরেই বন্ধুদের সঙ্গে রানা বেরিয়ে গেলো। ওরা দোকানে দাঁড়িয়ে সিগ্রেট কিনছে। ওদের দুজন মিলির জানলার দিকে তাকালো। ঘাড় কিম্বা কাঁধ চুলকাবার জন্য আরেকজনকেও এদিকে মুখ ফেরাতে হয়, ল্যাম্পোস্টের ঘোলা আলো তিনটে মুখে পাউডারের মতো ছড়িয়ে পড়ায় একজন থেকে আরেকজনকে আলাদা করা যায় না।

কাল তো তবু আকাশটা পরিষ্কার ছিলো। ঝোলাগুড় মাখানো টোস্ট না ছুঁয়ে এক পেয়ালা চা খেয়ে হঠাৎ গাড়ির হর্ন শুনে রানা আজ বেরিয়ে গেলো তখন বেশ বৃষ্টি পড়ছে। অনেক রাত করে রানা ঘরে ফিরলে মনোয়ারার দরজা খুলে দেওয়ার শব্দে মিলি জেগে ওঠে। রাস্তায় আব্বাস পাগলা তখন লম্বা বিরতি দিয়ে হাততালি দিচ্ছে।

'খেয়ে এসেছি,' জড়ানো স্বরে খবরটা জানিয়ে রানা আব্বার ঘরে ঘুমোতে গেলে আম্মা এই ঘরে আসে। মিলির পা দুটো ঠিক করে নিজের বিছানায় বসে আম্মা একা একা পান সাজে। 'কোথায় যায়! এতো রাত করে কোথায় থাকে!' মায়ের নিশ্বাস ঐ তক্তপোষ থেকে মেঝেতে এবং মেঝের হিম ও ছোটো শূন্যতার আর্দ্রতা নিয়ে মিলির গায়ে শিরশির করে। তার উঠে পড়তে ইচ্ছা করে। আম্মাকে ভুলভাল একটা পান সাজিয়ে দিলে হতো। কিন্তু মিলি জেগে আছে টের পেলে

সশব্দ নিশ্বাস চেপে রাখা ছাড়া আম্মার আর উপায় থাকবে না। মিলি তাই শুয়েই থাকে এবং এই ওলটপালট সময়ে রানার কবে যে কি হয়—এই ভাবনা মাথায় খামচা দিলে তাকেও কয়েকটা নিশ্বাস গিলে ফেলতে হয়। আম্মার ভাবনা আম্মার, রানার জন্যে ঘরের এতো শ্রী আসছে, তার সঙ্গে একটু রয়েসয়ে কথা না বললে কি চলে? আবার মিলির ভাবনা মিলির। কারো চোখেই তাই জলের সঞ্চার হয় না এবং মিলির চোখ করকর করে। তখন পাশ ফিরলে স্বস্তি পায়। এই ভাবে রাত্রি গড়ায়। বাইরে আব্বাস পাগলার হাততালি এখন স্পষ্ট ও উচ্চশব্দ। তালির মাঝে বিরতি খুব দ্রুত কমে আসছে। তার তাক্ তাক্/তাক্ তাক্ তাক্,তাক্ তাক্/তাক্ তাক্—এই তালের নিয়মিত ও দ্রুত পেটায় বাইরের নীরবতা সংহত। আম্মার একাকী জাগরণের নিশ্বাসের পটভূমিতে তাক্ তাক্/তাক্ তাক্ তাক্ ক্রমেই তেজি হয়, কিছুক্ষণের ভেতর ভারি হাতের গলি-কাঁপানো তালি দেখতে দেখতে আম্মার নিশ্বাস প্রশ্বাস—সব গ্রাস করে ফেলে। জানলা দিয়ে হাততালির ধ্বনি ছলকে ছলকে এসে ঘরময় থৈ থৈ ভাসছে। মিলির চোখেমুখে ছলাৎ ছলাৎ ঝাপ্টা মারে তাক্ তাক্/তাক্ তাক্ তাক্ হাততালি। তাক্ তাক্/তাক্ তাক্ তাক্—মিলির চোখ জলময়। তাক্ তাক্/তাক্ তাক্ তাক্—তার চোখ জোড়া নিঃশব্দে বন্ধ হয়, চোখের জলভরা শাঁসে এখন অন্ধকার। তাক্ তাক্/তাক্ তাক্ তাক্—চোখের পানি ঘন হতে হতে কালো মেঘের আকার ও রঙ পায়, অন্ধকার এখন নিশ্ছিদ্র। তাক্ তাক্/তাক্ তাক্ তাক্—অন্ধকারের ভেতর ডিমের মধ্যে বড়ো হওয়ার স্পন্দন অনুভব করা যায়, তখন সেই হাততালির সঙ্গে পা ফেলে মিলি একটা উঁচু ক্রেনের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকে। ক্রেনের মাথায় রেলিং-ঘেরা ছোট্টো একটি জায়গা, রেলিঙের ওপর আব্বাস পাগলা। তার হাতে তালির বদল এখন স্টেনগান। রানা এবং ফর্সা-রোগার হাতে মিলি এই জিনিসটা আগেও দেখেছে, এর নাম স্টেনগান হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। আর এতো নিচে থেকে জিনিসটা স্পষ্ট ঠাহর করা কঠিন। আকাশের দিকে তাক করে আব্বাস পাগলা আব্বাস পাগলা নিশানা ঠিক করছে। যুদ্ধরত শত্রুসৈন্যরা মিলির দৃষ্টির অনেক বাইরে। আব্বাস পাগলা ক্রেনের সিঁড়ি বেয়ে আরো ওপরে উঠে যাচ্ছে বলে তার এলোমেলো উড়ন্ত চুলের কালো শিখা ছাড়া আর কিছু নজরে পড়ে না। কোমরে শাড়ি জড়িয়ে নিয়ে মিলি সিঁড়ির ধাপ ভাঙছে, আব্বাস পাগলার চুল কালো আগুনের মতো দপদপ করে জ্বলে, সেই দিকে চোখ রেখে সে ওপরে উঠছে। এক ধাপ এক ধাপ করে মিলি বেশ অনেকটা উঠে পড়ে। হঠাৎ মিলির সমস্ত শরীর দুলে উঠলো।—তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে তার পা ফস্কে গেছে, অনেক ওপরে কালো আগুনের শিখা—মিলি পড়ে যাচ্ছে গভীর নিচের খাদে।

তবে ভূমি স্পর্শ করার আগেই তার চোখ খুলে যায়; দেখে, ঘরে ঘন-ঘোর অন্ধকার। পাশের বিছানায় মায়ের মিহিসুরে নাকডাকা ও নিজের বিছানায় লিলির নিশ্বাসের একটানা আওয়াজ। মিলির তখন মুখের তালু খা খা করছে, তার তখন

দারুন পানির পিপাসা। স্বপ্নকে মুহূর্তে স্বপ্ন বলে সনাক্ত করতে পারলেও তার খুব ইচ্ছা করে, জানালা খুলে ওপরে যতোটা পারে একবার দেখে নেয়। কিন্তু ক্রনের সিঁড়ির এতোগুলো ধাপ ভাঙা এবং পা ফস্কে নিচে পড়ার ক্লান্তিতে চোখ জড়িয়ে আসছে। পানি আর খাওয়া হয় না, জানলা খোলার জন্যে ওঠার আগেই মিলি ঘুমিয়ে পড়ে।

ক্রেন থেকে নেমে এসে পরদিন দুপুরে আব্বাস পাগলা ওর মুখোমুখি দাঁড়ালো। বেলা একটা দেড়টার দিকে বাইরের দরজায় কড়ানাড়া শুনে দরজা খুলতেই সামনে আব্বাস পাগলার জখম-হওয়া-ট্রাকের মতো থ্যাবড়ানো মুখ।

'রানা কৈ? রানারে ডাক।'

'বাসায় নেই।'

'ন্নে-ই!' আব্বাস পাগলা মুখ ভ্যাংচায়, 'নেই! নাই কেল্লায়? কৈ গেছে? কারে হাইজ্যাক করবো? দুই ঘণ্টা আগে দেখলাম মস্তানগুলি টেলিভিশন লইয়া আইলো, অহন গেছে রেফ্রিজারেটর আনতে? কৈ গেছে, কইলি না?'

ধমক খেলে মিলি চুপ করে থাকে। ওরা টেলিভিশন নিয়ে এসেছে পরশু, আর লোকটা কিনা পুরো দুটো দিনকে গুটিয়ে নিয়ে এল দুই ঘণ্টায়! লোকটা এতো শক্তি পায় কোত্থেকে? আব্বাস পাগলার মুখের দিকে সে সরাসরি তাকায়। এই সময় পাগলা বারান্দায় উঠে আসে। লোকটিকে ভালো করে দেখার জন্য মিলি দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে একটু এগিয়ে গেলে ওদের দূরত্ব দাঁড়ায় দুই থেকে আড়াই হাত। আব্বাস পাগলার গায়ে পচা ডিম ও স্যাঁতসেঁতে কাপড়ের ভ্যাপসা গন্ধ। ঠিক তাও না। নবদ্বীপ বসাক লেনে রেহানাদের বাড়িতে যেতে একটি হালুইকর দোকানের কারখানার পেছনটা পার হতে হয়। সেখানে মাঝে মাঝে এই গন্ধ পাওয়া যায়। তার মস্ত বড়ো মুখের বেগুনি-কালো জমিতে খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ির ঘন কাঁটাবন। দাড়ি তার বড়ো ছুঁচলো, এখান থেকেই মিলির ঘাড় কুটকুট করে, ডান হাতের দুটো আঙুল দিয়ে সে আস্তে আস্তে ঘাড় চুলকে নেয়। রানার ওপর আব্বাস পাগলা মহা চটা, 'খাটাশটা কৈ গেছে কেউরে কইয়া যায় নাই?'

বারান্দায় একটা মোড়া পাতা ছিলো, আব্বাস পাগলা রাজকীয় ভঙ্গিতে মোড়ায় বসে হুকুম করে, 'বস!' কিন্তু আর কোনো আসন না থাকায় মিলিকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। আব্বাস পাগলা এবার গলা নামিয়ে বলে, 'রানায় তরে কিছু দিয়া গেছে?'

'না।'

'কিছু কইছে তরে?'

'না।'

'খালি না, না, না!' আব্বাস পাগলা চিৎকার করে, 'ঠিক আছে! আমি ভি দেইখা লমু! খানকির বাচ্চারে কইস, আব্বাস আলী মাস্টারের লগে রঙবাজি করলে হালারে এক্কেরে জানে মাইরা ফালামু, বুঝলি?'

কিন্তু এই চিৎকার কাটিয়ে উঠে মিলি জিগ্যেস করে 'ভাইয়া আপনাকে কী দেবে?' এই কথায় পরশুদিন সন্ধ্যাবেলাকার মতো তার চোখ ছুঁচলো হতে শুরু করলো. চোখের পাতা ব্যবহৃত হচ্ছে শক্ত আঙুলের মতো. চোখের পাতা দিয়ে আঁকড়ে ধরে সে তার চোখের ঘোলাটে লাল সর ও তার ওপরকার আঁকিবুঁকি ছেঁকে ফেলতে চায়। হঠাৎ তার ভাঙাভাঙা গলায় হুঙ্কার বেরিয়ে আসে, 'শাট আপ!' ঘরের নোনা-ধরা দেওয়াল কাঁপে, মিলির পা হাঁটু ভেঙে পড়ে যাবার উপক্রম হয়। নিচে গভীর খাদে পড়ে যেতে যেতে সে ওপরের দিকে তাকায়: না, ওপরে কেবল ছাদ, ছাদে কড়ি-বর্গা, বাড়িওয়ালার ঠিকা-ঝির মশলা বাটার শব্দ। মিলি তাড়াতাড়ি দরজার পাল্লা ধরে ফেললো। লিলি রনি স্কুলে, আব্বা অফিসে. আম্মা বাথরুমে ঢুকেছে একগাদা ময়লা কাপড় নিয়ে। খালি ঘর পেয়ে আব্বাস পাগলার হুঙ্কার সারা বাড়ি স্বেচ্ছাভ্রমণ সারে।

ভিজে শাড়ি-ব্লাউজ কোনোরকমে গায়ে জড়িয়ে মনোয়ারা এসে দাঁড়ালো। প্রথম এক আধ মিনিট বেচারা কোন কথাই বলতে পারে না। তারপর মেঝের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আপনি পরে আসবেন। বাসায় কেউ নেই।' তার ক্ষীণকণ্ঠের অনুরোধ আব্বাস পাগলার হুঙ্কারধ্বনির ফাঁকে ফোকরে কোথায় লুকায় তার কোনো পাত্তাই পাওয়া যায় না। আব্বাস পাগলা মিলির দিকে চোখ রাখে, 'তুমি হেইদিনের ছেমরি, আমার লগে দুষামনি করো?'

মনোয়ারা দু'জনকে দু'রকম নির্দেশ দেয়, 'মিলি, এদিক আয়, ঘরের ভেতর আয়। আপনি এখন যান, বললাম তো বাসায় কেউ নেই। যান, পরে আসবেন। মিলি, ঘরে আয়।'

মিলি ব্যাকুলভাবে জানতে চায়, 'আপনাকে কী দেওয়ার কথা আছে? আমি ভাইয়াকে বলে রাখবো। কী দেবে?'

'তোমারে কইতে হইবো? বেঈমানের বইনরে সিক্রেট আউট কইরা দিমু?' আব্বাস পাগলা হঠাৎ তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকালো। 'আরে আরে. অরা আইয়া পড়বো না? মনে লয় আউজকা আসমানের ব্যাকটি অকুপাই করবো!' বলতে বলতে সে চার ধাপের সিঁড়ি লাফিয়ে নামে, 'খানকির বাচ্চারা, তোমরা দুনিয়ার পুরাটাই কব্জা করছো, অহন আসমান চোদাইবার তালে আছো, না?'

কিন্তু আকাশ জুড়ে কিসের আয়োজন? মিলি ওপরে যতোটা পারে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। ওপরে কেবল আকাশ। সকাল পর্যন্ত বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় মেঘ সব ধুয়ে মুছে সাফ। নীলচে সাদা আকাশ আসন্ন শীতকালের অনিবার্য বৈধব্যের জন্যে এখন থেকেই তৈরি হচ্ছে, তার শরীরে গয়না বলতে কিছু নাই। নাঃ! মিলি ভালো করে তাকালো. নাঃ! কোথাও কিছু নাই। লোকটা এতো কী করে দেখে?

বড়ো বড়ো পা ফেলে আব্বাস পাগলা এগিয়ে যায়, যেতে যেতে চ্যাঁচায়, 'এনিমি এ্যাডভান্স করতাছে, যাই গিয়া, এইবার এ্যামবুশ করবার পারলে

চুতমারানি ব্যাকটিরে এক্কেরে ফিনিস কইরা দেই!' তার একটা হাত মাথায়, ছোটোখাটো গোলাবারুদ কি বোমার কুচি সে এই হাত দিয়ে ঠেকাতে পারবে।

আশারাফ আলী অফিস থেকে ফিরলে মনোয়ারা হৈ-চৈ করলো, এসব পাগল ছাগলের সঙ্গে এতো বড়ো মেয়ে কিনা যেচে কথা বলে! কখন কী করে বসবে, এদের কিছু ঠিক আছে? আশরাফ আলী স্ত্রীর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত, 'না, না, এদের এ্যাভয়েড করতে হয়। সব জায়গায় আজকাল আই. বি'র লোক। কে যে কী ডিসগাইজ নিয়ে আসে!'

'আই. বি হবে কেন?' মনোয়ারা বিরক্ত হয়, 'তুমি কি এমন মস্ত বড়ো মানুষ যে তোমার ঘরে আই. বি ঢুকবে?'

'আহা, আমি কেন? আমি কেন?' দু'একবার তোতলালেও আশরাফ আলী শেষ পর্যন্ত বুকে বল নিয়ে বলে, 'তোমার ছেলে বড়োলোক হচ্ছে না?' 'ছেলের জন্যই একটু মানুষের মতো দিন চলছে, আবার ছেলেকে হিংসা করে!' মনোয়ারা হঠাৎ রেগে যাওয়ায় আশরাফ আলী ফ্যাকাশে হয়ে যায়, 'আরে না, না। আমি ঠিক তা বলি নি! মানে রানাকে তো আজকাল সবাই চেনে টেনে, মানে পপুলার তো, তাই ধরো—।' আশরাফ আলীর গোঁফদাড়ি কামানো মুখে কোনো ভাঙচুর নাই, সেখানে চট করে রেখা-উপরেখা তৈরি হয় না। কিন্তু তার ঠোঁট ও চোখ এলোমেলো হয়ে খসে পড়বার উপক্রম হয়। বাপের জন্য মিলির একটু মায়াই হয়, আব্বা যে কখন কী ভাবে! তার ইচ্ছা করে বাপকে বলে যে আই. বির যারা বাপ, তাদের বাপের সঙ্গে রানার কড়া লাইন। দামি দামি সব জিনিসপত্রে ঘরবাড়ি ভরে তুললো, গায়ে একটি আঁচড় পর্যন্ত লাগে না, আর আই. বি আসবে তাকে ধরতে?

আব্বাস পাগলা পরদিন ফের আসে। আজ মনোয়ারা তার বোনের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে বোনের ছেলের বিয়ের শাড়ি কিনতে, দরজায় ধাক্কা শুনে মিলি একবারে মোড়া হাতে দরজা খুললো। আব্বাস পাগলা প্রথমেই বলে, 'রাইখ্যা যায় নাই?'

'না।'

মোড়ার ওপর আব্বাস পাগলা ধপাস করে বসে পড়ে। তাকে হতাশ ও উদ্বিগ্ন দেখায়। 'রানায় আউজকাও দিলো না, না?' তার গলায় একটু অভিমান, 'আমার প্রবলেম বুঝবার চায় না। তামাম রাইত আমার ঘরের উপরে মেশিনগানের গুলি ছুঁড়ছে। কাউলকা বেলা দুইটা বাজলে আমারে সিগন্যাল পাঠাইলো, ইস্পেশাল মেসেঞ্জার পাঠাইছিলো, আমার কানের মইদ্যে লাইট মারলো পরে চোখের উপরে সাউন্ড পাইলাম, হালায় কি চোখা সাউন্ড, চোখের পাতা আমার খালি ফাল পাড়ে লাইক, লাইক, লাইক এ বাম্পিং স্যভর জেট।—কি? না, রাইত দুইটা বাজলে দুশমুনে পজিশন লইবো;—কোন জায়গায়?—না, কয় চান্দের ঐ সাইডে। ঐ সাইডটার ভিউ দুনিয়া থাইকা ঠিক ক্লিয়ার আসে না। পাহাড় পর্বতই বেশি, মাউনটেনিয়াস জোন। পাহাড়ের মইদ্যে গাত উত আছে না?—দুশমুনে হালায় গাতগুলিরে আর্টিলারি বানাইয়া রাখছে।'

আব্বাস পাগলা কথা বলে যাচ্ছে এক নাগাড়ে। একবার সে মিলিকে বোঝায়, একবার আকাশ দেখে। এর ফাঁকে একেকবার বারান্দার দেওয়ালে চুনসুরকি খসে-পড়া মানচিত্রের দিকে চোখ কুঁচকে কি সনাক্ত করতে চেষ্টা করে। গুহাময় পাহাড়-পর্বত খচিত চাঁদ দেখার জন্য মিলির মনটা ছটফট করে উঠলো। এখন বেলা মোটে বারোটা সাড়ে বারোটা। দুপুর ভালোভাবে জমবে, বিকাল হবে,—দিন ছোটো হয়ে আসছে, বিকালটা তবু একেবারে ফ্যালনা নয়। সন্ধ্যায় আজকাল পাতলা কুয়াশা পড়ছে, আকাশের নীলচেকালো বুকে কুয়াশা মিলিত হলে তারপর রাত্রি। সে এখনো মেলা দেরি। তারো পরে মধ্যরাত। মধ্যরাত্রির চাঁদে দখলদার বাহিনীর কাঁটাতার-ঘেরা ক্যাম্প। জনবিরল চাঁদের অপর পিঠে পাহাড় পর্বতের ভেতর সেই ক্যাম্প কী রকম দেখায়? আব্বাস পাগলা এগুলো কি সব দেখতে পায়? সেই ক্যাম্পের দিকে চোখ রেখে নিরস্ত্র হাতে বেচারা কী করে ওদের গতিবিধি নিজের নিয়ন্ত্রণে আনবে?

'বুঝলি? চান্দের পশ্চিম দিকে'—চোখ বন্ধ করে আব্বাস পাগলা দিকনির্ণয় করে, 'হিলি রেঞ্জ থাইকা ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি এ্যাঙ্গেল কইরা কয় মাইল উড়তে পারলেই নদী, বহুত বড়ো নদী।'

'নদীর নাম কী?' হঠাৎ জিগ্যেস করে ফেলেও মিলি আব্বাস পাগলার কাছে ধমক খাওয়ার ভয়ে কুঁকড়ে যায় না, কারণ চাঁদের নদীর নাম জানা তার খুব দরকার। 'নাম কইতে পারুম না।' আব্বাস পাগলা বিরক্ত হয় না, 'নদীর আবার নাম কিয়ের? এই চুতমারানিরা গেছে, খানকির বাচ্চাগুলি অহন নাম দিবো।—নাম দিবো, দাগ দিবো, খতিয়ান করবো, কবলা করবো, দলিল করবো, মিউটেশন করবো—হালারা বাপদাদাগো সম্পত্তি পাইছে তো, বুঝলি না? নদীর দোনো পাড়ে পজিশন লইয়া রেডি হইয়া আছে। দুনিয়ার পানি বাতাস মাটি আগুন পাথর তো জাউরাগুলি পচাইয়া দিছে, অহন পচাইবো চান্দেরে!'

এক কথা থেকে আরেক কথায় চলে যাচ্ছে সে, তার কথার আঁচে উস্কুখুস্কু চুল দপদপ করে ওঠে আর নামে। মিলি বুঝতে পারে যে আব্বাস পাগলার করোটির ভেতর কোথায় অঙ্গার রয়েছে, তারই তেজে তার কালো চুল ধকধক করে জ্বলে। সেই গোপন অঙ্গার ছোঁয়ার জন্য মিলির আঙুলগুলো কাঁপে। একবার ছুঁতে পারে তো এই ঘোরতর দুপুরবেলা চাঁদের ভেতর সৈন্য সমাগম স্পষ্ট দেখা যায়।

'মেইন প্রবলেম তো কেউরে কই নাই।' মূল সমস্যাটিকে গোপন রাখা দরকার বলে সে মোড়া নিয়ে সামনে এগোয়। দরজার চৌকাঠে বসে-পড়া মিলির কাছাকাছি এসে সে আস্তে আস্তে বলে, 'কুত্তার বাচ্চাগুলি চান্দের গ্র্যাভিটেশন বাড়াইয়া দিতাছে। এতোগুলি মানুষ গেছে, এতোগুলি আর্মস লইয়া গেছে, গ্র্যাভিটেশন বাড়াবো না? অহন কী হইবো? তুই ক, অহন কী হইবো?' মিলি বলতে না পারলে আব্বাস পাগলা নিজেই জবাব দেয়, 'অহন দুনিয়ার জানোয়ারগুলির লাহান চান্দের বাসিন্দাগো পায়ের মধ্যে গোদ হইবো, জিন্দেগিতে অরা আর উড়বার পারবো না।'

'কারা উড়তে পারে?' সাজ্ঘাতিক কৌতূহলে মিলি একটু এগিয়ে আসে। এখন তাদের মধ্যে ব্যবধান এক থেকে দেড় হাত। কিন্তু আব্বাস পাগলার গা থেকে পচা ডিম, স্যাঁতসেঁতে কাপড় ও নবদ্বীপ বসাক লেনের হালুইকরের কারখানার পেছনদিককার নালার মিলিত গন্ধ আসছে না। কিংবা এমন হতে পারে যে নিঃশ্বাস নিতে মিলি ভুলে গিয়েছিলো। কিন্তু আব্বাস পাগলার কথা তো স্পষ্ট শোনা যায়, 'চান্দের ব্যাকটি জীব উড়বার পারে। চান্দের ওজন আমাগো এই ধুমসা দুনিয়ার একাশি ভাগের একভাগ। অরা উড়বো না কেল্লায়? তুই সাইন্স পড়লে আমারে এতোটি কথা কইতে হয়?' তবে মিলি বিজ্ঞান পড়েনি বলে আব্বাস পাগলা রাগ করে না, বরং ছোট্টো করে একটু হাসে, 'আরে ছেমরি, তর ওজন যদি পঞ্চাশ পাঁচপঞ্চাশ পাউন্ড রিডিউস করবার পারস তো আমি তোরে গ্রান্টি দিতাছি তুই ভি উড়াল দিবার পারবি। পারবি না?' বিজ্ঞানে বুৎপত্তিওয়ালা আব্বাস পাগলার এই গ্যারান্টি অস্বীকার করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না মিলির। মিলির ওপর আব্বাস পাগলা বেশ আস্থা স্থাপন করেছে। চাঁদে বিভিন্ন সময় তার অভিযানের কথা সে ফিসফিস করে ফাঁস করে দিচ্ছে। চাঁদ এমন একটা জায়গা যেখানে সব শালাই সব সময় ভাসে, ওড়ে এবং দোলে। সেখানে কারো সঙ্গে কারো ক্র্যাশ হয় না। নিল আর্মস্ট্রংকে আব্বাস পাগলা অনেক আগেই এই তথ্য জানিয়ে দিয়েছিলো। ১৯৬৯ সালের ১৬ই জুলাই কেপ কেনেডি থেকে এ্যাপোলো ১১ তে চাঁদের দিকে রওয়ানা হবার ঠিক আগের মুহূর্তে নিল আর্মস্ট্রং আব্বাস আলীর ইংরেজিতে লেখা—হ্যাঁ ইন কিংস ইংলিশ—চিঠিটা ভালো করে পড়ে নেয়। আব্বাস আলী লিখে দিয়েছিলো যে চাঁদে গিয়ে তাদের হাঁটাহাঁটি করতে হবে না। দিব্যি উড়াল দিয়ে থাকতে পারবে। কিন্তু হাজার হলেও ওরা পৃথিবীর পয়দা, তাই তার কথাটাকে তেমন আমল দেয়নি। এখন নিল আর্মস্ট্রং লোকটি কে—প্রশ্ন করতে মিলি ভরসা পায় না। সাধারণ জ্ঞান তার কম। সে শুধু জানতে চায়, 'তা উনি উড়েছিলেন?'

আব্বাস পাগলা বলে, 'অফ কোর্স। মগর বুঝলি না? এই ইনফর্মেশনটা বেটা সিক্রেট রাখছে। কইলেই তো আমার চিঠির কথাও কইতে হয়। তাইলে অরা ক্রেডিট লইবো ক্যামনে? নেমকহারামের পয়দাগুলি!' আঙুলের কড়ে ১৯৬৯ সাল থেকে বর্তমান বছর পর্যন্ত গুণে সে বলে, 'চাইরটা বছর ভি পুরা হয় নাই, অকুপেশন আর্মি গিয়া চান্দের বহুত এরিয়া ক্যাপচার কইরা রাখছে, বুঝলি?' চারপাশে একবার দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে আব্বাস পাগলা বলে, 'আমি ব্যাকটিরে সাফ কইরা দিবার পারি। ফর্টি ফাইব ডিগ্রি এ্যাঙ্গেল কইরা এমুন ফায়ারিং করুম, বুঝলি, ফটাফট ফালাইয়া দিমু। প্যাসিফিকের যে স্পটটার মইদ্যে নিল আর্মস্ট্রং নামছিলো, হালারা ঐ জায়গার মইদ্যে পইড়া এক্কেরে ফিনিস হইয়া যাইবো।' একটু থেমে সে আক্ষেপ করে, 'রানায় আমারে দিলো না। একটা স্টেনগান দিবো—আমারে জবান দিয়া অহন খালি ঘুরাইতাছে! উই হালায় ভি অকুপেশন আর্মির লগে লাইন দিছে কৈ যাই? খালি দালাল, খালি কুইসলিং!' মন খারাপ করার

ভঙ্গিতে সে বলে, 'ঠিক আছে! আমারে তো চিনে নাই। এই কোলাবোরেটারগুলিরে আমি টিকটিকি দিয়াও মারাই না। অহন ঠ্যাকায় পইড়া আইছি! ঠিক আছে একদিন না একদিন তগো ব্যাকটিরে কব্জার মইদ্যে পামু, দুই উংলির মইদ্যে ধইরা তগো মাক্ষির লাহান জাইত্তা মারুম!' নক্ষত্র কি অন্য গ্রহ-উপগ্রহ থেকে আসা রোদ কি গোলাবারুদের আঁচ এড়াবার জন্য কপালে হাত রেখে লম্বা পা ফেলে আব্বাস পাগলা বড়ো রাস্তার দিকে রওয়ানা হয়। তার ধ্যাবড়া পায়ের নিচে টায়ারের স্যান্ডেল এবড়োখেবড়ো রাস্তায় থ্রাপ থ্রাপ আওয়াজ করে। ডাঙা থেকে শূন্যে ওঠার আগে সে কি পা ঝপটাচ্ছে? মিলি খুব মনোযোগ দিয়ে আব্বাস পাগলার হাঁটা লক্ষ করে।

পরদিন সকালে একটা ফোক্সওয়াগন গাড়িতে রানা ফিরে আসে। গাড়ি চালাচ্ছে সে নিজে, মনে হয় মালিকও সে নিজেই। ঘণ্টা দেড়েক পর মিলিকে ডেকে রানা জিগ্যেস করে, 'মিলি, আব্বাস পাগলা তোকে ইনসাল্ট করেছে?'

'না তো!' মিলি অবাক হয়, 'কে বললো?'

'অনেকেই বললো। আম্মাও জানে। তোকে নাকি বেটা গালাগালি করেছে?'

'আরে না! উনাকে তুমি কী নাকি দিতে চেয়েছিলে, তাই নিতে এসেছিলেন। দিচ্ছো না কেন?'

রানা বিরক্ত হয়, 'ওটা একটা থরোব্রেড বাস্টার্ড!'

রানার তলব পেয়ে আসতে হয় আব্বাস পাগলার ভাইকে। রানা রাগ ঝাড়ে এখন তার ওপরেই, 'এইসব পাগল ছাগলকে ঘরে চেন দিয়ে বেঁধে রাখবেন। না হলে আমরাই যা করার করবো। পাড়ায় এই পাবলিক নুইসেন্স টলারেট করা যায় না।'

ছোটো ভাইয়ের জন্যে রমজান আলীর দুঃখের শেষ নাই, 'তকদিরে নাই, বি. এস. সি. পাশ করবার পারলো না, দুইবার পরীক্ষা দিলো, আমার কতোটি ট্যাহা পানিত ফালাইলাম! ফেল করলি, কারবারের মইদ্যে ঢোক, বাপ-দাদাগো আমলের কারবার আমাগো।—না, ইস্কুলের মাস্টার হইবো। বিশ বাইশ বছর আগে বি. এস. সি. ফেল করছে, তখন লেখাপড়া আছিলো, ফেলের ভি ভ্যালু দিছে! সালাউদ্দিন মিয়ার বইনের জামাইরে ধইরা একরামপুর ইস্কুলের মইদ্যে ঢুকলো। ইস্কুল তো তার ভালোই ফিট কইরা গেছিলো। পোলাপানে বহুত ইজ্জত করছে।'

সোহেল না সিডনি না ফয়সল কি নাম, ফসা-রোগাটা আব্বাস পাগলার জীবনী শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়, বলে, 'আমি প্রথমে দেখেই বুঝেছি।' সে কি বুঝেছে তা বোঝাবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা না করে রমজান আলী তার বিলাপ অব্যাহত রাখে, 'মহল্লার মানুষে ভি ইজ্জত করছে। চার বছর হইলো এই বিমারি ধরছে। স্বাধীনের টাইমে ইন্ডিয়া গেলো, কৈ কৈ যুদ্ধ করছে, অহন ওয়ার ছাড়া আর কথা নাই। শীতের টাইমে আমাগো ভি পাগলা বানাইয়া ছাড়ে। ৩/৪ দিন বাদে বাদে ফাল পাইড়া চিক্কুর ছাড়বো, কি কমু, ভাড়াইটা থাকবার চায় না। দোতলার ভাড়া বাড়াইতে পারি না!'

'ডাক্তার দেখান, ডাক্তার দেখান।' গাড়িওয়ালা ছেলেটি—সোহেল না সিডনি না ফয়সল কি নাম—তাকে মাঝপথে থামিয়ে দেয়, 'ডাক্তার দেখান, ডাক্তার দেখান।'

'ডাক্তারে হাকিমে হাজার বারোশো টাকা বারাইয়া গেছে। ত্যালপড়া, পানিপড়া, শিরনি, তাবিজ—কিছু বাদ রাখছি?'

গাড়িওয়ালা বলে, 'পাবনা পাঠিয়ে দিন।'

পাবনা পাঠাতে হলো না। রানা এবং ফর্সা-রোগা দু'তিনজন একটু দৌড়াদৌড়ি করার ফলে পি. জি হাসপাতালের সাইকাট্রি ওয়ার্ডে লাল ছাপ মারা সাদা চাদর বিছানো শয্যায় আব্বাস পাগলা স্থাপিত হলো। বেলা ৩টার দিকে বাড়ি ফিরে আব্বাস পাগলার কথা বলতে বলতে ঘরে ঢুকে রানা দেখে মুখে মাথায় লেপ জড়িয়ে মিলিটা পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে। এতো বড়ো মেয়েটার ছেলেমানুষি এখনো গেলো না। যখন একেবারে ছোটো ছিলো, একটু একটু পড়তে শিখেছে, তখন খবরের কাগজে মিলি কেবল নিখোঁজ সংবাদ দেখতো। রানাকে বলতো, 'ভাইয়া এই জায়গাটা পড়ো তো।' একসঙ্গে স্কুলে যাবার সময় কোনো ছেলে মেয়েকে একা একা যেতে দেখলে থমকে দাঁড়াতো, "ভাইয়া, ছেলেটা দেখতে ঠিক ঐ ছবির মতো না? দেখো, পরনে নীল রঙের হাফ শার্ট, কথা বলে দেখো, ঠিক বাঙলায় কথা বলে।' রানা তো দুই বছরের বড়ো, তার বড়োত্ব দেখাবার জন্যে একটু রাগ না করলে চলে?—'দূর! এ বেটা কোনো বাসায় কাজ করে।' কিংবা, 'আরে দেখ্ না, হাতে টিফিন ক্যারিয়ার দেখছিস না? অফিসে ভাত নিয়ে যাচ্ছে।' আবার দেখো, এখন পাগল ছাগলের চিৎকার শোনার জন্যে এতো বড়ো হলো, রানা আস্তে আস্তে ডাকে, 'মিলি!'

তুলোট অন্ধকার দেখার জন্যে একটু আগে ভাত খেয়ে মিলি লেপ মাথায় করে শুয়েছে। কতোকাল আগে রানার সঙ্গে একই লেপের তলায় শুয়ে আবছা আলো অন্ধকার দেখতে মিলি ঘুমিয়ে পড়তো। কতোকাল আগে, কিন্তু এখনো সব স্পষ্ট মনে পড়ে। লিলি রনির বোধ হয় জন্মই হয়নি তখন। কিন্তু আজ এই লেপের ভেতর আলো ঢুকতে পারে না। নতুন তুলোতে ঠাসা লেপের ভেতর নিচ্ছিদ্র অন্ধকার। অনেকক্ষণ একনাগাড়ে দেখলে লেপের পাতলা অড়ে একটি রেখা চোখে পড়ে। রোগা একটি রেখা। সেই রেখা আস্তে আস্তে হৃষ্টপুষ্ট হলে বোঝা যায় যে, সেখানে একটি স্রোতস্বিনী প্রবাহিত। স্রোতস্বিনী বেশ বেগবান, জল স্বচ্ছ ও শীতল। দুই তীরে অস্ত্রসজ্জিত দুই সারি মানুষের নির্গেটিভ রেখা। তাদের স্পষ্ট রূপ দেখার জন্য সমস্ত মনোযোগ দিয়ে মিলি প্রাণপণে চেষ্টা করছে, এমন সময় শোনা যায়, 'মিলি!'

মিলি ধরফর করে উঠে বসলো।

রানা বলে, 'আব্বাস পাগলার এ্যাডমিশন হয়ে গেছে। মজনু ভাই টেলিফোন করে দিয়েছিলো। গণভবন থেকে ফোন পেয়ে সাইকাট্রির প্রফেসার বলে, 'পাবনা

পাঠাবার দরকার কী?' প্রফেসার নিজের ওয়ার্ডে ভর্তি করিয়ে নিয়েছে।' মিলি চুপচাপ শোনে। তারপর রানার খাবার বেড়ে দিয়ে নিজের ঘরের জানলায় এসে দাঁড়ায়। রাস্তার ওপার আব্বাস পাগলার বাড়ির ছাদে শেষ দুপরের রোদ। শীত এসে গেলো। তাদের উত্তরমুখো এই স্যাঁতসেঁতে বাড়িতে কয়েকটা মাস রোদ পড়বে না বলে মিলির মন খারাপ হয়ে যায়।

মিলির আজকাল জানলার দাঁড়াবার দরকার হয় না। তাকে নিয়ে তবু মনোয়ারার দুঃখের সীমা নাই। 'সেভেন এইট পর্যন্ত পড়া ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত ম্যাট্রিক পাশ করলো। আমার রানাই কতো লোককে পার করে দিলো!' আবার আশরাফ আলীও মিনমিন করে, 'বি. এ. পরীক্ষাটা দেনা! রানা গ্র্যাজুয়েশনটা নিলো না, তুই একবার ফেল করে কলেজে যাওয়া ছেড়ে দিলি! না হয় প্রাইভেট দে।'

পরদিন দুপুরে মিলি গেলো রেহানাদের বাড়ি। আম্মাকে বললো, 'বইপত্রের সঙ্গে কতোদিন টাচ নেই, ওর কাছ থেকে একটু দেখে আসি।'

রেহানাদের বাড়ির পথে নবদ্বীপ বসাক লেনে হালুইকরের কারখানার পেছন দিয়ে রিকশা যাচ্ছে, মিলি খুব জোরে নিঃশ্বাস নেয়, নাঃ সেই ভ্যাপসা গন্ধটা আজ নাই, কারখানার চুলায় মস্ত কড়াইতে জিলাপি ভাজা হচ্ছে, তার গন্ধ একেবারে পেটের ভেতর ঢুকে যায়, ওর একটু বমি বমি লাগে।

রেহানা বাসায় নাই। ভালোই হলো। থাকলে নাহোক ঘণ্টাখানেক তো বসতেই হতো। শীত পড়ে গেছে, হাসপাতালে পাঁচটার পর হয়তো ঢুকতে দেবে না।

ওয়ার্ডটা ছোটো। ১০/১২টা বেড হবে কি-না সন্দেহ। আব্বাস পাগলাকে দরজা থেকেই দেখা যায়। অর্ধেক-খাওয়া একটা কলা হাতে সে বারান্দার দিকে কী দেখছে। তার ঘাড়ের নিচে বালিশ। মাথা খাটের সঙ্গে ঠেকানো। কলা সে ধরেছে লাঠির মতো, আঙুলের ভাঁজ দেখে মনে হয় কলায় অতিরিক্ত চাপ পড়ছে, যে কোনো সময়ে ভেতরকার শাঁস সবটাই বেরিয়ে পড়তে পারে। আব্বাস পাগলার চোখজোড়া সম্পূর্ণ খোলা, কিন্তু এখান থেকে তার চোখের রঙ অস্পষ্ট। ভেতরে ঢোকার আগে মিলি একটু ঘাবড়ে যায় এবং অস্বস্তি বোধ করে। সে একবার পেছনে তাকালো। বারান্দার রেলিঙের পর খানিকটা জায়গা ফাঁকা, তারপর হাসপাতালের প্রধান দালান। এই দোতলার বারান্দা থেকে আকাশের অনেকটা চোখে পড়ে। হাল্কা রোদে আকাশ প্রায় বর্ণহীন। শীতের শেষ দুপুরবেলায় শূন্যতা সবরকম বাহুল্যবর্জিত; শূন্যতা ও শূন্যতার গন্তব্য মহাশূন্য তাই ধারালো বর্ণহীনতায় ঝকমক করে। এই বিরান আকাশে আব্বাস পাগলা কি না লিখে ফেলতে পারে। কৈ মিলি তো পারে না! প্রায় এক মিনিট বারান্দায় দাঁড়িয়ে মিলি তার টিপটিপ-করা বুক সামলে নিলো। তারপর ঘরে ঢুকে দাঁড়ালো আব্বাস পাগলার বিছানার পাশে।

'স্লামালায়কুম। কেমন আছেন?'

'ভালো।' আব্বাস পাগলা একটু নড়াচড়া করে, হাতের কলার অবশিষ্ট অংশ মুখে দিয়ে জড়ানো স্বরে বলে, 'রানার বইন না?' খাটের নিচে থেকে টুল টেনে নিয়ে মিলি বসলে আব্বাস পাগলা বলে, 'রানা কৈ? রানায় আহে নাই?'

'ভাইয়ার কি আসার কথা ছিলো? আব্বাস পাগলার বহু-আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটি নিয়ে আসতে পারলে ভালো হতো ভেবে মিলি চঞ্চল হয়ে ওঠে, 'ভাইয়ার কিছু নিয়ে আসার কথা ছিলো কি?'

'আরে কতো মানুষ কতো কি আনে!' অন্য কোণে একটি বিছানার দিকে আব্বাস পাগলা আঙুল দেখায়, 'দশ নম্বরে এই আপেল আইতাছে, আঙুর আনে, সুপ হর্লিক্স হাবিজাবি কতো কি খায়।'

'ভাইয়াকে কি আনতে বলবো?' মিলির এই ব্যাকুল প্রশ্নের জবাবে আব্বাস পাগলার স্বরের ক্লান্তি কমে না, একই রকম ধুকে ধুকে সে বলে, 'রানায় আমারে কইয়া গেলো মঙ্গলবারের মইদ্যে একদিন আইবো। কৈ? দশবারোদিন হইলো আইছি, বেটাই চুপিটাও মারলো না!'

এই কথা শুনে মিলির বুকের বল ফের ফিরে আসে; সময়ের প্রচলিত বিভাগকে লোকটা অগ্রাহ্য করে। হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে দেড় মাস তো হবেই, দেড় মাস সময়কে একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে সে এক সপ্তাহে ছেঁটে ফেলতে পারে।

মিলি জিগ্যেস করে, 'ওকে কিছু বলবো?'

'কইবি না? হাসপাতালে ভাত তরকারি বহুত কম দেয়, বুঝলি?'

'কম দেয়?' মিলির রাগই হয়, আব্বাস পাগলার মতো মানুষ কম খেয়ে থাকবে কী করে?

'বহুত কম। কি বালের ইঞ্জেকশন দিয়া ঘুম পাড়াইয়া রাখে, পাঁচ ছয় ঘণ্টা ঘুমাইয়া উঠি, মনে লয় কি প্যাটের মইদ্যে খালি আগুন জ্বলবার লাগছে।'

শুধু খাবার চাই? মিলি নিশ্চিত হবার জন্যে বলে, 'ভাইয়াকে কি বলবো?'

'আমার বহুত ভুখ লাগে রে।' তার খালি পেট আরো ফাঁকা করে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে, 'রানায় একটা ধামকি দিলে হালারা আমার ভাতের কোটাটা বাড়াইয়া দেয়, বুঝলি না?'

এইসব শুনতে শুনতে মিলি দেখছিলো, দরজার ওপারে বারান্দা, বারান্দার রেলিঙ ডিঙিয়ে হাসপাতালের মূল দালান। এই উঁচু দালান দিয়ে মহাশূন্য আড়ালে পড়ে গেছে। না, এখানে শুয়ে সৈন্যসমাবৃত মহাকাশ দেখার কোনো উপায় নাই।

কিন্তু রাত্রিবেলা ঘুমিয়ে পড়লে আকাশ ও গ্রহনক্ষত্র জুড়ে অস্পষ্ট সৈন্যবাহিনীর সমাবেশ মিলি একটু একটু দেখতে পারে বৈ কি! আজ ভাঙা চাঁদের সঙ্গে সাঁটা গোল চাঁদের ছায়া। কোনো একটা উঁচু ছাদ কি পানির ট্যাঙ্কের মাথায় কি ক্রেনের সবচেয়ে উঁচু তাকে দাঁড়িয়ে আব্বাস পাগলা ওকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে, 'দূর ছেমরি, ঐ তো! আরে তুই কি কানা হইলি? আরে ঐ তো ট্যাঙ্ক দেখতাছস না?

চান্দ থাইকা ঐগুলি আসমানে গেলে উড়বো বুঝলি? মাটির উপরে নামলে ছুটবো, লাইক, লাইক লাইক ইলেকট্রিসিটি; ইলেকট্রিক কারেন্টের লাহান ছুটবো, বুঝলি না?' মিলি একটু একটু দেখতেও পাচ্ছে, ঐ তো ট্যাঙ্ক। যুদ্ধের পর টিকাটুলিতে খালাম্মার বাড়ির দোতলা থেকে ওরা এইসব ট্যাঙ্ক দেখে এসেছে। তবে ঐগুলো চলে পানিতে ও ডাঙায়। আর এগুলো? আব্বাস পাগলা বলছে, 'এইগুলি উড়াল ভি দিবার পারে, এইগুলির মইদ্যে ইবলিসের ব্রেন ফিট করা, বুঝলি না?' ব্রেনওয়ালা সেইসব ট্যাঙ্ক মিলির চোখের সামনে স্পষ্ট আকার নিতে শুরু করেছে, এমন সময় শুরু হলো প্রবল গুলিবর্ষণ। সমস্ত আলো নিভে গেলো। কাউকে আর দেখা যাচ্ছে না। ইস! এই গোলাগুলির জবাব দেওয়ার মতো একটা গ্রেনেডও আব্বাস পাগলার সঙ্গে নাই। মিলির রাগ হয়, তোমাদের ঘরে ঘরে স্টেনগান এলেমজি, এসেমজি। তোমাদের পকেটে পকেটে রিভলভার, পিস্তল। তোমাদের বগলে কুঁচকিতে গ্রেনেট। একটি মাত্র অস্ত্র দিয়ে এই লোকটির হাত দুটোকে তোমরা তৈরি করতে দিলে না? দেখো কি রকম ফায়ারিং চলছে, এখন তোমরা কী করবে?—'মিলি! এই মিলি! খাট থেকে নাম, নিচে নেমে শুয়ে পড়!' গুলিবর্ষণের প্রবল আওয়াজে আম্মার ফিসফিস কথা ভালো করে বোঝা যায় না।

মিলি উঠে বসলো। ঘর অন্ধকার। দরজা জানলা সব বন্ধ। ঘরের ওপরের দিকে ভেন্টিলেটর দিয়ে আবছা আলো আসছে, ছাদের দুই বর্গার ফাঁকে চুনসুরকি-খসা একটা ছোট্টো জায়গায় পড়ে সেই আলো আর নিচে নামে নি। রনি বলে, 'আপা, মেঝের ওপর শুয়ে পড়ো।' লিলি কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, 'জানলার ওপারেই!' মিলিকে কে যেন টেনে মেঝেতে প্রায় গড়িয়ে নামালো। তাদের এইসব কাণ্ড কারখানায় মিলির হাসি পায়; চাঁদে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য শত্রুসৈন্য নিচে গোলাবর্ষণ করে চলেছে, আর এরা ধরে নিয়েছে যে গুলি চলছে জানলার বাইরে গলিতে!—এদের এখন বাঁচায় কে? কানের একেবারে কাছে শোনা গেলো, 'সরে যা, জানলা দিয়ে গুলি—।' মনোয়ারার বাক্য অসম্পূর্ণ থাকে। 'গলিতেই, না ভাইয়া?'—এবার রনির গলা। 'না না ভাইয়া যে বললো বড়ো রাস্তা—।' লিলি শেষ করতে না করতে আশরাফ আলী সাবধান করে, 'আঃ। বেশি কথা বলো কেন? কে কোথায় শুনে ফেলবে?' গোলাগুলির চেয়ে আই. বি'র লোকের ভয়ে আশরাফ আলী বেশি তটস্থ। 'বোধহয় বড়ো রাস্তায়।' রানা হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে এই কথা বললো বটে কিন্তু তার চাপা স্বরে বোঝা যায় বেচারা খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছে। অন্ধকারে তার হাতে ধাতব অস্ত্রের শীতলতা টের পাওয়া যাচ্ছে। তার হাতের অস্ত্রের কথা কি সবাই বুঝতে পেরেছে? সেইজন্যই কি মনোয়ারা, আশরাফ আলী এবং রনি ও লিলি একেবারে চুপ হয়ে গেলো?

গুলিবর্ষণ বন্ধ হওয়ার মিনিট বিশেষ পর মনোয়ারার চাপা অনুনয় উড়িয়ে দিয়ে রানা চলে গেলো নিজের ঘরে। ওর ঘর মানে ওর বাবারও ঘর। তবে আশরাফ আলী নিজের ঘরে না গিয়ে শুয়ে থাকে এই ঘরের মেঝেতেই। ভোর

হওয়ার আগে আগে আব্বা ও রানার ঘরে গিয়ে মিলি দেখে টেবিলে মাথা রেখে রানা চেয়ারে বসে রয়েছে। তার বড়ো বড়ো চুল ছুঁয়ে আলগোছে শুয়ে রয়েছে ছিদ্রওয়ালা একটা লোহার অস্ত্র। যুদ্ধের পর এই জিনিসটি নিয়ে রানা বাড়ি ফিরেছিলো। এটা নিয়ে ভাইয়া তখন কতো কথা বলতো। আর এটা এখন কোথায় রাখে, কখন লুকিয়ে নিয়ে বেরোয় কিছু জানা যায় না। ভাইয়াটা কি হয়ে যাচ্ছে কতোদিন চুল কাটে না! মিলি কি রানাকে এখন জাগিয়ে দেবে? থাক, বেচারা আরেকটু ঘুমিয়ে নিক।

সকালবেলা জানা গেলো বড়ো রাস্তার মোড়ে ব্যাঙ্ক লুট হয়ে গেছে। ব্যাঙ্কের দরজায় দুটো লাশ ধুলায় লুটোপুটি খাচ্ছে।

আজকাল মিলির সারাটা সকাল কাটে রানার ঘরে। রানার চেয়ার টেবিলে সে পড়ে, রানার ও আব্বার জিনিসপত্র গোছায়, রানার স্যুটকেস খুলে মাঝে মাঝে কাপড়চোপড়ের নিচে অস্ত্রটিকে দেখে এবং মুছে রাখে। গোসলের আগে আম্মাকে একটু আধটু সাহায্য করে। রান্নাবান্নার ব্যাপারে মিলিটা আনাড়ি, কিছুক্ষণ রান্নাঘরে থাকলে আম্মা নিজেই পাঠিয়ে দেয়। দুপুরবেলা পর্যন্ত রানার ও আব্বার ঘরের বাইরে ওকে আসতে হয় না। মাঝে মাঝে মনোয়ারাকে বলে, 'আম্মা, রেহানাদের বাড়ি যাওয়া দরকার।' তা আজ যাবো কাল যাবো করতে করতে যাওয়ার আর দরকার হলো না।

মার্চের প্রথমদিকে আম্মার কথা মতো মিলি লেপকাঁথা ট্রাঙ্কে তোলার আয়োজন করছে, এমন সময় দরজায় কে যেন কড়া নাড়লো।

'কেমন আছো মিলি? ভালো?'

ক্লিন শেভ-করা গাল, মাথার চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। পাট ভাঙা শার্টপ্যান্টের ভেতরে আপাদমস্তক আব্বাস পাগলা।

ঝকঝকে দাঁতে সে হাসছে, 'মিলি, ভালো আছো? রানা কোথায়?' 'আপনি?' মিলি বলে, 'কবে এলেন?'

মুখের হাসি অব্যাহত রেখে আব্বাস পাগলা জানায়, 'পরশু দিনের আগের দিন। তোমার লগে'—এক পলক বিরতি দিয়ে আব্বাস পাগলা বলে, 'একটু ব্যস্ত ছিলাম, তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারি নাই।' মিলি একটা মোড়া পেতে দিলে আব্বাস পাগলা প্যান্টের ক্রিজ অক্ষত রাখার উদ্দেশ্যে খুব আলগোছে বসে। বলে, 'রানার সঙ্গে আমার দেখা হইছিলো, দেখা হয়েছিলো। তে রানায় বলে তুমি নাকি কৈ বেড়াইতে গেছো, কোথায় নাকি বেড়াতে গেছো।' কথা ভালো করার জন্য আব্বাস পাগলাকে একই বাক্য দুবার করে বলতে হয়, 'তা কোথায় গেছিলা? কবে আসছো? এসেছো কবে?

'না, কোথাও যাইনি তো!'

'বুঝছি!' আব্বাস পাগলা লাজুক লাজুক হাসে, 'মিলি, তুমি হাসপাতালে গেছিলা, রানা জানে না, না?'

মিলি জবাব না দিলে মসৃণ গালে একস্টা রঙ উপচে পড়ে। এছাড়া গালের ও ঠোঁটের কোণে গুপচিতে তার লাজুক হাসি বড়োলোকের বিয়ে বাড়িতে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে লালনীল বাল্বের মতো মিটমিট করে জ্বলে। বিয়েবাড়িতে এইসব টিমটিম করা আলোতে আকাশজুড়ে আব্বাস পাগলার দেখা ছবি সে নিজের চোখে দেখার জন্য পা থেকে মাথা পর্যন্ত গুছিয়ে নিচ্ছে।

আব্বাস পাগলা বলে, 'মিলি, রানাকে একটু দরকার ছিলো।'

'এক মিনিট' বলে মিলি রানাদের ঘরে গেলে আব্বাস পাগলা বলে, 'মিলি, এখন চা দিও না।'

মিনিট তিনেক পর শাড়ির আঁচলের ভেতর হাত গুটিয়ে মিলি ফিরে আসে।

'রানা নাই, না? রানার সঙ্গে একটু দরকার ছিলো।'

'এই জন্যে তো?' আঁচলের ভেতর থেকে হাতজোড়া বের করে মিলি তার দিকে বাড়িয়ে দিলো।

আব্বাস পাগলা তখন মোড়া থেকে উঠে দাঁড়ায়, 'এ কী?'

মিলি দুই হাতে শিশুর মতো করে শোয়ানো স্টেনগান এগিয়ে ধরলো, 'তাড়াতাড়ি নিন। আম্মা এসে পড়বে।'

আব্বাস পাগলার ফিটফাট মুখ ঝুলে পড়ে, তার মুখ এখন একরঙা, মানে কেবলি কালো, তার লালনীল হাসির মিটিমিটি বাল্ব সব ফিউজড হয়ে গেছে, সে বিড়বিড় করে, 'মিলি আমি না ভালো হইয়া গেছি। তুমি বোঝো না? আমার ব্যারাম ভালো হইয়া গেছে।'

কিন্তু মিলির হাতের ভঙ্গি অপরিবর্তিত। সে কেবল আব্বাস পাগলার চোখ দেখছে। ঐ চোখজোড়ায়-দেখা সমস্ত ঘটনা মিলি নিজে দেখতে পারলেই আব্বাস পাগলার সঙ্গে ও শত্রুপক্ষ ঠেকাবার কাজে নেমে পড়তে পারে। কিন্তু আব্বাস পাগলার চোখের বহুবর্ণ জমি ঘুমের ঘষায় ঘষায় পানসে শাদা হয়ে গেছে। তার দুই চোখের রঙ-জ্বলা কালো মণি পদ্মপাতায় জলের মতো টলমল করে—কখন পড়ে কখন পড়ে। মিলি তাই বলে, 'ও।

'রানারে একটু বুঝাইয়া কইয়ো। রানারা কয় বন্ধু একটা ইন্ডেটিং ফার্ম করছে। রানা ইচ্ছা করলে আমারে প্রভাইড করতে পারে।'

মিলির চোখজোড়া এখন সম্পূর্ণ হাট করে খোলা। মনে হয় চোখের গহ্বরে আব্বাস শুদ্ধ বারান্দাটা গ্রাস করে নেওয়ার জন্য মনে মনে সে মন্ত্র পড়ছে। আব্বাস মাস্টারের গা শিরশির করে ওঠে। তার সাঁফ-সুতরো মাথার কাঠামো একটুখানি কাঁপে। 'মিলি, আমি ভালো হইয়া গেছি। আচ্ছা আসি।' বলে আব্বাস মাস্টার বারান্দা থেকে টলোমলো করে নামতে না নামতে মিলি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো।

ঘরে এসে মিলি আধ মিনিটও দাঁড়ায় নি। ভেতরের বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে সোজা ছাদে উঠে সে দেখে যে ধোয়ামোছা মসৃণ ঘাড় নিচু করে গুটিগুটি পায়ে

হেঁটে যাচ্ছে আব্বাস মাস্টার। গোলগাল মুণ্ডুটা তার অতিরিক্ত নোয়ানো। এটা তার ধড়ের সঙ্গে কোনোমতে সাঁটা। তার পেছনে আর একটি মানুষ, এর মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুল, ঝাঁকড়া চুলওয়ালা মাথাটিও সংশ্লিষ্ট ধড়ের ওপর ঢিলেঢোলা ভাবে ফিট-করা। কয়েক পা এগিয়ে গেলে এই দুটোর কোনটা যে আব্বাস মাস্টারের তা ঠাহর করা যায় না। এদের পর আর একজন পানের পিক ফেলে উল্টোদিকে হাঁটে। পরের লোকটি হাঁটে পানের পিক না ফেলে। এর পর দু'জন লোক হাঁটছে পাশাপাশি। ডানদিকেরটা চশমার ভেতর দিয়ে মিলিকে দেখতে দেখতে হাঁটে। চশমাবিহীন বাঁদিকেরটা হাঁটে মিলিকে না দেখতে দেখতে! এইসব পার্থক্যে কিছু এসে যায় না, কারণ গলির মাথায় পৌঁছবার আগেই সবগুলো মুখ একই রকম ঝাপশা হয়ে আসে। ওখানে বড়ো রাস্তায় বড্ডো ভিড়। ট্র্যাফিক পুলিসের বাঁশির সবিরাম শব্দে রিকশা, স্কুটার, হোন্ডা, কার, বাস, ট্রাক, ঠেলাগাড়ি এবং পথচারীরা সব একই তালে এবং একই গতিতে নড়াচড়া করে, একটি থেকে আরেকটিকে আলাদা করে সনাক্ত করা যাচ্ছে না। এ কি রঙবাজি শুরু হলো, দুপুরবেলার রোদে মানুষ ও যানবাহন ও রাস্তা ও ট্রাফিক পুলিসের দাঁড়াবার উঁচু জায়গা ও ফুটপাথ ও রেস্টুরেন্ট ও দোকানপাট ও তারের জটা-মাথায় ইলেকট্রিক পোল—সবাই মিলে মিশে দলা পাকিয়ে যাচ্ছে? ওমা! এ কী ধরনের রোদ? আকাশের দিকে মুখ তুললে মিলি টের পায় যে চারদিকের বাতাস চাপা হয়ে আসছে। চাঁদ তাহলে এতক্ষণে শত্রুর কব্জায় চলে গেছে! দখলকারী সেনাবাহিনীর একনাগাড় বোমাবাজিতে চাঁদের হাল্কা মাটির ধুলা এবং বারুদের কণা নিচে ঝরে পড়েছে। রোদ ও বাতাস তাই ধোঁয়াটে ও ভারি, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে বৈ কি! হাতের স্টেনগানের ইস্পাতে আঙুল বুলাতে বুলাতে পায়ের পাতায় চাপ দিয়ে মিলি আরো ওপরে দেখার চেষ্টা করে। রাস্তায় মানুষজন ও যানবাহন তো বটেই, ইলেকট্রিক তারের জটাধারী পোল এবং আশেপাশের ছাদের টেলিভিশনের এ্যান্টেনাগুলো পর্যন্ত তার চোখের লেবেলের নিচে। তবে কি-না চাঁদের রেঞ্জ এখনো মেলা দূর, ওকে তাই দাঁড়াতে হয় পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে। এতে হচ্ছে না। এবার একটা উড়াল দেওয়ার জন্য মিলি পা ঝাপ্টায়।

দুধভাতে উৎপাত

একটু বেলা হলে বৃষ্টি ধরে এলো। তবে আবুল মাস্টারের উত্তর পাড়ার জমিতে পাটকাটা শুরু হয়েছে, শালার মাস্টার আজ আসবে না। ইস্কুলে গেলে জুত করে ভেলায় চাপা যায়। ইস্কুলের নিচে এবাদত মুন্সির বড়ো ভেলাটা বাঁধাই রয়েছে, লগির ১২/১৪ টা ঠেলা দিলেই একেবারে ধলেশ্বরীর তীর। সাড়ে ১০ টার লঞ্চে উঠে কাপড়ের গাঁটের ওপর বসে থাকা প্যাসেঞ্জারদের সামনে সুর করে 'মা ফাতেমা কাইন্দা বলে বাপ কোথায় আমার/হায়রে নবীজীর এন্তেকালে দুনিয়া জারজার' গাইতে গাইতে বাঁ পা'টা খুঁড়িয়ে হাঁটলে ২টা আড়াই টাকা জোগাড় করা এমন কিছু নয়। তারপর রামেশ্বরদি ঘাটে নেমে কদম আলীর দোকানে বসে চায়ে ভিজিয়ে বনরুটি খাও, পেয়ারা খাও, গাব খাও, পয়সা থাকলে চাই কি মেঘনা সিগ্রেটও একটা জুটে যায়। ১টা ৫০-এর লঞ্চে বাড়ি ফিরলে মায়ের সাধ্য কি ধরে যে ছেলে তার আধখানা পেটে জামিনের বন্দোবস্ত করে এসেছে।

কিন্তু ওদিকে আকাশ থামে তো জয়নাবের পাড়া ফাটাবার বিরতি নাই। এই মিনিট দশেক হলো একটু জিরান দিয়েছে। এটাই সুযোগ, জয়নাব ফের শুরু করলে তাকে বোঝানো যাবে না। ঝাঁপ তুলে উঠানের কোণে মানকচুর ঝোপ থেকে বড়ো দেখে একটা মানপাতা ছিঁড়ে মাথার ওপর ধরে এক হাতে স্লেট ও মলাট-ছেঁড়া ধারাপাত নিয়ে ওহিদুল্লা পা বাড়ালো। অমনি অনেকক্ষণ একটানা চ্যাঁচাবার পর ক্লান্তিতে হাঁপাতে-থাকা জয়নাব কাতরায়, 'ওইদুল্লা! ইস্কুলে যাইস না!'

'আইজ আমাগো পরীক্ষা। না গেলে মাস্টারে মারবো!'

জয়নাব কথা না বলে হাত নাড়ে, এর মানে মারে মারুক। একটু হাঁপিয়ে, ফের হাত নাড়ে, এর মানে, তবুও যাস না। তারপর হাজেরার হাত থেকে হাতপাখা নিয়ে কোঁকায়, 'কাগজির পাতা লইয়া আয় তো মা। খালি বমি বমি লাগে। মরার বমি আয়ও না!' বিছানা থেকে মুখ নামিয়ে সে বমি করার উদ্যোগ নেয়। কেবল শব্দই সার, এক ফোটা রসও বেরোয় না। তখন চিৎ হয়ে শুয়ে কাতরাতে থাকে। এখন হাজেরার পালা। এই ছেমরিটা আরেক মুরুব্বি। ছনের

চালের ফুটো দিয়ে ঝরা পানি সরাতে সরাতে সে ঘরময় কাদাকাদা করে ফেলে আর উপদেশ ঝাড়ে, 'আম্মা বলে অহন-তহন, তুমি যাও বেড়াইতে?'

ওহিদুল্লাকে তাই মাচার ওপর বিছানায় মায়ের কাছে বসে থাকতে হয়। আম্মার পেট ব্যথা হলে তার কী করবার আছে? ব্যথার সঙ্গে জ্বর, জ্বরের সঙ্গে মাথাব্যথা, বুকের ভেতর হাঁসফাঁস, এর ওপর ২৪ ঘণ্টা বমি ভাব,—না, তার কিছু করার নাই। তার বাবা গতবার এসে প্রায় দিন পনেরো বাড়ি ছিলো। পেটব্যথা, বুকের হাঁসফাঁস তখন ছিলো কোথায়? বাজানকে বলে তখন যদি এক বোতল পানি পড়িয়ে রাখে তো তাই দিয়েই একটা বছর শরীরটাকে দিব্যি হাতের মধ্যে রাখা যায়। বাবা তার মৌলবি সাহেব, হাফেজ না হলেও কোরান শরিফ পড়ে পাখির মতো। দোয়া দরুদ যে কতো জানে তার লেখাজোকা নাই। গাছ লাগাবার সময় গাছ বাঁচিয়ে রাখার দোয়া, ধান পাটের জমিতে পোকামাকড় মারার দোয়া, বাচ্চাদের পায়খানা হওয়ার দোয়া, পায়খানা বন্ধ করার দোয়া, বাঁজা মেয়েমানুষের বাচ্চা হওয়ার দোয়া, আবার শত্রুদুশমনের বিমারি করার দোয়া—এক দোয়া পড়ে দিলে দুশমন শালা রক্তবমি করতে করতে পাল্টা দোয়া জোগাড় করার সময় পাবে না—আর মায়ের এসব রোগ তো বাজানের কাছে জলভাত। এখানে এই বিল এলাকায় কসিমুদ্দিনের দাম বোঝার মতো লোক কোথায়? বাজান ঠিকই বলে, যেখানে তিনদিন বৃষ্টি হলো তো ডাঙা ও নদীর কোন ভেদচিহ্ন রইলো না, সেখানে মানুষ বাস করে? আর সেখানে? সেই উত্তরে, ইছামতি, ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে তিস্তাতীরের গ্রাম খোলামহাটি। গ্রামে আজমত আলী প্রধানের আটচালা টিনের ঘর, তার পাটের গুদাম, তামাকের চাষ। কসিমুদ্দিনের কতো দাপট সেখানে। প্রধানের বাড়িতে থাকে, বাড়ির মক্তবে গ্রামের ছেলেমেয়েদের আমপারা-সেপারা পড়ায়, মসজিদে আজান দেয়, ইমাম সাহেব এদিক ওদিক জেয়াফতে গেলে নামাজও পড়ায়। বকরিদের সময় সেখানে ঘরে ঘরে কোরবানির ধূম, তার বারো আনা জবাই হয় কসিমুদ্দিনের হাতে। এক বছর পর বকরিদের সপ্তাহখানেক বাদে কসিমুদ্দিন বাড়ি ফেরে তখন তার হাতে মস্ত বড়ো এ্যালুম্যুনিয়মের ডেকচি বোঝাই জ্বাল-দেওয়া ৮/১০ সের খাসির গোশ্‌ত, গোরুর গোশ্‌ত। মৌলবি বাড়ি এলে জয়নাবের পায়ে পাখা গজায়, তখন খালি ওড়ে, খালি ওড়ে। একটু মনে করে তখন পানি-পড়া রেখে দিলে এতো কষ্ট পায়? মা হাজার হলেও আস্ত মেয়েমানুষ, ডেকচি ভরা গোশ্‌ত দেখলে হুঁশ থাকে না। বছরের একটা মাস গোশ্‌তের ঝোলের, গোশ্‌তের ভুনার, কলেজি-গুর্দার সুবাসে এই ছনের ঘরে দালানের চেকনাই আসে। গোশ্‌তের মৌসুম তখন, গোশ্‌তের উৎসব।- ওহিদুল্লা তার নিজের গোশ্‌ত-ঝরা চিমসে পেটে আদরে ও করুণায় হাত বুলাতে বুলাতে উঠে দাঁড়ায়। আদর পেয়ে বেতমিজ পেটের ভেতরটা ফোঁস ফোঁস করে।— নাঃ সাড়ে ১০ টার লঞ্চ এখনো যায়নি। লঞ্চে ঠাসাঠাসি করে বসা কাপড়ের ব্যাপারিদের কাছ থেকে ২ টাকা আড়াই টাকা না হোক ১ টাকা দেড়

টাকা পেলেও বনরুটি-চা না হোক ১ হালি গাব কি আমড়া খেয়ে মুখ মুছে বাড়ি ফিরলে কে কী ধরতে পারে? কিন্তু দাঁড়াবার সঙ্গে জয়নাবের চিহি চিহি স্বরে বল আসে, 'যাইস না!' 'মাস্টারে আইজ পাট কাটবো, হ্যায় লগে থাকতে কইছিলো!'

জয়নাব হাত নাড়ে, মানে, কউক।

'না গেলে মাস্টারে মাইর দিবো!'

'মৌলবি মাইনষের পোলা তুই পাট কাটবি ক্যান?' গোঙাতে গোঙাতে জয়নাব নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য মনোযোগী হয়। কয়েকদিন থেকে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কাজ করতে তার খুব পরিশ্রম হচ্ছে। চেষ্টা না করলে নিঃশ্বাস নিতে পারে না। অনেকক্ষণের জন্য বাতাস টেনে নিয়ে কথা বলতে বলতে শ্বাস ছাড়ে, কথাও বলে মিনমিন করে, পাছে আবার বেশি বাতাস বেরিয়ে যায়; তখন ফের নতুন করে বুক ভরাবার মেহনত করবে কে?

'ওইদুল্লা, বাবা আমার কালা গাইটা আনতে পারলি না? হাশমত মউরির পোলায় দড়ি ধইরা টাইনা লইয়া গেলো, একডা বছর পার হইয়া গেলো একটা দিন দুগা ভাত মাখাইতে পারলাম না।' এতো কথা বলায় তার বাতাসের স্টক শেষ হয়ে যায়, সে ফের হাঁপায়। ওহিদুল্লা তার কথার জবাব দেয় না। এই তো মেয়েমানুষের বুদ্ধি! কাল থেকে শুরু হয়েছে দুধের বায়না। গোরু বিক্রি করে দিয়েছে আজ এক বছরের ওপর, সেই গোরুর শোক কাল থেকে নতুন করে উথলে উঠছে। এতো হাহাকারের আছে কী? গোরু যখন ছিলো তখনি কি এই মা মাগী ওদের দুধভাত দিতো? প্রত্যেক দিন সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে হাশমত মুহরির বড়ো ছেলে ঢ্যাঙা আশরাফ বা তার ঘরজামাই বোনাই হারুন মৃধা এসে দুধ দুইয়ে নিয়ে গেছে। এর বদলে সাতদিন পর পর বাজারে হারুন মৃধার দোকান থেকে ওহিদুল্লা চালডাল নিয়ে আসতো। খালি বছরে একবার কসিমুদ্দিন বাড়ি এলে সেই কটা দিন পোয়া দেড়েক দুধ ঘরে রাখার রেওয়াজ ছিলো। 'হেইখানে কি দুধ পাও?'—স্বামীকে এই কথা বলে জয়নাব ঐ কয়েকটা দিন রাতে দেড় পোয়া দুধের সঙ্গে দেড় সের চালের ভাত দিয়ে, গুড় দিয়ে ও একটা শবরী কলা দিয়ে মাখাতো, সেই মাখানো ভাত খেতো বাপেবেটায় ঝিয়ে মিলে ছয়জনে। শেষ দুটো লোকমা বরাদ্দ ছিলো জয়নাবের জন্যে। দুধভাতের হাত ধুয়ে তার গোনাগুনতি ছাগলা দাড়ি কটায় হাত বুলাতে বুলাতে কসিমউদ্দিন মাঝে মাঝে হাসতো, 'এই শ্যাষ দুইডা লোকমার মদ্যেই ব্যাক সোয়াদ। তুমি খাইতে চাও না, তুমি নিজে না খাইলে এতো মজা কইরা মাখাইবা?' দুধভাত খেয়ে বাজানের মুখ থেকে কী সুন্দর সুন্দর কথা বেরোয়, 'আল্লাপাকে তোমার হাতের মইদ্যে বরকত দিছে! দেড় সের চাইলের ভাত তুমি দেড় পোয়া দুধ দিয়া মাখাইয়া ব্যাকটির জান ঠাণ্ডা করো! আলহামদোলিল্লা!'

সেই কতোদিন-আগে-খাওয়া দুধভাতের বাসি গন্ধ চোখা কঞ্চির মতো পেটে ঢুকে পাকস্থলীতে খোঁচাখুঁচি শুরু করলে সে ফের উঠে দাঁড়ায়। টিপটিপ পানি

মাথায় করে ঘরে ঢোকে বড়োআম্মা আর হাজেরা। এতোক্ষণ ঘরে না থাকার জন্য হাজেরাকে কষে একটা চড় মারার সুযোগ ঘটে যাওয়ায় ওহিদুল্লার হাতের তালু খুশিতে নিশপিশ করে, পেটের মধ্যে কঞ্চির তৎপরতার বিরতি ঘটে। কিন্তু হামিদা বিবি এসে বসলো জয়নাবের গা ঘেঁষে, তার পাশে হাজেরা।—এ অবস্থায় মারধোর করাটা মুশকিল। পেট ও হাতের চাপা তৎপরতা স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়ে ওহিদুল্লা নাক খুঁটতে শুরু করে।

জয়নাব কি ঘুমিয়ে পড়লো? হামিদা বিবি তার কপালে হাত রাখতেই সে বিড়বিড় করে দুধের কথা বলে। হামিদা বিবির হাত জয়নাবের কপালেই থাকে, 'মাইজা বৌ, দুধ তো পাই না! তামান গাঁও তালাস কইরা আলার বাপে হপায় আইছে। উত্তরপাড়ার করিম সিকদারের গাইটা দুই একের মদ্যেই বিয়াইবো। নুইলা আমিনুদ্দির গাই বলে কয়দিন থাইকা খালি দাপায়, দানাপানি ছাড়ছে। আলার বাপে ঝাইড়া দিয়া আইলো। কি করে, ধরছে, ঝাইড়া দিয়া যাও। তাই দেরি হইল।'

'দাপাইবো না?' আলার বাপ দরজার বাইরে দাঁড়িয়েই কথা বলে। সে হলো জয়নাবের ভাসুর, ঘরে ঢোকার নিয়ম নাই। 'গাভীন গাই দিয়া কয়দিন হাল বোয়াইছে, অহন গাইয়ের কী দোষ? আল্লায় ক্যামনে সয়?'

ভাসুরের কণ্ঠস্বর শুনে জয়নাব গায়ের কাঁথা আরো জড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। তার পায়ের কাছে বৃষ্টির পানিতে ভেজা জায়গাটা আঙুলে লাগলে সমস্ত শরীর শিরশির করে ওঠে। এতে কথা বলার বল পাওয়া যায়, 'অ বুজান, হাশমত মউরির গোয়ালের মইদ্যে আমাগো কালা গাইটা আছে!'

কিন্তু হাশমত মুহুরির বাড়িতে যাওয়া আলার বাপের পক্ষে অসম্ভব। গতবার খরার সময় হারুন মৃধার দোকান থেকে পাঁচ সের চাল নিয়েছিলো, সেই ধার আজও শোধ হয়নি। সে তাই ওহিদুল্লাকে ডাকে, 'ওইদুল্লা!'

ওহিদুল্লা বেরিয়ে দেখে তার জ্যাঠা টিপটিপ বৃষ্টির নিচে দাঁড়িয়ে ভিজছে আর পরনের গামছা বারবার নিঙড়ে নিচ্ছে।

'ওইদুল্লা, কোযাখান লইয়া মালখাপাড়া যা, হাশমত মউরির তিনটা গাই, দুধ লইয়া বাজারে অহনো যায় নাই। মউরিরে হাতে পায় ধইরা কইস, আমার মায়ের অহন-তহন অবস্থা, একখান হাউস করছে, আপনের না কওন চলবো না!'

সারা পাড়ায় একটিমাত্র কোষা, সেটা নিয়ে গেলো কে? ওহিদুল্লার ভেলাই ভালো। হাশমত মুহুরির বাড়ির পৈঠায় ভেলা ঠেকাবার আগেই দেখা যায় পরিষ্কার জামাকাপড় পরা কয়েকটি ছেলেমেয়ে পানিতে কাগজের নৌকা ভাসিয়ে দিচ্ছে। সবাই এক সঙ্গে কথা বলে, দেখেই বোঝা যায় শহরের পয়দা, এদের কথা বোঝা যায় না। ওহিদুল্লা ভেলা ঠেকিয়ে ডাঙায় নামে। হাশমত মুহুরির ঘর অনেক উঁচুতে, পা ঠেলে ঠেলে ওপরে উঠতে হয়।

হাশমত মুহুরি বাড়ি নাই, ভোরে উঠে বৃষ্টি মাথায় করে সে গেছে থানায়, কাকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য তদবির করতে। হাশমত মুহুরির বড়ো ছেলে ঢ্যাঙা

আশরাফ থাকলেও কাজ চলে, তো সে গেছে বাজারে। এই তো কোষা নিয়ে বেরোলো. অহিদুল্লার সঙ্গে তার দেখা হয় নি? হাশমত মুহুরির চাকরিজীবী প্রবাসী ছেলে আলতাফ অনেকদিন পর বাড়ি ফিরেছে, বাজারে না গিয়ে ঢ্যাঙা আশরাফের উপায় ছিলো না। ওহিদুল্লা বাড়ির ভেতরে উঠানে দাঁড়ায়। ঘরের পাকা বারান্দায় শহরবাসী ছেলে মস্ত মুড়ির বাটি নিয়ে জলচৌকিতে বসেছে। খাঁটি সর্ষের তেলের ঝাঁজ বড়ো বারান্দা পেরিয়ে ওহিদুল্লার নাকে ঝাপটা মারে এবং সেই ধ্যাবড়া নাকের সুড়ঙ্গপথে পেটে ঢুকে সুড়সুড়ি দেয়। মুহুরির বৌ ছেলের সামনে দাঁড়িয়ে একটা এ্যাল্যুম্যুনিয়ামের থালা থেকে গম ছিটিয়ে দিচ্ছে উঠানে।

ওহিদুল্লার আবদার শুনে মুহুরির বৌ অবাক হলো, 'হায়রে আল্লা!' তর মায়ের না প্যাটের ব্যারাম? চিরকালের সুতিকার রুগী? হ্যারে তুই দুধ খাওয়াইবি? পাগলা হইছস?' কিন্তু এই বিস্ময়বোধে তার গম ছড়াবার কাজ একটুও ব্যাহত হয় না, দাঁতের গোড়ায় পানে-ভারি জিভ ঠেকিয়ে সে 'টি টি টি টি' আওয়াজ করলে এক পাল মুরগি এসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গম খায়। মুরগির হাঁটা কি! পেটে দানা পড়ায় শালাদের দেমাক কতো! ইচ্ছা হয় সব কটার ঠোঁট কামড়ে গমের টুকরা নিয়ে দাঁতে চিবিয়ে ফেলে। কিন্তু এই সাধ পূর্ণ করার জন্য কোনোরকম প্রস্তুতি নেওয়ার আগেই মুহুরির জামাই হারুন মৃধা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে জামার বোতাম লাগায় আর বলে, 'তর মায়ের প্যাট খারাপ, তগো হইছে মাথা খারাপ!'

ওহিদুল্লা মিনমিন করে, 'না, হ্যার হাউস হইছে দুধভাত খাইবো, মায়ে বলে বাঁচবো না!' তার গলা কাঁদো কাঁদো করার চেষ্টা করেও বিশেষ সুবিধা হয় না। মুহুরির শহরবাসী ছেলের কথা বরং সর্ষের তেলের ঝাঁঝে খোনা শোনায়, 'দুধভাত খাইলে তর মায়ে ফাল পাইড়া উঠবো, না?'

শহরবাসীর স্কুলে-পড়া ফ্রক-পরা কন্যা কামড়ে কামড়ে পেয়ারা খাচ্ছিলো, মুখে পেয়ারা নিয়েই সে বলে, 'দুধ আমার ভাল্লাগে না! দুধ আবার মানুষ সখ করে খেতে চায়? মাগো!'

মুহুরির জামাই তার দোকানে যাবার জন্য পা বাড়াতে বাড়াতে বলে, 'পয়সা লইয়া ডাক্তার দেখা। ওষুধ দে, ওষুধ দে! তর চাচা না? ঐ যে আলার বাপে তর চাচা লাগে না? আমার চাউলের দামটা অহনো দিলো না। অর কাছে থাইকা ট্যাহা লইয়া ডাক্তার দেখা।'

গলাটা কাঁদো-কাঁদো করার জন্য ওহিদুল্লা আর একবার প্রচেষ্টা চালায়, 'মায়ের এ্যাট্টা হাউস হইছে, কালা গাইয়ের দুধ দিয়া গুড় দিয়া কলা দিয়া'—বলতে বলতে জিভ দিয়ে শব্দগুলো সে চাখে। কিন্তু হারুন মৃধা কালো গোরুর কথায় চটে গেলো: 'যা যা! এক কথা!—প্যাচাল পাড়িস না।' মুহুরির বৌ বলে, 'কইলাম আমার মাইজা পোলায় আইছে, নাতিপুতিগুলি আইছে বলে দুই বচ্ছর বাদ, দুগা পিঠা করুম, দুধ লাগে আমার চাইর স্যার! আইজ বাজার থাইকা দুধ আরো খরিদ করা লাগে! তর মায়ে—বুইড়া মাগীটার ঢঙের হাউস হইছে দুধভাত খাইবো!'

শহরের পয়দা মেয়েটি পেয়ারা কামড়ানো স্থগিত রেখে বেনী দুলিয়ে দুলিয়ে বলে, 'নেই কোনো উৎপাত, খায় শুধু দুধভাত!'

শহরে থাকলে পোলাপান কতো রঙই না শেখে। কথাবার্তা শুনে কে বলবে যে এরা হাশমত মুহুরির নাতিপুতি?

কালো গোরুর কথাটা হারুন মৃধা ভুলতে পারে না, 'এইগুলির উপকার করতে নাই। খাওন জোটে নাই, চাউলের দাম হইলো আগুন, ভাইজানে গোরুটা কেনে তয় হ্যাগো চাউল আসে! দানাপানি জোটে! হাটে বাজারে অহন আলার বাপে কইয়া বেড়ায়, হ্যার ভাই বাড়িত থাকে না, মউরির পোলায় হ্যার গাইগোরু লইয়া গেছে। গোরু লইছে মাগনা? ক্যারে, গোরু তর মায়ে মাগনা বেচছে?'

ওহিদুল্লা ফিরতে ফিরতে বৃষ্টি একেবারে থেমে গেলো। আলার বাপ কাদার পাশে একটা কাঠের গুঁড়িতে হাঁটু ভেঙে বসে আরো দু'জন জ্ঞাতির সঙ্গে ভ্রাতৃবধূর রোগ বিষয়ে গুরুগম্ভীর পরামর্শ করে। ওহিদুল্লাকে দেখে আলার বাপ চোখে প্রশ্নবোধক চিহ্ন তৈরি করলে ওহিদুল্লা বলে, 'মউরি নাই।'

'হারুন মিরধা আছিলো?'

'হ্যাগো ইষ্টি আইছে, দুধ লাগবো।' এই খবরে অবশ্য তাদের আলোচনা ব্যাহত হয় না। 'ডাক্তার আছিলো আমাগো অমরেশ ডাক্তার। খালি জিগাইছে, কও সে বাবা তোমার রুইদ ভালা ঠ্যাহে, না ছ্যাওয়া ভালো ঠ্যাহে? কেউরে কইছে, রাইতে আরাম পাও, না দিনে আরাম পাও? জবাব শুনছে, শুইন্যা ওষুধ দিছে। কী দিছে? চাইরটা পাঁচটা বাড়ি, মধুর লাহান মিঠা, খাইতেও মজা, দুইবার তিনবার খাও, জ্বর জারি কৈ যাইবো দিশা পায় নাই!'

শহরে-পয়দার পেয়ারা কামড়ানো দেখেও যা হয়নি হোমিওপ্যাথিক ওষুধের স্বাদের কথা শুনে ওহিদুল্লার পেটে ও বুকে কোলাহল শুরু হলো। জীবনে কোনোদিন মধু চেখেও দেখে নি, অথচ ফোঁটাফোঁটা মধু বা মধুর মতো মিষ্টি বড়ির এক আধটা দানা শূন্য উদরে পড়ে, শব্দ করে পড়ে আর সেখানে ঘায়ের ওপর সুচের মতো বেঁধে।

একে এই সুচ-বেঁধার কষ্ট। আবার পাটখড়ির বেড়ার পাশ দিয়ে ঘরে ঢোকার মুখে ওখানে কে রে?—খাদিজা। দেখো, ভরা-বর্ষায় বাড়ির মানুষ উপোস করে মরে, আর ছেমরিটা কেমন তারিয়ে তারিয়ে শশা চিবায়। দেখতে এতোটুকু হলে কি হবে,বাড়ে নাই বলে কি তার বয়সও থেমে আছে? তার আক্কেলটা দেখো। কানের কাঠি-বেঁধা ও একটু পুঁজ-মাখা লতি ধরে ওহিদুল্লা তার গালে গোটা তিনেক চড় মারলো। 'শয়তানী! চুন্নীটা! কচুর ঝোপে পলাইয়া শশা খাস? শরম নাই?' একাগ্রচিত্তে ও নিবেদিত উদরে শশা খেতে খেতে মিঞাভায়ের এই অতর্কিত আক্রমণে বিচলিত হয়ে খাদিজা কাদার ওপর পড়ে যায়; তার পায়জামাটা ছেঁড়া, সেটা একেবারে ফাঁক হয়ে গেলো। তবে সুখের বিষয় শশার অভুক্ত অংশের সবটাই তার আঁটা মুঠিতে অচঞ্চল বিরাজ করে।

জয়নাবের তখন খুব বাড়াবাড়ি। বড়োআম্মা বসে আছে স্যাঁতসেঁতে বিছানায়। হাজেরা হাত দিয়ে মায়ের পায়ের পাতা ঘষে দিচ্ছে। জয়নাবের ছোটো ছেলেটি আহমদউল্লা পাছা ও উরুতে পাতলা গু নিয়ে এদিক-ওদিক হেঁটে বেড়ায়, তার দিকে কারো নজর নাই। এর বড়োটা কানা বয়তুল্লা মায়ের পাশে শুয়ে অসময়ে ঘুমাচ্ছিলো, সে জেগে উঠে এক চোখে ফোঁৎ-ফোঁৎ করে কাঁদছে। হাজেরা কাঁদো-কাঁদো গলায় বলে, 'ভাইজান, মায়ে তোমারে কতো তালাশ করলো। মায়ে আর কথা কয় না, অ মা, তোমার জবান বন্ধ হইলো ক্যান? অ মা!' এইসব দেখেশুনে ওহিদুল্লার পেটের কোলাহল মাথায় ওঠে। সমস্ত পেট মাথার ভেতর সেঁধে যাওয়ায় খুলিটা ঘিঞ্জি ও ঝাপশা ঠেকে। বড়োআম্মা বিড়বিড় করে কোরান শরিফের আয়াত পড়ে। জয়নাব তার বন্ধ চোখ দিয়ে ওহিদুল্লার খোলা নোনা দুই চোখে অদৃশ্য সব ছবি এবং অনেক আগে সম্পন্ন গতিবিধি প্রকাশ করে দেয়। ওহিদুল্লা দেখতে পায়, প্রখর ঠাঠা রোদে জয়নাব মাখন ঘোষের পোড়ো-ভিটায় মেটে আলুর খোঁজে মাটি খুঁড়ছে। আবার এক বছর পর কসিমুদ্দিন বাড়ি ফিরেছে তাও দেখা যায়। বাপের হাতে গোশতের হাঁড়ি দেখে তারা সব কটা ভাইবোন অস্থির। কসিমুদ্দিন তার নবতম শিশুটিকে নিরীক্ষণ করছে। লাজুক লাজুক ও বোকা বোকা মুখে ঘোমটা দিয়ে জয়নাব হঠাৎ কতো ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। বদনা ভরে পানি নিয়ে একবার উঠানে রাখে, পুরনো কাঠের তোরঙ্গ থেকে কবেকার পুরনো রঙ-জ্বলা পাতলা ফর্শা গামছা বারান্দায় বিছিয়ে রাখে জায়নামাজের মতো। আবার সূর্যের দিকে তাকিয়ে তখনো নামাজের সময় হয়নি— এই খবর জেনে নিয়ে ফের জায়নামাজ গুটিয়ে রাখে। ঘরে তার ডেকচি ভরা গোশ্‌ত। সেই গোশ্‌ত ছোটো ছোটো মাটির হাঁড়িতে গুছিয়ে রাখতে হয়। সেসব জ্বাল দেওয়া, বেছে বেছে গুর্দা ও কলজে আলাদা করা—তার কাজের কি হিসাব আছে? কসিমুদ্দিন বাড়ি এসেই কালো গোরুটাকে নিয়ে মাখন ঘোষের ভিটা ও বিলের ধারের মাঠে একটুখানি চরিয়ে আনে। আবার স্বামীকে গোরুর কাছে যেতে দেখে আড়চোখে সেদিকে দেখে আর মুখ টিপে হাসে। কসিমুদ্দিন বলে, 'গাইয়ের প্যাট ওঠে না? গাই মনে হয় দুবলা হইয়া গেছে!' মুখে আঁচল দিয়ে জয়নাব জবাব দিতো, 'আপনেরে না দেইখা! এইডো আমার হতীন তো!' নিজের রসিকতায় সে নিজেই হেসে গড়িয়ে পড়তো। এই হাসিটা তার ঠোঁট জুড়ে চুপচাপ এলানো থাকে সারা পৌষ মাস। নতুন চাল উঠলে ছেলেমেয়েদের জয়নাব একদিন দুধভাত খাওয়ায়। কসিমুদ্দিন অবশ্য তখন তিস্তাতীরের গ্রামে। উঠানে ছেলেমেয়েদের সার করে বসিয়ে জয়নাব হাত দিয়ে মুখে মুখে ভাত তুলে দেয়। দুধ দিয়ে ভাত দিয়ে কলা দিয়ে গুড় দিয়ে।

ওহিদুল্লা দুধভাতকলাগুড়ের মিলিত দৃশ্য ভালো করে দেখার আগেই জয়নাব চোখ মেলে। কালচে লাল চোখে সে হামিদা বিবির দিকে তাকায়। ডাকে, 'বুবু!' কথা শোনবার জন্যে হামিদা বিবি মাথা এগিয়ে দিলে জয়নাব বলে 'দুধভাত

মাখছো?' এই পর্যন্ত সবাই শুনতে পারে কারণ এটুকু তাদের আগে থেকেই জানা ছিলো। কিন্তু পরবর্তী সব বাক্য অস্পষ্ট। বড়োআম্মা তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে সব শুনছে। তার চোখ ছলছল করে। 'হায়রে, পোলাপানেরে দুধভাত খাওয়াইবার হাউস করছে!' বলতে বলতে বড়ো আম্মার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে। এইসব দেখে ওহিদুল্লার একটু রাগমতো হয়।—এতে কান্নাকাটির কী হলো? জয়নাব এতোক্ষণে বিবেচকের মতো কথা বলছে। গত কয়েকটা দিন তার কেবল পেট ব্যথা করে আর বমি বমি ভাব হয় আর বমি না হওয়া বুক হাঁসফাঁস করে আর পেটের ও বুকের ব্যথায় সে মাঝে মাঝে তড়পায়। ছেলেমেয়েদের খাওয়া-দাওয়ার দিকে তার নজর নাই। দুদিন থেকে কারো খাওয়া হয় না, ঘরে যা ছিলো হাজেরা কোনোমতে কয়েকটা দিন চালিয়ে নিয়েছে। কাল থেকে ভরা বর্ষা, কোথায় কী পাওয়া যাবে? এই সময় মায়ের এই ইচ্ছাপ্রকাশে বড়ো আম্মার এতো কান্নাকাটির কী হলো?

হামিদা বিবি বলে, 'তরা বয়, আমি এট্টু আহি।' জয়নাব তার চোখের কপাট বন্ধ করে বর্তমান থেকে নিজেকে আড়াল করে নিলো।কলা গাব, চা-বনরুটি, মধুর মতো হোমিওপ্যাথিক বড়ি ও দুধভাত বারবার ভাবতে ভাবতে ক্লান্তিতে ওহিদুল্লার চোখও ভারি হয়ে আসে। চোখ মেলে অদৃশ্য বস্তু দেখতে বড়ো খাটনি হয়। ঝিমুনিতে তার মাথা নুয়ে নুয়ে পড়ে। ঝিমুনির ছোট্টো একটি পলকে তার গায়ে আগুন ফোটে, ভরা-বাদলের আকাশ হঠাৎ করে খরায় ফেটে পড়ে। দেখা যায়, সেই খরায় কে একজন, তাকে চেনা যায় না, তাদের কালো গোরুর দড়ি ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। লোকটা ঢ্যাঙা আশরাফ হতে পারে, হারুন মৃধাও হতে পারে। ওহিদুল্লা জয়নাবকে ডেকে বলছে, 'মা অ মা, আমাগো গাই লইয়া যায়, তুমি দেহো না' জয়নাব বলছে, 'হ্যাগো কাছে রাখবার দিলাম। তর বাপে ট্যাহা পাঠাইলে চাইলের দাম শোধ কইরা গাই লইয়া আহুম!' দুবার এই বাক্যের পুনরাবৃত্তি করতেই মায়ের চোখের খরা কেটে লোনা বাদল নামে, 'তর বাপে কৈ থন ট্যাহা পাঠাইবো? মোল্লায় খাইয়া দাইয়া প্যাটটিরে বানাইছে গোশাতের কালাপাতলা, হ্যায় ট্যাহা পাঠাইবো ক্যান?'

মাটির সানকি হাতে বড়ো আম্মা ঘরে ঢুকলে ওহিদুল্লার এই বাসি-ছবি দেখা শেষ হলো, শিথিল চোখ-কান ফের চাঙা হয়ে উঠলো।

'বড়োআম্মা দুধভাত লইয়া আইছো?' প্রায় চিৎকার করে হাজেরা উঠে দাঁড়ায়, 'বড়োআম্মা, দুধভাত কই পাইলা?'

'পাইছি! আল্লায় দিছে!' ঈশ্বরের প্রদত্ত খাদ্য নিয়ে বড়োআম্মা জয়নাবের শিয়রে বসলো। জয়নাবের কপালে, গায়ে ও চুলে হাত বুলিয়ে হামিদা বিবি জিগ্যেস করে, 'মাইজা বৌ, পোলাপানের মুখে দুধভাত দিবি না?' কিন্তু জয়নাবের মুখচোখ অপরিবর্তিত। 'অ মাইজা বৌ, পোলাপানেরে দুধভাত খাওয়াইতে চাইছিলি, অ বৌ?

মায়ের পদসেবা ছেড়ে হাজেরা এসে দাঁড়িয়েছে হামিদা বিবির হাতের সানকির ধার ঘেঁষে। খাদিজা তার শশা সম্পূর্ণ খেয়ে বা অভুক্ত অংশটি কোনো ঝোপে ঝাড়ে লুকিয়ে রেখে এখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। আহমদউল্লার মুখ থেকে অর্থহীন ধ্বনি ও লালা গড়িয়ে পড়ে, কিন্তু খাদিজার হাঁটুর পেছনে ছেঁড়া পায়জামার ঝুলে-পড়া কাপড় ধরে সেও মুখ তুলে গোল ও কালো সানকিটা দেখছে। স্যাঁতসেঁতে কাঁথার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে হামিদা বিবি জয়নাবের ডান হাত টেনে আনে। রোগা ও পাতলা এই হাত সানকিতে রাখলে আঙুলগুলোতে স্পন্দন বোঝা যায়। এক মুঠি দুধমাখা ভাত সেই হাতে পুরে দিলে হাতটা নিজে নিজেই ছেলেমেয়েদের দিকে এগিয়ে আসে। সবচেয়ে বেশি এগিয়ে সাড়া দিয়েছিলো খাদিজার মুখ। কয়েক কামড় শাশা তার পেটটাকে বড্ডো খুঁচিয়ে দিয়েছিলো। তবে হাঁ সবেচেয়ে বড়ো হয়েছিলো হাজেরার যদিও একটু পিছিয়ে পড়ায় জয়নাবের হাত ঘেঁষে সে দাঁড়াতে পারেনি। এক চোখ কানা হলেও এবং মায়ের উল্টোদিকে থাকা সত্ত্বেও কানা রহমতউল্লা তার ভালো চোখটা দিয়ে সব দেখে ফেলেছে, সেও মায়ের কাছাকাছি বিছানার ওপর উঠে বসতে চেষ্টা করছিলো। কনিষ্ঠটির আবোল তাবোল বকা শেষ, তখন তার জিভে কোনো ধ্বনি নাই, কেবল লালা গড়িয়ে পড়ছে।

হামিদা বিবি নিজের ডান হাত দিয়ে জয়নাবের দুধভাত-ভরা হাতটা ধরে পঞ্চাননের মাঝখানে এনে একটু উঁচুতে শূন্যে স্থাপন করে। ভাতের গন্ধে গুড়ের গন্ধে ওহিদুল্লার পেটের প্রসার এখন দ্বিগুণ। সে এককটি শূন্য ঢোক গেলে আর উদরের মস্ত গহ্বরে তার ঢক ঢক প্রতিধ্বনি বাজে। মুখ বাড়িয়ে ভাতের প্রথম গ্রাসটি সে নিজেই তুলে নিতে পারতো, তা আর হয়ে ওঠে না, তার, আগেই হাজেরা তার বসন্তের দাগ-ভরা মুখ এগিয়ে হলদে ছ্যাতলাওলা দাঁতে মায়ের হাত কামড়ে দুধ-ভাত তার নিজের জিভে চালান করে নিয়েছে। বেতমিজ আওরৎ! মেয়েমানুষের বুদ্ধি মানে ইবলিসের উস্কানি।

দেখতে দেখতে জয়নাবের হাত ধপাস করে পড়ে যায় বিছানার প্রান্তে। খাদিজা সেই হাত নিয়ে আঙুলগুলো চুষতে আরম্ভ করে। পারে তো আঙুল চুষে চুষে সবটাই খেয়ে ফেলবে। ধাড়ি ছুঁড়ির মায়ের আঙুলে স্তনচোষার কাণ্ড দেখে ওহিদুল্লার ইচ্ছা হয় ঠাস ঠাস করে দুটো চড় বসিয়ে দেয়। তা আর হয়ে ওঠে না। জয়নাবের মাথা কাঁপতে শুরু করে এবং তার গলা থেকে ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ এই রকম গোরুর গাড়ির চলন্ত চাকার আওয়াজ শোনা যায়। তার ঠোঁট জোড়াও এখন বেশ ফাঁক হয়েছে; মর্চে ধরা গোঙানি, ফাঁক-করা ঠোঁট ও মাথার মৃদু কাঁপুনি দেখে হামিদা বিবি ভয় পায় এবং 'লা ইলাহা ইল্লালাহু মুহম্মদুর রসুলাল্লাহ্! মাইজা বৌ, মাইজা বৌ!' বলতে বলতে নিজের হাতে আর এক মুঠ দুধভাত তুলে হাজেরা, ওহিদুল্লা, খাদিজা, রহমতউল্লা ও আহমদউল্লাকে থ' করে দিয়ে নিজের মুখের কাছে নিয়ে আসে এবং ঠোঁটে প্রায় ছুঁয়ে দারুণ থতমত খেয়ে জয়নাবের মুখের

কাছে নিয়ে যায়। সৌভাগ্যক্রমে জয়নাবের গোঙানিরত মুখ হাঁ করাই ছিলো, হামিদা বিবি অনায়াসে সেই হাঁর মধ্যে এক গ্রাস ভাত গুঁজে দেয়। ভাতের বেশ অনেকটা অংশ তার মুখের মধ্যে চলে গেছে, এতে কোনো সন্দেহ নাই। তবে খানিকটা তার কষ বেয়ে বাইরে গড়িয়ে পড়েছে।

তারপর পানিতে ডোবা মানুষের মতো জয়নাব কয়েকটা ঢোক গেলে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার গলায় ও মুখে প্রবলরকম ঝাঁকুনি শুরু হলো। কালো চামড়ার নিচেও কাঁপানের মোটা ও চিকন কারুকাজগুলো স্পষ্ট ধরা পড়ে। গলায় মাংসপেশী তার কুঁচকে ওঠে; কপাল ও কপালের নিচে, চোখের পাতায় ও নাকের দুই উপত্যকায় প্রবল আলোড়ন ওঠে এবং সে ওয়াক ওয়াক করে বমি করতে শুরু করে। তার বমির আওয়াজ ও ভঙ্গি খুব জমজমাট, এই বিনীত ও ভাঙাচোরা ঘরে ঠিক মানায় না।

জয়নাব অবিরাম বমি করে। প্রথমে বের হলো ঘোলাটে সাদা ভাত ও পানি। তারপর কেবল পানি। বিবর্ণ পানির ধারা বেরিয়ে আসে প্রবল তোড়ে। মাঝে মাঝে অল্পক্ষণের বিরতি দিচ্ছে। বিরতির পর পরই দ্বিগুণ বেগে বমি আসে। বমির পানিতে মেঝে ভেসে যাচ্ছে। ওহিদুল্লা অবাক হয়ে বমির পরিমাণ দেখে, মায়ের ভেতরকার সবকিছুই পানি হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে? জয়নাবকে যারা অনেকদিন থেকে চেনে তাদেরও এরকম মনে হতে পারে। এ পর্যন্ত খাওয়া যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার জন্য সে কি পাগল হয়ে গেলো? আজ থেকে ৩৬ বৎসর আগে তার আকিকার গোশ্‌ত থেকে শুরু করে কিছুই তার পেটে থাকছে না। বমির পরিমাণ দেখে মনে হয় তার বিয়ের আগে বাপের বাড়িতে যা খেয়েছে, নিজের বিয়ের খাবার, বিভিন্ন বকরিদের পর তার স্বামীর নিজের হাতে হালালকরা কোরবানীর গোশ্‌ত, কালো গোরুর দুধ দিয়ে কলা দিয়ে গুড় দিয়ে মাখা মোটা ও রাঙা চালের ভাত, খরার সময় মাখন ঘোষের পোড়া ভিটা থেকে খুঁড়ে-আনা মেটে আলু, এমন কি কসিমুদ্দিনের পড়া-পানি পর্যন্ত উগরে দিয়ে সে নিঃশেষিত হচ্ছে। তার বমির মাঝে মাঝে ১০/১২ সেকেন্ডের বিরতি থাকে। এরকম একটি বিরতির সময় হামিদা বিবি জয়নাবের ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে ওঠে, 'আরে করস কী? বমি লাগতাছে তো!'

কে শোনে কার কথা? বিছানার ওপর থেকে মাটির সানকিটা কখন যে পাচার হয়ে গেছে ঘরের পূর্ব কোণে এমন কি ওহিদুল্লাও টের পায়নি। কাদাকাদা মেঝেতে একমাত্র সে ছাড়া আর সবাই লেপ্টে বসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মাটির সানকির ওপর। হাজেরা তার ডান হাত দিয়ে খাচ্ছে বটে, কিন্তু সানকির সঙ্গে তার মুখের তফাৎ ২/৩ ইঞ্চির বেশি নয়। ইচ্ছা করলে সরাসরি মুখ দিয়েই সে ভাত তুলে নিতে পারে। খাদিজা বসেছে অর্ধেক সেজদার ভঙ্গিতে। বাপ-সোহাগী মেয়ে, বাপ এলে বাপের পেছনে তার নামাজপড়া নকল করে, তার মহড়া চলছে এখন। হাত দিয়ে দুধ-ভাত টেনে টেনে নিজের মুখে তোলার ভঙ্গি থেকে মনে হয় যে মস্ত একটা

কালো আরশোলা শুঁড় দিয়ে খাবার টেনে নিচ্ছে। কানা রহমতউল্লা এক চোখে যা দেখে সমস্ত সানকিটা দৃষ্টির নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে তাই যথেষ্ট। এখান থেকে তার কানা চোখটা দেখা যায়। মনে হয় খাওয়ার সুখে চোখটা বুঁজে এসেছে। আর কনিষ্ঠ আহমদউল্লা দুই হাতে ভাত খাচ্ছে, তার নাকের প্রবাহিত সিকনি মিশে খাওয়ায় তার লোকমাগুলোর তরলতা বাড়ে। তার সমস্যা তার দুই বছর বয়সসুলভ মন্থরতা। একেকবারে দুটো হাত মুখে তোলে তো অনেকক্ষণ নামাতে পারে না।

ওহিদুল্লার সর্বশরীর এখন কেবল পেটেরই সম্প্রসারণ। এই সব জানোয়ারের ওপর রাগে তার সর্বশরীর অর্থাৎ সমস্ত পেট জ্বলে ওঠে, ইচ্ছা করে সানকিটা কেড়ে নিয়ে দুধভাতসমেত চিবিয়ে চিচিয়ে খায়। কিন্তু জয়নাবের গমকে গমকে নিঃসারণ, তার মুখচোখ কপালের শিরা-উপশিরায় ভাঙাচোরার দৃশ্য কঠিন হয়ে তার মাথায় দারুণভাবে চেপে বসেছে। এ অবস্থায় সানকি কেড়ে নেওয়া কী করে সম্ভব? মা মাগী বমি করার আর সময় পায় না!

জয়নাবের বমির ভেতরকার বিরতির সময় আস্তে আস্তে বাড়ে। বমির জন্যে মুখের, গলার, পেটের, এমন কি মাথার মাংসপেশী, হাড়হাড্ডি, রগ, শিরা-উপশিরার যথেচ্ছ ও প্রচণ্ড ব্যবহারের ফলে জয়নাব খুব ক্লান্ত হয়ে মাথা এলিয়ে শুয়ে রয়েছে। বমি বোধহয় শেষ হয়ে এলো। তাকে দেখে মনে হয় তার ভার অনেক কমে এসেছে, সে বোধহয় নিজের শরীরকে অনুভব করতে পারে, তার মুখের অভিব্যক্তি এখন আর তার ইচ্ছানিরপেক্ষ নয়। খুব ক্ষীণকণ্ঠে সে বিড় বিড় করে, 'বুবু, পোলাপানরে তুমি কী খাওয়াইলা?'

হামিদা বিবি মাথা নিচু করে থাকে। হাত দুটো তার নিজের কোলের ওপর আলগোছে রাখা। ঐ অবস্থায় আস্তে আস্তে বলে, 'কী করি? পোলাপানেরে খালি দুধভাত খাওয়াইতে চাস। কী করি? চাইলের গুড়ি জ্বাল দিয়া দিলাম!' বলতে বলতে তার গলা চড়ে এবং সরাসরি জয়নাবের দিকে তাকায়, 'ক্যান বৌ? চাইলের গুড়ি পোলাপানের কুনোদিন খাওয়াস নাই? দুধ দিছস কয়দিন? দুধের স্বাদ তর পোলাপানে জানে কি?' ঘুম কিম্বা তন্দ্রা কিম্বা আচ্ছন্নতার মধ্যে থেকে উঠে আসার জন্যে খাটতে খাটতে জয়নাব বিড়বিড় করে, 'কালা গাইটারে ধইরা আনলে, কালা গাইটারে ধইরা আনলে—। হামিদা বিবি তার কথা শেষ করতে দেয় না, তার গলা আরো চড়ে, 'গাই না তুই বেইচা দিছস বৌ! হারুন মিরধার দোকান থাইকা চাইল লইছিলি, মিরধায় আইয়া গাই লইয়া গেলো, খালি গোরুর প্যাচাল পাড়স!'

কিন্তু আধমন চালের দাম শোধ না করা পর্যন্ত গোরু পাওয়া যাবে না—হারুন মৃধার এই শর্তটিও কি জয়নাব তার বমির সঙ্গে উগরে ফেললো? বেড়ার দিকে তাকিয়ে সে হঠাৎ ফিক করে হাসে, বলে, 'আপনে কী যে কন?' জায়ের দিকে চোখ ফিরিয়ে বলে, 'ওহিদুল্লার বাপের কথা হুনছেন? হ্যায় কয়, গোরু বিদায় করছো? গোরু আমার আরেক বিবি?—হায়রে কথা হুইন্যা আমি বলে হাইস্যা মরি! কন সে, ঘরের মইদ্যে চিকার গাত, চিকায় বলে গোরুর ব্যাক কয়টা ওলান খাইয়া

হালাইলো! অ ওহিদুল্লা!' -প্রলাপ বকতে বকতে জয়নাব ক্লান্ত হয়, আর কথা একবার চড়ায় ওঠে তো পর পরই খাদে নেমে আসে। তার বোধহয় গরম লাগছে, শরীর থেকে কাঁথা সরে গেছে, গায়ের কাপড় শিথিল। চোখজোড়া ঢুলঢুলু। ঠোঁটের কোণে, চিবুকের ডৌলে বমির পানির লালচে ফোঁটা, নীলচে ফোঁটা। এরি মধ্যে ওহিদুল্লার দিকে ডান হাতের তর্জনী তুলে ইঙ্গিত করলে সে এক পা এগিয়ে আসে। কিন্তু মায়ের প্রলাপ ক্রমেই দুর্বোধ্য হয়ে আসছে। জয়নাবের উকুনভরা লালচে চুল মাথার চারদিকে ছড়ানো, ঘরে হাওয়া নাই বাতাস নাই, তবু সেগুলো একটু একটু কাঁপে। ওহিদুল্লার বুক ছমছম করে, মা বোধহয় তাকে চিনতে পাচ্ছে না। মায়ের ভয়ে একবার 'মা' বলে চিৎকার করার জন্য ওহিদুল্লা শক্তি সঞ্চয় করছে, এমন সময় জয়নাব হুঙ্কার ছাড়ে 'বুইড়া মরদটা! কী দেহস? গোরু লইয়া যায়, খাড়াইয়া খাড়াইয়া কী দেহস!'—জয়নাবের শ্যাওলা-পড়া চোখজোড়া দেখতে দেখতে বড়ো হয়ে গেলো, মনে হয় ঘরের স্যাঁতসেঁতে শূন্যতার হঠাৎ ভেসে-ওঠা কোনো দৃশ্য প্রাণভরে দেখবে বলে চোখজোড়া সম্পূর্ণ ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। ওহিদুল্লার গলা থেকে ফিসফিস আওয়াজ বেরোয়, 'যাই মা।' কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে জয়নাবের মাথা বালিশের পাশে ঢলে পড়ে এবং প্রথমে হামিদা বিবি এবং ক্রমান্বয়ে হাজেরা, খাদিজা, কানা রহমতউল্লা, এমন কি আহমদউল্লার এলোমেলো চিৎকার ও বিলাপের বৃষ্টিভেজা বেড়া নিয়ে খড়ের চালের হুমড়ি খেয়ে পড়ার দশা হয়। ওহিদুল্লার পায়ের পাতা বাইরে বেরিয়ে যাবার জন্য শিরশির করে। এতো বমির পর নির্ভার মায়ের মুখের যে কঠিন চেহারা হয়েছে তাতে তার হুকুম তালিম না করে ওহিদুল্লার কি রেহাই আছে?

পায়ের নিচে জল

গুড়ের চা, তবে নতুনরকম স্বাদ একটা পাওয়া যায়। কিন্তু মাথার ওপর লোক দাঁড়িয়ে থাকলে কি রয়ে সয়ে চা খাওয়া চলে? দোকানের পাটখড়ির বেড়া, খড়ের চাল, বাঁশের খুঁটি সব সরানো হয়েছে, এখন এদের চা খাওয়া শেষ হলেই বেঞ্চিটা নিয়ে যেতে পারে। সকালবেলার লালচে রোদে, পাতলা মেঘে, ভিজে ভিজে বাতাসে, যমুনার ছলাৎ ছলাৎ স্বরে শরীরটাকে তারিয়ে তারিয়ে অনুভব করা যাচ্ছিলো। কিন্তু লোকজন বড়ো ব্যস্ত। এই ব্যস্ততা দিয়ে এরা পানির ধার ঠেকাবে? যার মৌন তাগাদায় চায়ের পেয়ালা শেষ করে উঠে দাঁড়াতে হলো তার সঙ্গে সঙ্গী কলাগাছটার পার্থক্য কী? চালাটা ভেঙে ফেলায় দোকানের পেছনে ব্যবহৃত-চা-পাতার ভাঙা-চোরা স্তূপ, জলকাদা, শ্যাওলা ও ছাইগাদার পাশে দাঁড়ানো কলাগাছের উরুটুরু সব একেবারে উদাম হয়ে গেলো; তো লোকটার এই হাঁটু পর্যন্ত ছিদ্রসর্বস্ব লুঙ্গি থাকলে কী, না থাকলেই কী? তবে এদের কালোকিষ্টি গতরে পানির বলো হিমের বলো, তাপের বলো, ভাপের বলো—ঠোকাঠুকি যা হয় তা ঐ হাড্ডি কটার সঙ্গেই। কিন্তু এখন এদের উত্তেজনা, এতো ব্যস্ততার মানে কী?—মানে জানে আলতাফ মৌলবি, 'কামকাজ নাই তো, আজ বেলা ওঠার আগেই কাম পাছে, তাই এতো ফুর্তি, বুঝলা না?'

আতিক বুঝলো। ঢাকা ইউনিভার্সিটির সোসিওলজির ভালো ছাত্র, কৃষকের কর্মসংস্থানের ওপর কোনোদিন পেপার লিখতে হতে পারে; বোঝবার জন্য সে সর্বদাই উদগ্রীব।—৩.০০ কাঁচে ভারাক্রান্ত চোখজোড়া মেলে সে কেবল মানুষের কর্মতৎপরতা দেখে। যেদিকেই তাকাও মানুষ গিজগিজ করে। এই যে চায়ের দোকানের খুঁটি উপড়ে দিচ্ছে যে লোকটি এবং যে লোকটি কাঁধে করে সেই বাঁশ নিয়ে যাচ্ছে বাঁধের দিকে—এরা কিন্তু দুজন লোক। কারো কাঁধে মুড়ির টিন কি গুড়ের জালা; আবার আটার বস্তা নিয়ে রওয়ানা হয়েছে অন্য কোনো লোক। বস্তার ফুটো দিয়ে আটা গড়িয়ে পড়ে হাড় রঙের মাটিতে আঁকাবাঁকা সাদা রেখা গড়িয়ে গেছে; হাতের তেলোয় এক আধ চিমটি আটা তুলে নেওয়ার একনিষ্ঠ সাধনায় মগ্ন লোকটি মনে হয় কোনো কাজই পায় নি যদিও বেঞ্চিকাঁধে লোকটির সঙ্গে তার

চেহারার মিল দেখে দুজনকে একই লোক বলে ভুল হতে পারে। সবার ব্যস্ত গতিবিধি এবং অবিরাম চ্যাচামেচি এখানে একই সঙ্গে একটি মেলা ও মেলা-ভাঙার বিশ্রাম তৈরি করে। কিন্তু বাজার ভাঙা তো আর নিত্যকার উৎসব হতে পারে না। এই বাজারের আয়ু আর কতোক্ষণ? আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত যমুনা কি জিভ সামলে রাখতে পারবে? যমুনাবিবির আগামীকালের মধ্যাহ্নভোজন যদি এই ভাঙা বাজার দিয়েই সম্পন্ন হয় তবে পরশুদিন এদের করার থাকবে কী? সে প্রশ্নের জবাবও আলতাফ মৌলবি ঠিকই দিতে পারবে। কিন্তু তাকে জিগ্যেস করার আগেই ওরা ওয়াপদার বাঁধে উঠে এলো।

বাঁধের পুবদিকে চাষের জমি, মাঝে মাঝে কলাগাছ ও ভেরেন্ডাগাছ ঘেরা ছোটো ছোটো বাড়ি। এখানে ওখানে খাবলা খাবলা করে ফসলকাটা পাটখেত। ধানের খেতে কাটা ধানগাছের গোড়া। জমিতে জমিতে তাড়াহুড়া করে কাজ করার চিহ্ন। কিছুদূরে গিয়ে খাড়া পাড় থেকে জমি লাফিয়ে পড়েছে যমুনা নদীতে। নদীর একেবারে ধার ঘেঁষে ঘন পাটখেত। এখান থেকে যমুনাকে অনেকটা দেখা যায়। নদীর ওপরে মথুরাপাড়ার চর। এই চরও উঁচু থেকে ডাইভ দিয়ে নেমেছে নিচের বালুচরে, তারপর ঢালু হয়ে নিঃশব্দে গড়িয়ে পড়েছে যমুনার পানিতে। ওপারে মথুরাপাড়া ঘেঁষে নদীর গা একেবারেই এলিয়ে দেওয়া, কিন্তু এদিকে আসতে আসতে যমুনা তার কোঁকড়া কোঁকড়া ঢেউ ঝাঁকিয়ে নিজের সীমানাকে অস্বীকার করে।

এতো হলো যমুনা, বাঁধের পূর্বদিকে। আর বাঁধের ওপর সারি সারি চালাঘর তোলা হচ্ছে। পাটখড়ির দুটো বেড়া তাঁবুর মতো খাড়া করিয়ে নিয়ে তার ভেতর মানুষ, মেয়েমানুষ, শিশু, হাঁড়ি, মাদুর, ন্যাকড়া, মাটির সানকি ও কলসি। একটি বেড়ার গায়ে বিড়ির সচিত্র লেবেল সাঁটা। এইসব ঘরের বাইরে গোরুবাছুরের সঙ্গে কিলবিল করে মানুষ। আলতাফ মৌলবি নিচু স্বরে বলে, 'এতোগুলো মানুষ বান্দের উপরে উঠছে, এই বান্দ থাকবো?'

আলতাফ মৌলবিকে প্রায় সবাই চেনে। কেউ 'সালামালকি' বললে সে মাথা ঝাঁকায়। কাউকে কাউকে জিগ্যেস করে, 'তর ভিটাও খাইছে?' একটুও অপেক্ষা না করে সে এগিয়ে চলে । পেছনে পেছনে জবাব শোনা যায়, 'কাল হামাগোরে মাঝিরা ছয় আনাই খাছে।' কিংবা 'উদিনক্যা শঙ্করপুর ধরছে, উত্তরপাড়ার জলিল মণ্ডলের ভিটা বাকি আছিলো, আজ বুঝি খালোই নাকি গো!' কিংবা 'দরগাতলার আলা ফকিরের গোইল, বাথান খাইয়া নদী এহন দম নিবা নাগছে।' কিংবা 'না গো, কামারটুলি ফকিরপাড়া বাদ দিয়া দরগাতলার ব্যামাক চরই বুঝি এই ফিরা থাকলো গো। নদীত মনে হয় টান পড়ছে।' এদের কথা শোনার জন্যে আতিক গতি একটু কমিয়ে দিলেই আলতাফ মৌলবি অনেকদূর এগিয়ে যায়। মৌলবির পেছনে ছুটতে ছুটতে আতিক শোনে, বাঁশের খুঁটি পুঁততে পুঁততে কে একজন রসিকতা করে, 'আর খাবো না গো। নদী এহন জিরাবা নাগছে! বেশি খালে পরে নদীর হাগা ধরবো না?' নদীর উদরাময়ের সম্ভাবনায় সবাই খুব হাসে। সবার মুখে

মুখে এই রসিকতা প্রচারিত হতে থাকে। এক জায়গায় পেটিকোট-ব্লাউজ-পরা ২৪/২৫ বছরের একটি মেয়ে যমুনার ভাঙনে সলিলসমাধিপ্রাপ্ত তার ছেলের ৭ বছরের জীবনের নানা কাহিনী ইনিয়ে বিনিয়ে জানায়। এইসব হাস্যকৌতুক তাকে স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু ওদের স্বভাব আলতাফ মৌলবির ভালোভাবে জানা. সে বিড়বিড় করে, 'শালার বেন্যার বিটির আবার ছোলপোল! আজ ময়নাপাখি ময়নাপাখি কর‍্যা কান্দিবা নাগছে, কালই ফির কার ঘরোত যায়া নিকা বসবো তার দিশা পাবো না।' বেন্যা পুরুষদের ওপর ক্ষোভ তার আরো বেশি, 'ইগলান কি মানুষের পয়দা? এই যে বান্দের উপরে দাপাদাপি ঝাঁপাঝাঁপি বান্দ একবার ভাঙলে এক ঘড়ির মধ্যে থানা হাসপাতাল ইস্কুল ব্যামাক পয়মাল হয়া যাবো না?' অতিককে ভালো করে বোঝাবার জন্য সে গতি একটু কমায়, 'গওরমেন্ট ডেভেলপমেন্টের জন্যে এতো টাকা ঢালবা নাগছে, ব্যামাক এ্যারা সান্দাবো নদীর প্যাটের মধ্যে।—অর্থের অপচয়! অর্থের অপচয়!' রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমকে সমীহ করার জন্য আলতাফ মৌলবি শক্ত শক্ত কথা ব্যবহার করে।

এবার এই বটগাছ থেকে ছাপরার যে সারি শুরু হলো তা আর শেষ হতে চায় না। বাঁধের যতোদূর দেখা যায় দুইদিকে সাজানো শনের চাল ও ময়লা পাটখড়ির বেড়া। এই ঘরগুলো মনে হয় পুরনো। বটগাছের নিচে পুরুষমানুষের জটলা। দেখে কোনো দৃশ্য বা ঘটনা আশা করা যায়। ভিড়ের বেশিরভাগই বাঁধের ওপর, বাকিটা বাঁধ থেকে গড়ায় পশ্চিমের জমিতে। বটগাছেরও তাই—অর্ধেকটা বাঁধের ওপর, বাকিটা মাটির ওপর ঝুলছে। গাছের শেকড়ে পা ঝুলিয়ে বসে রয়েছে অন্তত ১০ জন। আলতাফ মৌলবিকে দেখে তাদের মধ্যে বেশ সাড়া পড়ে যায়। যারা বসেছিলো তাদের প্রায় সবাই উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে-থাকা লোকেরা এগিয়ে আসে।

কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত লুঙ্গির একটি টুকরা জড়ানো এবং ব্লাউজ পরা, থুতনিতে কয়েকটি মাত্র দাড়িওলা একটি লোক সামনে এসে বলে, 'আপনের গজারিয়ার পাট জাগ দেওয়া শুরু করছেন?'

'গজারিয়া?' আলতাফ মৌলবি একটু চিন্তা করলো, 'দুই একের মদ্যেই দেওয়া নাগবো।'

ব্লাউজ-পরা দাড়িওয়ালা লোকটির চোখ ও ঠোঁট কাঁপে, বলে, 'আমাক না কিষ্যাণ নেওয়ার কথা কছিলেন হুজুর।'

আলতাফ মৌলবির চাপ দাড়ির ভেতর থেকে হাসির রশ্মি উদিত হয়, 'তোমাক কই নাই, কছিলাম তোমার ব্যাটাক। তুমি বাপু বুড়া মানুষ হয়া বিটিছোলের পিরান গাওত দিছো, তোমাক দিয়া কাম হবো?'

এই কথায় সবাই হাসে, মাত্রা ছাড়িয়ে হাসে এবং তাতে কাজ হয়: আলতাফ মৌলবি খুশি হয়ে চাপা ঠোঁটজোড়ায় ঢেউ তুলে রাখে। ব্লাউজ-পরা দাড়িওয়ালা তখন তোতলায়, 'উদিনক্যা গোলাবাড়ির হাটোত থ্যাকা কিনল্যাম বাপু। একটা ট্যাকা নিলো। হামরা বাপু অতো বুঝি?'

'চেংটুর দুই ব্যাটা আর এক ভাতিজাক বছর-কিষাণ রাখছি, গজারিয়ার পাটের তয়তদবির করবো তারাই।' আলতাফ মৌলবি তার কথার জবাব দিচ্ছে এতোক্ষণে, 'তোমাগোরে বাপু ঠিকমতোন পাওয়া যায় না। গাওত ব্লাউজ দিছো, নাচের বায়না নিয়া কোটে যাবা কেডা জানে?' এবার এদের হাসি তেমন জমে না।

অন্য একজন বলে, 'চাচামিয়া, দেলুয়াবাড়ির আউশ কাটেন না?'

'আর কয়টা দিন যাক। আল্লা বাঁচায়া রাখলে শুক্কুরবার দিন কাটা হবো।'

'আমাক একটা সোম্বাদ দিয়েন।'

'দেখি।' আলতাফ মৌলবির এই জবাব শোনবার সঙ্গে সঙ্গে ১০/১২ জন তাকে ছেঁকে ধরে। এই ১০/১২-র বৃত্তের বাইরে আরো ১০/১২ জন। ২০/২৫ জনের প্রধান আকর্ষণরূপে আলতাফ মৌলবি তার সাদা রঙের ময়লা পাঞ্জাবি, সবুজ-হলুদ ডোরাকাটা লুঙি, অল্প কারুকাজ-করা কিস্তি টুপি এবং মেহেদি-লাগানো ইটরঙের দাড়ির সাজসজ্জায় নিজের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করার একটি সুযোগ পায়। বটগাছের ওদিকে নতুন চালের সারির দিকে সে তর্জনী দিয়ে দেখায়, 'অরা না হয় নদী ভাঙা মানুষ, তোরা?' তার বিড়বিড় নালিশ এখন পরিণত হয় স্পষ্ট অভিযোগে, 'তিনটা বছর আগে বান্দের উপরে উঠলি, তগো নামাবো ক্যাডা? এই বান্দ ভাঙলে নোকসান কার? নদীর মাথাও ঘুরান দেওয়া লাগবো না, এ্যাল্লাখানি হাত-পাও মোচড়ালেই ভাঙা বান্দ দিয়া পানি ঢুক্যা পশ্চিমমুড়ার তামাম গাঁও তলায়া দিবো না? থানা হাসপাতাল ইস্কুল কিছু থাকবো?' কিন্তু এই সব আতঙ্ক তাদের স্পর্শ করতে পারে কি-না সন্দেহ। তার আক্ষেপ ও উদ্বেগ শুনতে শুনতে তারা আলতাফ মৌলবির বিভিন্ন জমির শস্যের অবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্ট ছাড়ে। আলতাফ মৌলবির হাঁসখালির ডাঙা জমিতে একটা শেষ-নিড়ানি দেওয়া খুব জরুরি। তার দেলুয়াবাড়ির আউশের খেতে ধান কাটার সময় প্রায় যায় যায়। আয়েন শেখের বাড়ির পৈঠা পর্যন্ত পানি এসেছে, নৌকায় এ-বাড়ি ও-বাড়ি করার সময় তারা আলতাফ মৌলবির ধানখেতের শোভা দেখে, 'আহা কি সোন্দর লকলক করব্যা নাগছে গো!' আবার মরিচা গ্রামে নতুন বাতাসে ও পানিতে আলতাফ মৌলবির পাট বেড়ে উঠছে হু হু করে, দেখে তাদের চোখ জুড়িয়ে যায়। সপ্তাহখানেকের মধ্যে ঐ পাট কাটা চলবে, তা আলতাফ মৌলবি লোক নেবে না?

কিন্তু আলতাফ মৌলবির বছর-কিষাণই খাটে জনা সাতেক, আশে-পাশের খন্দ তারাই দেখবে। আর হাঁসখালির জমি নিয়ে তার মাথাব্যথা কম; সেই জমিতে এবার বাছপাটই বেশী। দেলুয়াবাড়িতে তার শ্বশুরবাড়ি, সেখানে জনমজুর খাটাবার দায়িত্ব তার সম্বন্ধী ল্যাংড়া সোনা কাজীর। আলতাফ মৌলবির মনোযোগ এখন বাঁধের নিরাপত্তার দিকে। সুতরাং দুই পক্ষ কেবল নিজেদের কথা বলতে বলতে এবং পরস্পরের কথায় কান না দিতে দিতে বাঁধের পশ্চিমে নামে।

বাঁধের পশ্চিমে নিসর্গ কিন্তু আলাদা। এপারে খুব পুরনো গ্রাম, এপারে তাই অন্যরকম। মানে যেমন হওয়া উচিত— ছবিতে ফিল্মে কবিতায় যেমন পাওয়া

যায়—শস্য-শ্যামল ছায়া-সুশীতল বাঙলার গ্রামখানি। মাতৃসম গ্রামবাঙলার এই অপরূপ রূপ দর্শনে চোখজোড়ার প্রত্যেকটি জুড়িয়ে যাওয়ার কথা; কিন্তু ২০/২৫-এর সেই দঙ্গল আর পিছু ছাড়ে না। প্রকৃতির রূপ তেতো করার জন্যে এই সংখ্যাটি যথেষ্ট। আলতাফ মৌলবি শেষপর্যন্ত কষে ধমক লাগায়, 'আল্লায় তগো এক ছটাক বুদ্ধি দেয় নাই, জাহেল কর‍্যা রাখছে। কও তো জাহেলে জানোয়ারে তফাৎ কী? কও সে!' নিজেই এই জটিল প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্যে সে একটু দাঁড়ায়, 'না, জাহেলের পাও দুইখানা কম, সেদিক দিয়াও তরা কমই আছস। তিনটা বছর তরা বান্দের উপরে বসত করস, আরে, বান্দ ভাঙলে গওরমেন্টের কি রে? যমুনা যদি একটা ছোবল মারে তো থানা এটি থাকবো? সোনাতলাত তুল্যা নিয়া যাবো না?'

একজন দুজন করে সবাই সরে পড়লেও আলতাফ মৌলবির রাগ আর কমে না। একি ২/১ মাসের ব্যাপার? বাঁধের ওপর এরা নিয়মিত বসবাস শুরু করেছে সে ৩ বছরের বেশি ছাড়া কম নয়। তখন কি হলো?—আরে তখন নদীর ভাঙন নাই, বন্যা নাই, গোর্কি নাই—আকালের সময় কোনদিক থেকে কী হলো আশপাশের গ্রাম উজাড় করে মানুষ এসে বাঁধের ওপর মাইলকে মাইল জায়গা ভরে ফেললো। আলতাফ মৌলবির হাঁসখালির জমিতে বর্গা করতো এক শালা চাষা, ঝরু পরামাণিক। আলতাফ মৌলবিকে একটা কথা জিগ্যেস পর্যন্ত না করে নিমকহারামটা তার সর্বমোট সোয়া বিঘা জমি বেচে উঠে এলো বাঁধের ওপর। কোথায় হাঁসখালির পানধোয়া বিলের পাশে আলতাফ মৌলবির ডাঙা জমির ধার ঘেঁষে ছিলো তার গোপালভোগ আমের গাছ ও খাজাকাঁঠাল গাছওয়ালা জমি, ভালোভাবে চাষ করতে পারলে বছরে তিনটে ফসল; কোন ছোটলোকের কাছে সেসব বেচে শালা এখন বাঁধের স্থায়ী বাসিন্দা। পাটখড়ির তিন-কোণা খুপরির মধ্যে এখন বাপে ঝিয়ে মায়ে বেটায় দিনরাত গুয়েমুতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। 'আরে ইগলান কি মানুষ? তিনটা বছর হয়্যা গেলো বান্দের উপরে কি জুলুমটা করব্যা নাগছে কও সে!' আলতাফ আলীর একটানা কথা গরমে ঘামাচির মতো কুটকুট করে, ওয়াপদার বাঁধে মানুষের বেআইনি বসতি এবং এই নিয়ে আলতাফ মৌলবির বিরামহীন ঘ্যানঘ্যান করা—আতিকের কাছে দুটোই বিরক্তিকর। জুতো হাতে হাঁটু পানির ছোট্টো একটি সোঁতা পার হবার সময় আতিকের ভ্রূজোড়া কুঁচকে আসে, পানি বেশ গরম। গরম নীল আকাশ থেকে চুঁয়ে পড়ে শ্রাবণ মাসের রোদ; মাটিতে, আউশের খেতে জমে থাকা পানিতে আঠালো গরম। গোরুর গাড়ি চলার মতো চওড়া রাস্তার ধার ঘেঁষে বাঁশঝাড়, দড়ি বাঁধা ছাগল, বেগুনখেতের পেছনে জবুথবু হয়ে দাঁড়ানো খড়ের দোচালা। ফের বাঁশঝাড়, পার হলে একটা বাঁক। বাঁশঝাড় পেরিয়ে আলতাফ মৌলবি বলে, 'হুঁ আছে।' আরো দু'পা হেঁটে বাঁক পেরোলেই চোখে পড়ে গোরুর গাড়ির চাকার দাগ চিহ্নিত আধশুকনা কাদার পাশে ঘাসের চাপড়ায় দাঁড়িয়ে পাকা দাড়িওয়ালা একজন লোক রাস্তার ওপারে তাকিয়ে কার

উদ্দেশ্যে বকাবকি করছে। ওপারে জলমগ্ন জমি। জমির পর পাটখেতে পাট-কাটা চলছে। পাটখেত ঘেঁষে ৭/৮ বছরের একটি ছেলে লগি হাতে কলার ভেলা বাইছে। বুড়োর ভরাট কিন্তু দুর্বল স্বর কি বর্ষার পানি পেরিয়ে ভেলায় ঠেকবে?

ওরা আর একটু এগিয়ে গেলে বুড়ো জিগ্যেস করে, 'ক্যাটা গো?' তার খালি গায়ে গা জুড়ে ছড়ানো লোমরাজি, কালোর ওপর তামাটে সাদা, তার লুঙি থেকে টপটপ করে পানি পড়ছে, কাঁধে গামছা। লালচে, ঘোলাটে ও বিভ্রান্ত চোখ এদিক-ওদিক করে লোকটা ফের বলে, 'ক্যাটা?'

জবাব না দিয়ে আলতাফ মৌলবি তার কুশলে আগ্রহ প্রকাশ করে, 'সাকিদারের বেটা, ভালো আছো?' 'আল্লায় রাখছে বাবা।' বলে আলতাফ মৌলবির মুখমণ্ডলে সাকিদারপুত্র তার ঘোলা চোখের মণি বিঁধে দেওয়ার জন্য একাগ্রচিত্ত হয়। একটু পর তার চোখের রেটিনাসমূহ শিথিল হয়, খাঁ বাড়ির আলতাফ ভাই না? তাই তো কই! চোখেত ভালো দেখি না বাপু। দুই হাত আড়াই হাত তফাৎ থ্যাকা মানুষ চিনব্যার পারি না। কথা বলতে বলতে তার সৌজন্যবোধ জাগে, 'সালামালেকুম হুজুর, সাথে ক্যাটা?' দীর্ঘ সংলাপের পর তার চোখের রেটিনা ফের সঙ্কুচিত হয়।

'ভালো কর‍্যা চায়া দেখো।' আলতাফ মৌলবি রসিকতার ভঙ্গি করে। তারপর এক মুহূর্তে কণ্ঠের রস নিঙড়ে ফেলে সাদা গলায় বলে, 'করিম ভায়ের বেটা। বড়ো মিয়ার নাতি।'

চোখে ছাইরঙের পুরু ছানি পড়ায় তার আড়ালে তরল মণির কাঁপাকাঁপি বোঝা যায় না। মিনিটখানেক সে একটি কথাও বলে না, তার শরীরের অবস্থান যেমন ছিলো তেমনি থাকে। এমন কি তার শ্বাস প্রশ্বাসের স্পন্দন পর্যন্ত প্রায়-স্থগিত। কথা বলতে হয় আলতাফ মৌলবিকেই, 'ক্যাগো, টাসকা ম্যারা গেলা?' কিসমত সাকিদার বোবা চোখে তার দিকে তাকালে আলতাফ মৌলবি জিগ্যেস করে, 'খন্দ তো ভালোই, না?'

'আল্লায় দিলে ভালোই হজুর।' বলতে বলতে কিসমত সাকিদারের চমক ভাঙে, কিম্বা চমক ভেঙে সেই কথা বলে। হঠাৎ করে তার ডাকাডাকি শুরু হয়, 'আকালু, আকালু! ক্যারে আকালু! আসমত, আসমত! ক্যারে সোটকা, তোরা সব কোটে গেলু রে? আকালু।' এইসব হাঁকডাক আতিকের সর্বঅঙ্গে দমাদম ঘা দিতে শুরু করলে সে বিচলিত চোখে সামনের দিকে তাকায় ঃ পাটখেতে গরম পানির ওপর ঘামের গন্ধে ভারি চটচটে বাতাস। গরম হাওয়া এসে পাটখেতের সবুজ পাতা উসকে দেয়, ধোঁয়ার মধ্যে শিখার মতো পাটপাতা লকলক করে বাড়ে। কিসমত সাকিদারের এই ভাঙা গলার ডাকে তাদেরই জমির বর্গাচাষীর দল কি এসে পড়লো? চারদিকের পোকা-কিলবিল-করা পানি, বড়ো কোনো পোকার রোঁয়াওয়ালা ডানার মতো পাটপাতা, রাক্ষুসে শুঁয়োপোকার মতো আউশ ধানের শীষ এবং কালচে সবুজ, ঘোলা নীল ও ঈষদুষ্ণ কাদাকাদা মাটির মধ্যে নিজের

নিশ্চল ও স্থায়ী অবস্থানের সম্ভাবনায় আতিক শরীরের শিরা-উপশিরা আঁটোসাঁটো করে দাঁড়ালো।

'আকালু, ক্যারে আকালু, সায়েবের বেটা আসছে রে! পিঁড়া নিয়া আয়। তাঁই খাড়া হয়া থাকবো? বসব্যার দে। বিরিঞ্চি নিয়া আয়।'

কিসমত আলীর দীর্ঘ নির্দেশ শেষ হওয়ার আগেই আতিকের মাংসপেশী ও শিরাউপশিরার গেরোগুলো খুলে যায় এবং এই লোকটিকে ভয় পাওয়ার লজ্জায় সে কাচুমাচু হয়।

'সালামালেকুম চাচামিয়া।' সামনের জলমগ্ন মাঠের ওপার পাটখেত থেকে এসে পড়ে লম্বা ও রোগা একটি যুবক। পানিতে ভিজে ভিজে তার শরীরের রঙ জ্বলে গেছে, সে কালো না ফর্সা না শ্যামলা না নীল না সবুজ না হলুদ বোঝা মুশকিল। হাঁটুর ওপর তার একটি ভিজে গামছা, পায়ের আঙুলে আঙুলে পানির কামড়ের দাগ। 'সায়েবের বেটা না?' বলতে বলতে যুবক কলাপাতার পর্দার আড়ালে চলে যায় এবং এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসে। তার হাতে ছোট্টো একটা বেঞ্চ। বেঞ্চের পাগুলো সব বাঁশের, বসার জায়গাটা ভারি কাঠের। বেঞ্চটাকে সে কাঁধের গামছা দিয়ে ঝাড়লো অন্তত ৫ বার। আতিক ও আলতাফ মৌলবির মুখোমুখি মাটিতে বসলো কিসমত সাকিদার। বড়ো একটা জামগাছের নিচে বাঁশের মাচায় কোমর ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সেই রঙ-জ্বলা যুবক নিজের অনাবৃত বুকে গামছা দিয়ে হাওয়া করতে লাগলো।

উঁচু ও সাদা দাঁত বের করে সে হাসে. 'ভাইজানোক দেখ্যাই আমি চিনছি। ঠিক সায়েবের মুখখান পাইছে।'

'আগে দেখস নাই?' কিসমত সাকিদারের এই প্রশ্ন করার কোনো মানে হয় না; তার সঙ্গেও আতিকের এই প্রথম দেখা।

'না, আগে মনে হয় কুনোদিন আসে নাই।'

'আপনারা আসেনই না!' এই অনুযোগ করতে গিয়ে দ্বিতীয়বার কিসমতের চমক ভাঙে। 'পান খান বাবা' বলে ভেতরের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে চিৎকার করে, 'ক্যাগো, পান দিল্যা না?' তিন হাত দূরে ঘর, এতো চ্যাচাবার দরকার কী? 'আকালু, পান নিয়া আয়।'

যুবক উঠে গিয়ে মাটির থালায় পান, শুপারি, চুন ও তামাক-পাতা নিয়ে এলে কিসমত পান সাজতে শুরু করে। 'বাপদাদার ভিটা ভুল্যা গেলেন বাবা? আপনের বাপের হাতোপায়োত ধর্যা এই কয় বিঘা জমি আটকালাম। তো আপনের বাপ কলো, সাকিদার, বেচব্যার যখন তুমি দিল্যাই না তো দেখ্যাশোনা তোমাকই করা নাগবো।' কিসমত তামাক-পাতার অনেকটা ছিঁড়ে মুখে পোরে, একটু জড়ানো স্বরে আক্ষেপ করে, 'তাঁই তাও বছর দুই বছর অন্তর একআধবার আসছে, গাঁয়ের সাথে আপনেরা কুনো সম্পর্কই থুলেন না।'

গ্রামের ওপর আলতাফ মৌলবিও বড়ো অপ্রসন্ন, 'গাঁওত অ্যাসা লাভ কী? টাউনেত গেছে যারা, ব্যবসাপাতি কর্যা হোক চাকরিবাকরি কর্যা হোক, তারা সব

কতো কি কর‍্যা ফালালো, ছোলপোলেক মানুষ করলো। আমাগোরে কি হলো?' গ্রামের মানুষের ওপর সে আরো বিরক্ত, 'গাঁও গিরামত মানুষ থাকে না বাপু! জাহেল মানুষের সাথে বাস করার মুসিবত কি একটা?' নিজের কথার তাপে আলতাফ মৌলবি নিজেই তেতে ওঠে, 'তোমরা বাপু এই গাঁও গিরাম ব্যামাক ভাসায়া দেওয়ার বন্দোবস্ত করব্যা নাগছো, না কি?'

'জে?' আলতাফ মৌলবির অভিযোগের কারণ বা বিবরণ না শুনেই কিসমত অপরাধে একেবারে নুয়ে পড়ে, মাথা পেতে শাস্তি নেওয়ার জন্য সে প্রস্তুত। 'বোঝো না?' রাগে ও উৎসাহে আলতাফ মৌলবি সোজা হয়ে বসে, 'বান্দের উপরে জুলুম দ্যাখো না? তিনটা বছর হয়া গেলো শয়ে শয়ে ঘর-বাড়ি কর‍্যা বাস্তু গ্যাড়া বসছে। আর বছর ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার না ওয়ার্নিং দিয়া গেলো মানুষ না নামলে বাঁধ থাকবো না! কয়দিন হলো আবার নদী-ভাঙা মানুষ আসা ধরছে। ঠ্যালা সামলাও!'

'নদী-ভাঙা মানুষের কথা কি আর কই বাবা?' আলতাফ মৌলবির এক কথাতেই কিসমত তার অজ্ঞাত অপরাধ মেনে নিয়েছিলো, কিন্তু অভিযোগের স্পষ্ট বিবরণ শোনবার পর সে কিছুমাত্র বিচলিত হয় না, 'আমরাও তো বাপু নদী-খাওয়া মানুষ। বাপু, যমুনা হলো বড়ো গাঙ, ব্রহ্মপুত্রের পরিবার। ময় মুরুব্বি কইছে, যমুনার সাত স্রোত, ঊনপঞ্চাশ তরঙ্গ—তো তার খোরাক লাগে না? বাপদাদার আমলে দুইচার বিঘা যা পাছিলাম তাও তার খোরাকেতেই গেছে। এখন আপনাগোরে জমিত খাটি, ছোলপোলগুল্যান খাটে, আল্লা কুনোমতে দিন চালায়া নেয়।'

এইখানেই তো মুশকিল, আতিক এই ভয়টাই করছে। আলতাফ আলী রাতে সব বলেছে। এইসব লোকজন দিনদিন বড়ো আনরিজনেবল হয়ে উঠছে। কিসমত সাকিদারের জোয়ান জোয়ান সব ছেলে। মুক্তিযুদ্ধে খতম হয়েছে একটা, আর একটা ধান কাটতে গেছে পশ্চিমে খিয়ার এলাকায়। দুটো আছে বাপের সঙ্গে। এদের একটি বাতে পঙ্গু। শেষ সন্তান আকালু বাপের সঙ্গে আতিকদের জমি চাষ করে। এই জমি থেকে ওদের উচ্ছেদ করা একটু কঠিন বৈ কি! এই ঝুঁকি কভার করার জন্যে আলতাফ মৌলবি দামও কিছু কম দিতে চায়। মৌলবির দ্বিতীয় শর্ত হলো এই যে আতিককে নিজে গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করতে হবে। জমি বেচে তো ওরা খালাস, জীবনে কি আর এমুখো হবে? সব সামলাতে হবে এই আলতাফ আলী খানকেই। গত কয়েক বছরে গ্রামে মেলা রক্ত বয়ে গেছে, ভদ্রলোকদের মান-ইজ্জত সব ধুয়ে মুছে সাফ।

কথাটা পাড়বে কী করে? আতিক কি আর করে, ওপরের দিকে তাকায়। খড়ের চালে চালকুমড়া, জামগাছ ভরা কালোজাম। নিচে খুঁটিতে বাঁধা গোরু অল্প পানিতে দাঁড়িয়ে ছপছপ করে ঘাস খাচ্ছে। এখন সে কি করে জমি বেচার কথা তোলে? তবে কথা বলার পালা এখন কিসমত সাকিদারের।

'তোমরা বাপু আসোই না। তোমার বাপ এই খুলিত বস্যা কতো গল্প কর‍্যা গেছে। যখন হাই ইশকুলেত পড়ছে বর্ষার সময় ঐ ওটি বস্যা বড়শি দিয়া মাছ

ধরছে, আমার বাজান চার বানায়া দিছে।' কথার ভারে সে নুয়ে পড়ে, তুমি-আপনির ভেদ লোপ পায়, শ্লেষ্মা ও আবেগে কিসমতের গলার ঘর্ঘর ধ্বনি আরো ঘন হয়। 'এটি বস্যা মাছ ধরছে, আমার মায়ের কাছ থ্যাকা পানি চা নিয়া খাছে। তার কুনো দেমাগ আছিলো না, গরিব মানুষকে তাই হেলা করে নাই। টাউনেত বাড়ি করার পর বাড়িতে অ্যাসা কতো দরবার, কতো গল্প, কতো হাসি ঠাট্টা। ভাইজান একখান মাটির মানুষ আছিলো।'

শুনতে শুনতে আতিকের মুখে ও কপালে পাতলা ভাপের পরত জমে, বাপের স্মৃতি তার মাথা থেকে চুলের মতো বেরিয়ে চোখমুখ সব ঢেকে ফেলবার উপক্রম করে।

'ভাইয়ের নাহান মানুষ হয় না গো! ফসল তুললে বেচ্যা ট্যাকা পাঠায়া দিছি, ফসল নিবার চায় নাই, জোর কর‍্যা সাথে একবার গম দিছিলাম, কল্যাম, ভাইজান আপনের কি, মটোরেত যাবো, গাড়িত যাবো, আপনাক কি উব্যান লাগবো? দুই বছর অন্তর অ্যাসা কয়, এই খুলিত বস্যা, এই এটি,' আতিকের বাবার আসল অবস্থান ঠিক কোথায় ছিলো অবিকল তাই দেখাবার জন্যে কিসমত উঠে সরে বসে, 'না গো এটি, এবিন কর‍্যা পুব মুখ হয়া বস্যা কয়, সাকিদার, তুমি কি গম দিছিলা গো, আটা হছে ময়দার নাহান, ধলা ফকফকা। তোমার ভাবী ঠাওরাবার পারে না আটা না ময়দা। ছোলপোল রুটি খায়া কি খুশি।' আলতাফ মৌলবির দিকে জিজ্ঞসার ঢঙে বলে, 'কন তো বাপু, নিজের ভিউয়ের গম, তা আটার রুটি স্বাদ হবো না? কন তো বাপু স্বাদ হবো না?' বিরতি দিলেও তার ফাঁক করে রাখা মুখের ভেতর হলদেটে সাদা জিভের অনেকটা দেখা যায়, তার নিজের জিভে সে কি আতিকের বাবা ও আতিকের বাবার ছেলেমেয়েদের রুটি খাওয়ার স্বাদ অনুভব করার চেষ্টা করছে? নিজেদের জমির গম হলে কি রুটির স্বাদ বাড়ে? আব্বা কি কখনো বলেছিলো? আম্মা কি জানতো? কৈ, কবে?

জিভে অন্যলোকের রুটি খাওয়ার স্বাদ চাখার খাটনিতে কিসমত আলী হাঁপায়। একটু নিচু স্বরে বলে, 'বানে খরায় খন্দ মাইর গেলে কাকো দিয়া এখখান পোস্টকাড ল্যাখায়া দিছি, সায়েব, এবার বানে ধান খাছে, কি খরা হছে, খন্দের সোমাচার ভালো নয়, সায়েব কুনোদিন তদন্ত করব্যার আসে নাই।'

তদন্ত করার লোক তো ছিলোই, আতিকদের কিছু জমি তো আলতাফ আলীও দেখে, সুতরাং কিসমত আলী এদিক-ওদিক কিছু করলে আলতাফ মৌলবি কি আর খবর পাঠাতো না? এই জমিটা বর্গা নেওয়ার ইচ্ছাও তার অনেকদিনের। এই জমির সঙ্গে লাগোয়া বিঘা পাঁচেক জমি আছে তার, এটা নিতে পারলে এক দাগে অনেকটা জমি হয়। এই নিয়ে আলতাফ মৌলবি ঢাকায় গিয়ে আতিকের মায়ের কাছে তদবির করেছে। আব্বা রাজি হয় নি, 'চাষাটা তবু টাকা পয়সা যা হোক কিছু পাঠাচ্ছে, আলতাফকে দিলে প্রথম কয়েক বছর খুব রেগুলার দেবে, এমন কি বেশিও পাঠাতে পারে, তারপর তোমার জমির আর কোনো ট্রেস করা যাবে না।

ওকে যেগুলো বর্গা করতে দিয়েছি তাও হজম করে ফেলবে।' আব্বা লোক চিনতো। যাকে বিশ্বাস করলে রিটার্ন আসে তার ওপর আব্বার আস্থা ছিলো অপরিসীম। এই বুদ্ধি না থাকলে সিভিল সাপ্লাইয়ের চাকরি ছেড়ে এক হাতে এতো বড়ো ইন্ডেন্টিং বিজনেসের ফার্ম করতে পারে? তবু মনে হচ্ছে কিসমতকে আব্বা একটু বেশি পাত্তা দিতো! আব্বাকে যে রকম র‍্যানডম কোট করছে তাতে মনে হয় আব্বার সঙ্গে লোকটার বিশেষ রকম একটা সম্পর্ক ছিলো। কিসমতের অবিরাম স্বরপ্রবাহে তার বাবা যেভাবে আসছে মনে হয় পাতলা একটি পর্দার ঠিক ওপারেই তার অবস্থান। আব্বা বোধহয় এক্ষুনি উঠে এসে এই বেঞ্চে বা ঐ মাচায় বসে পড়বে। মনে হচ্ছে এখানে আর কেউ নাই, এমন কি আতিকও অনুপস্থিত, সে বড়োজোর বসে থাকতে পারে এই জামগাছের একটি মগডালে। নিচে বসে খেলো হুঁকায় তামাক টানতে টানতে গল্প করছে তার বাবা। আতিক জাম খেতে খেতে কিসমতের সঙ্গে আব্বার গল্প করা শোনে। দুজনের কথকতা একটুও বিঘ্নিত হয় না, আতিকের জামের বিচি হাওয়ায় উড়ে যায়। ছানির পুরু পর্দা ছিঁড়ে কিসমত আলীর তরল মণি টলটল করে। এই ছানি-ঢাকা চোখ, জলে-খাওয়া পুরু আঙুল, পাতলা নোনা-ধরা চুল—না, এসব থেকে আতিক হাতপা ঝেড়ে উঠতে পাচ্ছে না। অথচ জমি বিক্রি না করলেই নয়। আতিকের যখন এরকম একটা সঙ্কট চলছে, লোকটা বললো, 'চাষাভুষার বাড়িতে আসছো, একটা আবদার রাখা নাগবো।' আবদার বলতে কি বোঝানো হচ্ছে অনুমান করার আগেই সে আতিকের হাত ধরে, 'ভাত খায়া যাওয়া নাগবো বাবা।'

এইবার সুযোগ। হাত পা ঝেড়ে আতিক এবার মুক্ত হতে পারে। 'না না, আজ না।' মিনতিতে লোকটি বাঁকা হয়ে যায়, 'না বাবা আজই। বেলা গেছে কোটে!' বলে সে আঙুল দিয়ে সূর্য দেখায়, 'দেবডাঙা যাবা, এক কোশ দূরের ঘাটা, যাতে যাতে প্যাট খোলের মধ্যে সান্দাবো। বাড়িত যায়া না হয় চাচীর হাতোত পোলোয়া কোর্মা খাবাহিনি। হামার এটি এ্যানা শুদা ভাত খায়া যাও।'

'ভাইজান,' মেয়েলি বিনয়ে আকালু নত হয়, 'গরিব মানুষের বাড়িত আসছেন, উপস্থিত মতো যা আছে তাই দিয়া খায়া যান। গরিব মানুষকে হেলা করেন না। থালিবাসন যা আছে ম্যাঞ্জা ঘষ্যা দিমু।'

এরপর না করা মুশকিল, তবু আতিক উঠে দাঁড়ায়, 'না, আজ না, আজ একটু তাড়া আছে।' কিসমতকে এবার সোজাসুজি বলার প্রস্তুতি নেয়, 'আপনার সঙ্গে একটু কাজ ছিলো—'। মাঝপথে আলতাফ মৌলবি তাকে থামিয়ে দিলো। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে কিসমতকে সে বলে, 'ঠিক আছে, সাকিদারের জেয়াফত কবুল না করলে চলে? তোমরা খাবার জোগাড় করো। আমি বান্দের গোড়াত করিম ভায়ের হাটিকুমরুলের জমিটার একটু খবর নেই।'

হাতে একটা পলো নিয়ে বেরিয়ে যায় আকালু, আতিকের দিকে সে মিষ্টি করে একটু হাসে। আলতাফ মৌলবি এরপর আতিককে আড়ালে ডাকে, 'তুমি বসো,

গল্পগুজব করো, আমি এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টার মধ্যে আসতিছি। জমি বেচার কথা কিছু কয়ো না, আমি আসলে কথাবার্তা হবো।'

জমি বিক্রির কথা বলা আতিকের পক্ষে এখন অসম্ভব। বড়োভাই মেজোভাই কি যে একটা কাজের ভার দিয়ে এখানে পাঠালো! আর এই আলতাফ মৌলবির ওপর নির্ভর না করে উপায় কী? এই লোকটার গার্জেনি আর কতোক্ষণ সহ্য করা যায়? মেজোভায়ের কথা সব কাঁটায় কাঁটায় মিলে যাচ্ছে। ১৯৬৪ সালে মেজোভাই একবার এখানে এসেছিলো, আতিক তখন স্কুলের ছাত্র। ১৯৭১-এ সবাইকে নিয়ে এখানে পালিয়ে আসার কথা ভেবেছিলো। তুখোড় বাম যুবনেতা বলে বড়োভাইকে তখন পালাতে হলো কলকাতা। তার শোকে আম্মা একেবারে ভেঙে পড়লে আর কোথাও যাওয়ার কথা চিন্তাও করা যায় নি। তো একবারের অভিজ্ঞতা থেকেই মেজোভাই কি চমৎকার ব্রিফ করলো, 'গ্রামের সলভ্যান্ট আর এডুকেটেড হাফ-এডুকেটেডদের সঙ্গে ডিল করা সবচেয়ে টাফ। আনফরচুনেটলি অল অফ আওয়ার রিলেটিভ্‌স্ বিলং টু দিস সেকশন এ্যান্ড দে ফর্ম দি রুলিং এলিট। একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে।' আলতাফ মৌলবির কাছে সব জমি বিক্রির সিদ্ধান্ত অবশ্য বড়োভায়ের। জমি কিনে সঙ্গে সঙ্গে ক্যাশ ছাড়তে পারবে এই মোল্লা বেটাই। তার এক ছেলে ডিস্ট্রিক্ট ফুড অফিসের ক্লার্ক, আব্বার রেকমেন্ডেশনে চাকরি হয়েছিলো, আর এক ছেলে রিসেন্টলি মিড্‌ল ইস্ট গেছে। তবে—এই তবেটাই তো আতিকের মাথাব্যথা 'টু হ্যান্ডল উইথ কেয়ার।' ট্যাক্‌টফুল হতে হবে। মুশিকল! কিন্তু টাকারও খুব দরকার। ধানমণ্ডির বাড়ি তিনতলা করতে হবে, টাকা চাই। গুলশানের প্লট আর কতোকাল ফেলে রাখবে—টাকা চাই। মেজোভাই ইকনমিকস পড়ার জন্যে হার্ভার্ডে এ্যাডমিশন পেলেও স্কলারশিপের নিশ্চয়তা নাই, টাকা চাই। এখন টাকা সংগ্রহের এই তেতো কাজটা করতে হবে আতিককে। গুলশানের প্লটে কনস্ট্রাকশন শুরু করার জন্যে বড়োভাই হন্যে হয়ে উঠেছে। কোন গভর্নমেন্ট কি পলিসি নেয় এই দেশে কে বলতে পারে? শহরে জায়গা খালি রাখা রিস্কি। দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না বলে বড়োভায়ের আক্ষেপের সীমা নাই। গুলশানে বাড়ি করে সমাজতান্ত্রিক কোনো দেশের এমব্যাসিকে ভাড়া দিলে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে একটা লিঙ্ক থাকে, মাসে বিশ পঁচিশ হাজার টাকাও আসে।—আতিকের অস্বস্তি, লজ্জা ও সংকোচ গড়ায় বিরক্তিতে ঃ বড়োভাই মেজোভাই তাকে দিব্যি এই ঝামেলার মধ্যে ফেলে আরামসে টাকার জন্যে অপেক্ষা করছে। 'গ্রাম দেখে আয়, নিজেদের রুট না জানলে তোর কিসের সোসিওলজি পড়া?'—এসব শুনে সে-ও কিনা বোকার মতো একা একা রওয়ানা হলো। আব্বা বেঁচে থাকলে তাকে একা আসতে দেয়? গ্রামের সম্পত্তির ব্যাপারে যা করার আব্বা একা একাই করেছে, তাদের কারো গায়ে এতোটুকু আঁচ লাগাতে দেয়নি। নিজের গ্রাম, গ্রামের আত্মীয়-স্বজন কি লোকজন নিয়ে আব্বার বোধহয় কোনো দুর্বলতা ছিলো, তার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের জড়াতে চায়নি। গ্রামের আত্মীয়-স্বজন নিয়ে

মেজোভায়ের ঠাট্টা-ইয়ার্কিতে আতিক এখন অস্বস্তি বোধ করছে। তারা সবগুলো ভাইবোন আসলে এই ব্যাপারে প্রশ্রয় পেয়েছে আম্মার কাছে। শহরে নিম-শহরে বড়ো হওয়ায় আম্মা গ্রামের শ্বশুরবাড়ি নিয়ে বিশ্রী সব রসিকতা করতো। আম্মার গ্রাম্যতা তাদের ভাইবোনদের মধ্যে নেই, কিন্তু মেজোভায়ের কথায় ধার বড্ডো বেশি। এই কিসমত লোকটিকে বাগে পেলে মেজোভাই যে কি নাস্তানাবুদ করতো ভেবে আতিক একটু অপরাধ বোধ করে। কিসমতকে সে কাছে ডাকে, 'আপনি এখানে বসেন না।' তার আগের জায়গাতেই ছড়িয়ে বসতে বসতে কিসমত বলে, 'তোমরা কয়ো ভাই মাঘ মাসোত একবার আসো, চরের মদ্যে খুব পাখি বসে, শিকার করব্যার পারবা।'

'আব্বা বোধহয় এখানে এসে শিকার করতেন, না?'

'শীতের সময় তাঁই বন্দুক ছাড়া কুনোদিন আসে নাই!'

আলতাফ মৌলবির অনুপস্থিতিতে বাপের স্মৃতিতে আতিক ইচ্ছামতো স্যাঁতসেঁতে হতে পারে।

'শেষবার আব্বা যখন আসে, স্বাধীনতার আগের বছর, তখনো বন্দুক নিয়ে এসেছিলেন। হুঁ, আমার মনে আছে। শিকারে সেবার আপনি সঙ্গে ছিলেন?'

এই প্রশ্নে কিসমত মনে হয় আহত হলো। তাকে ছাড়া করিম সায়েব শিকারে বেরুবে, করিম সায়েবের ছেলে এই কথা ভাবতে পারলো? তার চোখ, পাকা ভুরু, চাপা নাক, যমুনার হাওয়ায়-ফাটা পুরু ঠোঁট ও দাড়িওয়ালা গাল ও চিবুক রেখা-উপরেখায় আঁকাবাঁকা হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ সে চুপ করে থাকে। তারপর সামলে নিয়ে বেদনা বা স্নেহে বা বেদনাময় স্নেহে একটু হাসে। সে তার আগের প্রসঙ্গই অব্যাহত রাখে।

'তোমরা বাপু তার কী দেখছো? তার হাতের যা নিশানা! আমি বাপু মেলা শিকারী দেখছি, তোমার বাপের নাহান কাকো দেখি নাই। কী কমু, পাখি না উড়লে তাঁই গুলি করে নাই।'

'মানে?'

'বুঝলা না? আগে হাতোত তালি দিয়া বসা-পাখি উড়ায়া দিছে, তারপরে বন্দুকের টোটা ফুটাছে।' আতিকের প্রশ্নের জবাব দেয় সে এতোক্ষণে, 'আমাক না নিয়া তাঁই কুনোদিন শিকারত যায় নাই। মানষে হিংসা করছে, এই চাষার সাথে আপনের এতো খাতির কিসের?'

'আলতাফ মৌলবি কী কম জ্বালাছে?' বাপের পাশে বসতে বসতে আকালু বলে। তার গায়ে টাটকা মাছের আঁশটে গন্ধ।

'থো, উগল্যান কথা থো।'

'ন্যায্য কথা কতে দোষ কি? এই জমি নেওয়ার জন্যে ফন্দি কি তাঁই কম করছে? ঢাকাত যায়া সায়েবেক ফুসলাছে! কি? না, তার কাছে বর্গা দেওয়া নাগবো। খালি জমির তালে থাকে। আকালের বছর গাঁয়ের ছয় আনি জমি তো

তাঁই নিলো। কিসের ট্যাকা, কিসের দাম, কয় মন ধান দিয়া কয়, চল রেজিস্টি অফিসত চল। কতো দলিল কর‍্যা নিছে তার বলে হিসাব কিতাব নাই। মানষেক ভিটা ছাড়া করছে, মানষে এখন বান্দের উপরে ঘর তুললে তার গোয়া কামড়ায়।'

'থো বাপু, উগল্যান প্যাচাল থো। চ্যাংড়ার সাথে তার বাপের গপ্পো করি এ্যানা।' সায়েবের সঙ্গে শিকার করার ঘটনা সে সায়েবের ছেলেকে দেখিয়ে ছাড়বে। 'শোনো, একবার মাঝিরার চর পার হয়া জাহাজের খাটাল ধর‍্যা নাও নিয়া গেলাম কচুয়ার চর। অনেক দূর বাপু, ময়মনিসং জেলা, জামালপুর মহকুমা, থানা মাদারগঞ্জ। বেলা তখন আর এক ঘড়ি আছে—' কিন্তু আকালুর জন্যে গল্প এগোতে পারে না, তার কথা সে বলবেই, 'ঝরু পরামানিকের ভিটা মৌলবি কিনবার পারলো না, ঝরু ভিটা বেচলো হাফিজদ্দি সরকারের বেটার কাছে। কিসক? না, নগদ কিছু পাইলে পরে ঝরু পরিবার-পরিকল্পনা অফিসে ট্যাকা দিবার পারে তো তার বেটার একটা চাকরি হয়। আকালের টাইমে ধান কিন্যাই ঝরুর ট্যাকা পয়সা শ্যায, বেটার চাকরিও হলো না, আলতাফ মৌলবি খেপ্যা যায়া ঝরুক বর্গা দেওয়া বন্দ কর‍্যা দিলো। দেখেন তো বাপু জুলুম!'

'চুপ কর।' কিসমত এবার ছেলেকে জোরে ধমক দেয়, 'দেখ তো রান্দাবাড়ির কী হলো?'

রান্নার খবর নিতে আকালু ভেতরে গেলেও কথাবার্তা আর এগোয় না। আতিক একটু দমে যায়। শীতকালে তাদের অপরিচিত একজন লোকের সঙ্গে তার আব্বা নদীতে খালে ও চরে বন্দুক হাতে শিকার করে বেড়াচ্ছে, বন্দুকে ট্রিগার টেপার আগের মুহূর্তে হাততালি দিয়ে পাখি উড়িয়ে দিচ্ছে—এই দৃশ্যে করোটি জুড়ে চমৎকার মাখনের প্রলেপ পড়ছিলো; এই মূর্খ চাষী যুবকের জন্য সব পণ্ড হবার জো হলো। কিসমতকে কি করে ফের উসকে তোলা যায় আতিক এই নিয়ে ভাবছে এমন সময় আলতাফ মৌলবির হাঁক শোনা যায়, 'ক্যাগো ভাত বাড়ো, বেলা গেলো।'

বেলে মাছের একটা তরকারি, তাতে চিকন করে কাটা বেগুন ও বেগুনের চেয়ে অনেক বেশি কাঁচা মরিচ। লাল আউশের ভাতের গন্ধে ছোটো ঘরটা আরো চেপে এসেছে। মাটির মেঝেতে পাতা বাঁশের চাটাই, তাতে পাশাপাশি বসেছে আলতাফ মৌলবি, আতিক আর কিসমত সাকিদার। ভাতের গন্ধে হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে পঙ্গু একটি লোক, এটা হলো কিসমতের বাতব্যাধিগ্রস্ত পুত্র আসমত। কাঁথার অজস্র ছিদ্র দিয়ে তার বাঁকা পা জোড়ার প্রায় সবটাই দেখা যায়। দেখে মনে হয় এগুলো সব সময় বাঁকা হয়েই রয়েছে। আবার পা দুটো তার কাঠির মতো সরু: সোজা হলেও দাঁড়ানো বা হাঁটার জন্যে সেগুলোর ওপর ভরসা করা যেতো না। আলতাফ মৌলবির নানা ধরনের জেরা ও মন্তব্যের জবাবে জানা গেলো যে, তার জলজ্যান্ত একটা বৌও আছে, কিন্তু বর্ষাকালে আসমত আলী মরিচা হাটের রাস্তায় বটতলায় ভিক্ষার থালা হাতে বসতে পারে না বলে বৌটাকে বাপের বাড়ি পাঠানো

হয়েছে। বর্ষা শেষ হলে পোয়াতি মেয়েকে নিয়ে বৌয়ের বাপ নিজেই চলে আসবে। এখন আসমত আলীর কাঁথার ভেতর থেকে হাল্কা আঁশটে ভ্যাপসা গন্ধ বেরিয়ে আসছে। আপাতত তার চেয়ে অনেক তীব্র হলো লাল আউশের ধোঁয়া ও ভাজা কলায়ের ডালের তীব্র সুবাস। দরজার আড়ালে ঘোমটায় মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে কিসমতের স্ত্রী, ঘোমটার ভেতর থেকেই চোখ দিয়ে সে ইসারা চালায় আর একজনের পাতের ভাত শেষ হতে না হতেই মাটির হাঁড়ি থেকে হাত দিয়ে ভাত তুলে দেয় আকালু। ঘরের দরজার ওপারে ছোটো উঠান। সেখানে উনানের পাশে বসে মাটির বাটিতে মাছের তরকারি তুলে দিচ্ছে আর একজন ঘোমটাধারিনী। এ বোধহয় কিসমতের বড়োছেলের বৌ। তার কোলে একটি শিশু, শিশুর মুখ দেখা যায় না। উঠানের এক কোণে কুয়া থেকে পানি তুলছে ৮/৯ বছরের একটি বালিকা। এইসব দেখতে ভালো লাগছে, কিন্তু আসমতের কাঁথার গন্ধ এবং আকালুর হাত দিয়ে ভাত তোলার ব্যাপারটা না থাকলে লাল আউশের সোঁদা গন্ধ, মাছের তীব্র ঝাল তরকারি ও মাসকলায়ের তীব্র সুবাস আব্বার স্মৃতির মতোই আপ্লুত করতে পারতো। তার পাতের দিকে তাকিয়ে আকালু বলে, 'আপনেরা কি এবা মোটা চাউলের ভাত খাবার পারেন?" কিন্তু কিসমত তাকে উৎসাহ দেয়, 'তোমাগোরে জমির আউশ বাবা। দেখোসে কি ঘেরান, কী মিষ্টি।'

'এই চাল বেচ্যাই তো আর বছর ট্যাকা পাঠালাম। বাজানোক কল্যাম কয়টা দিন পরে বেচেন, চাউলের দর আরো উঠবো।' আকালু একটু অভিযোগ করে, 'বাজান শোনে না, কয়, না বাপু, সায়েব নাই, দেরি হলে সায়েবের বেটারা আবার কি মনে করবো।'

'সাকিদারের বেটা,' আকালুকে হঠাৎ বাধা দেয় আলতাফ মৌলবি, 'আতিক আসছে জমি বেচব্যার।'

'কোন জমি?' ভাতের গ্রাস হাতে কিসমত একটু ধাক্কা খায়।

'ব্যামাক। করিম ভায়ের নামে যা আছে।'

আকালু জিগ্যেস করে, 'জমি বেচবেন?'

'হুঁ।' আলতাফ মৌলবি জবাব দেয়, 'ঢাকাত বাড়ি করতিছে, ট্যাকা নাজাই পড়ছে, জমি বেচবো।'

আকালু বাঁশের খুঁটির সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়।

কিসমত সাকিদার খাওয়া অব্যাহত রাখে। খেতে খেতেই আকালুকে ধমক দেয়, 'ক্যারে, দেখস না হুজুরে শুদা ভাত খায়। মাছ দ্যাস না?'

কারো পাতে মাছ আছে কি-না স্পষ্ট করে দেখার ক্ষমতা তার নাই, তবে সে কি সকলের পাত থেকে গন্ধ পায়?

আতিকের দিকে মুখ তুলে কিসমত বলে, 'বাবা খালি খালি কষ্ট দিলাম, খিল্যান দিল্যান কিছু করবার পাল্যাম না। মাছ নাই, ভাত খাবা কী দিয়া? মাছ পাওয়া যায় না, আমাগোরে এটি মাছের বংশ শ্যাষ।'

আকালু সোজা তাকায় আলতাফ মৌলবির দিকে, 'জমি বেচবো তো গাহক ক্যাটা? আপনে?'

'ধরছে, এখন কী করি?' আলতাফ মৌলবির গলায় পবিত্র ঔদাসীন্য, 'করিম ভায়ের বেটা, তাক তো না করব্যার পারি না। করিম ভাই যে আমার কি আছিলো তা তো আর কেউ কবার পারবো না। না হলে জমি-জমা নিয়া জড়াপল্টা আর ভাল্লাগে না।' তার ঔদাসীন্যকে ক্রমে বিরক্তিতে উঠতে দেখে আতিকের সরাসরি রাগ হয়, জমি কিনে আলতাফ মৌলবি কি তাদের উদ্ধার করবে? কিন্তু রাগ প্রকাশ করবে কি করে ঠিক বুঝতে পারে না। তার মৌন রাগে আলতাফ মৌলবির কী এসে যায়? তার বিরক্তি ফের নামে বৈরাগ্যে, 'গাহক থাকলে আমি আর নেই না। তোমরা ন্যাও তো কও, আমি তাইলে সর‍্যা পড়ি।'

এ কথার কোনো জবাব হয় না। আকালু তবু বলে, 'জমি তো আমাগো আছেই। আমাগোর জমি বান্দের উপরে। আমরা বান্দের জমিন্দার।' কিসমত কিছু বলে না। তার প্রতিক্রিয়া ভাববার জন্য আতিক মাথা নিচু করে কলাই-ওঠা টিনের দিকে তাকিয়ে থাকে, সেখানে কলায়ের ডাল মাখা কয়েকটি আউশের দানা। বুকের টিপটিপ ধ্বনি এবং ডাল-তরকারির ঝালে দুটো কানই জোড়া বলে কিসমতের দীর্ঘশ্বাস আতিকের কানে ঢোকে না। আকালু বলে, 'ক্যান, ঢাকাত না আপনাগোর বাড়ি আছে!"

জবাব দেওয়ার কথা আতিকের, কিন্তু আলতাফ মৌলবি এসেছে তাকে রক্ষা করতে, তাই আতিকের হয়ে সে বলে, 'বাড়ি আরো লাগবো না? ভাই তিনজন, দুইটা বাড়ি দিয়া কুলাবো?'

তাদের এতো বাড়ি থাকা সমীচীন নয়,—এই বিবেচনা খোঁচা দিলে আতিক বলে, 'না, মানে ঠিক তা নয়। মানে গুলশানে আব্বা একটা প্লট কিনেছিলেন। তখন প্লট এ্যালোট করা হচ্ছিলো, ডিআইটির চেয়ারম্যান ছিলেন মাদানী সাহেব, আব্বার পুরনো বন্ধু,—'এইসব কথা তার নিজের কানেই এলোমেলো ও অর্থহীন ঠেকলে আতিক চুপ করে ফের আলতাফ মৌলবির দিকেই তাকায়।

কিসমতের খাওয়া এখন প্রায় শেষ। ভাতের প্রতিটি দানা শেষ করার পর সে সশব্দে তার আঙুলগুলো চোষে। ঢকঢক করে পানি খেয়ে বলে, 'ঢাকাত না শুনছি তোমাগোরে বাড়ি খুব বড়ো, দুইতালা না তিনতলা শুনছি।'

একথার কী জবাব দেবে? ধানমণ্ডির বাড়ি না বাড়ালে বাড়িটা ইনকমপ্লিট রয়ে যায়। গুলশানের বাড়ি শেষ করলেই মাসে বিশ বাইশ হাজার টাকা আসে। ব্যবসার অবস্থা আব্বা মারা যাওয়ার পর থেকে মোটেই ভালো নয়। এসব কথা এদের বোঝায় কী করে? বড়োভাই এলে ঠেলাটা বুঝতো!

কাঁথার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে আসমতের খোঁচাখোঁচা দাড়িওয়ালা মুখ। আলতাফ মৌলবির দিকে তার পিঁচুটি ভরা চোখ রেখে সে মিনমিন করে, 'আপনে হুজুর আমাগোলে দিয়া আল বগগা কলাবেন না? আমাগোলে উথায়া

দিবেন গো?' ভাঙা ভাঙা গলায় এরকম আধো আধো বোল শুনতে অসহ্য ঠেকে। এটা তার রোগেই একটা লক্ষণ, এতে তার পেশারও কিছু উপকার হয়। হাটের রাস্তায় বটতলায় এই আধোবোলে ভিক্ষা চাইলে আতিক হয়তো এমন কি একটা সিকিও দিয়ে দিতে পারতো!

কিসমতের বড়োছেলের স্ত্রী উঠানে বসেছিলো একা। এখন তার পাশে কিসমতের স্ত্রী। ওরা কি ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে? কারো মুখ দেখা যায় না। নেভানো উনানের ওপর ডালের হাঁড়ি কাকের ঠোকরে ভোঁতা শব্দ করে। কাক তাড়িয়ে বড়োছেলের বৌ ঘরের পাশে দাঁড়ালো। ঘোমটা তার অনেকটা উঠে গেছে। এখান থেকে আতিক তার ডানদিকের প্রোফাইল দেখতে পাচ্ছে। মেয়েটার একটা চোখ কানা। ঘরের ভেতর দরজায় দাঁড়িয়ে আকালু কেবল আলতাফ মৌলবিকেই দেখছে। কাঁথার সবটা পায়ের নিচে ফেলে প্রায় দিগম্বর আসমত ফের কোঁকায়. 'অ হুজুল. আমাগোলে উথায়া দিবেন না গো!' কিসমত তাকে ধমক দেয়, 'চুপ কর।' আবার আকালুকেও ধমকের ভঙ্গিতেই পান আনতে বলে। কিন্তু সমস্ত ধমক ও নিষেধ সত্ত্বেও আসমতের সবিনয় বিলাপের আর বিরতি হয় না, 'আমাগোলে উথায়া দিবেন না হুজুল। আল্লায় আপনাল দেলের ইত্তা পুলন কলবো গো! একতা পয়তা দিলে আপনে সত্তল পয়তাল সওয়াব পাইবেন গো!' ঘরটিতে সে বটতলার গুমোট নিয়ে আসে এবং এই একটানা কোঁকানি উঠানে বসে-থাকা তার মায়ের ঘোমটায় ভেতর বাষ্প হয়ে মেঘের সৃষ্টি করে। তারে মায়ের ডান হাত এখন তার চোখের ওপর। এখানে বেড়ার আড়ালে দাঁড়ানো বড়োছেলের বৌয়ের ঘোমটা একেবারে খসে পড়েছে। তার গোটা মুখটা এখন স্পষ্ট দেখা যায়। ডান চোখটা তার কানা, সেই চোখের অব্যবহৃত আলো ও শক্তি কি তার বাঁ চোখে উপচে পড়ছে? সেই ঝকঝক-করা চোখের দিকে একবার তাকিয়ে আতিককে সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিতে হয়।

বাইরে এসে সবাই নিজের নিজের আসনে বসলে কিসমত বলে, 'বাবা, বাপদাদার গেরামের সাথে সম্পর্ক রাখবা না সাব্যস্ত করছো?'

'না. ঠিক তা নয়, ঐ কনস্ট্রাকশনটা শুরু করে একটু প্রবলেম হয়েছে—'

'ওটা কোনো কথা নয় বাবা, নিজেগো ভিটাতে আসো না, মায়া মোহাব্বত আশা করাই অন্যায়, না কী কও?'

আতিকের সমস্যা বোঝা এদের সাধ্যের বাইরে। বুদ্ধিমানের মতো আতিক তাই চুপ করে থাকে। বেশি কথা বলছে কেবল আকালু। এবার সে দাঁড়িয়েছে জামগাছের সঙ্গে হেলান দিয়ে। অবিরাম সে বিড়বিড় করে, 'কয় পুরুষ থ্যাকা এই জমির খেদমত করল্যাম। এই ভিটা ছাড়লে আমরা কৈ যাই? মৌলবি চাচামিয়া কি আমাগোরে এটি থ্যাকবার দিবো?' আলতাফ মৌলবি পানের পিক ফেলে, ঢোঁকও গিললো একটা, তার চোখে মুখে দাড়িতে পবিত্র বৈরাগ্য ফের ফিরে এসেছে। তার গলায় এখন ওয়াজের উদাত্ত স্বর, 'বাপু জমি কও জিরাত কও, রেজেক কও আহার

কও—সবই আল্লার হাতে। মানুষ ক্যাডা? কওসে মানুষের তৌফিক কয় পয়সা? মানুষ জানে কী? মানুষ করবো কী? আল্লায় কার জায়গা কোটে রাখছে আমি কবার পারি, না তুই পারস?'

'আমি পারি।' আকালু সামনে এগিয়ে আসে, 'আমাগোরে জায়গা রাখছে বান্দের উপরে।' আকালু কি রাগ করলো? তার ফাটা পুরু ঠোঁটের ওপর থেকে উঁচুউঁচু চকচকে দাঁত ভেতরে লুকিয়ে রাখার দিকে তার এখন মনোযোগ নাই।

বিদায় নেওয়ার সময় কিসমত আতিকের হাত ধরে বলে, 'বাবা, দোষত্রুটি হলো, কোদ্দ করেন না। খিলান দিলান তো কিছু করব্যার প্যারলামই না. খালি কষ্ট দিলাম। তোমাক দেখল্যাম, মনে হলো তোমার বাপের পাঁজরার কাছে বসা ভাত খায়া উঠলাম।'

বেগুন খেতে ঢুকে আলতাফ মৌলবি নিবিষ্টচিত্তে নতুন বেগুনের ফলন পরীক্ষা করে, কিসমত আতিকের হাত ছাড়ে না, তবে তার স্বর এখন খুব নিচু। প্রায় ফিসফিস করে সে বলে, 'খুব জোস্না উঠলে রাত দুই ঘড়ির সময় তোমার বাপ মাচার উপরে বস্যা খালি ঝিমায়। মনে হয় কতপা রাত ভাইজান নিন্দ পাড়ে নাই! আমি কিছু করবার সাহস পাই না। কথা কলেই তাঁই মিলায়া যায়, ধলা ফকফকা।'

এই ঘোরতর বিকালে আতিকের সারা গা ছমছম করে ওঠে। শীতের বেলা, দেখতে দেখতে কোথায় চলে যাবে! জ্যোৎস্না উঠতে আর কতোক্ষণ? এক্ষুনি রওয়ানা হওয়া দরকার।

আবার সেই বাঁধ: বাঁধে সারবাঁধা নতুন ও পুরনো চালাঘর। আবার সেইসব কালোকিষ্টি মানুষ, আবার অপরিচিত আঁশটে গন্ধ। নিচে চরের ওপারে নদীর ভেতর থেকে মেঘ ডেকে উঠলো। আলতাফ মৌলবি বলে, 'আতিক, শুনছো, নদী দৌড়ায়!' তার মানে এই বাঁধে আরো লোক আসছে। এরপর উঠে আসছে কিসমত আর আকালু আর কিসমতের বৌ আর কিসমতের বড়োছেলে আর বড়োছলের বৌ আর কিসমতের নাতি আর কিসমতের পঙ্গু ছেলে আসমত আর—। এদের ধ্যাবড়া পায়ের কাণ্ডজ্ঞানহীন চলাচলে বাঁধের ফাটলে চিড় ধরবে, চিড় পরিণত হবে মস্ত মস্ত হাঁ-তে। যমুনার কোলোকাঁখে এরা মানুষ, যমুনার হাভাতেপনা কি এরা দেখেও দেখে না? আর এদের পেছনে মস্ত বড়ো একটি ছবির নিগেটিভ, হাল্কা তামাটে রঙ জ্যোৎস্নায় বাঁশের মাচানে বসে ঘুমঘুম চোখে ঝিমায় ওর বাবা। আব্বাও কি এসে পড়বে? আলতাফ মৌলবি বলে, 'তুমি না আসলে কিসমতের বেটা কাইজা করতো। বেন্যার বাচ্চা শালা বড়ো নটখট্যা ছ্যারা। তুমি অ্যাসা খুব ভালো করছো বাপু, এখন শালারা আর কিছু অছিলা পাবো না।' কিন্তু আলতাফ মৌলবির সন্তুষ্ট চেহারা দেখার জন্য কে দাঁড়াবে? বাঁধ কখন ফাটে বিশ্বাস আছে? বর্ষাকালের ভিজে মাটি মানুষের পদভারে ফাঁক হতে কতোক্ষণ? তারপর সপ্তস্রোতে উনপঞ্চাশ তরঙ্গ তুলে যমুনা গ্রাস করতে আসছে এইসব গ্রাম, ধানী জমি, পাটখেত, স্কুলের পাকা দালান, নতুন সার্কল অফিস, সাবরেজিস্ট্রি অফিস, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র,

ইউনিয়ন কাউন্সিলের টিনের ঘর, সবুজ ও লাল পতাকা শোভিত লাল রঙের থানা। তাড়াতাড়ি কেটে পড়ো।—আতিক খুব লম্বা লম্বা পা ফেলছে।

'কদমে বাদাম খাটায়া নিছো বাবা?' আতিকের কানে স্বর পৌছাবার জন্য আলতাফ মৌলবিকে পেছন থেকে চেচাতে হয়, 'ও আতিক, আস্তে চলো বাবা।'

কে শোনে কার কথা? আতিকের সুটকেসটা আছে দেবডাঙায় আলতাফ মৌলবির বাড়িতে। সুটকেসটা নিয়ে দৌড়ে গিয়ে উঠতে হবে দেবডাঙা বাজার। ৬টার বাস ধরতে পারলে সাড়ে ৮ টার মধ্যে সোনাতলা স্টেশন। রাত্রি ৮ টা ৫০-এ ঢাকার ট্রেন।

দখল

দিন বিশেক যেতে না যেতে সকলের মাখো-মাখো ভাবটা জুড়িয়ে আসে। ২৩ বছর আগে-মরা বড়ো ভাইয়ের কথা মনে করে চাচাদের সব দফায় দফায় দেওয়াল বা ছাদ—যখন যেটা সামনে পড়ে, এমন কি বারান্দার নিচে উঠানে মানকচুর ঝাড় বা উত্তরদিকে ভাঙা দালানের সাদা ও খায়েরি স্তূপ কি হাড়-কাঁটা নিয়ে কামড়াকামড়ি—করা ৪/৫ টা ধুমসি ও নেড়ি কুত্তা—এই সবের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে অধিক-শোকে-পাথর গোছের শোক প্রকাশ করা, বড়োচাচীআম্মার 'বাবা', 'বাবু', 'আর একটু খাও বাবা,' 'দুধ না খেলে জোয়ান মানুষের শরীর টেকে?'—এ সবের প্রত্যেকটিতেই তলানি পড়ে।

পৈতৃক সম্পত্তির কথাটা না তুললেই ভালো হতো। বাবা যখন ব্যক্তি-মালিকানার বিরুদ্ধেই ছিলো এবং পৈতৃক সম্পত্তির কথা তোলার আগেই যখন তার মৃত্যু হয়েছে, তখন বাবার বাবার কাছে সে কি করে সেখানে ভাগ বসাবার চেষ্টা করে? শরিয়তে এ রকম বিধান নাই। বাবা বেঁচে থাকতে ছেলের মৃত্যু হলে মৃত পুত্রের ছেলেমেয়ে কিছুই পায় না। ইকবাল তবু নতুন নিয়মকানুন জেনে শুনেই এসেছিলো, তবু হলো না। এইসব নিয়ম হয়েছে আয়ুব খানের সময়ে, তার বাপ মারা গেছে এর বহু আগে। মোয়াজ্জেম কাজী তাকে কীভাবে সাহায্য করে? কিন্তু বড়ো ছেলের জন্য গদগদ ভাব তার কাটে না। ইকবালের বাপ তার প্রথম যৌবনের প্রেম ও সঙ্গমের ফল; কী হৃদয়ে কী শরীরে—সেই তীব্রতা আর কোনোদিন অনুভব করা যায়নি। বড়ো ছেলের কথা বলতে বলতে মোয়াজ্জেম হোসেনের গোসল করতে বেলা বয়ে যায়, খাওয়া দাওয়া শেষ হতে না হতে আসরের আজান পড়ে। বাড়িতেই মসজিদ: বাড়িতে মসজিদ থাকলে সেখানে নামাজ পড়া ফরজ, তাই খাওয়ার পর পরই মসজিদে গিয়ে প্রথম কাতারে দাঁড়াতে হয়। একটু গড়ানো আর হয়ে ওঠে না। বড়োছেলের কথা বলতে বলতে রাত হয়, তার জন্য দুধরুটি ভিজিয়ে বসে থাকে গেন্দুর মা, লম্বা টেবিলের পাশে ইকবালের ভাত আগলে অপেক্ষা করে ছোটোচাচীআম্মা। এশার নামাজ পড়ে সবার বিছানায় শুতে শুতে আদ্যিকালের দেওয়াল ঘড়িতে রাত ১২টার ঘণ্টা বাজে।

মগরের ও এশার নামাজ মোয়াজ্জেম হোসেন আজকাল অবশ্য ঘরেই পড়ে। দিনকাল খুব খারাপ। বাড়ির সঙ্গে চিথুলিয়ার বিলের ওপরে যতো গ্রাম, সে কাঁঠালপোঁতা বলো আর শিববাটি বলো আর কাঁটাহার বলো—সবখানে আজকাল গোলমাল। আরে, মাসখানেক আগে এই গ্রামের দক্ষিণপাড়ার কলুদের একটা ছোঁড়া তেলের ভাঁড়ে পিস্তল নিয়ে ধানজমির ওপর দিয়ে যাবার সময় সরকারী দলের ছেলেদের হাতে ধরা পড়ে। দলের ছেলেরা আর কতো সামলাবে, তাই থানায় খবর দিতে হয়েছে। এইসব ঝামেলা। রাত্রে তাই আল্লার নাম তাকে ঘরেই নিতে হয়। আল্লা সব জানে, মোয়াজ্জেম হোসেনের এই অনিচ্ছাকৃত অপারগতাও তার জ্ঞাতব্যের মধ্যেই পড়ে, সুতরাং এই নিয়ে সে মন খারাপ করে না। নামাজের পরও জায়নামাজে বসে বড়োছেলেকে নিয়ে দাপাদাপি করা তার অব্যাহত থাকে। বড়োছেলের জন্মের পর থেকে দেশে গোলমাল। ঠিক তা নয়, গোলমাল শুরু হয় আরো কয়েক বছর আগে, গোলমালের মধ্যে তার জন্ম। তখন ব্রিটিশ আমল। যাই বলো না সায়েবদের আমলে অফিসারদের কেরানিদের ঘুষ খাওয়া আর কাজে ফাঁকি আর কারণে-অকারণে জমির ওপর ট্যাক্স বসানো ছিলো না। ভেজাল কি জিনিস তাদের আমলে কেউ জানতো না। তা সুখে থাকলে ভূতে কিলায় বাপু—এত সুখ সহ্য হবে কেন? দেশের মানুষ সায়েব তাড়াবার জন্যে হন্যে হয়ে উঠলো। এই যে তাদের গণ্ডগ্রাম চণ্ডিহার, থানা হেডকোয়ার্টার থেকে হেঁটে আসতে সময় লাগে পাক্কা একটি ঘন্টা, সেখানেও কি-না আগুন জ্বলে উঠলো। না, সত্যি সত্যি আগুন। মাইলখানেক উত্তরে নুনগোলার হাট, সেখানে কি স্বদেশীওয়ালারা কম কাপড় পুড়িয়েছে? সেই সময় তার বড়ো ছেলের জন্ম। মোয়াজ্জেম সেদিন হাট থেকে ফিরছে, মস্ত বড়ো হাট, নানান জায়গার মানুষ আসে। হাটে কি লোকজন কেবল কেনাবেচা করতেই আসে?—কতো লোকের সঙ্গে দ্যাখা-সাক্ষাৎ হয়, ইকবালের দিকে তাকিয়ে মোয়াজ্জেম হোসেন হাসে, তখন জোয়ান বয়েস, হাটে একটু আমোদও হতো বৈ কি!—না, ইকবালের দাদী কিছু মনে করতো না, সেও ফুলতলার বড়ো ঘরের মেয়ে;—তো সেদিন আমোদ আহ্লাদে কিছু হয়নি, হাটের পশ্চিম দিকে মতিলাল আগরওয়ালার কাপড়ের গুদামে স্বদেশীরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে; বিলাতি কাপড়ের স্তূপে লেলিহান শিখা দেখে মোয়াজ্জেম হোসেনের জানটা খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলো, আর দেখো রাজ্যের শালার চাষাভুষা সেই আগুনে হাত পা সেকে নিচ্ছিলো। বাড়ির আরো কয়েকজন চাকরবাকর নিয়ে সেই সব কথাবার্তা বলতে বলতে বাড়ি ফিরছে, এই তো পোয়াটাক মাইল দূরে আমির সরকারের জমির কাছে শিমুলগাছ—সে গাছ কি আর আছে?—তার নিচে থাকতেই শোনে বাড়ি থেকে আজান দেওয়া হচ্ছে। ব্যাপার কী? এরকম মিষ্টি গলায় এত রাত্রে আজান দেয় কে? শীতকালের রাত, এশার ওক্ত হয়েছে কখন! মোয়াজ্জেম হোসেনের খটকা লাগে। দেখে বাড়ির দিক থেকে ছুটতে ছুটতে আসছে মন্তাজ ঠসা। লোকটা তার বাপের আমল থেকে বাড়িতে বছরকামলা খাটতো, তখনি তার

বয়েস ৫০ এর ওপর, কানে কম শোনে বলে নামের সঙ্গে ঐ উপাধি অর্জন করেছে। তার কথা মনে করেও মোয়াজ্জেম হোসেন একটু একটু হাসে, 'বুঝলা আমার বাপজান যতোই ডাকুক, ও মন্তাজ, গোরুর প্যাট ওঠে না ক্যা? গোরুক জাবনা দিস নাই?—না, মন্তাজ কানেই শোনে না। আবার যদি আস্তে করে ডাকো, ও মন্তাজ ভাত খাবু? তো সাথে সাথে হাজির!'—এসব অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে ইকবালের আগ্রহ নাই। কিন্তু মোয়াজ্জেম কাজী তার নাতির কাছে ছেলের জন্মের সময়কার ঘটনা খুঁড়ে খুঁড়ে পানি বের করে ছাড়বে, তার যৌবনকালের এতটুকু ছায়াও যদি দেখা যায়! আর ইকবাল আজ থেকে ৪৮ বছর আগেকার একটি ঘটনাকে দেখার লোভে মোয়াজ্জেম হোসেনের প্রত্যেকটি শব্দকে ছবিতে গড়িয়ে নিয়ে পরে রাখে চোখের মণিতে। মন্তাজ ঠসাকে বাদ দিলে তার কিছু এসে যায় না। তবে তার কাছ থেকে পুত্রের জন্মের খবর পেয়ে মোয়াজ্জেম হোসেনের কাছে আজানের কারণ স্পষ্ট হয়। হলে কী হবে, মোয়াজ্জেমের চোখ থেকে আগরওয়ালার কাপড়ের স্তূপের আগুন আর নেভে না। এই পোয়াটাক মাইল রাস্তা সে একরকম দৌড়েই গেছে। কিন্তু বারবার চোখে জ্বলে হাটের গুদামের আগুনের শিখা আর তারই পাশে শোনে নবজাতকের ওঁয়া ওঁয়া কান্নার আওয়াজ। 'বুঝলা,' মোয়াজ্জেম হোসেন কাহিনীর মাঝখানে মন্তব্য কিম্বা বিশ্লেষণ করে, 'মানুষ হৈ চৈ করে রাশি নিয়ে। আমি মানি না। আসমানের চাঁদ তারা যদি মানুষের জীবন কন্ট্রোল করে তো সব মানুষের রাশি তো একটাই হতো। ঠিক কি-না? আমি রাশি মানি না, আল্লার কেতাব মতে এইগুলি সব শেরেকি গুনা; আল্লার আকাশ, তারা আল্লার ওপর কেরামতি করবে? আমি বলি, জন্মের সময় মানুষের চারদিকের ঘটনা তার কাজকর্ম ঠিক করে দেয়, তার নসিব ঠিক করে।' কীভাবে?—মোয়াজ্জেম হোসেন বিষয়টিকে ঠিক বোঝাতে পারে না, কিন্তু তার অস্পষ্ট বক্তব্যের পক্ষে উদাহরণ দেয়, যেমন, আগরওয়ালার ঘরে আগুন এবং জিনের কণ্ঠে আজানের ধ্বনি—জিনও তো আগুনের তৈরি, মোবারক হোসেনের জীবনকে কি দাপটে কন্ট্রোল করলো, দেখলে না?

ইকবাল খুব অবাক হয়, 'জিনের আজান?'

'বললাম না, শিমুল গাছের নিচে থাকতেই শুনি, বাড়ি থেকেই আজান দেওয়া হচ্ছে!'

'তো আপনাদের বাড়ি থেকেই আজান দিয়েছে। নতুন ছেলের জন্ম হয়েছে শুনে আপনাদের মসজিদ থেকে আজান দিয়েছে।'

'এই বাড়ি তো তোমারও ভাই, খালি আপনাদের বাড়ি আপনাদের বাড়ি বলো কেন?'

বলতে বলতেই ছোট্টো ক্ষোভটিকে ঝেড়ে ফেলে মোয়াজ্জেম হোসেন বলে, 'আমরা বাড়িতে পৌঁছবার পর বাপজান কয়, মোয়াজ্জেম দেখো তো, মোয়াজ্জেম আজ কিসের হালুয়া খেয়ে আজান দিলো? মনে হয় হযরত বেলালের পড়া-পানি

মুখে পড়েছে, গলা এমন মিষ্টি হলো কী করে?—না, মোয়াজ্জেন কোথায়? মোয়াজ্জেন তো পরশুদিন ছুটি নিয়ে গেছে তার গ্রামে, নোয়াখালী জেলার ফেনী সাবডিভিশনে তার বাড়ি। আর ইমাম সাহেব এশার নামাজ পড়ানো শেষ করে চলে গেছে দক্ষিণপাড়ায় ওয়াজ করতে। আশেপাশে কোনো মানুষ নাই। তাহলে আজান দিলো কে? তাইতো বলি, হাটের আগুন, জিনের আগুন—দুইই তার ওপর আসর করেছিলো। না হলে দেখো না'—রাত বাড়ে, পশ্চিম সীমানায় দেওয়াল ভেঙে পড়ায় দেওয়ালের সঙ্গে লাগোয়া গোয়ালঘর থেকে গোরুর পা ঝাঁকানো ও লাজ নাড়ানোর আওয়াজ আসে। ভাঙা দেওয়াল ও এই ঘরের মাঝামাঝি লম্বা কনকচাঁপা গাছের পাতার শিশির-পড়া এবং লম্বাটে চাঁপাগাছের পাতা থেকে শিশিরবিন্দুর ফের নিচের কোনো পাতায় গড়িয়ে-পড়া কিম্বা সেই এককোষবিশিষ্ট শিশিরের মাটিতে শোষিত হওয়ার তৎপরতাও শোনা যায়। পাশের ঘরে ঘুমের মধ্যে কাশে ছোটোচাচার ৭ বছরের মেয়ে, ঘুম-জড়ানো গলায় চাচী একমাত্র সন্তানের চিকিৎসার প্রতি স্বামীর উদাসিনতার নিন্দা করে। কয়েক পা হাঁটলেই রংপুর-বগুড়া হাইওয়ে। গোবিন্দগঞ্জে যাবার গোরুর গাড়ির ক্যাঁচ-ক্যাঁচ আওয়াজ আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়। হঠাৎ সব লুপ্ত করে দিয়ে প্রকট হয় জিপ থামার শব্দ এবং একটি বিকট ধমকে গোরুর গাড়ির একটানা সুর ভাঁজা থামে, তার বদলে কীসব কথাবার্তা শোনা যায়। গোরুর গাড়ি একটু পরে ফের ক্যাঁচক্যাচ শুরু করে এবং এই বাড়ির পশ্চিমে হাইওয়ের সঙ্গে লাগানো যে মাঠ আছে, গোরুর গাড়ি এসে থামে সেখানে। জিপের ওয়্যারলেসে সাঙ্কেতিক সংখ্যায় কোথায় কি জানানো হচ্ছে। ৩/৪ মিনিট পর মোয়াজ্জেম হোসেনের স্থগিত সংলাপ ফের সচল হয় 'না হলে দেখো না' তোমার বাপ যখন ১০ বছরের চ্যাংড়া, তখনই পুলিসের হাত থেকে হান্টার কেড়ে নিতে পারে?—কি রকম?—সে আরেক হিস্ট্রি। পুলিস কও, দারোগা কও, এস. ডি. ও কও, ম্যাজিস্ট্রেট কও, সেই আমলে এলাকায় এলে সবাইকে একবার এই বাড়িতে আসতেই হতো। চিথুলিয়ায় বিলে তখন পানি ছিলো, এখনকার মত গজব পড়েনি—তো সেই বিলে একবার নৌকায় ডাকাতি হয়। ইনকুয়ারি করতে আসে বড়ো দারোগা নিজে। মোয়াজ্জেম কাজীর লিস্ট দেখে দেখে পুলিস এ গ্রাম ও-গ্রাম তছনছ শুরু করে। সেই লিস্টে সেবার ১ নম্বরে আকালু পরামাণিকের নাম। না, আকালু যে ডাকাত ছিলো তার স্পষ্ট কোন প্রমাণ নাই, তবে লোকটা ভয়ানক বেয়াদবি শুরু করেছিলো। হ্যাঁ, তাদের জমিতে বর্গা চাষ করতো, বিলের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে তাদের জমিতেই তার বসবাস। কিছুদিন হলো শালা ফসল দিতে গোলমাল করছিলো। এমন কি বাড়িতে বিয়েশাদি কি উৎসবে বেগার খাটতে জবাব দেয়। "দুইবেলা ভাত না দিলে কাম করা যাবি না!' নেমকহারাম-টাকে একটু শাস্তি দেয়ার জন্য তার নামটা ঢোকাতে হয়। গ্রামে লাল পাগড়ি ঢুকতে দেখেই আকালু আনিস আখন্দের গোয়ালঘরের পেছনে সারের গাদায় হাঁটুতে মুখ ঢেকে বসেছিলো। চৌকিদার তার ঘাড় ধরে টেনে এনে ধাক্কা

দিয়ে ফেলে দিলো মোয়াজ্জেম হোসেনের কাচারি ঘরের বারান্দায়। কনস্টেবলের হান্টারের দুটো বাড়ি পিঠে পড়তে না পড়তে শুরু হয় তার আকাশ-ফাটানো চিৎকার। ছোট জাতের মানুষ,—শালাদের গলাও থাকে তেমনি! মোয়াজ্জেম হোসেনের রাগ আজও যায়নি, 'নটকইটা খালি চিক্কুর পাড়ে। খালি চিক্কুর পাড়ে!' বেলা তখন ৯টা সাড়ে ৯টা, গোসল করে পশ্চিমের দালানের দাওয়ায় বড়ো খোকা ঘি, আলু-সিদ্ধ ও ডিম ভাজা দিয়ে ভাত খেতে বসেছে, চিৎকার শুনে তার কিসের খাওয়া আর কিসের স্কুল—ছেলে এক লাফে কাচারি ঘরে এসে কনস্টেবলের হাতের হান্টার ধরে টানাটানি শুরু করলো। দারোগা বড়োদারোগা সব থ'। এইটুকু খোকা, সে বলে, আকালুকে আমি চিনি না? রাত্রিবেলা দক্ষিণ পাড়ার আনিস আখন্দের বাড়ি থেকে তার ঘাড়ে করে বাড়ি ফেরার সময় বটগাছের কাছাকাছি এলে তার দাঁতে দাঁত ঠেকে, পায়ে পা লেগে যায়, বারবার বলে, ও মিয়া দেখো তো গাছের উপরে সলক দেখা যায় নাকি? সেই লোক করবে ডাকাতি?' কী কথা কও তো! তখন লাল পাগড়ির পুলিস। আজকালকার পুলিসের মতো পাটখড়ির ওপর কালো চামড়া জড়িয়ে তারা সেটাকে পা ঠাউরে হাঁটতো না: তাদের শাঁসালো পা ছিলো মুগুরের মতো, তাদের গোঁফ থাকতো ঢেউ-খেলানো, আর সেই সব পুলিসের হাতের লাঠি কেড়ে নিলো ঐটুকু ছেলে! দেখো তো! আর একবার, তখন ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতায় কলেজে ভর্তি হয়েছে, মোয়াজ্জেম হোসেন নিজে নিয়ে গিয়ে ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি করিয়ে দিয়ে এসেছে, চন্দনদহের ইয়াসিন সায়েব তখন কলকাতার ছাত্রনেতা, খুব নাম, মোয়াজ্জেম হোসেন ছেলেকে তার হাতে তুলে দিয়ে এসেছে। ৪/৫ মাস পর ছুটিতে ছেলে বাড়ি এসেছে। মোয়াজ্জেম হোসেন শোনে যে, সে পলিটিক্স শুরু করেছে। না, অন্য পার্টিতে গেছে। 'সেখানে মুসলমান ছাত্র কম, তারা নাকি কম্যুনিস্ট, আল্লা খোদা মানে না। দেখো তো সাহস! আবার,'—মোবারক হোসেনের অন্য ধরনের রাজনীতি করার কাহিনী আর শোনা যায় না। বাইরে থেকে কে যেন ডাকে। মোয়াজ্জেম হোসেন চুপচাপ দরজায় কান পেতে থাকে। যে-ই হোক সদর গেট দিয়ে এসে ঢুকেছে পশ্চিমের ভাঙা দেওয়ালের ফোকর গলে। বাইরে থেকে ফের শোনা যায়, 'আমরা ফোর্সের লোক!' ইকবাল বলে, 'দাঁড়ান দাদু, আমিই যাই।'

ইশারায় তাকে বাসিয়ে দেখে মোয়াজ্জেম হোসেন মেঝেতে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়েথাকা গেন্দুর বাপকে ডেকে তোলে। তাপর তার সঙ্গে সামনের দরজা খুলে গোটা বারান্দা ঘুরে গিয়ে মেজোছেলের ঘরের দরজায় টোকা দেয়। মোতাহার তৈরি হয়েই ছিলো। মোয়াজ্জেম হোসেন, মোতাহার হোসেন এবং গেন্দুর বাপ—এই ৩ জনের মিলিত দল সরকারী বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

মোয়াজ্জেমের ঘরে ইকবাল এখন একা। বোঝা যায় বাড়িতে সবাই এখন জেগে আছে। সকলের নিঃশ্বাস খুব চাপা। সকলের চাপা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে

ইকবালের নিজেরও দম বন্ধ হবার দশা। সে তাই পশ্চিম দিকের জানলাটা আস্তে করে খুলে ফেলে। কনকচাঁপা ও পেয়ারা গাছের মাঝখানের ফাঁক দিয়ে ভাঙা দেওয়ালের ওপারে গোয়ালঘরের একটা কোণ এবং তারপর খড়ের উঁচু গাদার পাশ কাটিয়ে মস্ত বড়ো একটা অন্ধকার গর্ত। ওটা আসলে পুকুর, পানি অনেক নিচে পড়ে গেছে, রাত্রিবেলা দূর থেকে অন্ধকার গহ্বর বলে ভুল হয়। পুকুরের ওপারে, উত্তরদিকে বাঁধানো এক জোড়া কবর। এখন শুধু কবর জোড়াই চোখে পড়ছে। একটি কবরের মাথায় সাদা পাথরের ফলক বসানো, সাদা ধবধবে পাথর। এই অন্ধকার ও কুয়াশায় অনেকক্ষণ আওটানোর ফলে সাদা রঙটা ঘন দুধের মতো জমাট-বাঁধা। পাথরের ওপরকার লেখা এখান থেকে অস্পষ্ট। তবে এই ২১/২২ দিন ধরে পড়তে পড়তে ফলকের প্রতিটি শব্দ তার মুখস্থ। একেবারে চোখে না পড়লেও ইকবাল এখান থেকে স্পষ্ট পড়তে পারে :

শহীদ কাজী মোহাম্মদ মোবারক হোসেন
জন্ম ১৯২৬, মৃত্যু ১৯৫০

স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকার কর্তৃক রাজশাহী কারাগারে নিহত।

এর নিচে একটি কবিতা। সেটা আলাদাভাবে কালো বর্ডারে ঘেরা :

তোমার বুকের রক্তে মোরা আজ অগ্নিতে রঞ্জিত
মৃত্যুহীন প্রাণ তব আমরা গ্রহণ করি ঋণ,
আমরা যাহারা বাঁচি বাঁচিবার অধিকারহৃত
তোমার শোণিতমূল্য শোধ করি দিব একদিন ॥

নাঃ, কবিতাটি প্রথমে ইকবালের ভালো লাগেনি। সেকেলে, আবার একটু গেঁয়ো। বড়োচাচা মোতাহার হোসেন অবশ্য ঢাকা থেকে ভালো কোনো কবিকে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলো। ঢাকায় তার কতো জানাশোনা কবি, নানারকম পুরস্কার পাওয়া, রেডিও বলো টেলিভিশন বলো মিটিং বলো সভা বলো সেই সব কবির সব জায়গায় অবাধ বিচরণ। শ'খানেক টাকা ফেললেই কতো সুন্দর পদ্য লিখে দেয়! না, স্বাধীনতার পর তো এইসব ছোকরাদের তেজ আলাদা, 'না চাচামিয়া পাথরের খরচ, ফিটিং চার্জ, মিস্ত্রী খরচ সব হামরা দিমু।'

'একটা পদ্য দেওয়া লাগে। ঢাকার কোনো কবির—'মোতাহারকে কথা শেষ করতে দেয় না, ছোকরারা বলে 'না পদ্যও হামরাই ঠিক করবার পারি।'—কীভাবে?—বিলের ওপারে গুণাহার গ্রামের সিরাজ নিকিরির বেটা আব্দুল্লাহ পদ্য লেখে, আজিজুল হক কলেজে বি. এ. পড়ে। তার লেখা কবিতা, আবার সংশোধন করার ভার নেয় হাইস্কুলের কাব্যতীর্থ পণ্ডিত। নানা লোকের হাতে পড়ায় এটার এই হাল হয়েছে।' তবে পড়তে পড়তে এখন বেশ সহ্য হয়ে এসেছে। না, মিথ্যা কথা বলবো না, কবিতাটা ইকবালের আজকাল ভালোই লাগে। পাথরের এই ফলকওয়ালা কবরের সঙ্গে আরেকটা কবর। এই কবরটা

ফাঁকা, মানে লাশহীন, লাশের জন্য অপেক্ষা করছে। এটা সংরক্ষিত মোয়াজ্জেম হোসেনের জন্য। এই শূন্য কবরের মাঝখানে ছোট্টো একটি টিনের ফলকে জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ ছাড়াই মোয়াজ্জেম হোসেনের নাম লেখা। মোয়াজ্জেম হোসেন বড়োছেলের পাশে সমাধিস্থ হবার জন্য কতো আগে থেকে এই আয়োজন করে রেখেছে। হুঁঃ! এই হয়! ইকবালের পাতলা ঠোঁটের একটু ভাঙা ধারালো ঢেউ তার দাদুর প্রবল বাসনাকে আঘাত করে; ভালোই! মানুষের হৃত-অধিকার উদ্ধার করতে গিয়ে ছেলে জেলখানার মধ্যে মরে পুলিসের গুলিতে, পরে তুমি শালা বুড়ো শয়তান তোমার আরেক ছেলের সঙ্গে পরামর্শ করে রক্ষিবাহিনী নিয়ে আসো গ্রাম উজাড় করার জন্য! আবার শালা শহীদ ছেলের সঙ্গে পাশাপাশি থাকার আয়োজন করো, না? আবার দেখো, কবরের তিনদিকে ছোট্টো দেওয়াল, ছেলের কবরের পাশটায় ফাঁকা। মানে শালা কবরের মধ্যে হাড়হাড়্ডি হয়ে বাপে বেটায় হাড়-তরঙ্গ বাজাবে, না?—অতো সোজা? তোমার ছেলে তোমার সঙ্গে মিলবে? তোমাকে আমার চিনতে বাকি আছে? শরিয়তের কথা বলে তোমার নাতিকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করো আর সেই নাতির বাপের সঙ্গে অনন্তকাল হাড়হাড়্ডি হয়ে, ফসিল হয়ে, ধুলোবালি হয়ে মিশে থাকতে চাও! তোমাকে আমি চিনি না!

মোয়াজ্জেম হোসেনকে তার চেনা হয়েছে আজ থেকে নয়। জীবনে দেখা না হলে কী হয় ছেলেবেলা থেকেই তো শুনে আসছে। মার কাছ থেকে যতো না, মামাদের কাছ থেকে শোনা হয়েছে অনেক বেশি। এবারেই কি কম শোনা হলো? চিথুলিয়া বিলের ওপারটা এককালে এদেরই ছিলো। না, ইকবালের কী? এই মোয়াজ্জেম হোসেনদের জায়গাই ছিলো ওসব। কয়েকদিন হাঁটতে হাঁটতে ইকবাল চলে গিয়েছিলো বিলের ওপার। বিল শুধু নামেই, খা খা করছে মাঠ, কয়েকদিন আগে জায়গায় জায়গায় ধান কাটা হয়েছে, কোনো কোনো জায়গা এখনো ফাঁকা। বিলের পশ্চিম দিকের ধান সব কেটে নিয়েছে পশ্চিম পারের কাঁঠালপোঁতা, শিববাটি, গুণাহার, তেলিহার এসব গ্রামের চাষারা। বিলের পুব দিকটা যদি পূর্ব পারের গ্রামের মোয়াজ্জেম হোসেনের দখলে থাকে তো পশ্চিম পারেও তাই হবে। এ তো সোজা হিসাব। গোটা বিল ১টি অখণ্ড সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হওয়া উচিত। আগে যখন এই বিলে ১২ মাস পানি থাকতো, তখন পূর্ব পারের নিকিরিয়া জেলেরা বিলের কই, মাগুর, শিং শোল—এমন কি রুই কাতলা মৃগেল মাছ ধরে কাজীদের খাজনা দিতো না? কয়েক বছর হলো পানি শুকিয়ে গেছে, বিশেষ করে শীতকালে দুটো ফসল হচ্ছে, ব্যস, হাভাতে চাষাগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়েছে এই বিলের ওপর। এসব নিয়ে মোয়াজ্জেম হোসেন, মোতাহার হোসেন একটু ঝামেলায় আছে। নিজেরা জন লাগিয়ে এবার বিলের প্রায় সিকি ভাগ জমিতে ধান করলো। ধান হয়ও খুব। মনে হয় ফসল ফলবার প্রবল ক্ষুধা যেন হাজার হাজার বছর ধরে পানির নিচে চাপা পড়ে ছিলো, পানি চলে যাওয়ায় তাই ধানের শীষে জমি যেন লকলক করে উঠেছে। এতো খরচ করে, কৃষি বিভাগ থেকে সার এনে কাজীরা সব

জমি চাষ করলো, ফসল হলো, রাতারাতি পাকা ধান কেটে নিয়ে গেলো পশ্চিমের চাষারা। কাকে বিশ্বাস করবে? এই চাষাদের দিয়েই বর্গাচাষ করায় ওরা, এদের দিয়েই জন খাটায়। আবার এরাই সব জোট হয়ে ধান কেটে নিয়ে গেলো। মোতাহার হোসেনের বিরক্ত হবার আর ১টি কারণ হলো এই যে, এইসব নেমকহরাম চাষীদের সঙ্গে ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলার যো নাই। দেখো না, বিলের পশ্চিমে এতগুলো গ্রাম, ভদ্রলোকের ঘর ১টাও নাই। বাবা-এখন তো স্বাধীন দেশ, এখন জমিজমা নিয়ে কোনো খটকা বাধে তো স্বাধীন দেশের বিচার আছে। কোর্টে যাও, জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যাও। যে সবুজ ও লাল পতাকার জন্য তিরিশ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিলো সেই পতাকাশোভিত কোর্টের প্রতি এত অবহেলা কেন? তবে এইসব ধান কাটাকাটির ব্যাপারে ইকবালের কী এসে যায়? তাকে কি ওরা ভাগ দেবে? দাদুর আগে তার বাপ মরে যাওয়ায় এরা তার প্রাপ্য সবকিছু গ্রাস করে নিয়েছে। আবার বিলের ওপারের লোকদের ধারণা মোয়াজ্জেম হোসেন তাদের ধানজমি হাতাবার জন্য এত আয়োজন করে।

পরদিনও ইকবাল ওপার থেকে ঘুরে এলো। দাদু আসরের নামাজ পড়তে গেলে হাঁটতে হাঁটতে ইকবাল চলে গিয়েছিলো বিলের ওপার। বিলের ওপারে জমি কালো, মাটি একটু নরম, এপারের মতো লাল খটখটে নয়। এর মানে বোধহয় এই যে অনেক আগে ঐ সব গ্রাম বিলের অন্তর্গত ছিলো? সেই কালো মাটি, তার নিচে কবেকার সুপ্ত বিলের পানি মাটির পরতে পরতে শুকিয়ে গেছে, তার ওপর দিয়ে সে একা একা হাঁটছিলো। সুমসাম রাস্তা, ধান-কাটা বিল-জমির ভেতর দিয়ে আসা আঁকাবাঁকা রাস্তা মিশে গেছে গ্রামের রাস্তার সঙ্গে। তেমনি সরু, এতো বড়ো বিল পার হওয়ার পর রাস্তা যেন আরো জড়সড় হয়ে গিয়েছে। এই রাস্তায় এই বিকালবেলা একা একা সম্পূর্ণ অন্যরকম লাগে। না, নিঃসঙ্গ মনে হয় না। এই যে রাস্তার বাঁশঝাড়, রাস্তার ধার ঘেঁষে বেড়ার ভেতর ছোট্টো জমিতে বেগুনগাছ, মাঝে মাঝে সর্ষেখেত, মাঝে মাঝে ডোবা, মাঝে মাঝে কোমরে ঘুন্সি-বাঁধা ন্যাংটোছেলে—সবই, সবাই বেশ সঙ্গে সঙ্গে থাকে। এরকম একা একা চলে আসাটাই মুশকিল। সুযোগ সব সময় পাওয়া যায় না। শুধু নামাজের সময়টাই দাদু ওকে ছাড়ে। নামাজের সময় হলে আর সবাইকে অবশ্য মসজিদে যেতে হয়। প্রথম ২/৩ দিন ইকবালকেও নামাজ পড়তে হয়েছে। তবে ওর বড়ো চাচা ওকে এই বাড়ির নিয়ম-কানুন মানতে বাধ্য করতে চায় না। চাপ দেওয়ার দরকার কী? ক'টাদিন থাকো, খাও দাও, ঘোরো, বাপদাদা চোদ্দপুরুষের ভিটেমাটি দেখো। নিজের বাপের কবর আছে। কবর জিয়ারত করো, দিনে ১বারের জায়গায় ২ বার ৩বার করো না! তার মা তো তাকে ২৪ বছর আসতে দেয়নি, মায়ের মৃত্যুর পর এলই যখন তো কয়েকটা দিন হেসে খেলে বেড়াক না। এই বাড়ির নিয়ম-কানুন ওর ওপর জোর করে চাপাবার দরকারটা কী? কিন্তু বাড়ির বড়োছেলের একমাত্র সন্তান, বংশের ছেলে নামাজ রোজা করবে না, তাও কী হয়? বাড়িতে যাদের ৪

পুরুষ ধরে মসজিদ, এককালে যারা মসজিদের মোয়াজ্জিন ও ইমাম রাখতো আলাদা, তাদের বাড়ির ছেলে নামাজ পড়বে না? মোয়াজ্জেম হোসেনের এই অস্বস্তি দেখে বড়োচাচা হাসে, বাড়িতে কোনোদিন ছিলো নাকি যে বাড়ির ধারা পাবে? নাকি থাকবে যে শেখার দরকার পড়ে গেছে? ইকবাল ও মোয়াজ্জেম হোসেন এই সম্বন্ধে স্পষ্ট জবাব না দেওয়ায় মোতাহার ফের বলে, 'আব্বা যে বলেন, নামাজের কথা বলেন, কন তো বড়োভাইজান নামাজ পড়েছে?'

'পড়েনি? ম্যাট্রিক পাস করা পর্যন্ত আমার সাথে মসজিদে গিয়ে পাঁচ ওকতো নামাজ পড়েছে। আট বছর বয়স থেকে রোজা করেছে। তারাবি কোনদিন বাদ পড়েনি। মোবারক কোনদিন কাজা নামাজ পড়েনি!'

জ্যেষ্ঠপুত্রের জন্য মোয়াজ্জেম হোসেন এই গর্ববোধ মোতাহারের মধ্যে একটুও ঈর্ষার সৃষ্টি করে না। এসব ব্যাপার তার কাছে অভ্যাস, নামাজ পড়া নিয়ে গর্ব করার কী আছে? আবার একটি অনভ্যস্ত ছেলেকে জোর করে নামাজ পড়িয়ে এই বাড়ির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা বাড়াবার দরকারটাই বা কী? তবু বড়োভাইয়ের নাস্তিকতার কথা বাপকে মনে করিয়ে দেওয়াটা তার কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে, 'কিন্তু কলেজে ঢোকার পর? ভাইজান ফার্স্ট ডিভিশনে আই. এস. সি. পাস করার পর মনে আছে বাবা, মসজিদে মিলাদ দেওয়া হলো, মনে নাই? গোরু জবাবই করা হলো দুইটা। মিলাদের পর দোয়া পড়া হবে, কেরামত আলী জৌনপুরী সাহেবের নাতিকে আনা হয়েছিল দোয়া পড়ার জন্য। তো দোয়া পড়ার সময় দেখা যায় যাকে নিয়ে এত হৈ চৈ তারই পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। খোঁজ, খোঁজ; সে গেলো কোথায়?—না, মন্তাজ ঠসা তাকে দেখেছে বিলের ওপর দিয়ে কলাগাছের ভেলা করে চলে গেছে পশ্চিম পাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে নৌকা করে লোক পাঠাও কাঁঠালপোঁতা। লোক গিয়ে দেখে, বড়োমিয়ার বড়োবেটা কলুপাড়ার নঈমুদ্দিন কলুর সাথে তেলের গাছ ঘোরাচ্ছে।'

'গাছ ঘোরাচ্ছে?' ইকবালের এই বিস্ময়ের জবাবে মোতাহার হোসেন একটু চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, 'গাছ মানে ঘানি। আমরা তেলের ঘানিকে বলি গাছ। ঘানি চেনো?'

নাতিকে এই ছেলের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মোয়াজ্জেম হোসেন তাড়াতাড়ি বলে, 'ওর বাপের খাই খাতির খালি এই কলু আর তেলি আর নিকিরি কিষাণপাটের সাথে।' বলতে বলতে লোকটা হাসে, তার মোলায়েম ও ঢেউতোলা পাকা দাড়ির ফাঁক দিয়ে লালচে পাতলা ঠোঁট, তামাটে খাড়া নাক একটু একটু কাঁপে, চোখ দুটো কুঁচকে আসে, বলে, 'ছোটো ছিলো যখন তখন খালি ডাংগুলি খেলতো কিষাণ কামলার ছেলেপেলের সাথে।'

এখন এই বাঁদিকে ডানদিকে আমগাছ, এলোমেলো পায়-চলা-পথ, মাঝে মাঝে সর্ষেখেত থেকে আসে মিষ্টি নরম গন্ধ, তাতে একটু ঝাঁঝ মেশানো থাকে। তার সঙ্গে নিকিরিপাড়া শুরু হয়। পুরনো জাল ছড়ানো রয়েছে ঘরের চালে, জাল ঐ ভাবে পড়েই থাকে, বিল শুকিয়ে যাবার পর কোথায় ব্যবহার করবে? কলুপাড়া

কোথায়? এইসব জেলেপাড়া কলুপাড়া, ডোবা, কাঁথামুড়ি দিয়ে রাস্তায় বসে-থাকা বুড়ো অথর্ব কিষাণ—খুব লোভী চোখে দেখতে দেখতে এগিয়ে চলে ইকবাল। এই সব জায়গায় ছড়িয়ে থাকে তার বাবা. বাবাকে দেখার জন্য তার চোখের কোটরে মণি দুটো কেবল এদিক ওদিক ঘোরে। কিন্তু বাবাকে কৈ দেখা যায় না। দেখতে চাইলেই কি দেখা যায়। দাদুর কাছে শুনতে শুনতে কতো কী দেখতে চায়, কিন্তু কেবল বাপের মুখটাই কোনো আকার পায় না। কী করে পাবে? রাজশাহী জেলের খাপড়া ওয়ার্ডে ওর বাবাকে যখন মারে ইকবালের বয়স তখন আট মাসও হয় নাই। দাদুর কাছে টেলিগ্রাম আসে, দাদু তো আর যেতে পারেনি। যাবে কি?—১ মাসতো কোনো কথা বলে নাই, কেবল বিছানায় শুয়েছিলো। স্বাভাবিক পথ্য মুখে দিতে পারতো না, বমি হয়ে যেতো। রাজশাহী গিয়েছিল মোয়াজ্জেম হোসেনের বড়ো জামাই। জামায়ের মামাতো না ফুফাতো ভাই তখন রাজশাহী পুলিস অফিসে কাজ করে। এসপি ছিলো এক হায়দ্রাবাদী, লোকটা ভালো, জেলে গুলি করে বন্দীদের মারার অপরাধে জেল-সুপার শুওরের বাচ্চা বিলকে এ্যারেস্ট করতে চেয়েছিলো। এই পুলিস সায়েবকে ধরে মোবারকের লাশ উদ্ধার করা হয়। এ্যাম্বুলেন্স থেকে ট্রেন, ট্রেন থেকে গোরুর গাড়ি—লাশ এখানে এসে পৌছলো ৩ দিন পর। বললে বিশ্বাস করবে না জেলারের হাতে গুলি খাওয়া, ডাক্তারের হাতে কাটাছেঁড়া লাশের মুখ দেখে মনে হয় সারারাত্রি পড়াশোনা করে ছেলে যেন ভোররাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছে। সে সব দিন গেছে বাবা! মোতাহার বলে, 'বাবা, নিজেদের বাড়ির মসজিদে বেতনভোগী ইমাম ছিলো বলে তার জানাজা হয়। কম্যুনিস্টের লাশ সামনে রেখে কোনো মৌলবি কি আল্লাহর কালাম উচ্চারণ করতে চায়? মুসলিম লীগের পাণ্ডারা সব কম জ্বালায়নি বাবা।' মোতাহারকে অন্য দল করতে হয় সাধে? এই বাড়ির ছেলে জেলখানায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মরেও যেন মহা অপরাধ করে বসেছে। মোয়াজ্জেম হোসেন রাতারাতি বুড়ো হয়ে যায়। আই. এ. পাস করে পড়াশোনা বন্ধ করে দেয় মোতাহার।

পুত্রশোক-বিধ্বস্ত বুড়ো বাপ কি জমিজমা দেখতে পারে? জোত জমি, বিলের মাছ সাবগ্রামের জেলা, বাড়িঘর সব ছেড়ে মোতাহার লেখাপড়া চালায় কী করে? তখন কি গ্রামে গ্রামে কলেজ ছিলো?

'ভাইজান নিজে তো গেলো, আমাদেরও পথে বসালো।' মোতাহারের এই ক্ষোভ মোয়াজ্জেম হোসেনের অনুমোদন পায় না। তার পথে বসার কথাটা মেনে নেওয়া ইকবালের পক্ষেও একটু মুশকিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে বিধ্বস্ত দালানের স্তূপ আর সারানো হয় না। কিন্তু অন্য দালানটির নানারকম সম্প্রসারণ চলে। এই সব দামী নতুন নতুন সোফাসেট, দামী বিদেশি কম্বলের ছড়াছড়ি, হাতে সদাসর্বদা ফাইভ ফিফটি ফাইভের প্যাকেট, কথায় কথায় মুজিব কোট চড়িয়ে মোটর সাইকেল হাঁকিয়ে টাউনে ছোটা—এসব দেখে তার হতাশা অনুমোদন করবে কে?

তার প্রতি এদের অবিশ্বাস মোতাহার বোধহয় টের পায়। বলে, 'বড়োভাইজান তো একগুঁয়ে মানুষ ছিল। ভাবী নাকি ২/১ বার না করেছে তা ভাইজান শোনেনি?'

'কারো কথা শুনে কাজ করার ছেলে সে ছিলো না বাবা।' মোয়াজ্জেম হোসেন সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে, 'নিজে যা বোঝে তার কাছে তাই ঠিক। তামাম গ্রাম একদিকে, সে গেছে আরেক দিকে। পাকিস্তানের ভোট হলো, আমার এই বাড়িতেই তখন মুসলিম লীগের অফিস। এই ইউনিয়নের,—ইউনিয়ন কি?—তামাম থানার চ্যাংড়াপ্যাংড়া জড়ো হয়েছে। আর তোর বাপ কয় পাকিস্তান পাকিস্তান করো, পাকিস্তান কার জন্যে? কামলা কিষাণদের ডেকে বলে, পাকিস্তান হলে কিষাণপাট বেন্যার ছোলপোলেক এক সন্ধ্যা ভাত দিবি? কও ভাত পাবা?

এই সময় বাইরে জিপ আসে। মোতাহার হোসেন বাইরে গিয়ে কার সঙ্গে কথা বলে। মোয়াজ্জেম হোসেন ও ইকবাল শোনে, 'চা খেয়ে যান। বসেন।' গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার আওয়াজের সঙ্গে অপর পক্ষের জবাব শোনা যায়, 'এখন না। আরে আপনাদের গেস্ট হয়েই তো থাকবো! শালাদের এ্যামুনেশন যা আছে একটা হোল নাইট লাগতে পারে। টোটাল এ্যানিহিলেশন, এবার টোটাল এ্যানিহিলেশন!

ঘরের ভেতর মোয়াজ্জেম হোসেনের শরীর একটা টাল সামলায়। মোতাহার ফের ফিরে আসতে আসতে সে গা ঝেড়ে বলে, 'তোমার বাপ তখন কলুপাড়ায় মিটিং করে বেড়ায়।'

সে কলুপাড়া কি রাস্তার ডান দিকে? নিকিরিপাড়ার ঘিঞ্জি বস্তি শেষ হলে, রাস্তার দুদিকে জমিতে কাউন ও চীনার খেত। ঠাণ্ডা একটা হাওয়া খেলে, পেছনের সর্ষে ফুলের খেত থেকে ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে চোখে ঝাপটা মারে; এই সব জায়গায় আমার বাবার দিন কাটতো এইসব ন্যাংটা ছেলেদের বাপ-দাদাদের সঙ্গে বসে বসে বাবা তাদের মধ্যে এই ঝাঁঝ জাগাবার চেষ্টা করে গেছে। একটি কাউনের জমির ধার ঘেঁষে কলাগাছের ঝাড় পার হতে হতে ইকবাল সামনের দিকে যাচ্ছে, এমন সময় শুনতে পায়, 'গাঁও দেখেন?' —কে? চাদর জড়ানো নোংরা ও ছেঁড়া লুঙি-পরা একটি লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে তার পাশে। লোকটা কোত্থেকে উদয় হলো? তারপর ইকবাল আর সামনে যেতে না পারে লোকটা এমনি করে দাঁড়ায়। একটু হেসে বলে, 'ক্যা বাবা উদিনকার কথা মনে নাই?'

মনে থাকবে না কেন? দ্বিতীয় দিন এই গ্রামে একা একা এভাবে বেড়াতে এলে এ রকম লুঙ্গি-পরা, গায়ে চাদর-ঢাকা দু'জন যুবক ওকে নানাভাবে বিরক্ত করতে শুরু করে 'আপনি কিসক আচ্ছেন?' 'আপনার বাড়ি কুটি?' 'গাঁয়ের মদ্যে ঘোরেন ক্যা, গাঁয়ের ম্যায়ামানুষ দেখেন?' তখন এই লোকটিই এসে তাকে সামলায়, 'আপনের খবর হামরা আগেই পাছি। আপনে মোবারক ভায়ের বেটা না?' তারপর যুবক দু'জনকে বলে, 'তোরা মানুষ চিনিস না? কার সাথে কথা কোস? মোবারক ভাইয়ের বেটাক চিনলু না?'

একজন, সে একটু বেশি কালো, পরে শুনেছে যে সে হলো নিকিরিদের ছেলে, একটু তেতো গলায় বলে, 'মোয়াজ্জেমের লাতি? মোতাহারের ভাইস্তা?'

এই লোকটি আস্তে করে তাদের ধমক দেয় 'তোরা ব্যামাক মানষেক সন্দ করিস, ব্যামাক মানষেক বাদ দিলে তোরা কাম করবার পারবু?' তারপর ইকবালের দিকে তাকিয়ে বলে, 'বাপু তোমাক, আপনাক তো চেনে না! তুমি ঢাকাত থাকো, নিজের গাঁও গেরাম আছে. কুনোদিন ফুচকি দিয়াও দেখো না, মানষে তোমাক চিনবি ক্যামন কর‍্যা, কও? তোমার বাপ হামারগোরে কি আছিলো তুমি জানো? তোমার বাপ না থাকলে আজ এটি হামাগোরে পাট্টি হবার পারে? তাঁই বিছন দিয়ে গেছিলো, এখন তামাম গাঁও এক জোট হছে।'

যুবক দুটি তার কথা শোনে, কিন্তু ইকবালের দিকে তাদের দৃষ্টির পরিবর্তন হয় না। একজন আস্তে আস্তে বলে, 'খবর তো সবই জানি। ইনি আসিছেন কিসক সেই খবরও রাখি। বাপের সয়-সম্পত্তি লিয়া দাদার সাথে চাচার সাথে একজোট হবি, হয়া লতুন ক্যাচাল বাধাবি, হামরা বুঝি না?'

কিন্তু বয়স্ক লোকটি তার কথায় আমল না দিয়ে বলে, 'তুমি বাপ্ তোমার দাদার সাথে হাত মিলাও ক্যা কও? তোমার দাদা তোমাক সম্পত্তি দিবি? তোমার চাচা,—তাঁই পয়সার জোঁক, পিঁপড়ার গোয়া টিপ্যা তাঁই গুড়ের অস বার করে, তাঁই তোমাক জমির ভাগ দিবি?'

ভয়ে ইকবালের পা দুটো তখন ঠকঠক করে কাঁপছিলো। সে কি ট্র্যাপে পড়ে গেলো? হয়তো এইসব কলাগাছের ঝাড়, আমগাছ, খড়ের গাদা, পুরানো জালের আড়ালে আরো অনেক যুবক চুপচাপ তাকে অনুসরণ করছে। প্রত্যেকের চলাফেরা এখন হয়তো স্থগিত রয়েছে, এই লোকটি ইঙ্গিত করলেই এক নিমিষে তার গলাটা কেটে বিলের মাঝখানে ফেলে আসবে। কিন্তু না, এসব কিছুই হয় না। বয়স্ক লোকটি কি ইশারা করে, যুবক দু'জন অন্যদিকে চলে যায়। তাদের গায়ের র‍্যাপারের নিচে তাদের একটা করে হাত, সেই হাত কি সশস্ত্র?

লোকটি ফের বলে, 'তুমি হামাক চিনবা না বাপু। হামার নাম ভেদু, হামার বাপ আকালু পরামাণিক আছিলো তোমার দাদার চাকর। তোমার বাপ হামাক দেখিছে লিজের ভায়ের অধিক। তুমি তার বেটা, তুমি বাপু হামাগ্যোরে পাট্টির মানুষ!'

একটি যুবক এগিয়ে আসে, 'সোয়াগ থোন। বাপোক দেখিছেন, দাদা চাচা চোদ্দ গুষ্টি বাদ দিয়া খালি বাপোকই দেখেন?'

এবার ভেদু পরামাণিক তাদের ধমক দেয়, 'হামি এটে কথা কচ্ছি, তোরা আসিস কিসক?'

তারপর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ পঞ্চম—কয়েকদিন ধরে ইকবাল ভেদু পরামাণিকের কাছে এসে তার বাপের কথা শোনে।' 'তোমার বাপোক মানষে কছে কাফের। হামরাও কই নাই? কছি। আবার দরদও করছি। তাঁই কছে, ভেদু, কাফেরও মানুষ। কিন্তুক এই মাক্কুচোষা শয়তানের বাচ্চাগুলো—এ্যারা কি মানষের পয়দা?' বাপের কথা শুনতে শুনতে ইকবাল এখানেও গুড়ের মধ্যে মাছির মতো সেঁটে থাকে। এই জন্যই বোধহয় বড়ো মামা বলতো 'আদর করো আর মানুষ

করো. মাথায় তুলে যতোই নাচো. ভাগ্নে কখনো আপন হয় না। পাখা গজালেই নিজের বাপের চোদ্দপুরুষের খোঁজ করে বেড়াবে, দেখো!' ঠাট্টা করে বলতো, 'জন জামাই ভাগনা, তিন নয় আপনা!'

ইকবালটা ছেলেবেলায় একটু বোকা ছিলো. জিগ্যেস করতো, 'জন মানে কী মামা?'

'জন মানে কাজের লোক। গ্রামে জমির কাজ করে, গোরুবাছুর দেখে। তোর দাদাবাড়ি গেলে দেখবি। বংশপরম্পরায় জমিতে খাটায়!'

'বেতন দেয় না?'

'কিসের বেতন? তোর দাদা হলো জোতদার। তোদের নর্থ বেঙ্গলে একেকজন জোতদার মানে শয়ে শয়ে বিঘার মালিক। জমিতে সব লোক দিয়ে কাজ করায় আর তাদের খেতে না দিয়ে মারে, বুঝলি? তোর বাপ তো এইসব দেখেই চটে যায়। তোর বাপ ছিলো গোবরে পদ্মফুল!' এই কথাটা তার বাপের বন্ধু না শিষ্য না চাকর—ঠিক বোঝা যায় না—ভেদু পরামাণিকও বলে, 'তাঁই বড়োনোকের বেটা, কিন্তুক বড়োনোকের পাথরের জান পায় নাই। তাঁই থাকলে দেশের মানুষ লোক করা বসা থাকে?'

এর মানে বোধহয় এই যে তার বাবা বেঁচে থাকলে দেশবাসীকে জেগে ওঠার ইন্ধন জোগাতো। বাপের গ্রামের বুলি সব বোঝে না, আবার দুর্বোধ্য শব্দের মানে জিগ্যেস করতেও ভয় হয় আশেপাশের যুবকেরা যদি তেতো হাসি ছাড়ে!

'মানষের খিদা তাঁই বুঝিছে লিজের গতর দিয়া, বুঝল্যা?'

বড়োমামারও ধারণা এরকম. 'মোবারক কমন পিপলের প্রব্লেম পার্সোনাল ফিলিং দিয়ে বুঝতে পারতো। আজ বেঁচে থাকলে পার্টিতে তার সামনে দাঁড়াবার মতো কেউ থাকে?'—তা বেঁচে থাকলে বাবাও বোধহয় বড়ো নেতা হতো। বড়োমামা এখন কতো ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোক। গভর্নমেন্টে না থাকলে কী হয়, মিনিস্টারদের চেয়ে কম কি? কথায় কথায় মস্কো যায়, হাঙ্গেরি যায়। তার সুপারিশে কতো ছেলেমেয়ে আই. এস. সি. পাস করে মস্কো যাচ্ছে। মামানীর আলমারি ভরা রাশিয়ার পুতুল, হাতের কতোরকম কাজ! ভেদু পরামাণিক অবশ্য অন্যরকম কথা বলে, 'তাঁই থাকলে ঐ পাপের বাড়িত লাথিগুড়ি দিয়া এটে কাঁটালপোঁতাত অ্যাসা হামাগোর সাথে থাকলোহিনি, হামি এই কথা কলাম।'

কাঁঠালপোঁতা থেকে ফিরতে ফিরতে একেকদিন দেরি হয়ে গেছে। ভেদু অবশ্য সন্ধ্যার পর তাকে যে করে হোক পাঠিয়ে দেয়, 'না বাপু. তোমাক বিল পার কর্যা দিয়া আসি। তোমার দাদু মনে করবি লাতিক হামার পুঁত্যাই থুলো না ম্যারাই থুলো ক্যাবা জানে?' ভেদুর কোনো তরুণ সঙ্গী হয়তো বলে 'হোঁ, ক্যাচলা ছোল তো, ঘাটা চিনবি না।' ইকবালের হয়ে এই ঠাট্টাটা ভেদু যেন মেনে নেয়, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, 'তোরা খালি বংশ দেখলু, মানুষ দেখবু না?' আবার দেখো এইসব তরুণ ভেদুর পেছনে পেছনে বিলের মাঝামাঝি আসে। ভেদু হাজার বারণ করলেও শোনেনি। ভেদু বলে, 'ক্যারে, হামাক মারবি কেটা?'

'তোমাক মারার মানুষের অভাব আছে? মটর ভর্‍্যা মানুষ আসিছে, বোঝো না?' দাদুও একদিন বলে, 'সন্ধ্যার দিকে কোথায় যাও? দিনকাল খারাপ, এই জায়গায় লোকজন ভালো না।'

'সেই শিক্ষা ওর মা-ই দিয়েছে। আপনাকে বলতে হবে না।' মোজোবৌয়ের এই কথা শুনে মোয়াজ্জেম হোসেন তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গে যেতে চায়। বড়োবৌ সম্বন্ধে কোনো কথা সে তুলতে চায় না। বড়োছেলের বিয়েটা মোয়াজ্জেম হোসেন মেনে নিতে পারেনি। মা-মরা ছেলেমেয়েদের নিজের হাতে মানুষ করেছে, এদের মুখের দিকে তাকিয়ে সে আর বিয়ে করেনি। সে কি এইজন্য যে ছেলেমেয়েরা নিজেদের ইচ্ছামতো চলবে আর নিজেদের পছন্দমতো বিয়ে করে যাকে তাকে ঘরে তুলবে? এতো সোজা? ছেলের মৃতদেহের সঙ্গে বৌও এসেছিলো ৮ মাসের শিশুকে নিয়ে। শ্বশুরবাড়ির মাটি কামড়ে তো মেয়েটা পড়েওছিলো দেড়টা মাস। মোয়াজ্জেম হোসেন বৌয়ের সঙ্গে এক দিনও ভালো করে কথা বলেনি। দরকার কী? এসব শহরের ফাঁদ-পাতা শিকারী মেয়ে, এদের কাজ পুরুষ মানুষ বাগানো আর তাদের হজম করা। এই মেয়ের ভাই এসেছিলো, তাকে খুব ঠেসে খাওয়ানো হয়েছে। এই বাড়ির আতিথেয়তা তুলনাহীন। কিন্তু মোয়াজ্জেম হোসেন তার সঙ্গে কথা বলেছে মোট এক দিন। তার বক্তব্য হলো এই যে, পুত্রের মৃত্যুর জন্য তার স্ত্রী ও সম্বন্ধীও কম দায়ী নয়। এই লোকটাও কম্যুনিস্ট, কমরেড বন্ধুর হাতে কালো রোগা বোনটিকে সে দিব্যি গছিয়ে দিয়েছে। তাদের বংশে এরকম বৌ কোনোদিন এসেছে? ভায়ের সঙ্গে বাপের বাড়ি ফিরে গিয়েও বৌ চিঠি লিখতো। মোয়াজ্জেম হোসেন তার একটিরও জবাব দেয়নি। এসব বৌ নাতি দিয়ে তার কী হবে? তার বুকের মধ্যে রয়ে গেছে তার ছেলে, মরার পর সেই ছেলের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য তার কবরের পাশে একটি জায়গা আগলে রেখেছে আজ ২৩ বৎসর।

আজ তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরা দরকার। ভেদু বলে, 'বাবা আজকা শালারা আসবি মনে হয়। তুমি কামটা করবার পারবা?'

কাজটা এমন কিছু নয়। রক্ষিবাহিনীর লিডার তার চাচার সঙ্গে যখন কথা বলবে ইকবাল যেন তার বাবার কবরের মাথায় দাঁড়িয়ে বিলের ওপারে সরাসরি তাকায়, এটা হলো সিগন্যাল। কবর থেকে তাকালে সোজা তাদের গ্রাম দেখা যায়। ভেদু বলে, 'বাবা, তুমি মোবারক ভায়ের বেটা, তোমাক দিয়া হামাগোরে কুনো লোকসান হবি না জানি! আর কি কই? কবরের সিথ্যানত খাড়াবার যদি না পারো তা'লেও হামরা ঠিকই বুঝবার পারমু। হামি কই তুমি খালি দেখাও, তোমার শরীলত তোমার বাপের অক্ত আছে। খালি এই, বুঝল্যা না?' তা ইকবাল তো ওর বাবাকেই স্পর্শ করতে চায়। জিভে যেমন চায়ের স্বাদ সে উপভোগ করে তারিয়ে তারিয়ে, আজ শরীর জুড়ে অনুভব করবে তার বাপের গরম রক্ত!

বাড়িতে যখন পৌঁছলো, মোয়াজ্জেম হোসেন মগরেবের নামাজের শেষে তখন সালাম ফিরছে। মোনাজাত শেষ করে বলে, 'তুই কোথায় যাস? আজ গোলমাল

হতে পারে। ছোটোবৌ ছাড়া বাড়ির মেয়েরা সব শহরে চলে গেলো, তুই গেলি না কেন?' ইকবালের তো যাবার প্রশ্নই আসে না। বাপের কবরটা দেখার জন্য পশ্চিমের জানলা খুলতে যাচ্ছে, দাদু বলে, 'জানলা খুলিশ না! ফোর্স আসবে এখন।' মোতাহার হোসেন ঢুকে বলে, 'তুই আজ গেলেই পারতিস! আজ একেবারে ফাইনাল হয়ে যাবে।' মোয়াজ্জেম হোসেন বলে, 'গুলি টুলি করবে না তো?'

মোতাহার হাসে, 'না, আদর করবে!' তারপর হাসি মুছে ফেলে, 'যেমন কুকুর মুগুরও তো তেমনি হওয়া চাই। শুওরের বাচ্চারা, লিবারেটেড জোন বানাও? এত লোকের প্রাণ দিয়ে দেশ স্বাধীন হলো, তবু শালাদের আশ মেটে না!'

মোয়াজ্জেম হোসেন আস্তে আস্তে বলে, 'ক্যাপ্টেনকে বলিস বাবা, গুলিটুলি বেশি না করাই ভালো। ১টা ২টা মারলেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, দেখিস!'

'কী যে বলো! কম মারা হয়েছে ভাবো? ওপর থেকে স্ট্যান্ডিং অর্ডার আছে, শালাদের দেখামাত্র গুলি করো। স্বাধীন দেশের মধ্যে শালারা আরেক দেশ বানায়। চোর-ডাকাত মারার নাম করে আমাদের লোক মারে, বুঝতে পারেন না?'

'তা বাপু চোর-ডাকাতও তো ওরাই মারে। মারে না? ক?' মোয়াজ্জেম হোসেনের এই উথলে-ওঠা দরদে মোতাহার হোসেন রাগ করে, খ্যাক করে ওঠে, 'চোর-ডাকাত মারার জন্য দেশে আর্মি নাই? পুলিস নাই? ওরা কেন? এসব এ্যানার্কি! শালারা হারামজাদার বাচ্চা হারামজাদা! এ সব লুটপাটের পাট্টি, বুঝতে পারেন না?'

কাঁঠালপোতার মানুষ লুটপাট করে মনে করা মুশকিল। ভেদুর তো দেড় বিঘা জমিও বেচে দিলো এবার। বেশ তো, আকাল পড়লো, খেতে পাস না, জমি বিক্রী করলে মোতাহারকে একবার বলেই দেখ! তা না, জমি বেচলো কোথাকার কোন্ শামসুদ্দীনের কাছে, শালা নতুন টাকার গরমে গ্রামে জমি কেনে—দাঁড়াও না, এই ছোটোলোকগুলিকে ঠাণ্ডা করে ধরতে হবে এই হঠাৎ-বড়োলোকদের। ভেদুর এই কাজটাকে মোয়াজ্জেম হোসেনও অবশ্য নেমকহারামি বলেই সাব্যস্ত করেছে। বংশ পরম্পরায় চাকর খাটলি যে বাড়িতে, সেই মনিবকে একবার জিগ্যেস পর্যন্ত করলি না? বিলের ধারে জমি, যা বোনা যায় তাই হয়। এই জমির লাগোয়া জমিও তো মোতাহারের। তা এই ভেদুটাকে মারলেই মনে হয় সব ঠাণ্ডা করা যায়! কিন্তু মোতাহারের ধারণা অন্যরকম।—সব শালাকে মারো, শত্রুর বীজ রাখা আহাম্মুকি।

বাইরে ট্রাক দাঁড়াবার আওয়াজ আসে। অন্ধকার রাত্রি। পশ্চিমের বন্ধ জানলার ছোট্টো ফাঁক দিয়ে দেখা যায় দুই ট্রাক ভর্তি জলপাই রঙের পোশাকধারী সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কবরের ওপারে কেবল বিশাল বিল, কুয়াশা এমন করে ঝোলে যে বিলকে সমুদ্র বা মাঠ এমন কি ওল্টানো আকাশ বলেও মনে হতে পারে। 'মেঝেতে শুয়ে পড়ো, শালারা এসে পড়তে পারে!' বলে মোতাহার তার নিজের ঘরে চলে যায়।

ট্রাক স্টার্ট দেওয়ার এবং এগিয়ে চলার আওয়াজ হয়। আস্তে আস্তে বিলের দিকে যাচ্ছে। ট্রাক এবার থামলো। হঠাৎ এল এম জি থেকে ব্রাশ ফায়ারের শব্দ হলো, ট্র ট্র ট্র ট্র! আবার সব নিঃশব্দ। তারপর প্রায় মিনিটখানেক ধরে গুলি চলে।

আজ কাঁঠালপোঁতা গ্রাম শেষ! ইকবাল মেঝেতে একবার এলিয়ে পড়ে। আজ কলুপাড়া শেষ! আজ নিকিরিপাড়া শেষ! তার বাপের চিহ্ন কি মুছে ফেলবে এরা? একটানা ব্রাশ ফায়ারের পর ফের নীরবতা। এই নীরবতা ভয়ানক ঠাণ্ডা! মনে হয় ঠাণ্ডা বরফের নল ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে কপালের ঠিক মাঝামাঝি।

হঠাৎ থ্রি নট থ্রি রাইফেল ছোঁড়ার আওয়াজ আসে। বহুদূর থেকে আসছে। মনে হয় দক্ষিণে বিলের পশ্চিম পাড়ে তেলিহারা গ্রামের পূর্বপ্রান্ত থেকে কেউ রাইফেল ছুঁড়ছে। তারপর ফের নিদারুণ নীরবতা। হঠাৎ এক ডাল থেকে অন্য ডালে বা এক গাছ থেকে অন্য গাছে উড়ে যায় এক ঝাঁক পাখি। গোলাগুলিতে ছিঁড়ে-যাওয়া কুয়াশার গলে-পড়ার ধ্বনি কোথায় চাপা পড়ে! পুকুরের ঘুম-ভাঙা ও স্বপ্ন-ছেঁড়া মাছদের চমকে ওঠার শব্দও লুপ্ত! ফের তেলিহার থেকে থ্রি নট থ্রি গুলি ছোঁড়া হচ্ছে। ৪বার, ৫ বার, ৬ বার, ৭ বার, ৮ বার। ট্রাক মনে হচ্ছে এবার ঐদিকে রওয়ানা হলো। ট্রাকের আওয়াজ ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসে। ব্যাপার কী? ট্রাক ওদিকে যাচ্ছে কেন? মোয়াজ্জেম হোসেন ফিসফিস করে বলে, 'ফোর্স তেলিহার যাচ্ছে। ওদিকে কেন?' তারপর নিজেই জবাব দেয়, 'শালারা কি ওদিকেই জড়ো হয়েছে?' ইকবাল তো কিছুই জানে না। তবে তার ধারণা ছিলো যে ভেদু তার লোকজন নিয়ে এই বাড়ির ঠিক উল্টোদিকে বিলের ওপারের গ্রামটিতেই পজিশ নেবে। তা ওরা অত দক্ষিণে চলে গেলো কেন? তেলিহার তো প্রায় মাইলখানেকের পথ। ফোর্সের ট্রাক দুটো তেলিহারের দিকে যাবার পর অবিরাম ব্রাশফায়ার চলতে থাকে। ওখানে বিলের মাঝখানে ছোটো একটা সোঁতা আছে, এখন পানি নাই, তবে থকথকে কাদা খুব ঠাণ্ডা। তাহলে দুটো রাইফেলের আওয়াজ শুনিয়ে ফোর্সকে কি ওরা ইচ্ছা করেই ওদিকে নিয়ে গেলো? মোয়াজ্জেম হোসেন এসব ভাবতে না ভাবতে পশ্চিমদিকে অজস্র মানুষের সমবেত পদধ্বনি এবং রাইফেলের আওয়াজ কানে আসে। রাইফেল আরো কাছে আসছে। মানুষের চিৎকার এখন খুব প্রকট। তাহলে কাঁঠালপোঁতার মানুষ কি বিলের সবটা দখল করে এবার এপারে চলে আসছে? তেলিহারের দিকে রাইফেল এখন স্তব্ধ; ফোর্সের লোকজন বোধহয় এবার গ্রাম জ্বালাচ্ছে। দারুণ হৈ চৈ শোনা যায়, দারুণ কোলাহল। এক মাইল কুয়াশা ভেদ করে সেইসব আর্তস্বর কানের চেয়ে মাথায় ঘা মারে বেশি। কিন্তু এদিকে এগিয়ে আসছে কাঁঠালপোঁতার মানুষ। দরজা ধাক্কা দিয়ে মোতাহার ঘরে ঢুকে বলে, 'বাবা, শুওরের বাচ্চারা তেলিহারের দিক থেকে কয়েকটা ফায়ার করে ফোর্সকে মিসগাইড করে নিয়ে গেছে। এদিকে কোনো ট্রাক নাই। ক্যাপ্টেন জিপ নিয়ে বগুড়ার দিকে চলে গেলো!'

মোয়াজ্জেম হোসেন কাঁপতে কাঁপতে বলে, 'কেন?'

'রিইনফোর্সমেন্ট!'

মোতাহার মেঝেতে শুয়ে পড়ে। মোয়াজ্জেম হোসেন ইকবালের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলে, 'ফোর্স তো আসছে। ততোক্ষণে আমরা কি থাকবো? এই বাড়ির কিছু রাখবে না ওরা। তোমার বাপের কবর ছাড়া এই বাড়ির কিছু

ছাড়বে না। সব ধ্বংস করবে। সর্বনাশ হবে।' মোতাহার চাপা গলায় ধমক দিলেও তার বাপ থামে না। কিংবা তার থামবার কোনো উপায় নাই। মনে হয়, তাকে কথার বমিতে পেয়ে বসেছে। সে একনাগাড়ে শব্দ বমি করে, 'এই বাড়ির একটা ইটও রাখবে না ওরা। ইকবাল আমার আর উদ্ধার নাই তোর বাপের দোহাই দিস, তোকে কিচ্ছু বলবে না। ভেদুর সাথে তোর বাপের খুব খাতির ছিলো। তুই পালা!' কিন্তু ইকবালের কি রেহাই আছে? বাপের সম্পত্তি দখল করতে এসে সে এসব কি ঝামেলায় পড়লো! কবরের মাথায় দাঁড়িয়ে সিগন্যাল দেওয়া তার আর হয়ে উঠলো না। এখন সে-ই বা রক্ষা পায় কীভাবে? মোয়াজ্জেম হাঁপাতে থাকে, 'তোকে কিছু বলবে না। তুই থাকলে আমার সম্পত্তিতেও শালারা হাত দেবে না। তোর বাপের কথা বললে শুওরের বাচ্চারা—।' মানুষ ও অস্ত্রের কোলাহলে তার বাক্য ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে মোয়াজ্জেম তার প্রবল বাসনা প্রকাশ করে, 'তোর বাপের পাশে যেন আমার কবর হয়।'

ইকবাল এবার উঠে দাঁড়ায়। হামাগুড়ি দিয়ে বারান্দা পেরিয়ে খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে পুকুরপাড়ে গেলো। এই কবর থেকে সব দেখা যাচ্ছে। বিলের ভেতর থেকে লুপ্ত জলধারা ফের সজীব ও সচল হয়ে স্রোতের মতো ঢেউয়ের মতো এগিয়ে আসছে বিল কি শালা আবার জলময় হয়ে উঠলো? এই শালা গ্রামের ব্যাপারে বোঝা বড়ো মুশকিল!

মানুষ আসছে। সামনে কয়েকজনের হাতে থ্রি নট থ্রি রাইফেল। পেছনে হাজার হাজার মানুষের হাতে কাস্তে, সড়কি, লাঠি ও দা। ইকবাল এটুকু জানে যে, এই গোষ্ঠিবদ্ধ মানুষ বড়োজোড় সকালপর্যন্ত টিকবে। বগুড়া কি রংপুর শহর থেকে রক্ষিবাহিনীর বড়ো দল আসছে। রক্ষিবাহিনীতে না কুলালে সেনাবাহিনী আসবে। কিন্তু তারা আসার আগেই এই বাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। টিকে থাকবে কেবল ওর বাপের কবর। আর এই চাঙ্গে পাশে ২৩ বছর ধরে বুক-করা কবরে সমাধিস্থ হয়ে টিকে থাকবে মোয়াজ্জেম হোসেন। ইকবাল লাফ দিয়ে বসে পড়ে শূন্য কবরের ওপর।—এতো সোজা! মোয়াজ্জেম হোসেন কে? ওর বিপ্লবী বাপের পাশে থাকবে এই শয়তান বুড়োটা? এই মানুষমারা, ঠক ও শোষক শয়তান জোতদার! এতো সোজা!

এই তো ওরা এসে পড়েছে! এই কবরে মোয়াজ্জেম হোসেনের থাকার কী অধিকার? ইকবাল নিজেই কবরে বেশ জুৎ করে বসলো। বাপের যা কিছু আছে সব তো তারই প্রাপ্য। শূন্য কবরে লাশের মতো শুয়ে সে একটু একটু করে পা নাচায়। এবার মরলে এখানেই তার চিরকালের আসন হয়ে থাকবে। চিরকাল? হ্যাঁ চিরকাল! কাঁঠালপোঁতার প্রবাহ এইতো এসে পড়লো। আসুক না! তার ভয় কী? তার জন্য নিশ্চিত অমরতা! বাপের ফলকের পাশে আরেকটি ফলক স্থাপিত হতে কতোদিন আর লাগবে? বিপুল মানুষের সমবেত পদযাত্রায় প্রচণ্ড ধ্বনি শুনতে শুনতে ইকবালের চোখ চকচক করে, জিভ দিয়ে সে ঠোঁট চাটে।

দোজখের ওম

কীটনাশকের কীর্তি

বাবা রমিজালী মিঞা,

পত্রে শত ২ দোয়া জানিবা পর সমাচার এই যে প্রায় মাসাধিককাল তুমার কুনরূপ সোম্বাদ না পাইয়া দুচ্চিন্তিত আছি। সোমাচার ইহা জানিবা যে তুমার ভইন অছিমুন্নেছা গত সমবার দিবাগত রাত্রে পোকের অউসুদ খাইয়া মরিয়া গিয়াছে। দারগা পুলিশে একুনে ৩ তিন টাকা কম ২৫০ টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে।

এই পর্যন্ত পড়ে সোনামিয়া ড্রাইভার ব্রেক কষে। ছোটো ছোটো কাঁচা অক্ষর, পোস্টকার্ড তিলপরিমাণ জায়গা নষ্ট করা হয় নি। রমিজের বোনের মৃত্যুসংবাদ পড়ে প্রথমেই তার হোঁচট খাওয়ার কথা, তবে কি-না এই হাতের লেখার মতো পড়াটাও তার তোতলা-তোতলা, তাই শব্দের দিকে মনোযোগ থাকে বেশি, কুঁতে কুঁতে বানান করে পড়তে পড়তে পুরো বাক্য কি বাক্যের মানে সঙ্গে সঙ্গে বোঝা তার আর হয়ে ওঠে না। এখন একটি মৃত্যুসংবাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক সংকটের প্রসঙ্গ যে সংঘাত তৈরি করেছে, তাতে তার মাথায় লাল সিগন্যাল জ্বলে উঠেছে। এই কয়েকটা লাইন বিড়বিড় করে ফের পড়ে সোনামিয়া তাকায় রমিজ আলির দিকে।

ট্রাকের পাদানিতে দাঁড়িয়ে রমিজ আলি তার চিঠি-পড়া শুনছে। বিকালবেলার রোদ শিরীষ গাছ ছুঁয়ে নেমে তার মুখে ডোরাকাটা আলোছায়া ফ্যালে; তাই, রমিজ আলির চোখে কি ঠোঁটে একটু কাঁপন থাকলেও মুখের গোটা পাড়ায় কেমন সাড়া পড়েছে বোঝা মুশকিল। সোনামিয়া থতমত খায়, আত্মহত্যা করেছে—সেই মেয়েটি তাহলে কে? রমিজ আলির চোখমুখঠোঁটে সে সাড়া দ্যাখার চেষ্টা করে, 'তর বইনে মনে লয় মইরা গেছে। তুই কিছু জানস না?'

'না। পড়েন।' রমিজ আলির এরকম বাষ্পহীন গলার জবাব শুনে সোনামিয়ার অস্বস্তি হয়। বোনের আত্মহত্যার বিষয়টি রমিজ আলিকে অনুভব করানো খুব জরুরি—এই বিবেচনা তার তেলমবিল-শোষা গর্দানে খামচা-খামচি করলে সে বলে, 'তর বইনে মনে লয় র‍্যাটম উটম কি এনড্রিন উনড্রিন খাইছে। কতো বড়ো বইন?'

'বিয়া দিছিলাম তিন মাস।'

'তর বড়ো না?'

'হ।' রমিজ তাড়া দেয়, 'পড়েন।'

সোনামিয়া ফের প্রথম থেকে পড়তে শুরু করলে রমিজ আলি বাধা দেয়, 'এইগুলি তো পড়ছেন।'

সোনামিয়াকে সুতরাং পড়তে হয় পরবর্তী বাক্য, 'আরও জানিবা যে মিরধাবাড়ির আছমত আলির পাওনা ২৪৫ টাকার জন্য দুইশত পাচ্চাল্লিশ টাকার জন্য বার ২ তাগাদা দিতাছে, তাগাদার জন্য হাটে যাওন একরূপ অসম্ভাব হইয়া পরিয়াছে। পুলিশ দিয়া বেইজ্জত করিবে এইরূপ সাসাইয়া বেড়ায়।' সোনামিয়া একটু বিরতি দেয়, 'আসমত আলি ক্যাঠা? ট্যাকা পাইবো তর বাপের কাছে?'

'পাইতে পারে, আমরা হ্যাগো জমিন করি। পড়েন।'

'পড়ি।' সোনামিয়া তাকে গাড়ির ভেতরে আসতে বলে, 'তুই এহেনে আয় না।' পাশের সিটে বসার জন্য রমিজকে এরকম আমন্ত্রণ সে কখনো করে না। ট্রাক চালানো শেখাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রমিজ আলিকে দিয়ে সে হাতপা টেপায়, আরো কিছু করতে ইচ্ছা করলে গাড়ির যন্ত্রপাতির নাম আওড়ায়—কিন্তু সেসব আদর সোহাগ গ্যারেজের ওপরতলায় তার থাকার ঘরে। ট্রাকের এই ড্রাইভারের আসন তার পবিত্র জায়গা, আকামের সঙ্গীকে এখানে ঢোকাতে সোনামিয়ার বাধে। এখন তার এই হঠাৎ-উদারতায় রমিজ সাড়া দেয় না, পাদানিতে দাঁড়িয়েই সে তাড়া দেয়, 'পড়েন না। সায়েবরে চা দিতে হইবো।'

চিঠি পড়া শেষ হলে পাদানি থেকে নেমে রমিজ চলে যায় বাড়ির মূল দালানে। সিঁড়ি পেরিয়ে নেট-ঘেরা চওড়া বারান্দা। কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পড়বে সায়েবের মেয়ে, এই বারান্দায় বসেই গল্প করতে করতে বাপে-বেটিতে চা খাবে। বিবিসায়েব এসে পড়লে অবশ্য একটু ভেতরে গিয়ে খাবার টেবিলে বসতে হবে, চায়ের সঙ্গে নাশতা থাকলে যেখানে সেখানে খাওয়া দাওয়া বিবিসায়েবের পছন্দ নয়। নতুন সাদা গাড়িটা নিয়ে বিবিসায়েব বেরিয়ে গেলো একটু আগে। সায়েব এখন একা এবং বেশ ঢিলেঢালা। তাকে কিছু বলতে হলে এটাই সবচেয়ে ভালো সময়।

পাজামা পাঞ্জাবি পরে ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে সায়েব খবরের কাগজ পড়ছিলো, তার পায়ের কাছে শুয়ে রয়েছে বাড়ির প্রধান এ্যালসেশিয়ানটি, সায়েব তার পিঠে খালিপায়ের মিষ্টি মিষ্টি চাপ দিচ্ছিলো। স্প্রিঙ-লাগানো দরজা ঠেলে রমিজ আলিকে বারান্দায় উঠতে দেখে কুকুর গর্‌র্ গর্‌র্ আওয়াজ করে। কাগজের আড়ালে মুখ রেখেই সায়েব বলে, 'একটু পরে চা দিস। শাম্মী আসুক।'

'স্যার, আমার বইনে—।'

কিন্তু কুকুরের গর্‌র্ গর্‌র্ কথায় তার আওয়াজ চাপা পড়ে। ওকে দেখে কুকুর ঘন ঘন ল্যাজ নাড়ে, সর্বাঙ্গ কাঁপায় এবং গলার অনেকটা ভেতর থেকে একইরকম

ধ্বনি অবিরাম ছাড়তে থাকে। ধ্বনির এই একটানা গতি সায়েবের পছন্দ নয়। স্বরকে আদুরে রেন্‌জের মধ্যে রেখে সায়েব আপত্তি জানায়, 'নো, জিপসি নো।'

এতোক্ষণ সায়েবের মনোযোগ ছিলো কেবল খবরের কাগজে, এখন কুকুরের দিকেও তার নজর। সায়েবের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য কিংবা অন্তত খবরের কাগজ থেকে তার মনোযোগ সরাবার জন্য কিংবা কী করবে বুঝতে না পেরে রমিজ আলি কুকুরকে ডাকে, 'জিপসি চলো।'

জিপসি এক ডাকে উঠে দাঁড়ায়। সায়েব তখন ঘেউ করে ওঠে, 'ওকে ডাকছিস কেন?'

রমিজ সঙ্গে সঙ্গে তার আহ্বান প্রত্যাহার করে নেয়, 'বসো জিপসি, বসো।' তবে ওর গলা সায়েব বা এ্যালসেশিয়ানের মতো গম্ভীর নয় বলে এই নির্দেশে মিনতির ভাব। জিপসি তবু দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়তে শুরু করলে রমিজ ভয় পায়। সায়েব চোখ ছোটো করে জিপসিকে দ্যাখে, রমিজকে হঠাৎ জিগ্যেস করে, 'জিপসিকে খেতে দেয় কে?'

'জি আমি দেই।' ঘাবড়ে গিয়ে এই মিথ্যা কথাটি বলে রমিজ বরং সায়েবের সুবিধা করে দেয়, 'তোর তো খেতে দেওয়ার কথা নয়, এই ডিউটি আবদুলের না? ওর খাবার কি নিজেই খেয়ে নিস?'

কয়েক বছর এই বাড়ির ভাত পেটে পড়ায় রমিজ একটু মোটা হয়েছে বৈ কি! জিপসির রোগা শরীর ও নিজের মোটা গতরের কারণে সে বেশ জড়সড় হয়। এখন বোনের আত্মহত্যা ও টাকার কথাটা তোলে কী করে? কুত্তার বাচ্চা জিপসি আজ সব বরবাদ করে দিলো। নইলে সায়েব কিন্তু হঠাৎ করে মেজাজ খারাপ করার লোক নয়। ১টা কাপড়ের মিল, ১টা কাচের কারখানা, শোনা যাচ্ছে ইলেকট্রিক বাল্‌ব তৈরি করে ফরেনে পাঠাবে—টাকাপয়সা বলো, গাড়ি বলো, বাড়ি বলো, চাকরবাকর বলো, কুকুর বিড়াল বলো—কোনো লেখাজোকা নাই। কিন্তু বাড়ির ভেতর ঢুকলো তো মাটির মানুষ। এই মেয়ের মুখে জোর করে কেকের টুকরা গুঁজে দিচ্ছে, ক্লাস টেনে পড়া ছেলের পকেটে টাকা গুঁজে দিয়ে বলছে, খিদে পেলে কিছু খেয়ে নিও, যেখানে সেখানে খাবে না কিন্তু। চাকরবাকর ড্রাইভার দারোয়ানের সঙ্গে খ্যাচাখেচি করার অভ্যাস তার নাই বললেই চলে। তাদের একটু আধটু চুরি কি ফাঁকি টের পেলেও সেদিকে চোখ ফিরিয়ে থাকে। কাউকে পছন্দ হলো না তো পুরো মাসের বেতন দিয়ে তাকে ছাঁটাই করে দেয়। এই অপ্রিয় কাজটিও সরাসরি নিজে করে না, সিনিয়ার কোনো চাকর কি ড্রাইভার দারোয়ান দিয়ে করিয়ে নেয়। বিবিসায়েব কাউকে বেশি বকাবকি করলে সায়েব বরং ভ্রূ কোঁচকায়, 'চ্যাঁচামেচি করে শরীর নষ্ট করার মানে হয়? কাজ না করলো তো পাছায় দুটো লাথি দিয়ে বের করে দাও।'—এখন রমিজ আলি তার সবুজ ডোরাকাটা লুঙির তলায় পাছা একটুখানি চুলকে নেয়।

খবরের কাগজের পাতা এদিকে ওদিক করতে করতে সায়েব স্বর নামিয়ে বলে, 'চুরি করবি না, কিছু খেতে ইচ্ছা করলে পয়সা চেয়ে নিস।'

এই স্পষ্ট আহ্বান সত্ত্বেও রমিজ সাড়া দিতে পারে না। এই কুত্তা হারামজাদা সব নষ্ট করে দিলো। অথচ সময় চলে যাচ্ছে হু হু করে, সন্ধ্যা পর্যন্ত আরিচার বাস পাওয়া যাবে, এখানেই যদি ৭টা বেজে যায় তো আজ আর যাওয়া হলো না। এখন বোনের মৃত্যুর খবর না দিয়ে সায়েবের কাছে টাকা চায় কী করে? আবার বোন কীভাবে মারা গেলো সেই ঘটনাটি ছাপিয়ে ওঠে জ্যান্ত অসিমুন্নেসার এই-স্থির এই-অস্থির চেহারা। মরেও অসিমুন্নেসার ছটফটানি ব্যারাম সারে না, তার কালো রোগা আঙুল দিয়ে চেপে ধরেছে রমিজের ঠোঁট, সেইসব আঙুল সরিয়ে দেওয়ার জন্য রমিজ ঠোঁট কাঁপায়। ঠোঁট থেকে বোনের আঙুল সরানো এবং সায়েবের কাছে টাকা চাওয়া—উভয় উদ্দেশ্যে সে গলা খাঁকারি দিয়ে বলতে যাবে, স্যার আমার বইনে মইরা গেছে চিঠি আসছে, পোকের ওষুদ খাইয়া মরছে, পুলিশের খরচ গেছে তিনশো ট্যাকার উপরে—নাকি আরো শখানেক টাকা বেশি চাইবে—আল্লার কসম স্যার, বিশ্বাস না পান তো এই যে চিঠি আসছে দ্যাখেন—চিঠি কি আর সায়েব সবটা পড়বে?—ভয় হয় সায়েব যদি জিগ্যেস করে ওষুধ খেয়ে মরলো কেন?—তাই তো, বুবু পোকার ওষুধ কেন খায় সেই কৈফিয়ৎ এখন সে কী করে দেয়? বুবুর স্বামী হাফিজুদ্দি ঠিক বলতে পারে বৌ তার পোকার ওষুধ খায় কেন? মিরধাবাড়ির ম্যাট্রিকপাসকেও জিগ্যেস করলে হয়। হাফিজুদ্দি ও ম্যাট্রিকপাসের সঙ্গে জোটে অসিমুন্নেসার বাপ, তার পিছে উঁকি দেয় অসিমুন্নেসার মা, ম্যাট্রিকপাসের বাপ কিসমত হাজি, ধলেশ্বরীর তীরে ম্যাট্রিকপাসের সাজানো গোছানো মনিহারি দোকান, দোকানের পাশে বড়ো রাস্তায় বাস যাচ্ছে, বাস বোঝাই মানুষ—সবই এলোমেলোভাবে চলে যায়, নানা ঢেউয়ের ওপর ওঠানামা করে, স্রোতের ওপর দিয়ে ঢেউ চলে যায়, ১টা থেকে ১টা আলাদা করা যায় না। এর সঙ্গে যায় শালার টাইম। সময় যায়। টাকা আর চাওয়া হয় না। না, সরাসরি টাকা চাওয়াই ভালো, টাকা চাইলে সায়েব সব জিগ্যেস করবে, তখন যা বলার এমনি বলা হবে, রমিজের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবে, এতো চিন্তাভাবনার দরকার হবে না। সায়েবের পায়ের নখে চোখ রেখে 'সায়েব আমারে কিছু ট্যাকা দিতে হইবো, আমার বইনে মইরা গেছে'—এই কথা বলার জন্য রমিজ ঠোঁট খুলছে এমন সময় দেওয়ালের ঘড়িতে কলের পাখির ডাক বেজে ওঠে। শেষ ডাকটির জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হয়। ৫ বার ডেকে পাখি থামে। এই ফাঁকে রমিজ তার বাক্যটিকে সম্প্রসারিত করবার সুযোগ পায়, তবে হারামজাদা পাখি সব তছনছ করে দিয়েছে বলে কথাবার্তা যা বলবার সবই ফের প্রথম থেকে ঠিকঠাক করতে অনেকটা সময় নষ্ট হলো। 'সায়েব, বাড়ি থাইকা চিঠি আইছে, পোকের ওষুদ খাইয়া আমার বইনে মইরা গেছে, আমারে আইজ বাড়ি যাইতে হইবো, কিছু ট্যাকা দ্যান, দারোগা পুলিশের খরচ যোগাইতে বাবার চাইরশো টাকার উপরে করজো হইছে'—কিন্তু কথা শুরু করার আগেই মাইকে হুংকার দেয় আসরের আজান। আজানে তার শোক সংগঠিত হয় না, কিংবা এর পরিচিত টানা ধ্বনি

অসিমুন্নেসাকে তাদের কাছ থেকে চিরকালের জন্য টেনে নেওয়ার ব্যাপারটিকে আরো তীক্ষ্ণ করে বাজায় না। বরং সাজানো গোছানো সব কথা লণ্ডভণ্ড করে দিলে তাকে ফের প্রথম থেকে বাক্য তৈরির কসরত চালাতে হয়। কিন্তু এর মধ্যে সায়েবের হাত থেকে খবরের কাগজ পড়ে যায় মেঝেতে। সায়েবের মৃদু নাক ডাকে। রমিজের এবারের প্রতীক্ষা সায়েবের জাগরণের তরে। কয়েক মিনিটের মধ্যে সায়েবের তন্দ্রা ভাঙে, কিন্তু সেটা গাড়ি বারান্দায় লাল টয়োটো করোলার প্রায়-নিঃশব্দ আবির্ভাবের ফলে। সায়েবের মেয়ে এসে পড়েছে। রমিজ আলি ছাড়ে না, বরং নতুন করে তৈরি হওয়ার উদ্যোগ নেয়। আপার মুড আজকাল সবসময়ই ভালো। ইউনিভার্সিটিতে নতুন ঢুকেছে, সব ব্যাপারেই তার হৈচৈ, পায়ের নিচে স্প্রিঙ ফিট করা, ইচ্ছা হলেই তিড়িং বিড়িং করে ওপরে উঠছে নিচে নামছে; এদিক হেলছে, ওদিক দুলছে। বাপের সঙ্গে গলায় গলায় খাতির। মেয়ের সঙ্গে চা খাবে বলেই সায়েব কোনো কোনো বিকালবেলা এই বারান্দায় বসে। এই মেয়ের কল্যাণেই বাড়ির লোকজন মাঝে মাঝে বিকালবেলা অন্তত ঘণ্টা দুয়েক সায়েবকে এখানে দেখতে পায়। আরো আগে, এই ধরো বছরখানেক আগেও সন্ধ্যাবেলাটা কিন্তু সায়েব ঘরেই কাটাতো, সন্ধ্যার পর মেহমানরা আসতো, এখানেই জমে উঠতো প্লেটের কাটার বোতলের গ্লাসের টুংটাং বোল। আজকাল ওসব চালান হয়ে গেছে সোনারগাঁও পূর্বাণী শেরাটনে।—কতো সব হোটেল, কী সুন্দর সুন্দর নাম, ড্রাইভারদের মুখে শুনতে শুনতে রমিজের মুখস্থ হয়ে গেছে। এইসব হোটেলের কথা অসিমুন্নেসাকে বলা হলো না। বুবুটা ঢাকার কথা শুনতে বড়ো ভালোবাসে। গুলিস্তান, শিশুপার্ক, নিউ মার্কেট, স্টেডিয়াম, হাইকোর্টের মাজার—কোনোদিন ঢাকায় না এসেও এইসব জায়গা বুবুর জিভে লেগে থাকে থুথুর মতো। মিরধাবাড়ির ম্যাট্রিকপাস তার বুবুর চোখের মণিতে দাঁড়িয়ে কালো দোহারা শরীরটা এমনভাবে দোলায় যে তাকে মুছে ফেলার জন্য রমিজের আঙুলগুলো শিরশির শিরশির করে। কিন্তু সায়েবের মেয়ের সরব হাজিরা ঘটায় তার আঙুল টাঙুল যেখানে থাকার সেখানেই থাকে এবং ঐগুলোকে ঐভাবে রেখেই রমিজ নেমে আসে গাড়ি-বারান্দায়।

ধিনিক ধিনিক নাচতে নাচতে মেয়ে ছোট্টো ধাক্কায় দরজা ঠেলে উঠে আসে নেটমোরা বারান্দায়। তার পিছে পিছে রমিজ। সায়েবের মেয়ে কোনোদিকে না তাকিয়ে এসে সটান বসে পড়ে বাপের পায়ের কাছে কার্পেটের ওপর। বসেই কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, 'আব্বু, তুমি না কী যে করো! তোমাকে কতোবার বললাম আজ আমাদের ফাইন্যাল। তোমার কিচ্ছু মনে থাকে না, আর ইউ গ্রোইং ওল্ড? কথাকলিতে আমার পারফরম্যান্স বেস্ট, এই দ্যাখো মেডেল, হান্ড্রেড পার্সেন্ট গোল্ড। আমার আইটেমের এন্টায়ারটা ভিডিও করেছে, নেক্সট ওয়েনজডে ছয় নম্বর চ্যানেলে দ্যাখাবে, এটা আবার মিস করো না কিন্তু!' বেগুনি সিল্কের ফিতায় বাঁধা সোনার মেডেল দ্যাখানো শেষ হলে তার কাঁদো কাঁদো ভাব কাটে এবং সঙ্গে সঙ্গেই গলায় ওঠে নতুন ঢেউ, এটা একেবারে আলাদা কিসিমের। 'আব্বু, আজ না

আরেকটু হলেই মরে যেতাম। ভাগ্যিস মরিনি!' তারপর পুরো ৫ মিনিট সে মাঝে মাঝে বাঙলা ভেজাল-দেওয়া ইংরেজি ঝাড়ে। তা এই বাসায় রমিজের অনেকদিন তো হয়ে গেলো, দিব্যি বুঝতে পারে যে শিল্পকলা এ্যাকাডেমি থেকে ফেরার সময় কাকরাইলের মোড়ে একটা ট্রাক সাঁ করে চলে গেছে তার গাড়ির গা ঘেঁষে, ইঞ্চিখানেক এদিক ওদিক হলে এতোক্ষণ তার লাশ চলে যেতো পিজি হাসপাতালে। শুনে সায়েব মতিন ড্রাইভারকে ডেকে আনার জন্য রমিজকে হুকুম দিলো। তার মানে ১ মাসের বেতন দিয়ে আবদুল মতিনকে বিদায়। কিন্তু সায়েবের মেয়ের দয়ার শরীর, 'না আব্বু, গাড়ি চালাচ্ছিলাম আমি নিজেই। ড্রাইভারকে স্টিয়ারিং দিয়েছি ট্রাক চলে যাবার পর।' তাতে অবশ্য রমিজ আলির ভয় কাটে না। কাঁদো কাঁদো গলায় নাচে মেডেল পাওয়ার খবর এবং মহা উল্লাসে প্রায়-এ্যাকসিডেন্টের বিবরণ দেয় যে মেয়ে তাকে ঠিকমতো ঠাহর করাই রমিজের পক্ষে শক্ত ঠেকে। তাকে আবার শুরু থেকে কথা তৈরির উদ্যম নিতে হয়। সায়েবের মেয়ে লাফ দিয়ে উঠে ড্রইং রুম পেরিয়ে ডাইনিং রুমে ঢুকে রেফ্রিজারেটার খুলে বোতল বার করে ঢকঢক করে পানি খায়। সায়েব এখান থেকেই ধমক দেয়, 'শাম্মি, খালি পেটে পানি খায় না।' মেয়ে তখন বেরিয়ে আসে কোকাকোলার বোতল খুলতে খুলতে। সায়েব বলে, 'এখন কোক খেও না, এ্যাসিড হবে।' তবু ২/৩ ঢোক কোকাকোলা গিলে 'ওঃ আব্বু!' বলে মেয়ে ফের ভেতরে যায়, বেরিয়ে আসে লিচুর গোছা হাতে। ১টা লিচুর বোঁটার দিকে খোসা ছাড়িয়ে ঠোঁটজোড়া ছুঁচলো করে সবটা লিচু সে মুখের ভেতর টেনে নেয় চুকচুক আওয়াজ করে। এই চুকচুকটা এমনি তীক্ষ্ণ যে শুধু লিচু খেয়ে সায়েবের মেয়ে এর ধার ক্ষয় করতে পারে না, অসিমুন্নেসার তেঁতুল চোষাতেও এর প্রতিধ্বনি সমান জোরে বাজে। তাই এই বাড়িতে, এই কার্পেটে তেঁতুলতলায় দাঁড়িয়ে অসিমুন্নেসা হেসে গড়িয়ে পড়ে। তার চুকচুক আর চটাৎ চটাৎ তেঁতুল খাওয়া আর থামে না। ম্যাট্রিকপাস কী যে রঙের কথা বলে আর তাই শুনে অসিমুন্নেসা চলকে চলকে হাসে।—অ বুবু মায়ে ডাকে, মায়ে কহন থাইকা ডাক পাড়ে হোনস না?—না তার ডাকাডাকিতে বুবু সাড়া দেয় না। বরং তেঁতুলের চুকচুক আর চটাৎ চটাতের ফাঁকে নালিশ করে, 'মায়ে না আমারে এককেরে ফুরসৎ দিবার চায় না, জানেন? এতো কাম করলে মানষে বাঁচে?' মিরধাবাড়ির ম্যাট্রিকপাস হাসতে হাসতে বলে, 'তর এতো কাম করনের দরকার কী।'—তা মা আর কী করবে? মিরধাদের রান্নাঘরের বারান্দায় পড়ে আছে একগাদা এঁটো বাসনকোসন, উঠানে পড়ে আছে সেদ্ধ করার জন্য ধানের স্তূপ। এতো কাজ কি মা একহাতে সারতে পারে?—এ ছাড়া আরো আছে। মিরধাদের পোয়াতি বৌটা কাল ভাত খায়নি, পান্তা পড়ে আছে এক গামলা, একা খেতে কি মায়ের মন টানে?—আরো আছে।—মিরধাদের ম্যাট্রিকপাসের সঙ্গে মেয়েকে হেসে হেসে কথা বলতে দেখে মায়ের বুক ঢিপঢিপ করে। তা মায়ের ডাকটা তখন যদি বুবুর কানে যায়! অ বুবু! মায়ে ডাকে, বুবু

সাড়া দেয় না। অ বুবু! বাজানে ডাকে, বুবু সাড়া দেয় না। বাঁশের থামের মতো ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে রমিজ। ধলেশ্বরী থেকে বাতাস আসে। ইলিশের গন্ধ চোঁয়ানো বাতাসে রমিজের খিদে পায়। বুবুর লালচে-কালো চুল ওড়ে পাটের ছেঁড়া আঁশের মতো। বুবুর সাড়া পাওয়া যায় না।

'চা দাও।'

বিবিসায়েব কখন এসে পড়েছে রমিজ খেয়াল করেনি। তার এই সংক্ষিপ্ত নির্দেশে তেঁতুলতলায় ঝড় ওঠে এবং সব এলোমেলো হয়ে যায়। তবে এই ঝড়ের সঙ্গে আসা ঠাণ্ডা হাওয়া রমিজের মাথায় নতুন সুড়সুড়ি তোলে; বিবিসায়েবকে বলতে পারলে কাজ হয়। গুছিয়ে বলতে হবে।—কী বলবে?—না, আম্মা, আমারে কয়টা ট্যাকা দিতে হয়। কেন?—আমার বইনে মারা গেছে পোকের ওষুদ খাইয়া। কীভাবে মরলো?—কারণটা বলা মুশকিল। জি, বাজানে চিঠি লেখছে, পোকের ওষুদ বলে খাইছিলো। কেন?—হঠাৎ করে মাথাটা খুলে গেলো রমিজের।—মিরধাবাড়ির ম্যাট্রিকপাসের কথা ভালো করে বলতে পারলে বিবিসায়েবের মন ভেজানো কোনো কঠিন কাজ নয়। তো সে লোক করলোটা কী?—সে তো অসিমুন্নেসাকে মারধোর করেনি, কিংবা বিয়েও করেনি যে ছেড়ে দেওয়ার ভয় দ্যাখাবে। যেসব মেয়েমানুষের ওপর জুলুম হয় তাদের বাঁচাবার জন্য বিবিসায়েব বড়ো উদগ্রীব। কিন্তু ম্যাট্রিকপাসের জুলুমের কথা কী বলবে? এক বলা যায় হাফিজুদ্দির কথা। অসিমুন্নেসা হলো হাফিজুদ্দির বিয়ে করা বৌ, অথচ হাফিজুদ্দি তাকে ঘরে নেবে না। এটা জুলুম হলো না? হাফিজুদ্দির শয়তানির কথা শুনলে বিবিসায়েব এমন চটবে যে হারামজাদাকে শেষপর্যন্ত জেলের ভাত খেতে না হয়! বিবি সায়েবকে তো ওরা চেনে না। বিবিসায়েবদের একটা দলই আছে শুধু পুরুষমানুষের জুলুম বন্ধ করার জন্য। এই যে ভাত খেয়ে ভর দুপুরবেলা গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলো, অন্তত কয়েকটা মিটিং না সেরে ফিরলো না। রমিজদের মতো গরিব গরবা ছোটোলোকদের মেয়েদের নিয়েই বিবিসায়েবদের সমিতির মাথাব্যথা বেশি। সমিতির সব ভালো ভালো বড়ো বড়ো ঘরের বিবিসায়েবরা, ফর্সা ফর্সা মেয়েরা বড়ো রাস্তার মোড়ে গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে বস্তিতে যাচ্ছে; ঘরে ঘরে খোঁজখবর নিচ্ছে, কোন রিকশাওয়ালা বৌকে রেখে হাওয়া হয়ে গেছে, বন্যায় গ্রাম থেকে ভেসে-আসা কোন মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছে, তাকে খুঁজে বের করে শাসাচ্ছে, হয় বৌকে নাও, না হলে খোরপোষের ব্যবস্থা করো। শয়তান রিকশাওয়ালা তালাক দিয়ে শেষপর্যন্ত প্রাণে বাঁচে। এক শালা দিনমজুর রোজ ভোরবেলা উঠেই বৌকে বেদম পেটায়, বিবিসায়েবদের পাট্টি তাকে এ্যায়সা ধমক লাগায় যে পরদিন বৌ পেটাবার দায়িত্ব সেরেই ব্যাটা কোথায় উধাও হয় যে তার আর উদ্দিশ মেলে না। পুরুষমানুষের জুলুম ঠেকাবার জন্য বিবিসায়েবরা চাঁদা তুলে কোর্টকাছারি পর্যন্ত করে। একবার অনেক টাকা তুলে প্রেসিডেন্টকে দিয়ে এলো, ঐ টাকা দিয়ে প্রেসিডেন্ট গরিব দুঃখী মেয়েমানুষদের ওপর জুলুম ঠেকাবে। রমিজ সেদিন টেলিভিশনে দেখলো, প্রেসিডেন্ট আর কয়েকজন মন্ত্রীর সঙ্গে

বিবিসায়েব তার সমিতির মহিলাদের নিয়ে কীসব কথা বললো, কেউই কিন্তু সেভাবে হাসছিলো না, মনে হয় মেয়েমানুষদের ওপর জুলুমের কথা মনে থাকায় সবারই মন খারাপ ছিলো। তো কথা শোনা গিয়েছিলো খালি প্রেসিডেন্টের, টেলিভিশনে গেলে আর কেউ মনে হয় কথা বলতে পারে না। বিবিসায়েব কিন্তু মিটিং টিটিঙে খুব সুন্দর বলতে পারে। পুরুষমানুষের শয়তানি বন্ধ করার ফন্দি শেখার জন্য বিবিসায়েব একেকবার বিলাত লন্ডন এ্যামেরিকা বোম্বাই কোথায় কোথায় যায়, তো একবার ফিরে এসে এই বাড়িতেই মিটিং করলো; খবরের কাগজের লোক, টেলিভশনের লোক, রেডিওর লোক এসেছিলো, বিবিসায়েব যে কী সুন্দর কথা বললো সে না শুনলে বিশ্বাস হবে না। এমনিতে কড়া লোক, তার দিকে তাকানো কঠিন, কিন্তু এটুকু কড়া না হলে জুলুম বন্ধ করবে কী করে? হাফিজুদ্দিকে যদি একবার এখানে এনে বিবিসায়েবের সামনে ফেলা যায় তো শালার হাড্ডিমাংস এক করে বস্তায় পুরে তেঁতুলতলায় পুঁতে রাখার সুবিধা হয়। কিন্তু তেঁতুলতলা দখল করে থাকে শালা ম্যাট্রিকপাস।—এবার রমিজ একটু দমে গেলো। ম্যাট্রিকপাস শিক্ষিত লোক, তার ওপর জমিজমা, হালগোরু, কিষাণপাট, সিঙাইড়ে মনিহারির দোকান, পাটের আড়ত।—তাকে ধরা কি সোজা কথা? —তা বিবিসায়েবের খাতির তো আরো কতো বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গে। বিবিসায়েবের কাছে টাকা চেয়ে নিয়ে সোজা থানায় গিয়ে হুকুম করো দারোগাকে, কী?—না বিবিসায়েবের হুকুম, মানে তোর বাপের হুকুম, বাপের বাপ মন্ত্রী প্রেসিডেন্টের হুকুম, ধরে নিয়ে আয় শালা মৃধাবাড়ির ভাদাইম্যা শয়তানটাকে। ওদের তেঁতুলতলাতেই এনে দে। তারপর শালার চুলের মুঠি ধরে প্রথমেই নাকে ধমাধম কয়েকটা ঘুষি লাগাও। লাগাও ঘুষি। লাগাও। নাকের হাড্ডি ভেঙে গুঁড়ো করে দাও। ওওরের বাচ্চা নিশ্বাস নিবি কী করে দেখবো। ঘুষি লাগালেও শয়তানটার মুখের দিকে তাকাতে পারে না রমিজ, কারণ লোকটা হাজার হলেও ওদের মনিব বললেই চলে। হঠাৎ কী মনে করে লক্ষ করলে তার হাত জমে যায়, সে ঘুষি লাগাচ্ছে কার মুখে? এ লোকটা কে? হাফিজুদ্দির মুখ রক্তে ভেসে যায়, কালো মুখে লাল রক্ত নিয়ে সে একটানা গোঙায়। পুলিসের লোক মিরধাবাড়ির টাকা খেয়ে কাকে নিয়ে এসেছে? ওদের সঙ্গে কি পারা যায়? পুলিস না পাঠিয়ে সে নিজেই যদি ধরতে চায় তো ম্যাট্রিকপাসের কি আর নাগাল পাবে? তাকে ধরবে কীভাবে?—

'ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে কী করছো? চা দাও।' রমিজের সামনে থেকে মৃধাবাড়িকে মার দেওয়ার সম্ভাব্য রিহার্সেল সমূলে উপড়ে ফেলে বিবিসায়েব নিচু ও ঠাণ্ডা স্বরে বলে, 'চা দাও।'

রাত্রে খেতে বসে সোনামিয়া জিগ্যেস করে, 'ট্যাকা পাইছস?'

রমিজ মাথা নাড়লে ফের বলে, 'সায়েব কী কয়?' রমিজ তবু কিছু না বললে ড্রাইভার বলে, 'বাড়ি যাইবি না?' জবাব না দিয়ে রমিজ সোনামিয়ার পাতে ভাত

বাড়ে। কয়েক গ্রাস খেয়ে সোনামিয়া মেঝের কোণে মশা-মারা কয়েলের ওপর রাখা প্যাকেটের দিকে বাঁ হাতের তর্জনী নির্দেশ করে, 'তর বইনে মনে লয় ঐগুলি খাইছিলো।' জিনিসটা হাতে নিয়ে রমিজ দেখলো র‍্যাটমের প্যাকেট। ঘরে ইঁদুরের উৎপাত বলে রমিজকে দিয়েই ড্রাইভার আনিয়ে নিয়েছে। প্যাকেটের ওপর রঙিন ছবি। ছবিতে কাদের চেহারা? কারা? কাদের ছবি? রমিজ তন্ময় হয়ে দেখতে থাকলে কিছুক্ষণের মধ্যে ছবির বিষয়বস্তু আকার পায়। চিৎপটাং হয়ে পড়ে রয়েছে ইঁদুর, আরশোলা, মাকড়শা, ছারপোকা, মশা এবং মাছি। দেখতে দেখতে ছবির অধিবাসীরা একটু আধটু নড়াচড়া করে। ঠিক নড়াচড়া নয়, মনে হয় আর কেউ ঢুকে পড়ায় তাদের মরা শরীরগুলো আপনাআপনি সরে সরে যাচ্ছে। আগন্তুককে জায়গা করে দিলে গভীর পানির নিচে একটি মুখ মাছের মতো ভেসে বেড়ায়। এটা কী? ধ্যাবড়ানো ছবির এলিয়েপড়া পোকামাকড়ের ফাঁকে ফাঁকে, কখনো ওপরে কখনো নিচে ঐ জীবটি একাই কিলবিল করে। আর সব পোকামাকড়ের মতো সে মরেনি, মরলে তার নড়াচড়া বোঝা যাচ্ছে কী করে? একেকবার থিতু হতে হতে ফের ছড়িয়ে পড়ে। ঐ জীবটিকে সনাক্ত করার জন্য খুব মনোযোগ দিয়ে তাকে মাথা ঘামাতে যাচ্ছে। আরশোলার শুঁড়ের মতো কালচে-লাল ধারালো চুল, গায়ের রঙ ইঁদুরের চামড়ার মতো ছাই ছাই। কে? এটা কার মুখ?

'তর বইনের কী হইছিলো রে?' সোনামিয়ার এই প্রশ্ন কানে গেলেও বাক্যটি ঐ ছবির মতোই তার কাছে অস্পষ্ট ঠেকে। সন্ধ্যাবেলা সোনামিয়া কাপ্তান বাজার থেকে বাঙলা মদ টেনে এসেছে, তার মুডটা ভালোই ছিলো। কিন্তু রমিজের একটানা নীরবতায় তার মেজাজ খিচড়ে আসে। ছোঁড়াটা আদর বোঝে না। সেই কি-না তার চিঠি পড়ে দিলো, চিঠিতে এতো সাঙ্ঘাতিক খারাপ খবর,—তা কি পরামর্শ করবে, উপদেশ চাইবে, দুটো সান্ত্বনার কথা শুনবে,—তা না, ছ্যামরা তখন ঘাড় ত্যারা কইরা রোয়াবি মারে। রাগ করে মাছের দ্বিতীয় টুকরাটিও সোনামিয়া বাটি থেকে নিজের পাতে ঢেলে নেয়। অথচ রমিজ আলির তরকারিও কিন্তু এই বাটিতেই ছিলো।— খাওনের দিকে গেরাইম্যাটার লালচ এট্টু বেশি।—তার নিজের মাছগোশতের টুকরা টাকরা দিয়েই তো সোনামিয়া রাত্রে রমিজকে নিজের ঘরে শোয়াতে পারে। তা দ্যাখো, ছোঁড়া আজ পাঙাস মাছের টুকরার দিকে ফিরেও তাকায় না। এই উদাসীনতায় সোনামিয়ার রাগ বাড়ে; রাগে রাগে নেশাও বাড়তে পারে। কিংবা নেশাই হয়তো তার রাগকে উস্কিয়ে দিচ্ছে। রাগে ও নেশায় তার মুখ ছোটে, 'এই খানকির বাচ্চা তর মায়েরে বাপ। এমুন নবাবি দ্যাহাস ক্যালায়? তর বইনের কি হইছিলো আমি জানি না, না? গেরাইম্যা মাগীগো আমার বহুত চিনা আছে, বুঝলি? টিরিপ লইয়া আরিচা নগরবাড়ি দুইদিন তিনদিন কইরা থাকি না? ক, থাকি না? দুইটা ট্যাকা দিয়া পাটের খ্যাতের মইদ্যে লইয়া খানকিগুলিরে খালি ঠাপাও, খালি ঠাপাও!' সোনামিয়ার প্রায়-চিৎকার তার মাথায় ধাক্কা খেলে সেখানে রক্তের কুলুকুলু আওয়াজ শোনা যায়। কয়েক মুহূর্তে

এই আওয়াজে শোঁশোঁ গোঙানিতে পরিণত হলে রমিজের হাত কাঁপে। সোনামিয়ার ভাত ও পাঙাস মাছ ঠাসা মুখে পোকামারা ওষুধ জুত করে চেপে ধরতে পারলে এই কাঁপুনিটা থামে। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে না, ফলে চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে গোঙানি হুংকার হয়ে মাথায় এমন তোলপাড় তোলে যে কান তো কান, তার চোখজোড়া পর্যন্ত ছিটকে পড়ার দশা ঘটে। র‍্যাটমের প্যাকেটের ছবিতে লুকোচুরি খেলতে থাকা চলমান জায়গায় অসিমুন্নেসা তখন স্পষ্ট চেহারা দখল নিয়েছে। আরশোলার শুঁড়ের মতো চুল দৈর্ঘ্যে ও পরিমাণে বাড়তে বাড়তে অন্যান্য জীবজন্তুকে ঢেকে ফেলে। মাকড়সার ৮টি পা দিয়ে গড়া হয় বুবুর চোখ, কান, নাক প্রভৃতি। ইঁদুর তার সমস্ত ছাইরঙ নিঃশেষে ঢেলে দেয় বুবুর গায়ে। মাশামাছিছারপোকার ভূমিকা যে কী ছিলো বোঝার আগেই রক্তের ধমক নেমে আসে চোখে এবং লাল টকটকে চোখে তার ধাক্কা সামলানো তখন দায়।

রাত্রে সিঁড়ির নিচে নিজের বিছানায় শুয়েও চোখের খচখচ আর কাটে না। এর ওপর চিৎ হয়ে শোবার ফলে মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত রক্তের দাপট ছড়িয়ে পড়ছে, শরীরের সব জায়গায় কেবল শোঁশোঁ আওয়াজ। কে জানে সোনামিয়া হয়তো ঠিকই বলেছে, অসিমুন্নেসাকে নষ্ট করার কাজটি মিরধাবাড়ির ম্যাট্রিকপাস বোধ হয় পাটখেতেই সম্পন্ন করেছিলো। রমিজদের ঘরের ভিটার লাগোয়া কাঁঠালতলার জমিতে এবার পাটও হয়েছিলো খুব ভালো। রমিজের দাদী ঐ পাট দ্যাখার জন্যই কলাপাতার পর্দার এপারে এসে দিনমান হাঁটু ভেঙে বসে থাকতো, মরার দিনও সারাটা সকাল কোঁকাতে কোঁকাতে পাড়াশুদ্ধ মানুষকে পেটের ব্যথার কথা জানান দিয়েছিলো ওখানে বসেই। ক'বছর আগে দারুণ খরা গেলো, রমিজের বাপ ঐ জমি বেচে দিলো মৃধাদের কাছে। তা মৃধারা দাম যাই দিক আর রমিজের দাদী ঐ জমি আর কাঁঠালগাছ নিয়ে যতোই প্যানপ্যান করুক, ঐ সময় ঐ টাকাটা না পেলে বাড়িশুদ্ধ সবাইকে না খেয়ে মরতে হতো। আবার ঐ জমির বর্গা কিন্তু কিসমত মৃধা রমিজের বাপ ছাড়া আর কাউকে দেয়নি। রমিজের বাপের হাতে ঐ জমিতে পাট যা হয় দূর থেকে মনে হয় যেন সবুজ মেঘের পাঁজা। বুবুকে নিয়ে ম্যাট্রিকপাস চলে গিয়েছিলো সেই মেঘের আড়ালে রমিজের দাদার লাগানো কাঁঠালগাছ কেটে কিসমত মৃধা নিজের পুরনো জমির সীমানা ঘুচিয়ে দিয়েছিলো—বোধ হয় সেই জায়গাটায়। মগরেবের আজানের ঠিক আগে আগে ওরা ওখানে ঢোকে, জায়গাটা সাফ করে নিতে নিতে আজান শুরু হয়। তারপর ঠাসবুনুনি পাটখেত ছেঁকে-আসা আজানের ঝাপসা শাসন এবং আজানে পাল খাটিয়ে-আসা থিকথিকে অন্ধকারে নোয়ানো পাটগাছের ওপর শুয়ে থাকে অসিমুন্নেসা খাতুন। শেকড়বাকড় শুদ্ধ উপড়ে তোলা কাঁঠালগাছের লুপ্ত ছায়ায় শুয়ে রয়েছে অসিমুন্নেসা, চিৎপটাং শোয়া, তার সারা গায়ে কোনো জামাকাপড় নাই। লজ্জাশরমের বালাই নাই, বেহায়া বেশরম বোনের গলা টিপে ধরার জন্য রমিজের আঙুলগুলো নিসপিস করে।—অতো বড়ো বাড়ির ছেলে, তার ওপর ম্যাট্রিকপাস,

তার তেরছা হাসি দেখে বুবু একেবারে উতলা হয়ে উঠলো। মৃধাবাড়ির কয়েক পুরুষের চাকর ওরা, মৃধাদের জমি বর্গা নিয়ে, ওদের জমিতে খেটে, ওদের বাড়িতে বৌঝিদের খাটিয়ে এরা মানুষ। সেই বাড়ির ছেলের সঙ্গে বুবুর অতো মাখামাখি কিসের? কাজকাম সেরে ম্যাট্রিকপাস কেটে পড়লো, তখন তার আর দ্যাখাই পাওয়া যায় না। তার বাপ নিজেই অসিমুন্নেসার বিয়ের উদ্যোগ নিলো হাফিজউদ্দির সঙ্গে। হাফিজুদ্দির বাপ ছিলো মৃধাদের বছর-কামলা, কিসমত হাজির কিছু অধিকার তো তার ওপর আছেই। কিসমত হাজি তার ম্যাট্রিকপাসকে দোকান করে দিয়েছে সিঙাইড়ে, হাফিজুদ্দি ঐ দোকানে কাজ করে। তার চালচলন একটু আলাদা; সিঙাইড় বাস স্ট্যান্ডের কাছে সাজানো গোছানো দোকানে বসে দাঁড়িয়ে সে টর্চলাইট, টর্চের ব্যাটারি, তেল সাবান, কাগজ পেন্সিল বেচে, কতো দেশের মানুষের সঙ্গে তার জানাশোনা, ওঠাবসা। মাথায় তার কালো চুলের ঢেউ তেলে চকচক করে, গায়ে শার্ট, পরনে পরিষ্কার লুঙি, পায়ে রাবারের স্যান্ডেল, খালি পায়ে তাকে দ্যাখাই যায় না। এমন বরের সঙ্গে বুবু ঘর করতে পারলো না তো তার কপালে পোকার ওষুধ ছাড়া আর কী জুটবে? বিয়ের পর বুবুকে কিন্তু খুশি খুশিই লাগতো, হাফিজুদ্দিকে তার মনে হয় পছন্দই হয়েছিলো।—তা হোক, তাই বলে বিয়ের পর বুবুর অতো সতীপনা দ্যাখাবার দরকার কী ছিলো? বুবুর বিয়ের দিন পনেরো পর এক ভরদুপুরে ম্যাট্রিকপাস তার ঘরে গেলে বুবু নাকি দরজা খোলেনি। তারপর দোকানের মাল কেনার জন্য হাফিজুদ্দিকে ম্যাট্রিকপাস পাঠিয়ে দেয় মানিকগঞ্জ, বুবু তবু দরজা খোলে না। এতেও দমে না গিয়ে হাফিজুদ্দিকে ঢাকা পাঠানো হয়, এবার অনেক মাল কিনতে হবে, দুই রাত থাকবে বাইরে। ভয় পেয়ে বুবু চলে এলো বাপের বাড়ি। কোত্থেকে যে কী হলো, হাফিজুদ্দি বাড়ি ফিরে বলে পাঠালো যে অসিমুন্নেসাকে আর ঘরে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়, এরকম ছিনালমেয়েমানুষ নিয়ে সে ঘর করতে পারবে না। বাজানের অনেক ঘোরাঘুরির পর হাফিজুদ্দি বলে পাঠায় যে শ্বশুর যদি একটা সাইকেল কিনে দেয় তো সে বিবেচনা করে দেখবে। আর মৃধাদের ম্যাট্রিকপাস তো বাজানের সঙ্গে দ্যাখাই করলো না, শোনা যায় এদিক ওদিক সে ফতোয়া ঝেড়ে বেড়াচ্ছে যে, চাকর বলে হাফিজুদ্দি কি মানুষ নয়? তার কি আখেরাত নাই? বিয়ের আগে যে মেয়ে পেট বাধিয়ে বসে তার সঙ্গে সে হাফিজুদ্দিকে ঘর করতে বলে কোন বিবেচনায়?—তা বুবু অতো সতীপনা দ্যাখালে তো মৃধার পোলা তার ওপর একটু ঝাল ঝাড়বেই। বুবুর পেটে তারই বীজ, তার দোকানের পয়সায় বুবুর খাওয়াপরা, আর তাকে এড়াতে সে কি-না চলে আসে বাপের বাড়ি! সে ছাড়া বুবুর গতি আছে?—মাসখানেক আগে রমিজ বাড়ি গেলে বাজান এমন ঘ্যানর ঘ্যানর শুরু করে যে মৃধাবাড়ি না গিয়ে তার উপায় থাকে না। মেলা সাধ্যসাধনার পর ম্যাট্রিকপাসের সঙ্গে তার দ্যাখাও হয়, কিন্তু আসল কথা আর বলা হয় না। ইরি ধানের ফলন নিয়ে কথা হয়, রমিজের সায়েবের কারখানায় বাল্‌ব তৈরি হবে শুনে ম্যাট্রিকপাস তার দোকানে বাল্‌ব

আমদানি করার সংকল্প ঘোষণা করে,—আরে গ্রামে তো ইলেকট্রিক লাইট এসে যাচ্ছে, ঢাকার ইনজিনিয়ার বন্ধু ম্যাট্রিকপাসকে নিজে বলেছে,—ধলেশ্বরীর ভাঙনে সিঙাইড় শেষপর্যন্ত টেকে কি-না এ নিয়ে লোকটা কতো হা হুতাশই না করে; কিন্তু বুবুর কথা আর পাড়া হলো না। আজ এতো চেষ্টা করেও সায়েবের কাছেও কথাটা তোলা গেলো না। বিকালবেলা কয়েকটা টাকা পেলে এতোক্ষণ বাড়ি পৌঁছে যেতো। বাড়ি তো তেঁতুলতলা দিয়েই যেতে হয়। তেঁতুলতলায় বুবু নাই। এতো রাত্রে বুবু ওখানে আসবে কেন? বুবু কৈ? হঠাৎ করে বুবু জ্বলে ওঠে দপ করে। সেই তাপে রমিজের চোখের কোণে বাষ্পের কুঁড়ি শুকিয়ে যায়। জ্বলে ওঠা বুবুর আঁচে বুবুকে চিৎপটাং হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে রমিজ বেশ ধাঁধায় পড়ে, এভাবে কোথায় কবে যেন বুবুকে দ্যাখা গেছে। কবে? কোথায়? বিছানায় উঠে বসে লুঙির ট্যাঁকে গোঁজা র‍্যাটমের প্যাকেটটা বার করলো। ওপরের বারান্দা থেকে আলো আসছে, সিঁড়ি ধরে নামতে নামতে আলোর তেজ অনেকটা কম। ঝাপসা আলোতে পোকার ওষুধের প্যাকেটে লেবেল জুড়ে ইঁদুর, আরশোলো, মাকড়সা, মশা, মাছি ও ছারপোকার পাশে চিৎপটাং হয়ে শুয়ে থাকে অসিমুন্নেসা। এখন অসিমুন্নেসাকে ঠিক চেনা যাচ্ছে—এমন লালচে কালো চুলের রাশি আর কার হবে? না, এইসব পোকামাকড়ের মধ্যে এতো চুল কেবল বুবুর মাথাতেই আছে। তেঁতুল চুষতে চুষতে এরকম ছুঁচলো ঠোঁট করতে পারে আর কে?—কে করতে পারে?—ছবি এলোমেলো হয়ে যায় এবং বুবুর ঠোঁটের এলাকা ফর্সা হতে থাকে। এই ফর্সা রঙ ঠোঁটের আশেপাশে চিবুক, গাল, নাক প্রভৃতি এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে লিচু খাওয়ার চুকচুক আওয়াজ শোনা যায়। লিচু খাওয়া শেষ হলেই যাতে এই ঠোঁটজোড়া নিশ্চিহ্ন না হয় সেজন্য রমিজ প্রাণপণে ওখানে কোকা-কোলার বোতল ঢুকিয়ে দেয়। কোকা-কোলার বোতল অল্পক্ষণের চুমুকে শেষ হতে না হতে ওখানে লাগে পানির বোতল। সায়েবের মেয়েকে এখানে রেখে বুবুকে ছবি থেকে সরিয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে রমিজ একজোড়া ফর্সা ঠোঁটে লিচু, কোকা-কোলা ও পানির সরবরাহ অব্যাহত রাখে। এজন্য প্যাকেটটা সে ধরেছে তার মুখের একেবারে সামনে। রমিজের নিশ্বাসের শিখায় ঐ নাক, ঠোঁট, চিবুক ও গালে গাঢ় নীল রঙের দাগ পড়ে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সেই ম্লান আলোতেও পরিষ্কার হয়ে যায় যে ঐ মুখ আসলে অসিমুন্নেসার। বিষের ধকে তার চেহারা নীল হয়ে আরো কালো দ্যাখাচ্ছে। তা পোকার ওষুধে এতোই যদি হয় তো সায়েবের মেয়ের ঠোঁটজোড়ায় ঐ জিনিস গলিয়ে দিলেই হলো। তারপর দ্যাখো না, তার এই ফর্সা গালে, সোনালি নাকের ডগায়, লিপস্টিক ঘষা ঠোঁটে কী করে গাঢ় নীলের পাকা ছোপ লেখা হয় এবং ঠোঁটের ফাঁক কোনোদিন জোড়া না লাগে। দ্যাখো না, তখন দ্যাখা যাবে আঠারো বছরের ধিঙি মেয়ে টাইট প্যান্ট পরে আর ছেলেদের মতো করে বুকের দুটো বোতাম খুলে টেনিস খেলে কী করে, শরীরের সঙ্গে পাজামা কামিজ সেঁটে কী করে ইউনিভার্সিটি যায়, কী করে বছরের একদিন লালপাড় হলুদ শাড়ি পরে লাল

টয়েটো হাঁকিয়ে পান্তাভাত খাওয়ার রঙ ফলাতে যায় রমনা পার্কে, তখন দ্যাখা যাবে সখের খালি পা কী করে অর্ধেক হেঁটে আর অর্ধেক গাড়ি করে চলে যায় মেডিক্যাল কলেজের ওখানে শহীদ মিনারে, তখন দ্যাখা যাবে শবেবরাতের দিনে ঘোমটা মাথায় কী করে আল্লারসুলের গান করে টেলিভিশনে, ফের পর দিনই পাছা দুলিয়ে তিড়িং বিড়িং নাচে, তখন দ্যাখা যাবে কী করে বাপের গলা জড়িয়ে হাসে, এই কাঁদে, এই সোহাগ করে—সব দ্যাখা যাবে, সব!

সায়েবের মেয়ের এই পরিণতি দেখতে দেখতে রমিজ বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে এবং হাতের মুঠোয় কীটনাশকের প্যাকেট নিয়ে সিঁড়ির তলা থেকে এসে দাঁড়ায় সিঁড়ির গোড়ায়। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে তার সময় লাগে ৭ সেকেন্ডেরও কম।

টানা বারান্দায় প্রথম ঘরটার পাশে সায়েব বিসিসায়েবের শোবার ঘর, তারপর ডানদিকে একটি গলি মতো, গলির ভেতর মুখোমুখি কয়েকটা ঘরে দুই ছেলের আলাদা আলাদা পড়ার, বসার ও শোবার ঘর। এদের মধ্যে বড়োটা চলে গেছে এ্যামেরিকা, ছোটোটা আজ সকালে ইনডিয়া গেছে ক্রিকেট খেলা দেখতে। গলিটা ডানদিকে রেখে এগুলে সায়েবের মেয়ের পড়ার ঘর এবং শেষ ঘরটিতে থাকে সায়েবের মেয়ে। ঘরের দরজা ভেজানো, ঠেলতেই খুলে গেলো। ঘরের ভেতর ঢুকতে চোখে পড়ে ব্যালকনিতে আলোর নিচে ডেক চেয়ার, চেয়ারের হাতলে বই। চেয়ারটা খালি। ঘরের ভেতর কেউ নাই। বিছানা ফাঁকা। ছোটো সোফা ফাঁকা। ড্রেসিং টেবিলের সামনে টুল ফাঁকা। রমিজ আলি এদিকে দ্যাখে, ওদিক দ্যাখে, তার হাতের বন্ধ মুঠি আরো আঁটো হয়, মেয়েটিকে দ্যাখার সঙ্গে সঙ্গে জাপটে ধরে তার ঠোঁটজোড়া ফাঁক করে ওষুধটা সম্পূর্ণ ঢেলে দিতে হবে। গেলো কোথায়?—চারদিকে ভালো করে খেয়াল করলে লাগোয়া বাথরুমে অবিরাম পানি ঝরার আওয়াজ পাওয়া যায়। শোবার আগে সায়েবের মেয়ে গোসল করছে।—কইরা ল, নাহাইয়া ল মাগী, জীবনের লাহান নাহাইয়া ল।—এই উত্তেজনা তার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়লে রমিজ আলি বেশ বিপদেই পড়ে; সারা শরীর তার কাঁপে। অনেক কষ্টে পাজোড়া দাঁড় করিয়ে রাখা যায়। ডান হাত ঝুলে থাকে পোকা-মারা ওষুধের ভারে, ঐ হাতের তেজে ঠিক থাকে বাম হাত। মুশকিল হয় তার চোখজোড়া নিয়ে। নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ বাইরে গিয়ে সে দুটো কেবলি এদিক ওদিক ঘোরে। হাল্কা গোলাপি রঙের দেওয়াল, জানালার গাঢ় লাল পুরু পর্দা, ঘোলা কাচ ও কাঠের পল্লার ওপারে সূক্ষ্ম নেট, এদিকে ড্রেসিং টেবিল, তার ওপর নানান সাইজ ও নানান রঙের শিশিবোতল ও কৌটা, গাঢ় খয়েরি রঙের গদি লাগানো সোফা, কাঠের চেয়ারে ছড়ানো ছবিওয়ালাপত্রিকার খোলা পাতা; তারপর ওয়াড্রোব, বিছানা, বিছানার পাশে টিপয়, টিপয়ের ওপর এলোমোলোভাবে রাখা ছোটোবড়ো টাকার নোট, ঘড়ি এবং বিকালবেলার সেই বেগুনি ফিতায় বাঁধা সোনার মেডেল। টাকা, ঘড়ি এবং সোনার মেডেল।—রমিজ আলির চোখজোড়া

এখানে এসে আটকে যায়, তার চোখে এখন কেবল টাকা, ঘড়ি এবং সোনার মেডেল। কপাটখোলা দরজার মতো চোখে এসে লাগে হুহু বাতাস, তার চোখ ফের খচখচ করে। সেগুলোকে সামলাতে রমিজ প্রথমে মেডেল তুলে নিয়ে রেখে দিলো তার বাম হাতের মুঠোয়। মেডেল পেয়ে মাগী মনে হয় জগৎ জয় করে এনেছে।—এবার রমিজের চোখ থেকে সরলরেখা ধরে আলো বেরিয়ে ঘড়ি ও টাকার নোটের ওপর ঠিকরে পড়ে। ওগুলো নেওয়া কি ঠিক হবে?—মুষ্টিবদ্ধ ডান হাতের দুটো আঙুল খুলে ঘড়ি তুলে নিয়ে সে রেখে দিলো লুঙির ট্যাঁকে। টাকাগুলো নেবে কি-না সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই বাথরুমের দরজা খুলে গেলো।

সায়েবের মেয়ের গুনগুন করা তখনো অব্যাহত ছিলো। রডলাইটের আলোয় তার সদ্য-ধোয়া মুখ ঝকঝক করে, লিপস্টিক-ছাড়া ঠোঁটজোড়া ইঁটচাপা ঘাসের মতো ফ্যাকাসে। তাতে রমিজের কিছু এসে যায় না, এর ভেতর পোকার ওষুধ গুঁজে দিতে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। সায়েবের মেয়ের পরনে নতুন ধরনের পোশাক, লম্বা আলখেল্লার মতো, পায়ের পাতা পর্যন্ত লম্বা। তার এরকম পোশাকের সঙ্গে রমিজ পরিচিত নয়, দিনরাত তো শরীরের যতোটা পারে কাপড়ের বাইরে রাখার সাধনাই করে যাচ্ছে, আর দ্যাখো ঘুমোতে যাবার আগে কীরকম ঢেকেঢুকে এসেছে। এদের খাসলত বোঝা বড়ো দায়। তা এখন অতো বোঝাবুঝির সময় কৈ? দরকারই বা কী? রমিজ এক পা এগোতেই সায়েবের মেয়ে থমকে দাঁড়ায়, ঐ মুহূর্তে সে বসতে যাচ্ছিলো ড্রেসিং টেবিলের সামনের টুলে। কয়েক পলক রমিজের দিকে তাকিয়ে সে বলে, 'তুই? কী ব্যাপার?' রমিজ আর এক পা বাড়াতে সায়েবের মেয়ে 'আম্মু' বলে চিৎকার করে ওঠে। ভয়ে কিংবা এতোক্ষণ গুনগুন করে সুর ভাজার ফলে তার গলার জোর ক্ষয় হয়ে গেছে, এই ঘরের বাইরে যাবার মতো ক্ষমতা তার শব্দের নাই। তার বাপ-মা থাকে আরো কয়েক ঘর পরে; তার বাবা কিছুক্ষণ আগে ঘরে ফিরেছে টলতে টলতে, মা শুয়েছে সেডাকসেন-১০ খেয়ে, এ বাড়ির ওষুধপত্র তো রমিজকেই কিনে আনতে হয়।—নাঃ। তবু বিশ্বাস নাই। দেরি করা মানেই ঝুঁকি নেওয়া। মাগীকে ধরে, এক্ষুনি, এই মুহূর্তে ধরে তার পাতলা ও ফ্যাকাসে ফর্সা মুখে পোকার ওষুধ চালান করে দেওয়ার মোক্ষম সময় চলে যাচ্ছে।—এইবার মাগী তরে বাঁচায় ক্যাডা।—রমিজের দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ। এক হাতে পোকা মারা ওষুধ, অন্য হাতে সোনার মেডেল, রমিজ আলী হরণ করে নিয়েছে তার নাচে কৃতিত্বের সাক্ষীকে।—অহন নাচবার তো দূরের কথা, হাঁটবার নি পারস? মুখের মইদ্যে চাবাইয়া চাবাইয়া চাপা নি মারবার পারস। লুঙির ট্যাঁকে গুঁজে রাখা সায়েবের মেয়ের হাতঘড়ি।—জিন্দেগিতে টাইম বাইন্দা আর রঙ নি করবার পারস?—কিন্তু ঘড়ি দখল করে নিলেও রমিজের সময় চলে যাচ্ছে। সময় বয়ে যায়। তার মাথায় তেঁতুলগাছের ঝাঁকড়া শরীর, পাটখেতে বিলি কাটতে কাটতে সমূলে উপড়ে ফেলা দাদার হাতে লাগানো কাঁঠালগাছের লুপ্ত ছায়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মৃধাবাড়ির

ম্যাট্রিকপাস। মগরেবের আজানে অন্ধকার গাঢ় হয়। বুবু কৈ যাও? ও বুবু! বুবুকে ডাকতে ডাকতে তার গলা কাঠ হয়ে যাচ্ছে, বুবু নাই—জ্যাতাও নাই, মরাও নাই। রমিজের মাথা ভার হয়ে আসছে, আর বসে থাকা যায় না।—না আর না।—সায়েবের মেয়ের ঠোঁটের সুড়ঙ্গ দিয়ে সমস্ত ভার গলিয়ে না দিলে বুবুকে ঠাঁই দেবে কোথায়।

কীটনাশকের প্যাকেট খুলতে খুলতে রমিজ ড্রেসিং টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলে গলা থেকে অস্পষ্ট হাওয়া বার করে সায়েবের মেয়ে সরে যায় বিছানার দিকে, রমিজ বিছানার কাছে পৌঁছতে না পৌঁছতে সে সরে পড়েছে ওয়াড্রোবের কাছে। তার বড়ো বড়ো চোখের লাল রেখা উপরেখায় বুবুর লালচে চুলের কয়েকটি শিখা দপ করে জ্বলে উঠলেও এক পলকেই নিভে যায়। এই বিভ্রম থেকে রেহাই পেয়ে পোকার ওষুধ মেয়েটির ঠোঁটে গুঁজে দেওয়ার অবিচল লক্ষে রমিজ লাফ দিলে সায়েবের মেয়ে চলে গেলো ব্যালকনিতে। কীটনাশকের প্যাকেট ধরা হাত উঁচু করে রমিজ ব্যালকনিতে ছুটলো। ব্যালকনিতে সে পৌঁছতে না পৌঁছতে সায়েবের মেয়ে ঘরে ঢুকলো, চট করে একটা শর্টকাট মেরে দরজা দিয়ে সটকে বারান্দা ধরে রওয়ানা হলো সায়েব বিবিসায়েবের ঘরের দিকে। এখন তার গলা খোলে, তার চিৎকার এখন স্পষ্ট। তার আর্তস্বরে সাড়া দিয়ে প্রধান এ্যালসেশিয়ানের নেতৃত্বে এই বাড়ির নানা জাতের, নানারঙের, নানা বয়সের ও নানা আকারের কুকুরের ঘেউঘেউ এবং সায়েববিবিসায়েবের, চাকরবাকর, ঝিচাকরানি, ড্রাইভার, বাবুর্চি, দারোয়ান, মালী, বয়বেয়ারার হুংকার, আর্তনাদ, হাহাকার, চ্যাঁচামেচি প্রভৃতি একই তালে ও ভিন্ন ভিন্ন লয়ে গোটা বাড়ি, এমন কি পাড়াটাকে মাত করে তোলে।

বিবিসায়েব ক্ষোভ প্রকাশ করে যে সায়েবের লাই না পেলে বাড়ির চাকরবাকর এরকম বাড়াবাড়ি করার সাহস পায় না। তার মতে রমিজের একমাত্র শাস্তি হওয়া উচিত মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু তার আফসোস, এই ছোটোলোকের দেশে আইনকানুন বড়ো শিথিল, ২/৪ বছর জেল খেটেই শয়তানটা পার পেয়ে যাবে। তবে বিবিসায়েবের ছোটোমামা না চাচাতো ভাই ও মেজোচাচা না বোনের ভাশুর যথাক্রমে পুলিস ও মিলিটারির বেশ বড়ো বড়ো সায়েব। তাদের দিয়ে থানায় টেলিফান করিয়ে দিলে ওদের নিয়ম মতো হারামির বাচ্চাকে সম্পূর্ণ মেরে ফেলে বস্তায় ভরে, বস্তার সঙ্গে ইঁট বেঁধে বুড়িগঙ্গায় ডুবিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করা যায়। এতেও অবশ্য তার উপযুক্ত শাস্তি হয় না। কিন্তু উপযুক্ত শাস্তিটা কী সে সম্বন্ধে বিবিসায়েব স্পষ্ট করে কিছু জানে না বলে ব্যাপারটা ওদের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

স্ত্রীর আত্মীয়স্বজনের পদমর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তি সম্বন্ধে যথাযথ অবহিত থাকলেও দেশের আইন-শৃঙ্খলা প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের ওপর সায়েবের আস্থা তেমন মজবুত নয়। আইনকানুন একটু আধটুও থাকলে তার ব্যবসা বাণিজ্য

এতোদিন লাটে উঠতো। পুলিসে খবর দিয়ে লাভ নাই, তাতে বাড়ির স্ক্যান্ডাল। বরং মারধোর যা করা হলো তা খুব সন্তোষজনক না হলেও চলনসই তো বটেই। আগামীকাল কাচের কারখানা থেকে সর্দার গোছের কোনো শ্রমিককে নিয়ে এসে ফাইনাল টাচ দিয়ে ব্যাটাকে চিরকালের জন্য পঙ্গু করে ফেললে ইবলিসটা যে কোনো অপকর্ম করার ক্ষমতা চিরকালের জন্য হারাবে। তাতে সায়েবের সামাজিক দায়িত্ব পালন করা হয়। তবে রাত্রি অনেক হলো বলে কাজটা স্থগিত থাকে। আপাতত গ্যারেজের ভেতর তালা বন্ধ করে রেখে আগামীকাল চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে যে যার ঘরে চলে যায়।

গ্যারেজের ভেতর বাঁদিকে একটা থামের সঙ্গে রমিজের দুই হাত বাঁধা। কুণ্ডলী পাকানো শরীরে সে বসে রয়েছে। লাল টয়েটো গাড়ির পেছনের চাকার মাডগার্ডে তার মাথা ঠেকানো। গ্যারেজে তালা লাগাতে এসে সোনামিয়া রমিজ আলির পাশে বসে।—নাঃ! ছ্যামরাটারে বেশি মাইর দেওয়া হইছে।—হুজুগে পড়ে ও রাগের মাথায় এবং খানিকটা কর্তব্যের টানেও বটে, অন্যান্যদের সঙ্গে সোনামিয়াও বেশ কয়েকটা লাথি মেরেছে। এতোটা না করলেও চলতো। গলার স্বর অনেকটা নরম করার সাধনা চালায় সোনামিয়া. 'তুই এইটা কী করলি, এ্যাঁ?' জবাব না পেয়ে ফের বলে, 'এইটা করলি কী, ক তো?' এরপর জবাব পাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়ে সে বলে. 'সায়েবরে ভালো কইরা কইলেই ট্যাকা পাইতিস। বুঝাইয়া কইছিলি?'

'বিয়ানে গেছিলাম তো। বুবুর কথা কইতে দেয় না, কী করুম? হাফিজুদ্দি ভাইজানরে অরা হাবিজাবি কী কইছে, মায়ে কয় তাবিজ করছে। ট্যাকার কথা কইলে সায়েবে আমারে—' টানা কোঁকানিতে রমিজের প্রলাপ লুপ্ত হলে সোনামিয়া হাসে. অভিজ্ঞ টাইপের সংক্ষিপ্ত হাসির আভাস। রমিজের পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সে আফসোস করে, 'তুই যে গেরাইম্যা ঐ গারাইম্যাই রইয়া গেলি। আরে তর বইনের উপরে ক্যাঠায় কৈ কী জুলুম করছে তুই তার বদলা লইবি সায়েবের মাইয়ারে বেইজ্জত কইরা? বইনের মরার খবর পাইলি, আর লগে লগে গেলি এই আকাম করবার?' তার হাত রমিজের পিঠ বেয়ে নিচে নামতে গেলে কোমরের ওপর লাথি খেয়ে ফুলে ওঠা জায়গায় ঘষা লাগে এবং রমিজ হঠাৎ মাডগার্ড থেকে মাথা তুলে সোজা হয়ে বসে। থামের ধাক্কা খেয়ে মাথাটা ফেরত এলে চোখের সামনে অজস্র বুদবুদ দ্যাখা যায়। কোনো বাষ্প তৈরি না করে সেইসব বুদবুদ মিলিয়ে গেলে ঘাড় ঘুরিয়ে সোনামিয়ার দিকে তাকিয়ে রমিজ থুথু ছোড়ে। কাটাছেঁড়া ও ভাঙাচোরা ঠোঁটজিভদাঁত দিয়ে থুথুর দলা এলোমেলো ছড়িয়ে পড়ে, তেমন আওয়াজও হয় না, রক্তমাখা থুথু মুখ থেকে বেরিয়ে খানিকটা জায়গা ভিজিয়ে দেয়, সোনামিয়ার মুখ কিংবা শরীরের প্রধান বা গৌণ অংশ স্পর্শ করতে তা ব্যর্থ হয়। তবে তার থুথুর স্পিড ছিলো, নইলে গাড়ির মাডগার্ডের এদিকটায় না লেগে ওপারে পড়লো কী করে? রমিজের থুথুর লক্ষ সম্বন্ধে সোনামিয়া অনুমান করতে পেরেছে কি-না বোঝা মুশকিল। তবে এবার চলে যাবার জন্য সে উঠে দাঁড়ায়,

'তরে কাউলকা সায়েবে যে কী করে আল্লাই মালুম। সায়েবের মাইয়া এমুন ডরাইয়া গেছে, নিজের ঘরে যাইতে পারে না। বিবিসায়েবের লগে শুইয়া রইছে, জুরজুর আইছে, মনে লয়।' সোনামিয়ার এই শেষ তথ্যটি ফের শোনাবার জন্য রমিজ সামনের দিকে একটু ঝোঁকে। তালা লাগিয়ে বেরিয়ে যাবার পর সোনামিয়ার একটি বাক্য ধ্বনি পায় এবং রমিজ শোনে, 'সায়েবের মাইয়া কেমুন আঁতকাইয়া উঠতাছে, বিবিসায়েবের লগে শুইয়া রইছে, বিবিসায়েবে কান্দতাছে।'—সোনামিয়া কী বললো? তাহলে সায়েবের মেয়ে কি একেবারে চিৎপটাং হয়ে শুয়ে পড়লো? তার ফ্যাকাসে ফর্সা ঠোঁটজোড়া কি নীল হয়ে গেছে? তার গায়ে রঙ কি এখন কালো? সে শুয়েছে কোথায়? ইঁদুর আর মাকড়সা আর তেলাপোকা আর মশা মাছি ছারপোকার সঙ্গে একই আসনে? তাহলে বুবু? সায়েবের মেয়ে কি বুবুর সঙ্গে শুতে পারে?— সায়েবের মাইয়া ভ্যাটকাইয়া শুইয়া থাকলে বুবু তাইলে কৈ?—তাহলে?—বুবু কি ঐ আসন থেকে নেমে গেলো? তার মানে বুবু খালাস পেয়েছে?—চোখ খুললে দিব্যি দ্যাখা যায় সায়েবের মেয়েকে পোকামাকড়ের পাশে ছিটিয়ে রেখে বুবু কেটে পড়েছে। 'বুবু। অ বুবু!'—বুবু গেলো কোথায়?—'বুবু বুবু রে!' —এবার বুবুর সাড়া পাওয়া যায়, 'ভাত খাইবি?' হঠাৎ করে ভাত খাওয়ার সম্ভাবনা দ্যাখা যাওয়ায় বুবুর গলায় ভাতের হাঁড়ি বলকাবার আওয়াজ ওঠে, 'রমিজ, জলদি আয়, মায়ে কতোটি পান্তা লইয়া বইয়া রইছে।' কী ব্যাপার? না, মৃধাবাড়ির মেজোবৌ গতরাত্রে ভাত খায়নি, তাদের রান্নাঘরে গামলাভরা পান্তাভাত। নুনমরিচপেঁয়াজ দিয়ে, লেবুপাতা দিয়ে চটকানো পান্তা, ঘন ভাতের মাড়ের মতো পানি।—'অ বুবু, মায়ে মাখছে, না রে?'—না, বুবু নিজেই মেখেছে। বুবু তো মাকে দেখে দেখেই শিখেছে। মায়ে কয়, ত্যালমরিচপিঁয়াজ দিলে যা খাইবা তাই মজা হইবো। মায়ে কয়, বড়োলোকের বৌঝিরা রান্দনের কী জানে? মায়ে কয়, অগো সালুন মজা হয় কি রান্দনের গুণে?—তয়?—অগো খালি ত্যালমরিচ—পিঁয়াজরসুনের কারবার।—তা বড়োলোকের বাড়ি থেকে সরানো তেল-নুনপেঁয়াজরসুন দিয়ে রাঁধা সুঁটকি দিয়ে মায়ের হাতে মাখানো কড়কড়া ভাত খেতে গিয়ে প্রতি গ্রাসের পর রমিজ বলবেই, 'কী মজা হইছে রে বুবু, নারে?'—বেশি কথা বললে বিপদ, এক সানকিতে খাচ্ছে, একজন কথা বললেই আরেকজন কয়েক গ্রাস বেশি খেয়ে ফেলে। এই নিয়ে বুবুর সঙ্গে কতো ঝগড়া, কতো মারামারি। মা কিন্তু সবসময় টানে রমিজের দিকে, 'মাইয়ামানষের অতো লালচ ক্যান রে? সবুর না থাকলে কিয়ের মাইয়ামানুষ?' বড়ো হতে হতে বুবুর খাওয়ার লালচ কমে গিয়েছিলো। তখন তার অন্যরকম সব সখ। রমিজ ঢাকায় আসার পর থেকে বুবুটা ধাঁ ধাঁ করে বেড়ে গেলো। কয়েক মাস পর পর বাড়ি গেলে বুবুকে আর চেনা যেতো না। বাড়তে বাড়তে সে কি-না নিউমার্কেট বায়তুল মোকাররম ছুঁতে চায়। আর বিয়ের পর তো গুলিস্তানে সিনেমাই দেখতে চাইলো। সেবার রমিজকে বলে কী, 'তর দুলাভাইয়ে কইছে, আমারে একবার ঢাকা লইয়া

যাইবো; আমারে তুই গুলিস্তান হলে বই দ্যাহাইতে পারবি? টিকিটের দাম যা লাগে তর দুলাভাইয়ে দিবো, তুই আমাগো লগে যাইবি আর টিকিটটা কিন্যা দিবি। গুলিস্তানে বই দ্যাহস নাই? রাজ্জাক ববিতারে দ্যাখছস? হাছাই? জ্যাতা দ্যাখছস? আমারে একবার দ্যাহাইতে পারবি?' অসিমুন্নেসার দীর্ঘ প্রশ্নমালার জবাবে রমিজ চুপ করে থাকলেও অসিমুন্নেসার উৎসাহ কমে না, মৃধাবাড়ির মেয়েদের কাছে হোক আর হাফিজুদ্দির কাছে হোক কিংবা ম্যাট্রিকপাসের কাছে হোক—সিনেমার কতো লোকজনের নামই না সে শুনেছে। এবার গেলে রমিজ আলি ঠিক বলবে, হ্যাঁ, ববিতা রাজ্জাক শাবানা জসিম—সবাইকে সে দেখেছে, তা একরকম জ্যান্ত দ্যাখাই বলা চলে। দেখলে ক্ষতি কী? সে দেখলে বুবুরও দ্যাখা হয়। গত মাসে যখন বাড়ি যায় কী ঝামেলা চলছিলো, সব তো বুবুকে নিয়েই, কিন্তু হলে কী হবে, বুবুর উতলা উতলা ভাবটা তখনো কাটেনি। রমিজ তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ছে, মা ঘরে ছিলো না, অসিমুন্নেসা বললো, 'আরেকটা দিন থাকলে কী হয়?' 'না রে, যাই গিয়া, সায়েবে আবার চেতবো, একটা ঘাপলা বাধাইয়া বইবো।'—ঢাকাইয়া কথা শুনতে বুবু কী মজাই যে পায়! বলে, 'তুই এইগুলি কী কথা কস বুঝি না।' কোনো কথা বুঝতে না পারার মধ্যে যে এতো সুখ তা বুবু ছাড়া আর কে জানে? সোনামিয়া, মতিন ড্রাইভার—এদের কাছে কতো নতুন নতুন কথা শোনা যায়, এবার বাড়ি গিয়ে ঢাকাইয়া বোল শোনাতে শোনাতে বুবুর কানজোড়া কানায় কানায় ভরে দেবে। বুবুর জন্য আরেকটা কাজ করা দরকার। বিয়ের কয়েক মাস আগে বুবু আবদার করেছিলো, 'অ রমিজ, ঢাকা থাইকা আমারে একটা শ্যাম্পু আইনা দিতে পারবি?'—এসবের নাম বুবু শিখলো কোত্থেকে? মৃধাবাড়ির বৌঝিরা বুঝি বলে? তা শ্যাম্পু এখন রমিজ পায় কোথায়? শ্যাম্পু খুঁজতে না খুঁজতে গ্যারেজের মাঝখানে সাদা গাড়িটার ছাদে সায়েবের মেয়ের ড্রেসিং টেবিলের একটুখানি সেট হয়ে যায়, সেখানে হাজার রকমের শিশিবোতল, কৌটা, টিউব। ওখান থেকে আন্দাজে মান্দাজে কয়েকটা তুলে নিলেই তো হয়।—তবে এর ভেতর শ্যাম্পু কোনটা? শ্যাম্পু সে চেনে কী করে? পাগলের মতো সে শ্যাম্পু খুঁজছে, শ্যাম্পু খুঁজছে তো ঐ চাপে সায়েবের মেয়ে ঘর থেকে দৌড়ে পালায় ব্যালকনিতে, ব্যালকনি থেকে ঘর হয়ে বারান্দায় গিয়ে চিৎকার শুরু করলে রমিজের ঘাড়ে পিঠে পেটে মুখে জিভে কাটা ও থ্যাঁতলানো জায়গায় চিনচিন করে ওঠে। তার ওপর সবাই মিলে নুনের ছিটা দিতে শুরু করলে বসে থাকাটা অসহ্য ঠেকে।—মা কী সুন্দর গাঁদাপাতা ছেঁচে লাগিয়ে দেয়—অ মা, অ মা—মা গেছে মৃধা বাড়ি, আজ ফিরতে অনেক দেরি—মণকে মণ ধান পড়ে রয়েছে উঠানে, আজ সময় কোথায় মায়ের? বুবু গাঁদাপাতা ছেঁচে দিতে পারে না? তার কিছু হলে বুবু কিছুই করতে পারে না, খালি এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে। তো বুবু একবার তার থ্যাঁতলানো পায়ে ফুঁ দিয়েছিলো, কবেকার সেই ফুঁ পা থেকে উঠতে উঠতে রমিজের সারা গায়ে শিরশির করে উঠছে, এমন কি চোখজোড়া পর্যন্ত উঠে খচখচ করা চোখের খরা

কাটায়। প্রথমে চোখে একটু ধোঁয়া লাগার মতো হয়েছিলো, তারপর পানি পড়তে শুরু করে। চোখের পানিতে নেমে বুবু ডুব সাঁতার দেয়। বুবুর পাশে কী?—ওগুলো তেলাপোকা না? মশা না? মাছি না? মাকড়সা না? ছারপোকা না? ইঁদুর না?—তার হাত বাঁধা বলে চোখের পানি মোছার জো নাই। তবে কায়দা করে চোখ খোলা রাখলেও কয়েকবার চোখের পাতা পিটপিট করলে বুবুকে রেখে আর সব জীবজন্তুকে চোখ থেকে মুছে ফেলা যায়। তখন বুবু থাকে একা। ঐসব পোকামাকড়ের পাশে রমিজ তো ফেলে রেখে এসেছে সায়েবের মেয়েকে. ঐগুলোর পাশে সে বেটি চিৎপটাং হয়ে শুয়ে রয়েছে। নইলে বুবুকে খালাস করা যায় কী করে? শালার সায়েববিবিসায়েব এখনো বুঝতে পারেনি. বুঝবে, সবই বুঝবে। আরেকদিন কায়দা করে বিবিসায়েবের মুখে পোকার ওষুধ ঢুকিয়ে দেবে. আরেকদিন সায়েবের মুখে, আরেকদিন আরেকদিন। তারপর বোঝো ঠেলা, সোয়াগের বেটির পাশে ভ্যাটকাইয়া থাকো. পোকের লগে কীড়ার লগে ল্যাপ্টালেপ্টি কইরা জিন্দেগি কাটাও। চোখজোড়া রমিজের সটান খোলা। না, চোখ বন্ধ করা চলবে না, একবার চোখ মুনজাইছো কি পোকা আর কীড়ার লগে বুবুরে রাইখা সায়েবের মাইয়া পলাইয়া যাইবো, কৈ পলাইবো আর দিশা পাইবা না।—না, বুবুকে আর পাঠাচ্ছে না। বুবু তেঁতুলতলায় থাক, বাড়ির বাইরে কলাপাতার পর্দার এপারে বসে দাদীর কাছে কাঁঠালতলার জমিতে দাদার পাট ফলাবার গপ্পো শুনুক, মায়ের হাতে চেলাকাঠের বাড়ি খেয়ে উঠানে চুলার পাশে লুটিয়ে পড়ে কাঁদুক. ঢাকা থেকে শ্যাম্পু আনার জন্য রমিজের কাছে মিনতি করুক। বুবুকে দেখতে দেখতে রমিজ বুবুর সঙ্গে মৃধাবাড়ি যায়, মা ডেকে পাঠিয়েছে. এক গামলা পান্তাভাত নুনমরিচপেঁয়াজ দিয়ে লেবুপাতা দিয়ে চটকানো—মা এটা করে ওটা করে আর দ্যাখে ওরা এলো কি-না। কতোদিন আগেকার পান্তার পেঁয়াজমরিচের ঝাঁঝে রমিজের নাক জ্বলে, চোখ জ্বলে. চোখ দিয়ে পানি ঝরতে শুরু করলে সে ফুঁপিয়ে কাঁদে, 'বুবু, অ বুবু!' কান্নায় তার গলা বন্ধ হয়ে এলেও সে বুবুকে ডাকে, 'অ বুবু! আমারে একবার কইলি না ক্যান?' অনুপস্থিত অসিমুন্নেসার প্রতি এই প্রশ্ন বারবার করেও সে খান্ত দেয় না, 'আমারে একবার ডাইকা কইলি না ক্যান?' অসিমুন্নেসা তাকে কী বলবে? বললেই রমিজ কী করতে পারে?—আর কিছু না হোক সায়েবের মেয়েকে পোকামাকড়ের সঙ্গে এক বিছানায় শুইয়ে বুবুকে খালাস করে নিয়ে বয়স উজিয়ে সে সোজা চলে যেতে পারে কোরবান মেম্বারের বাড়ি। তাদের যেতে দেরি হয়ে গিয়েছিলো বলে ভাইবোনের কপালে গম জুটেছিলো মোটে দেড় সের। কালো কালো গমে কিসের সাদা গুঁড়ো, কী রকম ঝাঁঝালো গন্ধ, মেম্বার সবাইকে ভরসা দিলো, 'এইটা কিছু না. বিদ্যাশ থাইকা জাহাজে আইছে. বহুত দিন লাগছে তো, গমে পোক না লাগে তাই ওষুদ দিছে।' মা ভালো করে ধুয়ে আটা কুটে রুটি করলো. তবু গন্ধ কিন্তু ছিলোই। বুবু একটা রুটিও খেতে পারেনি। তাই নিয়ে মায়ের কতো কথা, 'মাইয়া-মানষের

অতো ফুটানি ভালো না!' বুবু খালি গজগজ করে, 'কোরবান মেম্বরের বাপের মুখের মইদ্যে ওষুদ হান্দাইয়া দেওন লাগে তয় ব্যাডায় বোঝে কী খাইলো।' তা মেম্বরের বাপ না থাকলে কী হয়, রমিজ এবার গিয়ে কোরবান মেম্বারের মুখে পোকার ওষুধ ঠিক দিয়ে আসবে। সায়েবের মেয়েকে দিলো না? শালার ওষুদের ঝাঁঝ কী! বুবুর আর দোষ কী? রমিজও এখন ঐ ওষুদ কি আর নিজের মুখে তুলবে?—এতোদিন পর হাওয়ায় হাওয়ায় পোকার ওষুধের তীব্র গন্ধ এই গ্যারেজের ভেতর গলগল করে ঢুকছে ধোঁয়ার মতো। এই ধোঁয়ায় চোখ দিয়ে নতুন ধারায় পানি ঝরতে শুরু করে। রমিজ ডুকরে কাঁদে, 'বুবু! বুবু রে! বুবু।' রমিজ কাঁদতেই থাকে, কেবলি কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতেই বুবুকে স্পষ্ট চেহারায় দেখতে পায়, অসিমুন্নেসাকে দ্যাখে আর চোখ উজাড় করে কাঁদে। এইভাবে রাত কাবার হয়। কাঁদতে কাঁদতে চোখজোড়া নুনমরিচপেঁয়াজলেবুপাতা চটকানো পান্তাভাত-খাওয়া পেটের মতো আরাম হলে নোনতা ও কুসুম-গরম পানির ওমে ভোরের দিকে রমিজের চোখ জুড়ে ঘুম নামে।

যুগলবন্দি

'আসগর!'

কার্পেটে বসে আসগর হোসেন তখন খালি সব বোতল থেকে ফোঁটা ফোঁটা তলানি ঢালছিলো নিজের জিভে। মস্ত ড্রয়িংরুমের আরেক মাথায় সরোয়ার বি কবিরের হুইস্কিশোষা গলা গমগম করে উঠলে প্রথমে সাড়া দেয় বারান্দায় বসে থাকা এ্যালসেশিয়ানটি। তারপর চমকে ওঠে আসগর। অতিথিদের বিদায় দিয়ে সরোয়ার কবির এইতো ভেতরে গেলো, ১৫ মিনিটের মধ্যে তার ফিরে আসার সম্ভাবনা আঁচ করতে পারলে এখন বোতল ঠোঁটে ধরার সাহস আসগরের হয়? মিনিট দশেক আগেও বারান্দায় বসে সে আসগরের পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো, সরোয়ার কবির ফিরে আসবে জানলে তাই অব্যাহত রাখা যেতো। আসগরের লাকটাই এরকম, সায়েবের ফেভারিট কাজগুলো যখন করে সায়েব তখন লক্ষই করে না। সরোয়ার কবিরের গলা পর্যন্ত এখন ডিম্পলে শিভাজ রিগ্যালে টইটম্বুর, সাহিত্য কি কোষ্ঠকাঠিন্য কি নিজের ব্রিলিয়ান্ট এ্যাকাডেমিক ক্যারিয়ার নিয়ে কথাবার্তা শুরু করে তো রাতটা বসে বসেই কাবার।

টাল সামলাতে সামলাতে আসগর উঠে দাঁড়ায়, 'জি?'

তার গোপনে বোতল চোষার দিকে সরোয়ার কবির ফিরেও তাকায় না। 'বোসো' বলে নিজে লম্বা ১টা সোফায় বসে আধশোয়া হয়ে। এখন সহজে উঠবে না। আসগর আড়চোখে সার্ভে করে; না, চেহারা দেখে তার মুড বোঝবার জো নাই। তবে মিসেস জেসমিন বি কবিরের মেজাজ বোধ হয় ফর্মে নাই, বেডরুমে লোকটা সুবিধা করতে পারেনি। আহা, এতোবড়ো জাঁদরেল অফিসার—যার হাত দিয়ে লক্ষপতি কোটিপতিদের রোজগারের খানিকটা চালান হয়ে আসে রাষ্ট্রীয় তহবিলে—দ্যাখো বৌয়ের মেজাজের জন্য মাসে কম করে হলেও ৪/৫ দিন তাকে কাটাতে হয় ড্রয়িংরুমে, স্রেফ সোফায় কি ডিভানে আধশোয়া অবস্থায়। লোকটার এই ভোগান্তির কথা ভেবে আসগর এতোটা দুঃখিত হয় যে তার দুঃখ নিজেই বরণ করে নেওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এ ধরনের দুঃখকষ্ট ভোগ করার কপাল যে তার কবে হবে!

'আসগর, তোমাকে তো একটু কষ্ট করতে হয়। পারবে?'

কুশনঢাকা মোড়ায় বসে বসেই আসগর এ্যাটেনশন হয়। একই সঙ্গে অভিভূত চোখে তাকায়, সায়েব কীরকম পোলাইট, কী তার এটিকেট! আসগর হোসেন কি?—না, তার বোনের চাচাতো না মামাতো দেওরের বন্ধু।—এটা কোনো সম্পর্ক হলো? আসলে তো চাকরির উমেদার। তাকে সোজাসুজি হুকুম করলেও পারে। তা না, ভারী গলায় কী বিনয়! কিন্তু এ ধরনের জবাবে কী করতে হয় না জানায় আসগর কথা বলে না। সরোয়ার কবির জিগ্যেস করে, 'রাত অনেক হয়েছে, না?'

'জি পৌনে একটা, বারোটা তেতাল্লিশ।'

'মোটে?'

সরোয়ার কবির হাসলে আসগরও অগত্যা হাসে, 'না, রাত তেমন হয়নি, শীতের রাত, এখনো সারাটা রাত্রি পড়ে আছে।' বোঝাই যাচ্ছে, হুইস্কির বোতল আনতে তাকে এখন যেতে হবে মাইল পাঁচেক দূরে। অসময়ে এসব কাজ সরোয়ার কবির তার অফিসের লোক দিয়ে করায় না, অফিসে সে দয়ালু ও বিবেচক বস। বছরখানেক এসব কাজ করেছে তার বোনের চাচাতো না মামাতো দেওর। ১০/১২ মাসের একনিষ্ঠতার পুরস্কারও তার জুটেছে, সরোয়ার কবিরই বলে কয়ে তাকে ঢুকিয়ে দিয়েছে এ্যামেরিকান এক জাহাজ কোম্পানিতে। ঐ সিকানদারের থ্রুতেই আসগর এই বাড়িতে ঢোকে, লেগে থাকতে পারলে তারও হবে। এখন বোতল নিয়ে এলে ১টা অন্তত সরিয়ে রাখতে হবে, কোথায় কীভাবে রাখবে এই নিয়ে আসগর একটু পরিকল্পনা করে।

'শীত কোথায়? দেখছো না পাঞ্জাবি পরে কেমন ঘামাছি।' তা পেগের পর পেগ শিভাজ রিগ্যাল চালালে আসগর ন্যাংটা হয়ে এতোক্ষণে রাস্তায় নামতে পারে। সরোয়ার কবির বলে, 'বসন্তের হাওয়া ফিল করছো না?'

'জি, আর মাস খানেকের মধ্যেই ফাল্গুন মাস এসেছে।'

'রাইট। ফাল্গুন আসছে, না?'

'জি, নেকস্ট মান্থ। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি।'

'দ্যাটস রাইট। এনিওয়ে, তোমাকে একটু বদার করবো।'

'না, স্যার, না স্যার। আগ্রাবাদ যেতে হবে?'

তাকে কবির ভাই বলে ডাকলেও তার কোনো অর্ডার ক্যারি আউট করার সময় আসগর স্যার বলতেই বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করে।

'আগ্রা দিল্লি যেখানে ইচ্ছা যেতে পারো। কয়েকটা কমলালেবু জোগাড় করতে হয়। এক্ষুনি দরকার।'

'কমলালেবু? এখন?'

'হ্যা। পিঙ্কির, আই মিন তোমার ভাবীর হঠাৎ কী হয়েছে কমলালেবু খেতে ইচ্ছে করছে। নর্ম্যালি ও রাতে কিছু খায় না, নট ইভন এ গ্লাস অফ ওয়াটার, পানিতেও নাকি ফ্যাট বাড়ে। আমি বারবার করে বললাম এতো ড্রিঙ্ক করার পর

খালি পেটে থেকো না, অন্তত ফলটল কিছু খাও। তো ফ্রিজ খুলে দেখি আপেল আছে, কলা আছে, বাট নো অরেঞ্জ।'

'আপেল খেলে হয় না?' জিগ্যেস করেই আসগরের ভয় হয় যে এই কথায় সরোয়ার কবির তাকে কর্মবিমুখ অলস ও অপদার্থ যুবক হিসাবে চিহ্নিত না করে। সঙ্গে সঙ্গে তাই একটু মেরামত করতে হয়, 'রাত্রে কমলালেবু খেলে অনেক সময় এ্যাসিড হতে পারে।'

'আপেল থেকেই বরং এ্যাসিড হওয়ার চান্স বেশি।'

এরপর কলা সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়াটা রিস্কি। আর এদের সোসাইটিতে কলার পজিশনও ওর কাছে স্পষ্ট নয়।

সোফায় মাথা এলিয়ে দিয়ে সরোয়ার কবির বলে, 'শি ওয়ান্টস অরেঞ্জ। ইট হেল্পস হার টু রিডিউস হার ওয়েট। টক তো চর্বিনাশক।'

'জি, টক সব সময় চর্বিনাশক।' সরোয়ার কবিরের ইংরেজির মতো তার কঠিন কঠিন বাঙলা কথাও রপ্ত করার জন্য আসগর সদা সচেতন।

'গাড়িটা বের করো', আসগরের হাতে ১০০ টাকার নোট গুঁজে দিতে দিতে সরোয়ার কবির বলে, 'ড্রাইভার বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। বেচারা সারাটা দিন ডিউটি করেছে, ড্যাম টায়ার্ড। দ্যাখো তো ওঠে কি-না।'

'আমি নিজেই বরং চালিয়ে নিয়ে যাই।'

'গুড।' টেবিলের শেলফ থেকে ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ টেনে নিতে নিতে সরোয়ার কবির ছোট্টো করে হাসে, 'ভেরি গুড। যাও।'

গাড়ি বার করার সময় এ্যালসেশিয়ানটা গর্‌র্ গর্‌র্ করলে আসগর ডাকে, 'আরগস।' দুর! ডাকটা হার্শ হয়ে গেলো। সরোয়ার কবির শুনে ফেললো। সঙ্গেসঙ্গে মোলায়েম ও আদুরে করে বলে, 'আরগস।' এবার গলাটা বেশি নিচু হয়ে গিয়েছিলো। সরোয়ার কবির শুনলো তো?

না, চকবাজারে ফলের দোকান একটিও খোলা নাই। এতো রাতে তার জন্যে কমলালেবু নিয়ে বসে থাকবে কোন শালা? সুতরাং ডানদিকে মোড় নিয়ে চাকা গড়িয়ে দিলো দক্ষিণ-পূর্বে। ডাইভটা ভারী চমৎকার। রাস্তা-ঘাট-সব ফাঁকা। সারমন রোড দিয়ে এতোবার গেছে, জামান ইন্টারন্যাশনালের পুরনো জিপ নিয়ে সিকানদারের সঙ্গে যখন ড্রাইভিং শেখে তখনও এই রাস্তায় মেলা গাড়ি চালিয়েছে। কিন্তু এরকম অদ্ভুত লাগেনি কোনোদিন। কোথাও পাতলা কোথাও ঘন কুয়াশার আড়ালে পাহাড়গুলো ভারী রহস্যময়। জয় পাহাড়ের এখানে ওখানে আলো জ্বলে, কুয়াশায় সেই সব আলো এখন ঝাপসা। কখনো কখনো ১টি আলো ২টি ৩টি আলোয় ভাগ হয়ে লুকোচুরি খেলে। গাড়ির হেডলাইটের আলো কুয়াশা ছিঁড়তে ছিঁড়তে নিজেই গলে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে, ফ্যাকাসে অন্ধকার বড়ো অপরিচিত মনে হয়। গাড়ির জানলা খোলা, সেদিক দিয়ে পাহাড়ের ঠাণ্ডা নিশ্বাস এসে মুখে লাগে। জানলাটি উঠিয়ে দিতে বাধো বাধো ঠেকে, মনে হয় কেউ অসন্তুষ্ট হতে পারে।

পাহাড়ের গায়ে গাছগুলো সরে সরে যাচ্ছিলো, হঠাৎ করে চোখে পড়ে একটু দূরে পাহাড়ের মাথায় ন্যাড়া ঢ্যাঙা গাছের পাতাঝরা ডালে ডিমে তা দেওয়ার ভঙ্গিতে বসে রয়েছে কৃষ্ণপক্ষের কালচে রক্তের রঙের চাঁদ। ডাল ভেঙে শালার চাঁদ পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়লে মহা কেলেঙ্কারি! জোর করে সেদিক থেকে চোখ ফেরাতে ফেরাতে আসগর গাড়ির স্পিড বাড়ায়। দুত্তোরি! ভূতের ভয় কি শালা ফের চাগিয়ে উঠলো নাকি? বছর চারেক আগে পর্যন্ত তাকে কাটাতে হয়েছে মফস্বলে, প্রায় এঁদো মফস্বল, পোস্ট অফিসের সঙ্গে লাগোয়া পোস্ট মাস্টার বাপের টিনের বাড়িতে। শোবার ঘর থেকে কলপাড়ে যেতে সেখানে উঠান পেরোতে হয়। এখন অনেক উঁচুতে ন্যাড়া গাছের রোগা ডালে কালচে লাল চাঁদের ডিম পাড়া দেখে উঠানের কলাগাছের ঝাড় শিরশির করে কাঁপতে লাগলো। দুর! এখন আবার এসব আদিখ্যেতা কেন? এসব ভয় কি এখন পোষায়? তবু কমলালেবু জোগাড় করার অভিযানের চেয়ে এই বুক-ছমছম অনেক ভালো।

রিয়াজউদ্দিন বাজারের কুকুরগুলো পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছিলো। গাড়ির নরম আওয়াজেও তাদের কাচা ঘুম ভাঙে এবং আসগরের দিকে টার্গেট করে মহা ঘেউঘেউ শুরু করে। কুত্তার বাচ্চা! একেকটার চেহারা সুরৎ কী! একবার চোখে পড়লে আর তাকাবার রুচি হয় না। ইচ্ছা করে সবকটাকে লাথি মেরে স্টেশন রোড, স্ট্রান্ড রোড ডিঙিয়ে কর্ণফুলীতে নামিয়ে দেয়। কিন্তু ওদের ওপর আসগরের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, কারণ কোরাস ঘেউঘেউতে কাজ হলো, একজন লোক দোকান খুলে বাইরে এলো। দোকানের কর্মচারী গোছের লোক। প্রথমে পাত্তাই দেয় না। আসগর তখন ইব্রাহিম সওদাগরের নাম বলে। পোর্ট থেকে কয়েকবার গোপনে টু-ইন-ওয়ান এনে আসগর তার কাছে বিক্রি করেছে। তার নাম বলায় কাজ হয়।

তারপর গাড়ি নিয়ে সোজা মাদারবাড়ি। সরোয়ার কবিরের হাতে কমলালেবু একটু দেরিতেই পৌঁছানো ভালো। রাত দেড়টায় কমলালেবু জোগাড় করা চাট্টিখানি কথা নয়। সায়েবরা, আরামে থাকো, বোঝো না কতো ধানে কতো চাল! কিন্তু মাদারবাড়িতে আসগরদের বাসায় সবাই গভীর ঘুমে মগ্ন। বাবা যখন থানা বা রেলওয়ে স্টেশনের কাছে পোস্ট অফিসে কাজ করতো তখন যতো রাতই হোক তাদের ২ কামরার বাসায় টিনের চালে টিকটিকি হাঁটলেও 'কে? কে?' বলে লাফিয়ে উঠতো। আর সারাজীবন কিপটেমি করে জমানো পয়সায় দালান তুলে লোকটার ঘুম কীরকম গাঢ় হয়েছে। রিটায়ার করার পর কাজ নাই কম্ম নাই খালি ঘুমাও, না? দাঁড়াও তোমার ঘুমের ঘোর ঘোচাচ্ছি, দাঁড়াও। আসগর দরজায় ধাঁই ধাঁই করে ঘুষি মারে আর চ্যাঁচায়, 'দরজা খোলো, দরজা খোলো না!'

ঘুমঘুম চোখে দরজা খোলে আসগরের মা, ছেলের বিরক্তির শিকারও হতে হয় তাকেই, 'ঘুমালে তোমরা কি সব মরে যাও নাকি? কড়া নাড়ি, দরজায় ঘুষি মারি, তবু কারো ঘুম ভাঙে না কেন? কলিং বেল বাজে না কেন? বাল্‌ব খুলে রেখেছো

নাকি?' কলিং বেলের বাল্‌ব খুলে রান্নাঘরে লাগানো হয়েছে, আজকাল বাল্‌ব বড্ডো ফিউজড হয়, বাল্‌ব কেনার কথা বললেই আসগরের বাপ খ্যাকখ্যাক করে। কিন্তু এতো বকাবকিতে ঘাবড়ে যাওয়ায় মা জবাব দিতে পারে না, হাই তুলতে গিয়ে তার মাড়ির হাড় আটকে যায়। আবার সেটাকে সামলাতেও হয় ভয়েই, লালাজড়ানো জিভে মা বলে, 'রান্নাঘরের বাল্‌বটা হঠাৎ নষ্ট হয়ে গেলো।'

'ওটাও কি আমাকেই আনতে হবে? বাড়িতে আর লোক নেই?'

বাবা ছাড়া বাড়িতে পুরুষমানুষ বলতে আর কে আছে? আসগরের ছোটোভাই আজহারটা একেবারেই ছোটো, ক্লাস ফোরে পড়ে। একমাত্র বোনের বিয়ে হয়ে গেছে, সে থাকে ঢাকায়। সুতরাং বাল্‌ব না কেনার দায়িত্ব পড়ে বাবার ঘাড়েই। ওদিকে স্ত্রী-পুত্রের মধ্যরাত্রির কথপোকথনে অংশ নেওয়ার জন্য গোলাম হোসেন বিছানা ছেড়ে এখানেই আসছিলো, আসগরের সঙ্গে তার একটু দরকারও আছে। কিন্তু ছেলে এবার তাকেই সরাসরি ধমক দিয়ে বসবে অনুমান করে বেচারা করিডোরের সঙ্গে খাবার ঘরে চেয়ারে বসে পড়ে।

মাকে পাশ কাটিয়ে খাবার ঘরে ঢুকে আসগর রেফ্রিজারেটরের দরজা খোলে। মা বলে, 'ভাত খা, একটু বোস, তরকারি গরম করে দিই।'

আর খাওয়া! রেফ্রিজারেটরের ভেতরটা দেখে আসগরের মেজাজ খিচড়ে গেছে। রাজ্যের হাঁড়িকুড়ি আর লাউয়ের ফালি আর বেগুন আর পুঁইশাকে তাকগুলো ঠাসা। এইসব ছোটোলোকি জিনিসপত্র রাখার জন্য কি এতো রিস্ক নিয়ে পোর্ট থেকে আসগর ফ্রিজটা সরিয়েছিলো? সেই এ্যামেরিকান জাহাজের এক সেলারকে পটাতে কাঠখড় কম পোড়াতে হয়নি, তারপর কাস্টমসের লোক, তারপর পুলিস—ঝামেলা কম হয়নি। আর সেই ফ্রিজে কি-না রাখা হয় এইসব অখাদ্য? ফ্রিজের তাক থেকে হাত দিয়ে লাউয়ের ফালি, পুঁইশাক ও বেগুন গড়িয়ে নিচে মেঝেতে ফেলে আসগর সেখানে সাজিয়ে রাখে ডজনখানেক কমলালেবু। আজ ২ ডজন দিয়েই সরোয়ার কবিরকে সামলানো যাবে। মা উপুড় হয়ে তরকারিগুলো তুলে টেবিলে রেখে দেয়। রেফ্রিজারেটর বন্ধ করে আসগর ফিরে তাকালে মা বলে, 'খাবি না বাবা?'

'ঐসব?'

'পাগলা!' ঘুম-ভাঙা ঘরঘরে গলায় মা বলে, 'ট্যাংরা মাছের তরকারি আছে, বেগুন দিয়ে রাঁধা, পুঁইশাকের চচ্চড়ি আছে, ভাত খা।' এসব আসগরের প্রিয় খাদ্যের অন্তর্গত। কিন্তু মেনু শুনে রাগে দুঃখে তার গা জ্বলে যায়। মায়ের দিকে তাকায় না পর্যন্ত।

গোলাম হোসেন ভয়ে ভয়ে ছেলের তড়পানি দ্যাখে। তার রোগা কালো শরীরে ভয়টা বড়ো স্পষ্ট। বাপের এই ভয় আসগর অনুমোদন করতে পারে না। ছেলেকে বাপ এতো ভয় পাবে কেন? মাসখানেক আগে সরোয়ার কবিরের বাপকে দেখলো। সে একেবারে আলাদা ধরনের বাপ। কী জাঁদরেল চেহারা, বৃটিশ

আমলের পাকিস্তানি আমলের হাই গভর্নমেন্ট অফিশ্‌র। ঢাকা থেকে সেকেন্ড ফ্লাইটে এলো, এয়ারপোর্টে গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলো আসগর। গাড়িতে উঠতে উঠতে জিগ্যেস করলো, 'টুকু নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত? ফাইনান্স সেক্রেটারি তো এখন চিটাগাঙেই আছে?'—দ্যাখো তো কতো বড়ো ছেলে, তো তার সম্বন্ধে স্রেফ টুকু ছাড়া আর কিছুই বললো না। আর গোলাম হোসেন ঘাড় নিচু করে কেমন মিনমিন করে, 'বাবা সিমেন্ট তো পাওয়া যাচ্ছে না, আজ সারাদিন ঘুরলাম।'

'পাওনি?'

'না। নতুন ঘরের ফ্লোরের কাজ বন্ধ, মিস্ত্রীকে বসিয়ে রেখে খালি খালি পয়সা দেওয়া হলো।

আসগর জানে বাপের দুটো কথাই ডাহা মিথ্যা। সিমেন্টের খোঁজই সে করেনি, সিমেন্ট পেলে তো পয়সা যেতো নিজের গাঁট থেকে আর মিস্ত্রী সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করলেও মজুরি দিতে তার বুকটা ছিঁড়ে যায়, আর সে কি-না বসিয়ে রেখে মিস্ত্রীকে পয়সা দেবে? অতো সোজা? তবে বাপের এই মিছে কথা বলার জন্য তার ওপর রাগ করার সুযোগ পেয়ে আসগর খ্যাক করে উঠেলো, 'খালি খালি দণ্ড দাও কেন? সকালে না করে দিতে পারলে না?'

গোলাম হোসেন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলে তৃপ্ত আসগর স্বর নামায়, 'তুমি সিমেন্ট পাবে কোথায়? সোমবার এগারোটার দিকে কালীবাড়িতে ইয়াজউদ্দিনের দোকানে যেও। বলা থাকবে। আমার নাম বললে পঁচিশ বস্তা সিমেন্ট ছাড়বে।'

'দাম?' গোলাম হোসেন অন্যদিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করে। ইস! লোকটার ছোটোলোকামির কোনো সীমা নাই! 'আগেই দেওয়া থাকবে।' 'ঠেলাগাড়ি করে আনবো তো?' গোলাম হোসেনের এই উদ্বেগের জবাবে হিপ-পকেট থেকে ১০ টাকার ৩টে নোট টেবিলে ছুড়ে রাখে আসগর। সকালবেলা সরোয়ার কবির ১০০ টাকার হিসাব চাইলে একটু মুশকিল হবে। টাকা দিয়ে হিসাব চাইবার লোক অবশ্য সরোয়ার কবির নয়। কিন্তু করবে কী এরপর ২/৩ দিন এটা আনতে বলবে, ওটা আনতে বলবে, তবে টাকা দেবে না। মানে, মনে মনে শালাদেরহিসাবপত্তর সব ঠিকই থাকে। এই টাকাটা কীভাবে ম্যানেজ করা যায় ভাবতে ভাবতে চেয়ারে ডান পা রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আসগর কমলালেবুর খোসা ছাড়ায়।

'ভাত খা। এখন লেবু খেলে ভাত খেতে পারবি না।' মার এইসব বাঙাল মার্কা কথাবার্তা সে আর কতো সহ্য করবে? এদের ধারণা গাদা গাদা ভাত না গিললে খিদে মেটে না। সরোয়ার কবিরের বৌ কেমন দিনের পর দিন ভাত না খেয়ে কাটায়, তাতে কি তার শরীর ভেঙে পড়েছে, না আরো সুন্দর হয়ে উঠছে? সরোয়ার কবির যে বলে, ঠিকই বলে, ডেফিনিট এইম না থাকলে লাইফে কিচ্ছু করা যায় না। স্লিম হওয়া হলো জেসমিন কবিরের জীবনের আকাঙ্ক্ষা, তার চিন্তাভাবনা, তার সুখ-দুঃখ; বলা যায় তার দর্শন—সবই একটি অভিন্ন কেন্দ্রের দিকে

ধাবমান—ক্লাবে পার্টিতে সোসাইটিতে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলা। এজন্য তাকে কিছু খেসারত তো দিতেই হবে। খাওয়া কন্ট্রোল করা তো আছেই, যখন তখন ঘুম পেলেই বিছানায় গা এলিয়ে দিলে চলবে না, ঘুম পেলেও নয়, সেক্স ফিল করলেও নয়। ক্ষুধা নিদ্রা কাম—সবরকম স্পৃহা জয় করার জন্য ওদের ঐ সাধনা এই রিটায়ার্ড পোস্ট মাস্টার আর তার বৌ কি কল্পনাও করতে পারে? না। এরা সব সংশোধনের অতীত। আসগর ১টি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, না, এদের সঙ্গে বকবক করে লাভ নাই। বাইরে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে চোখ কুঁচকে বাবার ময়লা বেনিয়ানটা দ্যাখে এবং চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, 'এসব যে কী পরে থাকো? এতো সব দামি স্লিপিং স্যুট এনে দিই, সেসব কবরে নিয়ে যাবে?'

সরোয়ার কবিরের ড্রয়িংরুমে তখন কেউ নাই। দারোয়ান গেট খুলে দেওয়ার সময় আরগস একটু ঘেউঘেউ করলেও আসগরকে চিনতে পেরে ফের শুয়ে পড়ে। এখন কমলালেবু ভেতরে পাঠায় কী বলে? আসগর কয়েকবার গলা খাঁকারি দিলো, আবদুলের নাম ধরে কয়েকবার ডাকলো, কোনো সাড়া নাই। বেশি জোরে ডাকতেও ভয় হয়, কী জানি কারো ঘুম ভেঙে যায়। সায়েব কি রাগ করলো? মাদারবাড়িতে না গেলেই হতো। মেমসায়েব না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে তার প্রতিক্রিয়া কতোরকম হতে পারে। যেমন খালি পেটে ভালো ঘুম হওয়া অসম্ভব। ভালো ঘুম না হওয়া মানে হ্যাংওভার। হ্যাংওভার মানে বদমেজাজ। বদমেজাজ হলে হাজব্যান্ডের ওপর একচোট ঝাড়া। তার মানে সরোয়ার কবিরেরও মেজাজ খারাপ। তাহলে আসগরের অবস্থাটা কী দাঁড়ায়? ম্যাকডোনাল্ড এ্যান্ড রবিনসনের কাজটা সম্বন্ধে কাল একবার মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিলো, তা সায়েবের মেজাজ শরিফ ঠিক না থাকলে আর কথা বলবে কী করে? ঐ কোম্পানির কাজটা বাগানো এমন কিছু নয়, সরোয়ার কবির ১ বার কি বড়োজোর ২ বার টেলিফোন করলেই হয়ে যায়। এরা টাকা পয়সা মেলা এদিক ওদিক করছে, চুরি করার যাবতীয় সীমা পার হয়ে গেছে, সরোয়ার কবির এদের ওপর দারুণ চটা। ওদের ১জন ডিরেক্টর নানাভাবে তোয়াজ করার চেষ্টা করছে, সরোয়ার কবিরের পেছনে খুব ঘুরছে, সরোয়ার কবিরও বেশ ঘোরাচ্ছে। যতোই ঘোরাবে কমিশন ততোই বাড়বে। মোক্ষম সময় যাচ্ছে এখন, ইচ্ছা করলে আসগরকে এখনই কাজটা পাইয়ে দিতে পারে। সরোয়ার কবির আসগরকেই বা এভাবে নাচাচ্ছে কেন? আসগর তো তার জন্য কম করে না। মধ্যরাতে কমলালেবু জোগাড় করে আনা তো কোনো ব্যাপারই নয়, কতো রিস্কি কাজ করে দিচ্ছে তার হিসাব দেবে কে? বড়ো বড়ো ফার্ম সরোয়ার কবিরকে যে কমিশন দেয় তার মধ্যে ইন-কাইন্ড যা আসে তার শতকরা ২৫ ভাগ আজকাল ট্যাক্‌ল করে আসগর। কোনো কোনো জিনিস আনতে হয় সোজা পোর্ট থেকে। এসবে খাটনি কী কম? খাটতে আসগরের আপত্তি নাই, ঝুঁকি নিতেও সে পেছপা হয় না। তা একটা ভালো চাকরি ম্যানেজ করে না দিলে কি পোষায়? কয়েকদিন খুব ঝোলালো, মস্ত কোম্পানি, আড্রিয়াটিক-বেঙ্গল বে লাইনে

কনটেনার সার্ভিস, বেতন মেলা, তার ওপর আন্ডারওয়ার্লড বিজনেসের হেভি কমিশন + কুলশিতে ফার্নিশড ফ্ল্যাট। ফার্নিশড মানে খালি খাট পালং আর চেয়ার টেবিল নয়, এর ওপর রেফ্রিজারেটর, ওয়াশিং মেশিন, ইউটেনলিসলস, কিচেন গ্যাজেটস, এমন কি প্রতিবছর কয়েক সেট করে বিছানার চাদর, বেড কভার, পর্দা—সব, সব। চাইলে এ্যালসেশিয়ান জোগাড় করে দেবে। কাজটায় ঝুঁকি আছে: শতকরা ৭৫ ভাগ কারবার স্মাগলড গুডস নিয়ে, ধরা পড়লে কোম্পানি সম্পূর্ণ প্রোটেকশন নাও দিতে পারে। তা অতো সুযোগ দেবে আর সে এটুকু করতে পারবে না? কিন্তু কাজটা জুটলো কোন মিনিস্টারের শালা না ভাইপোর। অথচ মন্ত্রীর আত্মীয় কি আর সরোয়ার কবিরকে এরকম সার্ভিস দেবে? একেকবার আসগরের মনে হয়, দুত্তোরি! সব ছেড়েছুড়ে চলে যাবে। কোনো ফার্মে ছোটোখাটো চাকরি সে নিজেও কি জোগাড় করে নিতে পারে না? পারে। কিন্তু তাহলে কি পাঁচলাইশ কি কুলশিতে ফার্নিশড বাড়িতে থাকা যাবে? ইহজীবনে নয়। কখনো কখনো ভাবে, পোর্টের অন্ধিসন্ধি তার যা রপ্ত হয়েছে তাতে নিজেও বেশ করে খাওয়া যায়। কিন্তু তখন আবার ফেঁসে যাওয়ার চান্স থাকে। রিস্ক সে নিতে পারে বটে, কিন্তু মাথার ওপর কেউ না থাকলে চলে না। তাছাড়া এরকম ভাবাটাও তার অন্যায়। কবির ভাই না থাকলে এতো লোকজন, এতো ট্রিকস, এতো পথঘাট—না, কিছুই তার জানা হতো না। কবির ভাইকে শেষপর্যন্ত ধরে রাখতেই হবে। লেগে থাকলে কী না হয়? কাল খুব ভোরে উঠেই এ্যালসেশিয়ানটা নিয়ে আসগর খেলবে। সরোয়ার কবির সেই সময় লনে কিছুক্ষণ ফ্রিহ্যান্ড এক্সারসাইস করে। তখন কি ম্যাকডোনাল্ড এ্যান্ড রবিনসনের কথাটা পাড়বে? না না তা হয় না। আরগসকে আদর করে তখন সরোয়ার কবিরের ইমপ্রেশনটা জাস্ট ভালো করা। ব্যস, দিস মাচ। সায়েবকে তখন শুধু খুশি করা। কথাটা বলবে সরোয়ার কবির যখন অফিস যাবে তার আগে আগে। সবচেয়ে ভালো হতো ড্রাইভার ব্যাটাকে ২০টা টাকা গছিয়ে দিয়ে মেয়ের অসুখের নাম করে সকালবেলা ছুটি নেওয়াতে পারলে। তাহলে সরোয়ার কবিরকে গাড়ি ড্রাইভ করে অফিসে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায় আসগর, ঐ সময় ভালো করে পটানো যায়। ড্রাইভারের কাছে একটু ছোটো হতে হয় বটে, তবে ঐ চাকরি পেলে এরকম কতো ড্রাইভার তার পায়ের নিচে গড়াগড়ি যাবে। পরিকল্পনাটি পরিষ্কার হলে আসগরের ছটফটানি কমে, ফলে ঘুমটা নামে একেবারে ঝোঁপে।

'আরগস! আরগস! নটি বয়।' ডাক শুনে আসগর লাফিয়ে উঠে দ্যাখে, পৌনে সাতটা বেজে গেছে। জগিং শেষ করে, ফ্রি-হ্যান্ড এক্সারসাইস সেরে লনে আরগসের সঙ্গে বল নিয়ে লোফালুফি করছে সরোয়ার কবির। ইস! আসগরের সব পরিকল্পনা ভেস্তে গেলো। কী আর করে, হাত কচলাতে কচলাতে সে লনে এসে দাঁড়ায়। হাতের কাজ অব্যাহত রেখে সে বলে, 'কাল বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিলো, চকবাজার গেলাম, তো দেখি একটা দোকানও খোলা নেই, রিয়াজউদ্দিন বাজারে

কেউ দোকান খুলতে চায় না। মহাবিপদ! কমলালেবু কোথায় পাই? ওদিকে নিউ মার্কেটে—' 'কমলালেবু?' এই প্রশ্নবোধক শব্দটি উচ্চারণ করে সরোয়ার কবির ফের মনোযোগ দেয় আরগসের দিকে। কিন্তু আসগরকে দ্যাখার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আরগস চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং ল্যাজ নাড়তে নাড়তে বারবার কেবল তার দিকেই তাকায়। 'আরগস মনে হয় তোমাকেই লাইক করে।' সরোয়ার কবির এই কথা বললে আসগরের ভালো লাগে। খুব ভালো খবর, কিন্তু কমলালেবুর ব্যাপারটা তো স্পষ্ট করা যাচ্ছে না। তার এতো কষ্ট, এতো পরিশ্রম, এতো সাহস—সরোয়ার কবির কি কিছুই জানবে না? কমলালেবু না পেলে মিসেস জেসমিন বি কবির—বুড়োধাড়ি মাগীটা অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে— সেই ক্ষোভটিও তো সরোয়ার কবির প্রকাশ করতে পারে! কিংবা কমলালেবু না পেয়ে শেষপর্যন্ত ফিগারের ব্যালান্স নষ্ট হওয়ার মস্ত ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও তাকে আপেল খেতে হয়েছে—এটা জানতে পারলেও আসগরের টেনশন একটা আকার পায়। এই সব সম্ভ্রান্ত, মহামার্জিত ও ক্ষমতাবান লোকদের নিয়ে আসগরের হয়েছে শতেক জ্বালা। এখন চাকরির কথাটা তোলে কী করে?

সরোয়ার কবির বলে, 'আরগসের মিলটা বাড়াতে হবে, কেমন ডাল হয়ে যাচ্ছে, দেখছো? খুব উইক।'

'জি। আবদুলকে বলে দেবো, দুধটা বরং বাড়িয়ে দিক।' আসগর জিভ নাড়ে বটে, কিন্তু আরগসের খাবার বাড়িয়ে দেওয়া অতো সোজা নয়। পরশু এই নিয়ে জেসমিনের সঙ্গে সরোয়ার কবিরের একটু তর্কমতোনও হয়ে গেলো। আরগসের খাবার বাড়িয়ে দেওয়া দরকার সরোয়ার কবির এই কথা বলতেই জেসমিন প্রতিবাদ করে, 'বডি স্লিম না হলে এ্যালসেশিয়ানের সঙ্গে দেশি কুকুরের আর পার্থক্য কী? বেশি খেলেই খালি বসে বসে হাই তুলবে।'

'দিস ইজ আ সিলি আইডিয়া। শোনো, খাবার কষ্ট দিলে কোনো প্রাণীরই শক্তি বাড়ে না।'

'না, তোমাকে বললো কে? মডার্ন মেডিক্যাল সায়েন্স বলে, কক্ষনো পেট ভরে খাওয়া উচিত না, পেট ভরে খাওয়া মানেই হাঁসফাঁস করা, কোনো কাজে মন দিতে না পারা।'

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে স্ত্রীর ব্যুৎপত্তি নস্যাৎ করার জন্য সরোয়ার কবির হাসে, 'বাজে কথা। ব্যালান্সড ডায়েট মানে কি কম খাওয়া? যা দরকার তা তো খেতেই হবে। তবে বাউয়েলস ক্লিয়ার হওয়া চাই। লোডিং আর আনলোডিং সমান গুরুত্ব পাবে।'

'রাস্টিক।' কথায় কথায় কোষ্ট নিয়ে কথা তোলা জেসমিন কবিরের রুচিতে বাধে। কিন্তু সরোয়ার কবিরের প্রধান বিবেচনা আবার এটাই। সকালবেলা কোষ্ট পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত সে অবিরাম সিগ্রেট টানে, এমন কি তার ভোরবেলার জগিং ও ব্যায়ামের অন্যতম উদ্দেশ্য তার পাকস্থলি পরিষ্কার করা। একদিন লনে

বসে এক বন্ধুর সঙ্গে সরোয়ার কবির এই নিয়ে আলাপ করছিলো, আসগর শুনে ফেলেছে। সরোয়ার কবির বলছিলো, 'সকালবেলা জগিং করতে না পারলে পেটের মধ্যে ট্র্যাফিক জাম, সারাটা দিন মাটি। এ্যাট এনি কস্ট আই মাস্ট গেট মাই স্টমাক ক্লিয়ার বাই সেভ্‌ন থার্টি ইন দ্য মর্নিং।'

'বৃষ্টি টিষ্টি হলে জগিং করো কী করে? প্রবলেম হয় না?' বন্ধুর এই উদ্বেগে সরোয়ার কবির কৃতজ্ঞতার হাসি ছাড়ে, তাকে নিশ্চিন্ত করার জন্য বলে, 'সে এ্যারেঞ্জমেন্টও আছে।

'কী রকম?' বন্ধুর কৌতূহলকে জিইয়ে রেখে সরোয়ার কবির ধীরেসুস্থে সিগ্রেট ধরায়। কৌতূহল মেটাবার জন্য আসগরকেও গেটের কপাট অকারণে বন্ধ করতে হয়, ওখানে থাকার জন্যে তার ছুতা তো চাই।

'ঘুম ভাঙলে বিছানায় শুয়ে শর্ট একটা ইন্টারকোর্স সলভস ইওর প্রবলেম। কয়েকটা স্ট্রোক দিলেই তলপেটে চাপ পড়বে, এরপর রেগুলার ডোজ অফ থ্রি সিগারেটেস এ্যান্ড ইউ গেট ইওর বাউয়েলস ক্লিয়ার।'

'তা সাত সকালে তোমার ওয়াইফ এ্যালাউ করবে কেন?' বন্ধু হেসেই অস্থির, 'তুমি না বলো শি ইজ আ লেট রাইজার।'

'শি ইজ।' সরোয়ার কবির ঠোঁট টিপে হাসে, এই হাসিও এরকম ডাঁটেফাঁটে না থাকলে ঠিক রপ্ত করা যায় না। ঐ হাসিই প্রসারিত করে বলে, 'একটু ট্রিক খাটাতে হয়। ভোরবেলা ঘুম থেকে না উঠেও যে এক্সারসাইস করতে পাচ্ছো এতেও তোমার ফিগার স্লিম থাকবে। এক নম্বর সাঁতার আর দুই নম্বর সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স ইন দি আর্লি মর্নিং—আইদার অফ দিজ টু কিপস্ ইওর ফিগার স্লিম।—ব্যস, এই থিওরিতে কাজ হয়।'

এই পশ ধরনের হিউমার আসগর যে কবে করতে পারবে এই ভেবে এখন সে একটু উতলা হলো। তো সেদিন তো 'রাস্টিক' বলে জেসমিন কবির ভেতরে চলে গিয়েছিলো, আজ স্বামী-স্ত্রীর মতানৈক্যের কথা মনে করে আসগর বললো, 'বেশি খাওয়ালে আপা আবার রাগ করতে পারে।'

'তোমার আপার কথা বাদ দাও। ওর মিল বাড়াতেই হবে। একটু ছোটাছুটি করলেই খাবারটা হজম হবে, এজিলিটি বাড়বে। এ্যালসেশিয়ানস আর অলওয়েজ নিম্বল-ফুটেড। মাই আরগস ইজ রাদার স্লো। ওর প্রপার নিউট্রিশন হচ্ছে না।'

আসগর বলে, 'আজ ওর খাবার সময় আমি দেখবো।'

'একটু দেখো তো। কুকুরের যত্ন নিলে মানুষ ছোটো হয়ে যায় না।'

'না না তা কেন?'

'কুকুরের মতো বন্ধু কি হয়? আমি কয়েকদিন বাইরে কাটিয়ে এলে আরগস কীভাবে রি-এ্যাক্ট করে দ্যাখো না? যতোবার বাইরে থেকে এসে ওর জুভিল্যান্ট মুড দেখি ততোবার আমার মনে হয় ওর নাম রাখাটা খুব এ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়েছে।

সরোয়ার কবির লনে চেয়ারে বসে একটু পা দোলায়, আরগস শুয়ে শুয়ে সামনের ডান পা দিয়ে মাছি ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করে। রোদ ছড়িয়ে পড়ছে লনে,

রোদের সীমানা মিনিটে মিনিটে বাড়ে। কচি রোদের আলোয় শিশির-ভেজা সবুজ ঘাসে মোড়ানো টিলাগুলো ঝকঝক করে। আসগর এই পরিবেশের সুযোগ নিতে চায়, 'এহসানুল হক সায়েবকে আমার কথা বলেছিলেন?'

'ম্যাকডোনাল্ড রবিনসনের হক? ওদের থাকতে দিই কি-না দ্যাখো! ব্যাটারা কোটি কোটি টাকার বিজনেস করবে আর গভমেন্টকে ট্যাক্স দেওয়ার কথা তুললেই ধানাই পানাই। কী করে বিজনেস করে আমি দেখবো।' সে ফের আরগসের প্রসঙ্গে ফিরে আসে, 'এরকম হয়েছিলো অডিসিতে। অডিসিউস যখন ইথাকায় ফিরে আসে—' একটু থেমে বলে, 'অডিসির নাম শোনো নি?'

নামটা আসগরের চেনা চেনা ঠেকে, কোন জাহাজের বিজ্ঞাপনে দেখেছে, সাহস করে বলে, 'কোনো শিপের নাম বোধ হয়, না? এ্যামেরিকান লাইনার?'

'শিপ! শিপ! শিপ! তুমি একটা আস্ত শিপ, বুঝলে? এস এইচ ডবল ই পি। অডিসির নাম শোনোনি, বি এ পাস করেছো কীভাবে? বিরক্ত হয়ে সারোয়ার কবির চুপ করে। আসগর কী আর বলবে, বি এ যে কীভাবে পাস করেছে সে বিবরণ না দেওয়াই ভালো।

'এই যে সকালবেলা উঠেই মাস্টারি শুরু করেছো?'—বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলে জেসমিন কবির, 'সুযোগ পেলেই মাস্টারি।'

'আরে তোমার ঘুম ভেঙে গেছে? সো আর্লি?'

'যে লেকচার শুরু করেছো, এর মধ্যে ঘুমুই কী করে? ইস! এতো মাস্টারি করতে পারো!'

মাস্টারির কথায় কাজ হয়। ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে সরোয়ার কবির সেই প্রথম যৌবনে বছরখানেক কোনো কলেজে ইংরেজি পড়িয়েছিলো, তারপর সি এস এস পরীক্ষা দিয়ে চাকরি নিলো, তারও বছর দুয়েক পর বিয়ে করলো। কোনো বইয়ের রেফারেন্স দিয়ে কথা বললেই সেই কবেকার মাস্টারির কথা তুলে জেসমিন এমন তীক্ষ্ণ গলায় ঠাট্টা করে যে সরোয়ার কবিরকে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষান্ত দিতে হয়। মহিলা আসায় আসগর হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। কৃতজ্ঞতায় সে জিভ নাড়ে, 'আপা, কাল আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, কমলালেবু আনতে আমার একটু দেরি হয়ে গিয়েছিলো। তো অতো রাত্রে দোকানপাট তো সব—'

'ও মা, কমলালেবু এনেছিলো?' জেসমিন কবির কলকল করে ওঠে, স্বামীর দিকে তাকিয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, 'আর তুমি আমাকে একগাদা আপেল খাইয়ে দিলে, এ্যাঁ?'

'তোমার ঘুম পাচ্ছিলো, তাই এক স্লাইস আপেল খেতে বললাম।'

'তা একটু ওয়েট করলেই তো পাওয়া যেতো। তুমি কখন এসেছো আসগর।'

সুযোগটির সদ্ব্যবহার করতে আসগর ব্যস্ত হয়ে পড়ে, 'দুটো আড়াইটে বেজে গিয়েছিলো। অতো রাত্রে কোথাও দোকান খোলা নেই, চকবাজারে সব বন্ধ, চকবাজার থেকে রিয়াজউদ্দিন মার্কেট—সব বন্ধ। আগ্রাবাদে কর্ণফুলী মার্কেটেও দোকান খোলা নেই। কী আর করি, শেষপর্যন্ত ফের রিয়াজউদ্দিন মার্কেটে—'।

কিন্তু তার এই কর্মতৎপরতায় জেসমিন কবিরের কোনো আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না। তার টার্গেট এখন সরোয়ার কবির. 'টেল মি সরোয়ার, আমার ওয়েট বাড়লে কি ফিগারটা বেঢপ হলে হাউ ডাজ ইট হেল্প ইউ?' স্ত্রীর এই মারাত্মক অভিযোগে সরোয়ার কবির বিচলিত না হয়ে খাদ্য, পরিপাক ও কোষ্ঠ পরিষ্কার সম্বন্ধে তার বক্তব্য ঝড়ে. 'আমি বলি যদি ডাইজেস্ট করতে পারো তো যতোই খাও না বডি ঠিক থাকে। নিয়মিত এক্সারসাইস করো, জাস্ট ফ্রি-হ্যান্ড এক্সারসাইজ, আর বাউয়েলেস ক্লিয়ার হলে—।'

'ননসেন্স!'

জেসমিন কবির উঠে ভেতরে চলে গেলে সরোয়ার কবির বেশ জড়সড় হয়ে পড়ে। এখন উঠে বৌয়ের পিছে পিছে গেলে এক ধরনের আত্মসমর্পণ হয়. আসগরের সামনে ব্যাপারটা ঠিক হবে না। অথচ এখন যাওয়াটা তার খুবই জরুরি। এতোক্ষণ ২টো সিগ্রেট শেষ করেছে, ৩ নম্বরটি ব্যবহার করবে টয়লেটে ঢুকে। ঠিক সময়মতো ঢুকতে না পারলে স্টমাক ক্লিয়ার হবে না। তাহলে দিনটা মাটি। সরোয়ার কবিরের মুড অফ হলে আসগরের কথাটা পাড়বে কী করে? সরোয়ার কবিরকে সহজ করে তোলার জন্য আসগর উদ্যোগ নেয়, 'আমার মনে হয় আরগসের বাউয়েলস ক্লিয়ার হচ্ছে না।'

'একটু দেখলেই তো পারো।' তেতো গলায় বলে সরোয়ার কবির ভেতরে চলে যায়। তার দামি সিগ্রেটের প্যাকেট পরে থাকে টিপয়ের ওপর। প্যাকেটটা প্যান্টের পকেটে রাখতে গেলে আসগরের পকেট থেকে তা বেরিয়ে থাকে। এই সিগ্রেট আজকাল সুযোগ পেলেই আসগর প্যাকেট থেকে ২/১ টা করে সরায়। এখন প্রায় ভরা প্যাকেট সরাতে গিয়ে তার দারুণ উত্তেজনা হয়। এর মানে কী? পোর্ট থেকে একবার গাড়িতে মস্ত টেপ রেকর্ডার নিয়ে বেরিয়ে আসার সময় কাস্টমসের সেপাই তার গাড়ি দাঁড় করিয়েছিলো একেবারে ল্যাম্পোস্টের নিচে, তখনো বুক এভাবে কাঁপেনি। আস্তে করে গাড়ি দাঁড় করিয়েছিলো এমন কায়দায় যাতে আলো পড়ে তার মুখে, পেছনের সিটে ছায়া পড়ায় মালটা দ্যাখা যাচ্ছিলো না। আর ঐ সেপাই ব্যাটার চোখের মণিতে এমনভাবে তাকিয়েছিলো যে লোকটা বাঁকাচোরা হয়ে এ্যাটেনশন হয়ে তাকে স্যালুট দিয়ে ফেলেছিলো। মাথা বেশ ঠাণ্ডা রাখা সেই সময় চাট্টিখানি কথা নয়। তাহলে এখন এরকম হচ্ছে কেন?

অফিসে যাওয়ার সময় সায়েবের মুড অনেক ভালো, বেশ ভালো। গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বলে, 'আসগর, ম্যাকডোনালডের এহসানুল হক টেলিফোন করেছিলো. বিকালে আসবে. তুমি থেকো।' নরম আওয়াজে তার গাড়ি চলে যায় আগ্রাবাদের দিকে। একটা লিফট পেলে আসগরের ভালো হতো। বাসায় মিস্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলে সে নিজেই চলে যেতো সিমেন্টের খোঁজে। দোকানদারদের সঙ্গে বাবা দামটাম নিয়ে বিশ্রীরকম খ্যাচাখেচি করে। লাভ কিছুই হয় না, ব্যাগ প্রতি ২/১ টাকা কম দিয়ে ভেজাল মেশানো মাল গছিয়ে দেয়। আসগরের খিদেও

পেয়েছে অসম্ভব রকম। এদের ব্যাপার বোঝা দায়, যেদিন মুড ভালো তো গাদা গাদা খাওয়ায়। আবার দ্যাখো কাল বিকাল থেকে এ পর্যন্ত কয়েক ফোঁটা হুইস্কি আর কমলালেবুর গোটা চারেক কোয়া ছাড়া পেটে কিছুই পড়েনি। রাত্রে মা এতো করে মাছ দিয়ে ভাত খেতে বললো! মা দিনদিন রোগা হয়ে যাচ্ছে, ভেতরে ভেতরে কী রোগ হচ্ছে কে জানে? ম্যাকডোনালড এ্যান্ড রবিনসনের কাজটা পেলে খেয়ে না খেয়ে দিনরাত এখানে পড়ে থাকতে হবে না! কোম্পানির ভালো বাড়ি আছে কুলশিতে। ফার্নিশড বাড়ি, যা যা দরকার সব পাওয়া যাবে। এমন কি ফর্সা, বয়-কাট চুল, ডায়াটিং-করা, স্লিম, ন্যাকা ন্যাকা করে কথা-কওয়া ১টা বৌ পর্যন্ত। প্রবলেম বাবা মাকে নিয়ে, ঐ ২ জনকে নিয়ে মুশকিল। বাবাকে এতোবার বলে, জামাকাপড়গুলো একটু ভালো দেখে পরো, তোমাকে তো আর পয়সা দিয়ে কিনতে হচ্ছে না, আমি রেগুলার সাপ্লাই দিয়েই যাচ্ছি। না, তার কেরানি মেন্টালিটি ঘোচাবে কে? আর মায়ের খাওয়ার রুচি ইম্প্রুভ করা তার সাধ্যের বাইরে। এরা সব ইনকরিজেবল। কিন্তু আসগরকে তো থাকতে হবে তার নিজের মতো করে। ঠিক আছে তোমরা নিজেদের নিয়মে থাকো, টাকা পয়সা যখন যা লাগে দেবো। টাকাপয়সা কি জিনিসপত্র নেওয়ার বেলায় তো বাছাধনদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই, আসগর যেখান থেকে যা-ই নিয়ে আসে চুপচাপ ঘরে ঢোকায়, জিগ্যেসও করে না, এটা কোথায় পেলি বাবা? তাহলে তার মতো করে চলবে না কেন? হঠাৎ করে এতোটা রাগ হয় তার যে আরগসকে চড় মারার জন্য বাম হাতটা ওপরে উঠে যায়। পাগল! সে কি পাগল হয়ে গেলো? বুদ্ধিমানের মতো চট করে ডান হাত দিয়ে নিজের বাম হাতটা নামিয়ে নেয়। ডান হাতের চাপে বাম হাতের কব্জি লাল হয়ে গেলো।

বিকালে আসগর একটু ফিটফাট হয়ে আসে, এহসানুল হককে ইম্প্রেস করা চাই। তবে সব নির্ভর করে সরোয়ার কবিরের ওপর। আসগর যখন ঢোকে আরগসকে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে আবদুল। এটা হলো আরগসের বেড়াবার সময়। ১ ঘন্টার বেশি তাকে বাইরে রাখা যাবে না, সায়েব ফিরে এসে বরান্দায় তাকে ল্যাজ-নাড়া অবস্থায় দেখতে ভালোবাসে।

আসগর বলে, 'আবদুল, আমার কাছে দাও।'

'ক্যান?'

'দাও না, একটা নতুন খেলা শেখাবো।'

'এখন তো অর বেড়াইবার টাইম। সায়েবে অর লগে খেলে অফিস থিকা আইসা।'

'সায়েব ফেরার আগেই আমি নিয়ে আসবো।'

আবদুল ইতস্তত করে, 'এই সময় ঐ যে ঐ বাড়িগুলির ঐদিকে ইটের পাঁজা, তার পারে ঝোপের মধ্যে বাহ্যি করবো। আপনে না হয় সকালবেলা খেলা শিখাইয়েন।'

'যা বলছি শোনো। সবই করবো।'

কিছুক্ষণের জন্য ডিউটি থেকে রেহাই পাবার ইচ্ছাও আবদুলের কম নয়। শিকলটা আসগরের হাতে সমর্পণ করে সে বলে, 'এট্টু টাইট কইরা ধইরেন। কুত্তাটা খালি ছুইটা যাইতে চায়।'

বাইরে পা দিতে না দিতে আরগস সত্যিই ছুটে যেতে চাইছে। ইঁটের পাঁজার কাছে পৌঁছতেই ওর স্পিড দ্বিগুণ হয়ে গেলো। শিকলে কেবলি টান পড়ে। তা আসগর ধরেছেও টাইট করে, বাপধন যাবে কোথায়? এই শিকল ছেঁড়া তোমার বাপেরও সাধ্যি নয়। ওর বাপটা ছিলো কে? সরোয়ার কবিরকে জিগ্যেস করতে হবে। লোকটা জানে না হেন বস্তু নাই। এঞ্জিনিয়রদের সে সিমেন্ট-বালির অনুপাত সম্বন্ধে উপদেশ দেয়, এ্যান্টি-বায়োটিক কোথায় প্রয়োগ করা উচিত তা শিখিয়ে দেয় ডাক্তারদের, কলেজের বুড়ো প্রফেসর দ্যাখা করতে এলে তাকে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে ক্লাসে রোলকল করার সঠিক ও আধুনিক পদ্ধতি বুঝিয়ে দিয়েছিলো। ঝাড় দারকে ঝাড় ধরার কায়দা দেখিয়ে দেয়, আইন গাইনের যথাযথ উচ্চারণ সম্বন্ধে তার এলেম জবরদস্ত আলেমদের স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। মেয়েদের পটাবার বিদ্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত লম্পটদের সে হার মানাতে পারে, কুকুর কখন কী খেতে ভালোবাসে সংশ্লিষ্ট কুকুরদের চেয়ে সে ভালো জানে। আরগস কি এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানে যে সে হলো নেকড়ের বংশধর? কিন্তু সারোয়ার কবির জানে। এ নিয়ে আসগরের কাছে সে কতোদিন কতো পাঠ দিয়েছে।—লোকটা এতো শিখলো কোত্থেকে? লাহোর সিভিল সার্ভিস এ্যাকাডেমিতে কতো ট্রেনিং দেয়, সেখানে?—নাকি প্রশাসনে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে?—এই প্রশ্নের মীমাংসা হওয়ার আগেই শিকলে হ্যাঁচকা টান পড়লে আসগর প্রায় পড়েই যাচ্ছিলো, কোনোমতে সামলে নিলো। এখন বুঝতে পাচ্ছে, আরগসের বাউয়েলস আসলে ক্লিয়ার হচ্ছে না। সরোয়ার কবির ঠিকই বলে যে পাকস্থলি পরিষ্কার না হলে জীব শান্তি পায় না। আসলে ক্লিয়ার করার বন্দোবস্ত করাটা খুব দরকার। সায়েবসুবোর বাড়িতে থাকে, ওদের নিয়ম মানলেই কাজ হবে।—পকেট থেকে সকালবেলা সরোয়ার কবিরের টেবিল থেকে হাতানো সিগ্রেটের প্যাকেট বার করে ১টা ধরালো। সিগ্রেট শেষ করার পরও আসগরের হাতের মুঠিতে শিকলের কম্পন বোঝা যায়! এই সময় আরগসের উত্তেজনা হঠাৎ বেড়ে যেতে পারে এই ভয় করতেই শিকলে বেশ জোরে টান পড়ে। এবার ঠিক হাঁচকা টান নয়। বেশ লম্বা ধরনের শক্ত টান। না, অতো ঝুঁকি নেওয়া যায় না। আসগর তার ডান হাতের কব্জিতে শিকলের এদিকের প্রান্ত বেশ টাইট করে জড়িয়ে নিলো। একরকম বাঁধাই হয়ে গেলো আর কি! এবার সম্পূর্ণ নিরাপদ, এখন শালা কুত্তার বাচ্চা যদি ছোটে তো তাকে না নিয়ে যেতে পারবে না। নিশ্চিন্ত হয়ে ২য় সিগ্রেটটি ধরিয়ে গোটা তিনেক লম্বা টান দেওয়ার পর আসগরের হাতের শিকল শান্ত ও শিথিল হয়ে আসে। আসগর সিগ্রেটে বেশ কয়েকটা সুখটান দেয় আর অনুভব করে যে আরগস

খুব আরাম ও তৃপ্তির সঙ্গে বাউয়েলস ক্লিয়ার করছে। শিকলের ধাতব বিনুনি বেয়ে সেই তৃপ্তি আসগরের শরীরে চমৎকার মৌতাত ছড়িয়ে দিচ্ছে। অফিস থেকে ফিরে সরোয়ার বি কবির দেখবে তার প্রিয় প্রাণীটি কতো সপ্রতিভ হয়েছে, নিম্বল-ফুটেড এ্যালসেশিয়ানের স্পিন লক্ষ করে সে মুগ্ধ না হয়ে পারে না। এ ব্যাপারে তার নিজের প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের কথা আসগর কীভাবে প্রকাশ করবে এ নিয়ে আগেই কিছু ডায়ালগ ঠিক করে রাখা দরকার। এটা পরে করলেও চলবে। এখন রেগুলার ডোজ হিসাবে ৩টে সিগ্রেট খাওয়া উচিত. ৩ নম্বর সিগ্রেটটি ধরাতেই আসগরের হাতে শিকল শিরশির করে ওঠে এবং সে রিনিঝিনি আওয়াজ শুনতে পায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চমৎকার, আশাতিরিক্ত ক্ষিপ্রতায় আরগস তার সামনে এসে মৃদু মৃদু ল্যাজ নাড়ে। কোনো সন্দেহ নাই যে তার পাকস্থলিতে এখন শেষ-শীতের নির্মল হাওয়া বইছে। হাওয়ার তোড়ে সে এতোটা বেগে বাড়ির দিকে ছুটতে শুরু করে যে আসগরকে রীতিমতো দৌড়াতে হয়। তাড়াতাড়ি যেতে হবে, কিছুক্ষণের মধ্যেই সরোয়ার কবির ঘরে ফিরবে।

অপঘাত

ডুকরে-ওঠা কান্নার একেকটি ধাক্কায় মোবারক আলির বন্ধ চোখের মণি কাঁপে, চোখের পাতা আলগা হয়ে আসে, তার বাঁ পায়ের পাতা শিরশির করে। দুই হাঁটুর ভেতর হাতজোড়া ভাঁজ করে ডান কাত করে শুলে বাঁ পায়ের পাতার ওপর একজিমা চুলকাবার জন্য উঠে বসার উৎসাহ পায় না। এদিকে দেখতে দেখতে কান্নার ফাঁকগুলো সব ভরে যায় এবং কান্না একটানা বিলাপে পরিণত হয়ে তার ঝুনা করোটির ভেতরকার ঠকঠক দেওয়ালে ঘনতালে বাজতে থাকে। বাজনাটা একবার বৃষ্টি বলে মনে হয়েছিলো; কিন্তু বৃষ্টিপাতের ফলে ঘরের কান্নাকাটির খবর বাইরে যাবে না—এই আশা করে একটু নিশ্চিন্ত হবার আগেই বৃষ্টির বিভ্রম কাটে। বিলাপের আওয়াজ তার আঁশের মতো চুলের গোড়ায় গোড়ায় হ্যাঁচকা টান মারে। টানাটানির ফলে চোখের ঢাকনি সম্পূর্ণ উদাম হলে মোবারক কিছুই দেখতে পায় না, ঘরে ঘনঘোট অন্ধকার। ভালো করে তাকাবার বলও তার নাই, ঘুম-ভাঙা শরীরে স্ত্রীর বিলাপ অবিরাম ঠেলা দেওয়ায় সে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। তবে কি-না মুণ্ডুর প্রতিক্রিয়ায় নিস্তেজ শরীরেও মোবারক আলি বিরক্ত হওয়ার বলটুকু পায়: এটা কি বিলাপ করার টাইম হলো? এই বয়সেও বুলুর মায়ের কাণ্ডজ্ঞান হলো না তো হবেটা কবে? ২৫০/৩০০ গজ দূরে হাইস্কুলের দালানে মিলিটারির ক্যাম্প, স্কুলের চওড়া বারান্দায় গাদা গাদা বালুর বস্তার আড়ালে থাবার মতো সব হাতে ধরা রয়েছে কতো কিসিমের অস্ত্র, মোবারক ওসবের নামও জানে না, শুনলেও তার মনে থাকে না। সপ্তাহখানেক হলো ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিসটাও মিলিটারি দখল করে নিয়েছে, সে তো ১৫০ গজও হবে না। বুলুর মায়ের বুকের পাঁটা কতো বড়ো যে এইভাবে বিলাপ করে কাঁদে? মেয়েমানুষের এতো সাহস ভালো না. সব ছারখার করে ফেলবে। এই বিলাপ শুনে ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিস থেকে দুজন সেপাই এসে পড়লে মোবারক আলির ক্ষমতা হবে যে তাদের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়ায়? তারপর সেপাই, মানে সেপাই সায়েব যদি জিগ্যেস করে তোমার বৌ কাঁদে কেন?—তো সে কী জবাব দেবে? যদি বলে তোমার ছেলেমেয়ে কটা?—তখন না হয় বলা যাবে, জি দুই ছেলে, দুই মেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে জানাতে হবে যে মেয়ে দুটোর

বিয়ে হয়ে গেছে, তারা সব স্বামীদের সঙ্গে থাকে। তবে ছোটো মেয়েটা দুমাস হলো এখানে এসেছে, তিনদিন আগে সে গেছে তার মামাবাড়ি। তার মামা আলেম মানুষ, ঠনঠনিয়া মোস্তাফাবিয়া মাদ্রাসার হেড-মোদাররেস, সারা শীতকালটা ওয়াজ করে বেড়ায়, জেলা জুড়ে তার নাম।—সেপাই ধমক দিতে পারে, আরে, এতে তার বিবির কান্নাকাটির কী হলো? ঠিকভাবে কথার জবাব দাও।—তখন বাধ্য হয়ে বলতে হবে যে তার বড়োছেলের মৃত্যুই হলো তার স্ত্রীর কান্নাকাটির কারণ।—বড়ো ছেলে?—জি, আমার দুই ছেলে, ছোটোটা ঘরেই আছে, ক্লাস ফোরে পড়ে—সেপাই চটে যাবে, বাখোয়াজি রাখো। বড়োটা মারা গেছে? কী করতো?—জি, কলেজে পড়তো।—কলেজে পড়তো? মুক্তি ছিলো? কীভাবে মরলো?—হুজুর, অপঘাতে মারা গেছে।—অপঘাত? অপঘাত কেয়া হ্যায়?—না, মানে এ্যাক্সিডেন্ট হ্যায় না? হেঁ হেঁ।—ক্যায়সা এ্যাক্সিডেন্ট? সাচ বলো!—এরপর মোবারক আলি আর বলতে পারবে না।—জি না স্যার, জি না হুজুর, জি না মেজর সাহেব, জি না ক্যাপ্টেন বাহাদুর, আমি কিছু জানি না!—শালা তোমার ছেলে মিসক্রিয়ান্ট ছিলো? তোমার ঘরে তুমি মিসক্রিয়ান্টদের শেলাটারও দাও?—না হুজুর!—মিসক্রিয়ান্টদের কথা সে জানে না। ইউনিয়ন কাউন্সিলের কেরানি মোবারক আলি হাজার হলেও পাকিস্তান গভমেন্টের চাকরি করে, জি, তার বেতন আসে বগুড়া ট্রেজারি থেকে, মিসক্রিয়ান্টদের খবর সে রাখবে কোত্থেকে?—না, তার শুকনা এবং কাঠ-কাঠ গলা থেকে এইসব বাণী হাঁকা অতো সহজ নয়। মিলিটারির সঙ্গে কাল্পনিক বাক্যবিনিময়ের সংকল্পে তার বল তাই বাড়ে না। তার পাশে শুয়ে-থাকা ছোটো ছেলে টুলু ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে কী বলে, তাতে মোবারক আলির তন্দ্রা একেবারে ছিঁড়ে যায় এবং সে উঠে বসে। এখন আর শিরশির না করলেও একজিমার খানিকটা চুলকে নেয় এবং পাশের ঘরে দেড় বছরের নাতিটা হঠাৎ কেঁদে ওঠে। তখন তার মগজের ময়লা কাটে, মোবারক আলি বোঝে যে এই একটানা বিলাপের উৎস তার নিজের বাড়ি নয়। আওয়াজ আসছে দক্ষিণ থেকে। নাতি তার ফের কাঁদে এবং মোবারকের মাথায় বিদ্যুৎ খেলে যায় ঃ চেয়ারম্যানের ছেলেটা তা হলে মারা গেলো!

বিকালেও সে চেয়ারম্যানের বাড়ি গিয়েছিলো। ইউনিয়ন কাউন্সিলে মিলিটারি ক্যাম্প হবার পর থেকে অফিসের টুকটাক কাজ সারতে হয় চেয়ারম্যানের বাড়িতে। বিকালবেলা চেয়ারম্যানের চোখমুখ একটু হাল্কা মনে হচ্ছিলো, শাজাহান মনে হয় একটু ভালো। না, ভালো আর কোথায়? জ্বরটা রেমিশন হচ্ছে না, তবে একটু আগে লেবু দিয়ে প্রায় এক গ্লাস বার্লি খেয়েছে। চেয়ারম্যান একটু আলাপও করলো, এখানে চিকিৎসা একেবারেই হচ্ছে না, অবস্থা একটু ভালো হলে বগুড়া পাঠাবে। চার গাঁয়ের এক ডাক্তার চেয়ারম্যানেরই কীরকম চাচাতো ভাই, একই বাড়ি, মার্চের প্রথমদিকে দিনাজপুরে শ্বশুরবাড়ি গেলো মরণাপন্ন সম্বন্ধীকে দেখতে, গোলমাল শুরু হতেই ওপারে ভাগলবা। আর সেরপুরের বীরু সান্যাল, পুরনো

আমলের ন্যাশনাল পাস,—১০/১২ বছর আগেও এই গ্রামের সবাই তার কাছেই যেতো, তা শোনা যাচ্ছে বর্ডার পার হবার সময় বেয়নেটের খোঁচায় বুড়ো সাফ হয়ে গেছে।— ছেলেকে নিয়ে চেয়ারম্যান এখন যায় কোথায়? গোরুর গাড়ি করে সেরপুর পর্যন্ত না হয় গেলো, সেরপুরে জনমনিষ্যি কেউ নাই, বড়ো রাস্তায় খালি মিলিটারি, খালি মিলিটারি। তা এখানে হাইস্কুল ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন সাহেবের সঙ্গে চেয়ারম্যানের একটু আলাপ হয়েছে, তবে ওদের সাহায্য চাইতে ভয় হয়, ঘরে সোমত্ত বয়সের মেয়েরা আছে, কিসের বিনিময়ে আবার কী চেয়ে বসে! তা দ্যাখা যাক, আজ তো বার্লি খেলো, অবস্থা একটু ভালো হোক, এর মধ্যে কি অনেকটা নর্ম্যাল হবে না? দেশের অবস্থা নর্ম্যাল হওয়ার আগেই ছেলেটা মারা গেলো? তাহলে সন্ধ্যার পর থেকে কি খারাপ হচ্ছিলো? মনসুর সরকার কয়েক বছর থেকে হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিস করে, কাউকে না পেয়ে তাকে দ্যাখানো হলো, তার ডায়াগনোসিস হলো টাইফয়েড। দুর, টাইফয়েড কি দুটো সপ্তাহ সময় দেবে না? ১০/১২ দিনেই সব শেষ হয়ে গেলো? আহা! ছেলেটার মায়ের স্বর স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তার সঙ্গে ছলকে ছলকে ওঠে চেয়ারম্যানের মায়ের কান্না। এদের কান্নাকে মোবারক বুলুর মায়ের বিলাপ বলে ভুল করলো কী করে? স্ত্রীর জন্য তার মায়া হয়, শোকে বুলুর মা একেবারে কাঠ হয়ে গেলো! বৌয়ের ওপর সে মিছেমিছি রাগ করছিলো।

বিছানা থেকে নেমে মোবারক আলি ঘরের উল্টো প্রান্তে বৌয়ের বিছানার দিকে পা বাড়ায়। তক্তপোষের কাছাকাছি যেতে পা লেগে নেভানো হ্যারিকেনটা গড়িয়ে পড়ে। কেরোসিনের ঝাঁঝালো গন্ধে মাথা আরেকটু পরিষ্কার হয়। মনে পড়ে যে নাতিকে নিয়ে বুলুর মা শুয়ে রয়েছে পাশের কামরায়। এই ঘরটায় থাকতো বুলু। মোবারক আলি একটু দমে যায়, তবু অন্ধকারে হেঁটে হেঁটে বারান্দা দিয়ে সে পাশের কামরায় ঢোকে। বুলুর মা বলে ওঠে, 'আস্তে হাঁটো, টেবিলের উপরে দুধের বোতল, কাচের গিলাস!' মোবারকের মুখস্থ। আজ ২ রাত হলো বুলুর মা এখানে শোয়, কিন্তু বুলুর খবর শোনার পর থেকে মোবারক অনেক রাত্রে পেচ্ছাব করতে বেরিয়ে একবার করে এই ঘরে বসে। অল্পক্ষণ বসে, কাঠের চেয়ারে পাছা ঠেকাতে না ঠেকাতেই উঠে নিজের ঘরে যায়। কিন্তু তার জানা আছে কোথায় বুলুর তক্তপোষ, কোথায় তার কেরোসিন কাঠের টেবিল। টেবিলে পুরনো ক্যালন্ডারের মলাট লাগানো বই, খাতা, দোয়াত, কলম—কীভাবে সাজানো সব তার জানা। বিছানার দিকে এগোবার বদলে মোবারক টেবিলের বইপত্র হাতড়াতে শুরু করে। বুলুর মায়ের সাড়া পেয়ে সে বিড়বিড় করে, 'দিয়াশলাই পাই না, দুর!'

'বাতি জ্বালায়ো না।' স্ত্রীর ভিজে ভিজে গলায় এই সতর্ক নিষেধ শুনে মোবারক এসে দাঁড়ায় তক্তপোষের মাথায়। মাস দেড়েক হলো প্রতিরাতে পেচ্ছাব সেরে এ ঘরে এসে ঠিক এখানেই দাঁড়িয়ে মোবারক বিছানাটা ভালো করে ঠাহর করার চেষ্টা করে। আজ তার মাথায় তন্দ্রার রেশ নাই, সুতরাং বুলুর ঠ্যাঙা শরীরটাকে এখানে শুইয়ে অন্ধকারে নয়ন ভরে আর দ্যাখা হয়ে ওঠে না।

চোখজোড়া তাই ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে এবং বিছানার ওপরকার শূন্যতা চোখের মধ্যে নুন হয়ে জমতে শুরু করলে নিজেকে সামলাবার জন্য তাকে অনাবশ্যক স্বাভাবিক গলায় বলতে হয়, 'চেয়ারম্যানের ব্যাটা বুঝি মারা গেলো।' শাজাহানের মৃত্যু-সংবাদ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হওয়ার আগেই বুলুর মা ফোঁপাতে শুরু করে। এই ফোঁপানো হলো কোনো দীর্ঘকান্নার রেশ। বুলুর মা তাহলে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদছে। ঘুম ও তন্দ্রার ভেতর দক্ষিণপাড়ার আখন্দবাড়ির বিলাপকে যখন সে স্ত্রীর কান্না বলে ভুল করে, বুলুর মা তখনো কাঁদছিলোই। তবে বাইরের বিলাপের তোড়ে রোগা গলার কান্না চাপা পড়েছিলো। স্ত্রী বিলাপ করছিলো বলে একটু আগে তার ওপরে রাগ করায় মোবারকের যে অস্বস্তির মতো হচ্ছিলো তা এখন কেটে যায়। স্ত্রীর ওপর বিরক্ত হবার সুযোগটি সে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার করে, 'আস্তে! আস্তে কান্দো! বিপদ বোঝো না?'

চুপ করার চেষ্টায় বুলুর মায়ের কান্না আরো উথলে ওঠে। কান্নায় সম্পূর্ণ মগ্ন থাকায় এবং অন্ধকারের জন্যেও বটে, বুলুর মা স্বামীকে দেখতে পাচ্ছে না। ভয় ও রাগে মোবারক আলির চোখমুখনাকঠোঁটের ওলটপালট হবার দশা ঃ বুলুর মা সারাটা জীবন কি অবুঝ মেয়েমানুষই থেকে যাবে? তার কান্না শুনে মিলিটারির ১ জন সেপাই যদি এসেই পড়ে তখন এই পুত্রশোকের ব্যাখ্যা করা যাবে কী করে? তখন কি খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে না? তারপর? তার পরে? তারপরের ঘটনা মোবারকের জানা আছে। তাকে ধরে নিয়ে যাবে স্কুলের দালানে, হেডমাস্টারের কামরায় এখন টর্চার সেল। মোবারক আলির মেরুদণ্ড শিরশির করে। সুতরাং টর্চার সেলের ছবি তাড়াতাড়ি মুছে ফেলার জন্য সে কাতর হয়। তার বাড়িতে ওরা নির্ঘাত আগুন ধরিয়ে দেবে। এই পুরনো মাটির বাড়ি, টিনের চাল, বাঁশের সিলিঙ—সব দাউদাউ করে জ্বলবে। আগুনের আঁচ সে এখনি অনুভব করতে পারে। তলপেটে আগুনের আঁচ লাগে। তার ভয় হয় যে লুঙিতে প্রস্রাবের ফোঁটা পড়েছে। একটু বাইরে গেলে হতো। কিন্তু এও তার জানা আছে যে বাড়ির পেছনে ভেরেণ্ডা ঝোপে বসলে গুণে গুণে ৮ ফোঁটাও পড়বে কি-না সন্দেহ। সে প্রায় চিৎকার করে ধমক দেয়, 'চুপ করো, বুলুর মা চুপ করো। সোয়াগ দ্যাখাবার টাইম পাও না, না?' ধমকে কাজ হয়। বুলুর মা চুপ করে। এই সুযোগে মাথা তোলে দক্ষিণপাড়ার বিলাপ। মোবারক আলি হঠাৎ খুব জোরে নিশ্বাস ফেলে তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে-চলে-যাওয়া পাছাটিকে ধপাস করে তক্তপোষের একধারে ফেলে দিলে বুলুর মা বলে, 'আস্তে!' এই একটিমাত্র শব্দে স্বামীর প্রতি তার অনাস্থা বা সাময়িক অনাস্থা প্রকাশ পায়। প্রায় মিনিট দুয়েক সময় পার হলে মোবারক আলির শিরদাঁড়ায় স্পন্দন থিতিয়ে আসে এবং আপোশ-আপোশ গলা করে সে বলে, 'চেয়ারম্যানের একটাই ব্যাটা গো।'

শাজাহানের জন্যে মোবারক আলির খারাপ লাগে। এই শাজাহান স্কুলে সাত বছর বুলুর ক্লাসমেট ছিলো, আহারে! না, স্কুলজীবনে দুজনের তেমন খাতির হয়নি।

শাজাহান ছাত্র খুব ভালো, রাতদিন লেখাপড়া নিয়ে থাকে। বুলু গড়পড়তা ছাত্র, সেকেন্ড ডিভিশনে পাস করেই খুশি। ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েও শাজাহানের তৃপ্তি হয়নি, আর ক'টা নম্বর পেলেই সে অনেক ভালো করতো। এই নিয়ে তাঁর আক্ষেপের আর শেষ নাই। শাজাহান বছরের ১টা মাস কোনো না কোনো রোগে ভোগে, নইলে চেয়ারম্যান কি তাকে গ্রামের স্কুলে ফেলে রাখে? শহরে তাদের কতো আত্মীয়স্বজন, জেলা স্কুলে পড়লে কেবল রোল নম্বর নয়, খবরের কাগজে তার নামও ছাপা হতো। এসএসসি'র পর শাজাহান শুনলো না, জেদ করে ভর্তি হলো ঢাকায়। বুলু গেলো বগুড়া কলেজে। অথচ, তখন থেকে দুজনের ভারী ভাব, ছুটিতে বাড়ি এলে প্রায় সারাদিন এক সঙ্গে কাটায়। শাজাহান ছেলেটি ভারী ভদ্র, বাপ-চাচাদের মতো কথায় কথায় খোঁচা-মারা কথা বলে না।—বুলুর কথা ভোলার জন্য মোবারক আলি শাজাহানের কণ্ঠস্বর মনে করার চেষ্টা করে, আহা কী অমায়িক ছেলে, দ্যাখা হলেই 'স্লামালেকুম চাচা, বুলু বাড়ি নাই?'—আহা, সেই ছেলে কয়েক দিনের জ্বরে এভাবে—। শাজাহানের জন্য শোকটা তারিয়ে তারিয়ে দেখবে, তা বুলুর মা তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে ফোঁপাতে লাগলো। ছেলের শোক বহন করার চেষ্টা সে এখন করছে একা একা! মেয়েমানুষের দৌড় মোবারক আলির জানা আছে। একটু পরেই তার হাত জড়িয়ে হাউমাউ করতে শুরু করবে। কেন, ছেলেকে আগলে রাখতে পারোনি, এখন হায় হায় করে লাভ কী? বুলুটা বড্ডো বেশি বেড়ে গিয়েছিলো। মুক্তিবাহিনী করে তোরা করলিটা কী? মিলিটারি এসে গ্রামকে গ্রাম উজাড় করে দিচ্ছে, মরা ছাড়া তোরা আর কী বালটা ছিঁড়তে পারিস?—রাগে মোবারক আলি মনে মনে মুখ খারাপ করে। করবে না? মিলিটারি কলেরার মতো আসে, ম্যালিরিয়ার মতো আসে। যে গ্রামে একবার হাত দেয় তার আর কোনো চিহ্ন রাখে না। গতকাল বৃহস্পতিবার গেলো, তার আগের বৃহস্পতিবার মাইল ছয়েক উত্তরে মালিয়ানডাঙায় মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা এক রাত্রির জন্য আশ্রয় নিয়েছিলো। একদিন পরে, শনিবার দিনগত রাত্রে সিঙড়া ক্যাম্প থেকে মিলিটারি এসে গোটা গোটা গ্রাম জ্বালিয়ে দিলো। প্রাইমারি স্কুলটাও বাদ দেয়নি,—তা মুক্তিবাহিনী, তোরা কী করতে পারলি? সরকার-বাড়ির ল্যাংড়া জমির আলির মেয়ে আর ভাইঝিকে নিয়ে গেলো। কী ব্যাপার? না, তাদের নামে কমপ্লেন আছে।—মেয়েমানুষের নামে কমপ্লেন?—হ্যাঁ, তারা সব ইনফর্মার, মুক্তিবাহিনীকে খোঁজখবর পাঠায়।—তাদের একজন ফিরে এলো দিন দশেক পর। সেই মেয়েকে নিয়ে ল্যাংড়া জমির আলি যে মুসিবতে পড়েছে, কপালে তার আরো কতো যে ভোগান্তি আছে!—গজব! গজব! গজব ছাড়া এসব কী?—চেয়ারম্যান যে চেয়ারম্যান, যে সরকারই আসুক, লোকটা ঠিকঠাক সামালাতে পারে, সবাইকে খুশি করার মতো ক্ষমতা তার আল্লার রহমতে ভালোই আছে, তো সেই চেয়ারম্যান পর্যন্ত পরশুদিন সকালবেলা মোবারক আলিকে বলে, 'মোবারক মিয়া, ডাঙর বেটিছেলেকে বাড়িতে না রাখাই ভালো গো!'—'কেন?'—মোবারকের অজ্ঞতায়

চেয়ারম্যান বিরক্ত হয়, 'বোঝেন না? ইউনিয়ন কাউন্সিলের মধ্যে মিলিটারি ক্যাম্প করিছে, একরকম ঘরের মধ্যেই ঢুকলো, না কী কন? মিলিটারির সব মানুষ তো একরকম নয়। হাতের পাঁচ আঙুল কি এক সমান হয়? আবার এটাও কই, দুই চারটা মাথা-গরম মানুষ না থাকলে মিলিটারি চলে না।'

চেয়ারম্যানের পরামর্শে মোবারক আলি তার ছোটো মেয়েকে পাঠিয়ে দিলো সম্বন্ধীর সঙ্গে। চেয়ারম্যানও তার মেজো মেয়েটিকে সঙ্গে দিলো। মেয়েটি বেশ ফর্সা, নাকমুখ চোখে পড়ার মতো, তাই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। মোবারক আলির সম্বন্ধী নামকরা মওলানা, জেলার নামকরা মাদ্রাসার হেড মোদাররেস, গোলমালের জন্য মাদ্রাসা বন্ধ থাকায় বাড়িতেই থাকে, আল্লা আল্লা করে, মানুষকে হেদায়েত করে, সেটাই চেয়ারম্যানের ভরসা। কুদ্দুস মওলানা লোকও খুব ভালো। কোত্থেকে ভাগ্নের খবর পেয়ে বোন-ভগ্নীপতির সঙ্গে দ্যাখা করতে এসেছিলো। আহা, উপযুক্ত ভাগ্নে তার, তার ওপর কি-না খোদার গজব পড়লো, নইলে এভাবে গুলি খেয়ে মরে? মোবারক আলি ফিসফিস করে জানায় যে এখানে এসব নিয়ে কথাবার্তা না বলাই ভালো। মিলিটারি খবর পেলে নির্বংশ করে ছাড়বে। তা মওলানা সাহেব জবাব দিয়ে গেছে, বাড়ি গিয়ে বুলুর নামে কোরান-খতম করাবে, আরো যা যা করার সব করবে। তারপর মোবারক আলির এক কথায় ভাগ্নীকেও সঙ্গে নিলো, এমন কি জোহরার দেড় বছরের ছেলেটিকেও নিতে চেয়েছিলো। কিন্তু মেয়ের শরীরের কথা ভেবে বুলুর মা নাতিকে রেখে দিলো। পোয়াতি মেয়ে, জমির আল দিয়ে, বাঁশঝাড়ের মধ্যে দিয়ে লুকিয়ে ছাপিয়ে যাবে, কোলে বাচ্চা থাকলে বিপদ আপদে সামলাতে পারবে? জামাই ঢাকায় ব্যাঙ্কের কেরানি, বৌ বাচ্চা পাঠিয়ে দিলো, না, ঢাকায় ফুটফাট লেগেই আছে, আর এ সময়টা মেয়েরা তো মায়ের কাছেই ভালো থাকে। মায়ের কাছে আর রাখা গেলো কোথায়?—আল্লা না করুক জোহরার যদি কিছু হয়! জোহারার সম্ভাব্য বিপদের কথা মনে হলে মোবারক আলির নিয়ন্ত্রণহীন শরীর আরো এলিয়ে পড়তে চায়। শরীর সামলাবার উহ্য বাসনাতেই সে বলে, 'যাই! চেয়ারম্যানের বাড়িতে যাই। একটাই ব্যাটা! কয়টা দিন খুব ভুগলো গো! চেয়ারম্যানের বৌ এই কয়টা দিন একটা মিনিটও ব্যাটার কাছ-ছাড়া হয় নাই। ব্যাটা ব্যাটা কর‍্যা মনে হয় জান দিবি!'

এবার ডুকরে কেঁদে ওঠে বুলুর মা। বলকানো কান্নার জন্য প্রথমদিকে তার কথা জড়িয়ে যাচ্ছিলো, কিছুক্ষণের মধ্যে কান্নার স্বর নিচে নামে এবং কথা স্পষ্ট হয়, 'সেই কথাই তো কই গো, হামি সেই কথাই কই!' কোন কথা তা শোনার জন্য মোবারক আলিকে আরো কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করতে হয়, 'দ্যাখো তো, চেয়ারম্যানের ব্যাটা, এ্যাঁ, তাঁই মরলো মায়ের সামনে, বাপের সামনে! মাও তো তার ব্যাটাক জান ভর‍্যা দেখ্যা লিবার পারলো! আর হারাম বুলু কোটে কার গুলি খায়া মুখ থুবড়্যা পড়্যা মলো গো, ব্যাটার মুখকোনা হামি একবার দেখবারও পারলাম না গো! হামার বুলুর উপরে গজব পড়ে কিসক গো? বুলু অপঘাতত মরে

কিসক গো?'—এর জবাব দেওয়া মোবারক আলির সাধ্যের বাইরে। বুলুর মায়ের এই বিলাপময় প্রশ্নের খাঁড়া থেকে ঘাড় বাঁচাবার জন্য এক্ষুনি তার বাইরে পালানো দরকার। কিন্তু দরজার ফাঁক দিয়ে বোঝা যায়, ফর্সা হতে এখনো বাকি। অন্ধকারে বাইরে বেরুলেই গুলি করে দেবে। ১০/১২ দিন আগে সরকারবাড়ির এক বর্গাদার চাষা পিঠে গুলি খেয়ে মরলো পানধোয়া বিলের ধারে। বিলের কাছে তহসিন সরকারের নাবা জমিতে লোকটা ঘর করে থাকে, তহসিন সরকারের জমিতেই বর্গা চাষ করে। রাত্রে বিলের ধারে পায়খানা করতে বসেছিলো, হাইস্কুলের ক্যাম্প থেকে গুলি করা হয়। পেটে গুলি লেগে লোকটা সঙ্গে সঙ্গে শেষ। তারপর হাইস্কুলের দপ্তরি নজীবুল্লার পিঠে গুলি লাগলো, সেও রাত্রেই। নজীবুল্লা গিয়েছিলো বেলুকুচি হাটে। মিলিটারি ক্যাম্প হওয়ায় এদিককার হাটবাজার সব লাটে ওঠার অবস্থা,—গত বছরের সের পাঁচেক মরিচ ছিলো, তাই বিক্রি করতে নজীবুল্লার বেলকুচি যাওয়া। ফিরতে একটু রাত হয়েছিলো, রাত আর কতো, এই এশার আজান দিয়েছে কি দেয়নি, স্কুলের সামনে দিয়ে সে হনহন করে হেঁটে যাচ্ছে তো মিলিটারি তাকে হুঙ্কার দিয়ে থামতে বলে। নজীবুল্লা থামবে কি, পড়িমরি করে দৌড় দেয় সামনের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে গুলি এসে লাগে তার পিঠে। মনে হয় গুলি লাগার পরেও লোকটা দৌড়েছিলো, তার লাশ পাওয়া যায় আমিনুদ্দিন সরকারের বাঁশঝাড়ের ভেতর। আমিনুদ্দিন সরকারের ভাইপো তবারক, লাঠিডাঙার আয়নুল, পদুমশহরের হাশেম মণ্ডল, হাইস্কুলের অঙ্ক স্যার নুর মোহাম্মদ—এদের মারা হয়েছে লাইনে দাঁড় করিয়ে, স্কুল দালানের পেছনে, ছোটো ক্লাসের ছেলেরা যেখানে দাড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, হাডুডু খেলতো সেখানে এদের পুঁতে রাখা হয়েছে। বিলের ধারে লাশ, বাঁশঝাড়ে লাশ, স্কুলের পেছনে লাশ,—তাইতো একটা মাস যতোগুলো মানুষ পড়লো সব কটা গুলি খেয়ে মরেছে।—সব্বাই! তাই তো!—সকলের অপঘাতে মৃত্যু! এমন কি পুব অঞ্চলে বিয়ে হয়েছে তার খালাতো বোন আমেনাবুবুর, সে মেলা দূর, যমুনার তীরে কেষটিয়া গ্রাম, প্রত্যেক বছর বর্ষাকাল আসে তারা নদীভাঙার ভয়ে তটস্থ হয়ে ওঠে; এবার এসেছে নদীর বাপ মিলিটারি। আমেনাবুবুর দেওরের ছেলে আলি আকবর, চন্দনবাইসা কলেজে আই কম পড়ে, তাকে গুলি করে ফেলে দিয়েছে যমুনায়। চন্দনবাইসা তহশিলদার অফিসে মিলিটারি ক্যাম্পের সামনে ছেলেটা ধরা পড়ে, তার কাছে অস্ত্র পাওয়া গিয়েছিলো। আহা, বেচারা বংশের একমাত্র ছেলে, ঐ বাড়িতে আর সবকটা মেয়ে, ছেলেটাকে খুব কষ্ট দিয়ে মেরেছে। না, না, বুলুকে কিন্তু কষ্ট দেওয়ার সুযোগ পায়নি। ধরা পড়ার আগেই ও গুলি খায়।—সেই অজ্ঞাত জায়গায় অশ্রুত গুলির শব্দে মাথাটা দুলে ওঠে, হঠাৎ মনে হয়, তাইতো, কয়েক মাস এই এলাকায়, এমন কি কোন পুব অঞ্চলে কেষটিয়া গ্রাম, সেখানে পর্যন্ত—সবাই মারা গেছে গুলি খেয়ে। সব অপঘাতে মৃত্যু, স্বাভাবিকভাবে লোকে মরে না, গজব, আল্লার গজব, গজব না পড়লে মানুষের এরকম মৃত্যু হয়? চেয়ারম্যানের ভাগ্য!—তার ছেলেরই এমন

স্বাভাবিক মরণ। এসব ভাগ্যের ব্যাপার! চেয়ারম্যান লোকটার সবদিকেই ভাগ্য ভালো, তার জমিতে ফসল হয় সবচেয়ে ভালো, যেবার যা বোনে সেবার তাতেই লাভ থাকে। ধান বলো, মরিচ বলো, পেঁয়াজ বলো, আলু বলো—চেয়ারম্যানের জমিতে যার ফলন ভালো সেই ফসলের সেবার দাম উঠবে। আবার দ্যাখো না, তিন তিনবার ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হলো, ইলেকশনে লোকটা কখনো হারে না। একমাত্র ছেলে, ছাত্র কতো ভালো, গত কয়েক বৎসর এই-স্কুল থেকে তার মতো রেজাল্ট কেউ করতে পারেনি। আবার দ্যাখো সবাই যখন এদিক ওদিকে মরছে, চেয়ারম্যানের ছেলে তখন মায়ের কোলে দোল খেতে খেতে চোখ বোজে। এটা ভাগ্য ছাড়া কী?—দীর্ঘনিশ্বাস চাপার জন্য মোবারক আলি একটু কাশে। আর বুলু—কী সুন্দর ছেলে তার, কী রকম ঢ্যাঙা হয়ে উঠছিলো, তাই না?—মাথায় মোবারক আলিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলো, ও ঠিক ওর দাদার মতো হতো—সেই ছেলে, দিব্যি ভালো ছেলে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো, ৪ মাস পর খবর এলো যে সে গুলি খেয়ে মারা গেছে। কোথায়? না, সে এখান থেকে মেলা দূর! একই জেলা, তবে সে হলো পুবের পলি এলাকা। হ্যাঁ, আমেনাবুর শ্বশুর বাড়ির কাছেই হবে। গ্রামের নাম তার জানা নাই।

দেড় মাস আগে বুলুর মরার খবর পেয়ে মোবারক ভেবেছিলো যে বৌয়ের কাছে খবরটা একেবারে চেপে যাবে। তো শোনার পর কয়েকটা ঘণ্টা সে চুপ করেই ছিলো, তাও যে ছেলেটি খবর নিয়ে এসেছিলো তার বিশেষ অনুরোধে। অনুরোধ না বলে আদেশ বলাই ঠিক, যাদের হাতে অস্ত্র থাকে তারা কি অনুরোধ করতে পারে? ছেলেটার নাম যেন কী?—না, নামটা মনে না করাই ভালো, বাড়ির কাছে মিলিটারি ক্যাম্প, কখন কে এসে ধমক দিলেই মোবারক আলি তার নাম ফাঁস করে দেবে। নাম মনে না থাকলে কী হয়, তার চেহারা প্রায় ২৪ ঘণ্টাই মোবারকের সামনে দোলে। ঘন কালো মেঘের সামনে শ্যামবর্ণ একখানা মুখ। ও যখন আসে তখন বিকালবেলা। খুব মেঘ করায় অন্ধকার হয়ে এসেছিলো। মোবারক হাট থেকে ফিরছিলো পা চালিয়ে। এদিকে, এই ৫/৬/৭ মাইলের মধ্যে মিলিটারি ক্যাম্প তখনো হয়নি, তাই আকাশে জমাট মেঘ ছাড়া জোরে হাঁটার অন্য কোনো কারণ ছিলো না। ছেলেটিকে সে প্রথম দ্যাখে, বড়োমিয়ার আউশের জমির পাশে সাইকেল ঠেলে ঠেলে নালা পার হচ্ছিলো। তারপর সাইকেলে উঠে ছেলেটি তাদের গ্রামের দিকে চলে যায়। পাকুড় গাছের তলায় এসে রাস্তা হঠাৎ বাঁক নিয়েছে, ছেলেটি সেখান থেকে আড়াল হয়ে পড়লো। তার দিকে মোবারক আলি ভালো করে লক্ষও করেনি। হাটে শুনে এসেছে যে সেরপুর শহরে মিলিটারি ঢুকে বাড়িঘর তছনছ করে ফেলছে। তারপর বগুড়ায় নাকি মিলিটারির বিরাট আড্ডা। মানুষের লাশের গন্ধে নাকি টাউনে ঢোকা যায় না। আবার এরই মধ্যে কোন এক বড়ো মিলিটারি অফিসারকে মেরে ফেলেছে কারা। বর্ডারে জোর যুদ্ধ চলছে। এবার পাটের দর বাড়তে পারে। হাঁটের ভেতরেই লোকজন ফিসফিস করে এইসব

আলোচনা করে। মোবারক আলি ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিসের সামনে এসে পড়ে, না সাইকেলের তখন চিহ্নমাত্র দ্যাখা যায়নি। অফিসের পাকা বারান্দায় উঠে মোবারক অফিস ঘরের তালা দুটো একবার করে টেনে দ্যাখে। না, ঠিক আছে। এ পর্যন্ত ভুল তো কোনোদিন হলো না, তবু যতবার এদিক দিয়ে যাবে—তা সে জমি দেখতে হোক কি হাটে বাজারে হোক বা বিলে মাছ ধরতে হোক—বারান্দায় উঠে তালা দুটো তার পরীক্ষা করা চাই। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে একবার আকাশের দিকে মেঘের ভারটা ঠাহর করার চেষ্টা করলো। না, তাড়াতাড়ি বাড়ি যাওয়া দরকার। বারান্দা থেকে নিচে নামছে এমন সময় অফিসের পেছন থেকে এসে ওর মুখোমুখি দাঁড়ালো শুকলু পরামানিক। শুকলুকে দেখে মোবারক ভ্রূ কোঁচকায় ঃ এইসব চাষাভুষাদের মানুষ করা তার বাপের সাধ্যের বাইরে। এতোবার বারণ করা হয় তবু শালাদের হাগামোতা সব এই অফিসের পেছনে। চেয়ারম্যান সাহেব এতো সখ কর শেফালির চারা লাগিয়েছে, তা এদের গুয়ের গন্ধে ওদিকে উঁকি দেওয়া যায় না। কিন্তু তাকে ধমক দেওয়ার আগেই শুকলু বলে, 'চাচামিয়া, একটা চ্যাংড়া আপনের ঠিকানা পুস করিচ্ছিলো। সাইকেল লিয়া আচ্চে।'

'কেটা?'

'কে জানে বাপু? হামি পুস করনু তো ক'লো বুলুর সাথে কলেজত পড়ে। হামাগোরে ইঠানকার মানুষ লয় গো চাচামিয়া। হামি এক লজর দেখ্যাই বুঝিছি টাউনের মানুষ।'

'নাম পুস করিছিস?'

'ক্যাঙ্কা কর‍্যা করি? এ্যানা কথা কতে না কতে সাইকোলোত উঠ্যা তাঁই হাঁটা দিলো।'

বুলুর ক্লাসমেট? মোবারক আলি যতো তাড়াতাড়ি পারে ছুটতে লাগলো। আজ ৪ মাস বুলুর দ্যাখা নাই। মার্চের মাঝামাঝি বাড়ি এলো। এখানেও তখন খুব তোড়জোড়। রাস্তায়, হাটে, বাজারে, পুকুরে ধারে খালি মিছিল। গাঁও-গেরামে এতো মানুষ কোনোদিন দ্যাখা যায় নাই। মানুষ যেন ফুলে ফেঁপে উঠছিলো। মানুষ হয়তো ২০টা কি ৩০টা, কিন্তু ওদের চিতানো বুক দেখে মনে হয় একেকজনের গায়ে ১০ মানুষের বল। বুলুর খাওয়া নাই, গোসল নাই, খালি এ -গ্রাম ও-গ্রাম করে, জোয়ান জোয়ান ছেলেদের নিয়ে প্যারেড করে, এইসব কালোকিষ্টি চাষাভুষা রাখালদের নিয়ে সে যেন জগৎ জয় করবে। ছেলেটা হঠাৎ ঢ্যাঙা হয়ে গেছে। শহরে দূর সম্পর্কের মামাবাড়িতে থাকে, কী খায়, কী পরে—অথচ দেখতে দেখতে তাগড়া জোয়ান হয়ে গেলো। মার্চের শেষে ঢাকায় মিলিটারিরা মানুষ মারতে শুরু করলো, আর বগুড়া থেকে শুরু হলো মানুষ আসা। বগুড়ায় মিলটারিকে ঢুকতে দিচ্ছে না, শহরের উত্তরদিকে ব্যাংকের দালানের ওপর পজিশন নিয়ে ছেলেরা ফাইট করে যাচ্ছে। চেয়ারম্যান একদিন এসে অভিযোগ করে, 'মোবারক মিয়া, বুলু এই গোলমালের মধ্যে যাচ্ছে, আপনে শাসন করিচ্ছেন না? আবার শাজাহানকে

খালি খালি চেতাচ্ছে, শাজাহান স্কলার ছাত্র, অর কি ইগলান করা মানায়, কন?' তারপর আস্তে আস্তে বলে, 'কী পাগলামি শুরু করিছে, কন তো! চ্যাংড়াপ্যাংড়ার মাথার মধ্যে পোকা ঢুকিছে! গাদাবন্দুক আর দাও কুড়াল খন্তা লিয়া মিলিটারির সাথে যুদ্ধ করবি, এ্যাঁ?' মোবারক আলিও এসব বোঝে। কিন্তু বুলুকে বোঝাবার আগেই সে একদিন উধাও হয়ে গেলো। ৪ দিন যায় ৫ দিন যায় তার পাত্তা নাই। খবর আসে যে বগুড়ায় মিলিটারি ঢুকে বাড়িঘর সব পুড়িয়ে দিচ্ছে। সেখান থেকে মানুষের ঢল আসে, এই গ্রামের ভেতর দিয়ে মানুষ যায়, বেশিরভাগই ভদ্দরলোক। তাদের কী সুন্দর সুন্দর মেয়ে! চশমা চোখে জুতা পায়ে হাঁটে। জীবনে গ্রামে আসেনি, তারা হাঁটতে হাঁটতে টলে, টলতে টলতে পড়ে যায়। সেরপুর থেকে মানুষ পালালো। এমন কি ব্যাংক ভেঙে টাকা নিয়ে নেতারা পর্যন্ত এই পথ দিয়ে বর্ডারের দিকে চলে গেলো। সেই টাকা দিয়ে তারা দেশ স্বাধীন করবে। কিন্তু বুলুর দ্যাখা নাই।—বাড়ির দিকে যেতে যেতে মোবারকের বুক ঢিপঢিপ করে। বয়স তো হলো, এখন কি অমনি করে ছোটা যায়? সাইকেলওয়ালা ছেলেটি হয়তো বুলুও হতে পারে। ছদ্মবেশ ধরে এসেছে। শুকলু হয়তো চিনতে পারেনি। এরকম হতে পারে না? না।—এরকম যে হয়নি সেই ক্ষোভ মোবারকের আজও কাটেনি। ছদ্মবেশী বুলুকে দ্যাখার আশাভঙ্গের দৃশ্যটি সে তাই মুছে ফেলতে চায়। শুকলু পরামাণিকের কথাবার্তা বরং আরেকবার শোনা যায় না? না, তাও যায় না। এর সপ্তাহ দুয়েক পর গ্রামে যখন মিলিটারি ঢোকে, শুকলু তখন বড়োমিয়ার জমিতে কাদামাটিতে উপুড় হয়ে বীজতলা থেকে ধানের চারা তুলছে। জিপের আওয়াজে সে চমকে উঠে দাঁড়ায়। তার হাতে ১ আঁটি কলাপাতাসবুজ ধানগাছের চারা এবং চোখে বোকাবোকা ভয়। মিলিটারি সোজা গুলি করে তার পেটে।—মিলিটারি কি বুলুরও পেটেই গুলি চালিয়েছিলো?—অন্ধকার ঘরে নাতিকে নিয়ে শুয়ে-থাকা স্ত্রীর পাশে বসে মোবারক আলি নিজের পেটে আস্তে আস্তে হাত বুলায়। পেটের বাঁ কোণে তার বহুদিনের একটা চিনচিন ব্যথা ছিলো, আজ মাস তিনেক হলো সেটা বোঝা যায় না। নিজের পেটে গুলিবারুদ পেতে নিয়ে বুলু কি তার পেটের ব্যথা চিরকালের জন্য শুষে নিয়ে গেছে? মোবারকের মনেই থাকে না যে সাইকেলওয়ালা ছেলেটি বুলুর মৃত্যুর যে বিবরণ দিয়েছে তাতে পেটে গুলি লাগার কোনো কথা নাই। হয়তো একটু পরেই সেটা তার মনে পড়তো, কিন্তু ফের প্যানপ্যান করতে শুরু করে বুলুর মা, 'একবার চোখের দ্যাখাটাও দেখবার পারনু না গো! কোটে কোন পাথারের মধ্যে একলা একলা দাপাদাপি কর‍্যা মরলো, মুখোত এ্যানা পানিও পালো না গো! হামার ব্যাটার উপরে ইস্কা গজব কিসক পড়লো গো? আল্লার বিচার ক্যাঙ্কা কও তো? তার মাটিও হয় না, কোটে কোন কাদোর মধ্যে পড়্যা থাকে, কও তো!'

'থামো!' মোবারক আলি ভয় পায় যে বুলুর মা এবার চ্যাঁচাতে শুরু করবে, 'থামো! মাটি হয় নাই তোমাকে ক'ছে?'

'তুমি একবার দেখবার গেলা না কিসক?' বুলুর মা রাগ করে, 'তুমি যায়া তার কবর জিয়ারত কর‍্যা আসলা না কিসক! আপাঘাতত মরছে, তো তাঁই কি তোমার ব্যাটা লয়? পাষাণ বাপ হচ্ছো, ব্যাটা তোমার লিজের পয়দা লয়?'—রাগ করতে চাইলেও বুলুর মা রাগ টিকিয়ে রাখতে পারে না। রাগ তার মুখ থুবড়ে পড়ে শোকে, শোকে এবং ভয়ে, নাতির ঘুম ভাঙার ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও মোবারকের উরুর ওপর ১টি রোগা কালো হাত রেখে সে ফোঁপায়, 'হামরা কী গুনা করছিলাম গো, হামাগোর উপরে গজব পড়ে কিসক? হামাগোর ব্যাটা অপঘাতত মরে কিসক গো?' মোবারক আলি ভয় পায়। ছাদের ফুটো দিয়ে বাঁশের সিলিং ফুঁড়ে ঘরে আলো ঢুকছে। মোবারক জানলা খুলে দেয়, ভোরবেলার লালচে সাদা আলোয় আকাশ, গাছপালা ও মাটি যেন স্বপ্নের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে। ঝিরঝিরে বাতাস ঢুকে মশারি কাঁপায়। জোহরার ছেলেটা হাত পা ছড়িয়ে ঘুমায়, বাতাসের ঝাপ্টায় ঘুম গাঢ় হয়।

মোবারকের একটু ভয় হলো, তার বোধ হয় দেরি হয়ে গেলো। চেয়ারম্যানের বাড়িতে এর মধ্যেই মেলা লোক এসে পড়েছে। বাইরে আমতলায় হাঁটু ভেঙে মাটিতে বসেছিলো কাবেজউদ্দিন। এদের বাড়ির পুরনো কাজের লোক, বুড়ো হয়ে গেছে, দুটো চোখেই ছানি পড়তে শুরু করছে, একটু কাছে না এলে লোক চিনতে তার কষ্ট হয়। মোবারক তার পাশে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করে, 'কাবেজ, চেয়ারম্যান সাহেব কৈ?' 'তাঁই না আপনাক উটকাচ্ছিলো!' চেয়ারম্যান তাকে খুঁজছিলো শুনে মোবারক আলি ঘাবড়ে যায়, তার আরো আগে আসা উচিত ছিলো। শুকনা গলা করে ফের জিগ্যেস করে, 'সমাচার কী?' 'ফজরের আগে, আন্ধার থাকতে মিলিটারি খবর দিয়া চিয়ারম্যানোক লিয়া গেছিলো। তাঁই কলো, মোবারক মিয়া থাকলে একসাথে গেলামনি।'

দ্যাখ্যা হলে চেয়ারম্যান কিন্তু এসব কিছুই বলে না। মোবারক আলিকে জড়িয়ে ধরে লোকটা হঠাৎ বেগে কাঁদতে শুরু করে। তাকে নিয়ে মোবারক ভেতরের বারান্দার কোণে জলচৌকিতে বসায়, নিজেও পাশে বসে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চেয়ারম্যান চোখ মোছে, সে আবার স্বভাবে ফেরার চেষ্টা করে। আস্তে আস্তে বলে, 'মোবারক মিয়া, সাজু তামাম রাত খালি বুলুর কথাই ক'ছে। রাত আটটা সাড়ে আটটার সময় প্রলাপ শুরু হলো যতোক্ষণ প্রাণ ছিলো খালি বুলুর কথা কয়!' যে জলচৌকিতে তারা বসেছিলো তার সঙ্গেই চেয়ারম্যানের শোবার ঘরের দরজা। সেই ঘর থেকে চেয়ারম্যানের স্ত্রীর কান্নার শব্দ আসছিলো। স্বামীর কথা কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বিলাপে সে ছেলের শেষ কথাগুলো যোগ করে, 'খালি বুলু, খালি বুলু! তামাম রাত খালি বুলুকই ডাকে, খালি বুলুকই ডাকে। বুলুর সাথে চল্যা যামু,—বুলুক কও আমাক না লিয়া যেন যায় না। ও মা, বুলুক আটকাও, আমাক ছাড়া উঁই গেলো।'

মোবারকের মাথা দুলে ওঠে। এই দুলুনি সারা শরীরে চালান হয়ে গেলে সে বেশ চাঙা হয়; এতোটাই চাঙা যে শাজাহান বুলুর সঙ্গে কোথায় যেতে চেয়েছিলো

জানার জন্য প্রবল আগ্রহ বোধ করে। চেয়ারম্যানের বৌ এবং এই বাড়ির এক পুরনো দাসী মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত শাজাহান যা কিছু প্রলাপ বকেছে তার সবই অত্যন্ত এলোমেলোভাবে উদ্ধৃত করে চলে। শাজাহান তার বাবা মা, ভাই, বোন কারো সঙ্গে কথা বলতে চায়নি। এক ঢোক পানি খাবার জন্য এদিকে ওদিক তাকায়নি। একবারও বলেনি, মা, আমার মাথাটা টিপে দাও না। মউত এলে মানুষ আজরাইলকে দেখে ভয়ে চোখ বড়ো করে ফেলে, কিন্তু শাজাহানের চোখ খালি অস্থির হয়ে এদিক ওদিক ঘুরছিলো বুলুর খোঁজে; তার শুধু এক কথা, বুলুকে ডাকো, আমি বুলুর সঙ্গে যাবো। চেয়ারম্যানের বৌ জানায় যে এইসব শুনেই বুকের মধ্যে সে সঙ্কেত পেয়েছে, তার শাজাহান বাঁচবে না।—স্ত্রীর এইসব বিলাপে চেয়ারম্যান উসখুস করে, পুত্রবিয়োগ তার বিবেচনাবোধ বিনাশ করতে পারেনি। সে এখনো ভালোভাবে জানে যে, বৌডোবা খালের ব্রিজে মিলিটারি জিপ উড়িয়ে দেওয়ার পর পরই বুলুর নিহত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে মোবারক তো মোবারক, এই গ্রামের ১টি মানুষকেও আস্ত রাখা হবে না। চেয়ারম্যান এ পর্যন্ত খবরটা গোপন রেখেছে, কিন্তু বৌকে কোন কথাটা না বলে থাকা যায়? এখন বৌকে চেয়ারম্যান থামায় কী করে? বাড়ির পাশে মিলিটারি, তাদের কানে খবরটা গেলে গ্রামে কেয়ামত ঠেকাবে কে?—কিন্তু মোবারক আলির রক্তমাংসহাড্ডিমজ্জা সব তোলপাড় করে ওঠে, বুলুর সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে শাজাহান তাহলে অস্থির হয়ে উঠেছিলো! শাজাহান আর কী বলেছিলো?—কিন্তু সে সব বিস্তারিত জানার উপায় নাই। কারণ চেয়ারম্যানের বৌয়ের বিলাপ এখন চাপা পড়েছে বুলুর মায়ের হামলানো কান্নায়। এই বারান্দারই অন্যপ্রান্তে শাজাহানের লাশ। লাশের মুখ থেকে কাপড় সরাতেই বুলুর মা চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে। তার কান্না বাজে সমস্ত আওয়াজ ছাপিয়ে। এর ফলে মেয়েদের মধ্যে যাদের কান্না নিস্তেজ হয়ে এসেছিলো তারা ফের নতুন করে কাঁদতে থাকে। মোবারক আলি উঠে লাশের দিকে চলে যায়। না, বৌকে থামাবার কোনোরকম ইচ্ছা তার নাই। কাঁদবার এরকম সুযোগ বুলুর মায়ের কতোদিন জোটেনি, আবার কবে জোটে কে জানে। যতো খুশি সে কেঁদে নিক, মোবারক তাকে একটুও বাধা দেবে না। তার নিজের চোখ একেবারে খটখটে, সেই পরিষ্কার শুকনা চোখে সে শুধু শাজাহানকে একবার ভালো করে দেখবে।

মরার পরও শাজাহানের ভ্রূর মাঝখানে ছোট্টো একটা ভাঁজ। সামনের দুটি দাঁত দিয়ে চেপে ধরেছে নিচের পাতলা ঠোঁট। বুলুর সঙ্গে বৌডোবা খালের ব্রিজে গ্রেনেড মারার সুযোগ না পাওয়ার ক্ষোভ কি এখনো ভ্রূতে, গালে, দাঁতে ও ঠোঁটে বিঁধে রয়েছে? বুলুর সঙ্গে এর চেহারার কোনো মিল নাই—বুলু শ্যামবর্ণের, এর গায়ের রঙ ফর্সা; বুলুর গাল ভাঙা, কয়েক দিনের জ্বরে মলিন হলেও শাজাহানের গালের ফোলা ফোলা ভাবটা রয়েই গেছে। মিলিটারি জিপ উল্টিয়ে দেওয়ায় বুলু হয়তো এরকম অসন্তুষ্ট মুখ করে মরেনি। কে জানে, শাজাহানের বুকে হয়তো

গুলির দাগ ২/১ টা লেগে থাকতে পারে। গুলিটা তো বুলুর বুকেই বিঁধেছিলো। সাইকেলওয়ালা ছেলেটি তো তাই বলে গেছে।—সন্ধ্যার পর পরই সেদিন খুব চেপে বৃষ্টি আসে। এমনি অন্ধকার, তার ওপর দেওয়ালের মতো বৃষ্টি। ছেলেটির বাইরে যাওয়ার উপায় ছিলো না। সেই রাত্রেই তার চলে যাওয়ার কথা, বৃষ্টিতে আটকে না পড়লে হয়তো এতো কথা বলতো না। ওরা সব কাজের ছেলে, নিহত বন্ধুর বাপের সঙ্গে এতো কথা বলার সময় কোথায়? ছেলেটি এদিকে এসেছিলো ভবানীহাট গ্রামে, এখান থেকে মাইল দুয়েক পথ। কী কাজে আসে তা একবারো বললো না, খালি বলে ওদিকে ওদের লোক আছে। ফেরার সময় তার মনে হয় যে সুলতানদের গ্রাম তো এদিকেই, একবার ওর বাবার সঙ্গে দ্যাখা করে যাবে। সুলতান হলো বুলুর ভালো নাম, ওর কলেজে এই নামেই বুলু পরিচিত। সাইকেলওয়ালা ছেলেটি ওর এক ক্লাস ওপরে পড়ে, বগুড়া শহর মিলিটারিদের কব্জায় চলে গেলে ওরা একসঙ্গে পূর্বদিকের গ্রামে পালায়। ছেলেটি অনেকক্ষণ পর পর কথা বলছিলো, প্রথমদিকে খুব রেখেঢেকে, খুব সাবধানে। পরে আস্তে আস্তে সব বলে ফেলে। বুলুর মৃত্যুর সময় ওদের আরেক বন্ধুর সঙ্গে এই ছেলেটিও ছিলো। জায়গাটার নাম?—এখান থেকে সেরপুর গিয়ে সেরপুর হাটের ওখানে করতোয়া পার হয়ে যেতে হয়। ওসব জায়গা মোবারক আলি চেনে। তারপর? তারপর চওড়া কাঁচা রাস্তা চলে গেছে একেবারে যমুনার পশ্চিম তীর পর্যন্ত। যমুনার কাছাকাছি, যমুনা থেকে সোয়া মাইল কি দেড় মাইল হবে, সেখানে বৌডোবা খাল। তারপর? ধূনট বাজারে মিলিটারির ক্যাম্প বসেছে। ধূনট থেকে আরো অনেকটা পূর্বে দেবডাঙা গ্রাম। দেবডাঙায় মুক্তিবাহিনী তখন কেবল এসে জমা হচ্ছে। ঐ গ্রামের এক দালাল শালা ধূনটে গিয়ে খবরটা পৌঁছে দেয় মিলিটারি ক্যাম্পে। তা ওরাও খবর পেয়ে যায় যে মিলিটারি এদিকে আসছে। ধূনট দেবডাঙা রাস্তায়, দেবডাঙার একেবারে কাছে বৌডোবা খাল। রাস্তা আড়াআড়ি চলে গেছে। এই খালের ওপর ছোট্টো পাকা ব্রিজ। ওরা ৩ জন মাইন পুঁততে যায় ব্রিজের নিচে। মাইন পোঁতার কাজ শুরু করবে এমন সময় জিপের আওয়াজ। জিপ যে এতো তাড়াতাড়ি আসবে ওরা ভাবেনি। সঙ্গে সঙ্গে ৩ জনেই নেমে পড়ে রাস্তার ধারে। নিচু জমি, ঘন পাটখেতে মানুষ সমান পাট। পাটখেতে ঢুকে নিশ্বাস বন্ধ করে ৩ জনেই জিপের অপেক্ষা করে। এই ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তা খারাপ, ব্রিজ কোনোমতে পার হলেই কয়েক মিনিটের মধ্যে দেবডাঙা। মুক্তিবাহিনীর ছেলেগুলো একটু তৈরি হবার সময় পাবে না। উঁচুনিচু রাস্তায় টলোমলো চাকায় জিপ যখন ব্রিজের ওপর উঠেছে, বুলু করলো কি, পাটখেত থেকে হঠাৎ করে বেরিয়ে গ্রেনেড ছুড়ে দিলো জিপ লক্ষ করে। অব্যর্থ লক্ষ। ড্রাইভারের পাশে বসা অফিসার একেবারে সঙ্গে সঙ্গে ব্রিজ ডিঙিয়ে নিচে পড়ে যায়। নিচে বৌডোবার খালে তখন ৫ হাত পানি। ডাইভার সামলাতে না পারায় গাড়ি গড়িয়ে পড়ে বিজ্রের একটু আগে রাস্তার ঢালুতে, সেখান থেকে গড়াতে গড়াতে ফের খালের মুখে আটকে গেলো। বুলু এবং

সেই ছেলেটি তখন দৌড়ে যায় জিপের দিকে, রাস্তার অন্য ঢালে জিপ, সুতরাং রাস্তা ক্রস করা দরকার। ওদের এখন অস্ত্র চাই। স্টেনগান মেশিনাগান তখনো ওরা চোখে দ্যাখেনি, এই থানা টানা থেকে ছিনিয়ে-নেওয়া থ্রি নট থ্রি, গাদাবন্দুক এবং দুদিন আগে পাওয়া কয়েকটা গ্রেনেড ওদের সম্বল। কিন্তু জিপ থেকে এক সেপাই যে আগেই লাফিয়ে পড়েছে তা বোঝা যায়নি। ওদের দুজনকে রাস্তায় উঠতে দেখে লোকটা গুলি ছোড়ে রাস্তার ঢাল থেকে। দুটো গুলিই লাগে বুলুর বুকে। লোকটা তারপর সোজা ছুটতে থাকে ধূনটের দিকে। কিন্তু বুলুর সঙ্গীদের রাইফেলের গুলি সে এড়াতে পারেনি। তার পায়ে গুলি লাগে, কিন্তু সে তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে। আহত সেপাইকে ওরা ধরতে যাবে কি-না ঠিক বুঝতে পারছে না, এমন সময় ফের মিলিটারি গাড়ির শব্দ আসে। ওদের দুজনকে ফের ঢুকতে হয় পাটখেতের ভেতর। আহত সেপাইটিকে হয়তো একটি গাড়ি ঠিক তুলে নিয়েছে। তবে গাড়িগুলো ব্রিজের এখানে এসে এক পলকের জন্যেও গতি কমায়নি। কিছুক্ষণ পর দেবডাঙার দিক থেকে পাল্টাপাল্টি গুলিবর্ষণের শব্দ আসে, প্রায় মিনিট ১৫ ধরে ক্রসফায়ারিং চলে। এরপর দারুণ নীরবতা। আরো কয়েক মিনিট পর সেদিকে আগুনের মস্ত শিখা চোখে পড়ে। এর সঙ্গে সাংঘাতিক কোলাহল ও আর্তস্বর। গ্রামের লোকজনকে পালাতে হয় যমুনার দিকে, নয়তো মাঠ পার হয়ে তারা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। রাস্তাটি কেউ ব্যবহার করতে পারেনি, রাস্তার মুখে কড়া মিলিটারি। বুলুর সঙ্গী দুজন সারারাত এবং পরদিন বিকাল পর্যন্ত পাটখেতেই ছিলো। এর মধ্যে মিলিটারি জিপ বেশ কয়েকবার রাস্তা দিয়ে ধূনট-দেবডাঙা করে।

'বুলুর লাশ?'

ছেলেটি মাথা নিচু করে ছিলো!—না, না, তাকে বিব্রত করতে চায়নি মোবারক, এমনি জিগ্যেস করেছিলো। বুকে গুলি লেগেছিলো?—হ্যাঁ, দুটো গুলি। বুলু তখনো রাস্তায় সম্পূর্ণ ওঠেনি, রাস্তার অন্য ঢাল থেকে গুলি ছোড়া হয় বলে তারা কেউ সাবধান হতে পারেনি। বিপরীত ঢালে সে পড়ে যায়!—চিৎ হয়ে?—হ্যাঁ, চিৎ হয়ে। তার মাথা ছিলো নিচের দিকে, শরীরটা ওপরের দিকে।—খালের পানিতে মাথা ডুবে যায়নি?—চুলগুলো পানি ছুঁয়েছিলো।—তারপর ছেলেটা এ সম্পর্কে আর তেমন কিছু বলেনি। গুলি দুটো ঠিক কোথায় ঢোকে?—না, সে কিছুই না বলে উঠে পড়ে। বৃষ্টি তখন ধরে এসেছে, অন্ধকার ও টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে সে সাইকেলের প্যাডেলে পা রাখে। এখন শাজাহানের লাশের সামনে দাঁড়িয়ে তার বুকটা এক নজর দ্যাখার জন্য মোবারক আলির চোখজোড়া নিসপিস করে।

সে নিজেও ঠিক জানে না কেন, হয়তো এই উদ্দেশ্যে কিংবা এমনি প্রতিবেশীসুলভ সৌজন্যের খাতিরে বা ওপরওয়ালা চেয়ারম্যানের মন যোগাবার জন্য বা ছেলের সহপাঠীর প্রতি ভালোবাসা—যে কোনো কারণে মোবারক আলি

এগিয়ে যায় উঠানে চাদরঘেরা জায়গায়। সেখানে তখন শাজাহানের লাশ ধোয়ানো হচ্ছে। কাবেজ খুব যত্ন করে সাবান মাখায় আর বিড়বিড় করে, 'ছোটো থাকতে বড়ো দিঘিত নিয়া কতো গোসল কর‍্যা দিছি, কী দাপাদাপি করিছে। এখন তাঁই একটা কথাও কচ্ছে না গো!'

নাঃ! শাজাহানের মৃতদেহে কোথাও গুলির একটি চিহ্ন পর্যন্ত নাই। ব্যাপারটা মোবারক আলির এতো স্পষ্ট করে মনে হয়নি! কিন্তু তার নিজের চোখ জোড়া বড্ডো পরিষ্কার ঠেকে। বুলুকেও ভালোভাবে দ্যাখা যায়, শাজাহানকেও দ্যাখা যায়। বুলু এবং শাজাহান সম্পূর্ণ আলাদা ২ জন যুবক। চোখের মাধ্যমে সে মাথার জট খুলতে থাকে এবং শাজাহানের শেষকৃত্যের দায়িত্ব এসে পড়ে প্রধানত তার ওপরই। চেয়ারম্যান তাকেই বলে যে একটু তাড়াতাড়ি করা দরকার, ভোর হবার আগেই স্কুল দালান থেকে ক্যাপ্টেন সাহেব তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলো।—এতো চ্যাঁচামেচি কিসের? মিসক্রিয়েন্টরা কি তার বাড়ি এ্যাটাক করলো?—না, তার ছেলে মারা গেছে।—তাহলে যতো তাড়াতাড়ি পারে, এই ২/৩ ঘণ্টার মধ্যেই যেন তার দাফন করা হয়। দরকার হলে তার ট্রুপ তাকে সাহায্য করবে।—সাহায্য-প্রস্তাব অনেক কষ্টে এড়ানো গেছে, এখন দেরি হলে আবার ট্রুপ যদি চলে আসে! বাড়িতে বৌ-ঝিরা আছে। জুম্মাঘরে জানাজা হয়ে গেলো বেলা সাড়ে ১০টার মধ্যে। এদের পারিবারিক গোরস্থানটা বাড়ি থেকে একটু দূরে, ৪০০/৪৫০ গজ পথ পার হয়ে যেতে হয়।

কিন্তু ইউনিয়ন কাউন্সিলের সামনে কয়েকজন সেপাই পথ রোধ করে দাঁড়ালো। এতো লোক একসঙ্গে কোথায় যাচ্ছে?—চেয়ারম্যান ছিলো মোবারকের পাশে, মোবারকের ডান কাঁধে খাটিয়ার একটা কোণ। মোবারক গলা খাঁকারি দিয়ে বলে, 'লাশ হ্যায়, খান সাব। চেয়ারম্যান সাহেবের লড়কা।'

তাদের ক্যাম্পের সামনে দিয়ে এতোগুলো মানুষের একসঙ্গে যাওয়া নিষেধ। জুম্মাঘরের ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেন মিনমিন করে, 'মুসলমান কা লাশ খান সাব! দাফন কা লিয়ে লে রহা। মেহেরবানি করকে—।' না, সৈন্যরা কোনো ঝুঁকি নেবে না। মানুষ যদি মরে থাকে তো তাকে দাফন করতেই হবে। যেখানে ইচ্ছা দাফন করুক, এদিক দিয়ে শবযাত্রা যেতে দেওয়া যায় না। কানুন নাই। চেয়ারম্যান এবার নিজেই এগিয়ে আসে। ভয়, দ্বিধা ও সঙ্কোচে তার শোক প্রায় মুছে যায় যায়। বাঙলা উর্দু এবং ইংরেজি মিশিয়ে সে জানায় যে রাত্রি পৌনে চারটায় তার ছেলের মৃত্যু হয়েছে। তাদের বাড়িতে কান্নাকাটির আওয়াজ পেয়ে স্কুলদালান থেকে ক্যাপ্টেন সাহেব তাকে তলব করেছিলো। সব শুনে ক্যাপ্টেন সাহেব আদেশ দিয়েছে যে যতো তাড়াতাড়ি পারে লাশ যেন দাফন করা হয়। তারই হুকুমে এরা এতো তাড়াতাড়ি এসেছে। এমন কি তাদের আত্মীয় স্বজন অনেকে এখনো এসে পৌঁছেনি। মোবারক আলি তাড়াতাড়ি যোগ করে, 'উনার বেটিও আসতে পারেনি।' কিন্তু মেয়ের ব্যাপারটা জানাতে চেয়ারম্যানের সায় নাই। সে শুধু মিনতি

করে যে তারা যদি মেহেরবানি করে—। না অনুমতি দেওয়া যায় না। সৈন্যরা তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে নিজেদের মধ্যে পা মেলাতে মেলাতে ইউনিয়ন কাউন্সিলের বারান্দায় গিয়ে উঠলো। শবযাত্রীরা কী করবে বুঝতে পারে না। ওদিকে সৈন্যদের ২ জন বন্দুক তাগ করে রেখেছে এদের দিকে, এক পা সামনে বাড়ালেই সাংঘাতিক বিপদ হতে পারে। প্রায় ১০/১৫ মিনিট পর ২ জন সেপাই ফের এগিয়ে আসে, জিগ্যেস করে, 'লড়কা? জওয়ান লড়কা? উমর কেতনা?' ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেন বলে, 'জ্বি হাঁ হুজুর! আঠারো বয়স কা নওজোয়ান!' ২ জন সৈন্যের ১ জন হাসে, অপরজন গম্ভীর মুখে যুবকের মৃত্যুর কারণ জানতে চায়। মোবারক শাজাহানের জ্বরের কথা বলে শেষ করতে না করতে সৈন্য ফের বলে, 'সালা মুক্তি থা? গোলি খাকে খতম হুয়া?' পেছন থেকে কাবেজউদ্দিন কি বোঝে সে-ই জানে, কেবল বিড়বিড় করে, 'তাহলে তো কামই হলোনি!'

চেয়ারম্যানের ছোটোভাই আস্তে করে তাকে ধমক দেয়, 'চুপ কর!' এবং একই সঙ্গে ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেন সৈন্যের সন্দেহের প্রতিবাদে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'নেহি হুজুর! বহুত আচ্ছা লড়কা থা।' সৈন্য ২জন তেতো হাসি ছোড়ে। চেয়ারম্যান একটু এগিয়ে ফের জানায় যে সকালবেলা ক্যাপ্টেন সাহেব নিজে তাকে অনুমতি দিয়েছে, এখন তারা যদি মেহেরবানি করে তাকে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখাটুকু করিয়ে দেয় তো বড়ো উপকার হতো। এবার ২জন সেপাই একসঙ্গে রাগ করে এবং ২জনের রাগ ১জনের গলায় প্রকাশিত হয় দ্বিগুণ ঝাঁঝের সঙ্গে। ক্যাপ্টেন কি তাদের মতো জানোয়ার যে ইচ্ছা করলো আর তার সঙ্গে দ্যাখা হয়ে গেলো? ক্যাপ্টেন কি তার বাবার চাকর যে এত্তেলো দিলেই চলে আসবে?

এদিকে লাশ কাঁধে করে কতোক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায়! কিছুক্ষণ পর পর শবযাত্রীরা খাটিয়ার নিচে ঘাড় বদল করে। হঠাৎ খুব গুমোট শুরু হওয়ায় সবাই ঘামতে শুরু করেছে, কেউ কেউ ভাবছে এর চেয়ে রোদ ভালো। পাশের নিচু জমি থেকে পানি সরে যাচ্ছে, কিন্তু পচা ঘাসপাতা ও কাদার জমাটবাঁধা গন্ধ বাতাসের একেকটি ঝাপটায় ভালোরকম জানান দিয়ে যায়। এর মধ্যে ১জন সেপাই চেয়ারম্যানকে ডেকে নরম গলায় বলে যে এভাবে অপেক্ষা করে তাদের ফায়দা হবে না। যেখানে পারে তারা লাশ পুঁতে ফেলুক। চেয়ারম্যান রাজি হয় না। লোকটি তখন বিরক্ত হয়ে বলে, ঠিক আছে, তা হলে তার কিছু করার নাই। তবে এখানকার লোকদের তো হিন্দুদের সঙ্গেই আঁতাতটা বেশি এবং তারা একরকম হিন্দুই বলা চলে তখন ছেলের লাশ সে পুড়িয়ে ফেললেই পারে। সেনাবাহিনী দেশলাই সরবরাহ করতে প্রস্তুত।

চেয়ারম্যান কাঁদো কাঁদো মুখে শবযাত্রীদের কাছে আসে। কী করা যায়? শর ৎকালের ফাজিল মেঘ থেকে এমন সময় পেচ্ছাবের মতো ছর ছর করে বৃষ্টি শুরু হয়। চেয়ারম্যান বলে, 'চলো চলো, বাড়ি চলো।' কিন্তু লাশ নিয়ে একবার বাড়ি থেকে বেরুলে আর ফেরা যায় না। সুতরাং মুশকিল হলো। ডানদিকে নিচু জমিতে

কোনো বড়ো গাছ নাই। বাঁদিকের জমিও নিচু, তবে রাস্তার ঢালে ১টা শ্যাওড়া গাছ। শ্যাওড়াগাছের নিচে তেমন আড়াল হবে না, তার ওপর ঐ গাছে ভূতপেত্নীর আড্ডা, তারা আবার সব হিন্দু। কিন্তু আর কোনো উপায় না থাকায় খাটিয়া নামাতে হলো ওখানেই। চেয়ারম্যানের চাচাতো ভাই কোত্থেকে বাঁশের চাটাই এনে লাশের ওপর বিছিয়ে দেয়, কিন্তু তার আগেই শবযাত্রীদের কারো হাতের ছাতা নিয়ে লাশের শিওরে তাই ধরে বসে পড়ছে কাবেজউদ্দিন। বৃষ্টি থেমে যায় এবং দেখতে দেখতে মেঘ ও গুমোট কেটে রোদ উঠলো। রোদও ভয়ানক চড়া। মোবারকের কানের কাছে মুখ দিয়ে কাবেজউদ্দিন বলে, 'শালার ওদের তেজ কী! ওদপানি সবই গেলো চ্যাংড়ার শরীলের উপর দিয়া! কন তো, কী গজব পড়িছে, কন তো বাপু!'

জ্যান্ত মানুষের শরীরেও রোদপানির তেজ কম লাগে না। মোবারক আলির পায়ের একজিমা টাটায়, সেখানে একটু চুলকে নিলে হতো। ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেন সায়েব তাকে একটু তফাতে নিয়ে ফিসফিস করে নতুন প্রস্তাব দেয়। লাশ নিয়ে পেছনে হটে চেয়ারম্যানদের বাড়ির দক্ষিণে বড়ো দিঘির উঁচু পাড় দিয়ে কিছুদূর হেঁটে তারপর নিচে জমির আল দিয়ে গোরস্থানে যাওয়া যায়।—মোবারক একটু ভাবে।—হ্যাঁ, তা যাওয়া যায় বটে, কিন্তু নিচু জমি থেকে পানি এখনো সম্পূর্ণ সরে যায়নি। লাশ নিয়ে ঐ জমিতে কি যাওয়া যাবে?—কষ্ট একটু হবে, তবে জমিতে পা দেওয়া দরকার কী? আল দিয়েই তো দিব্যি হাঁটা চলে।—কিন্তু সদর রাস্তা ছেড়ে পেছন দিক দিয়ে লাশ নিয়ে যাওয়ার কথা চেয়ারম্যানকে বলা যায় কী করে?

মাথার উপর রোদ গজায়। এবার আর ভ্যাপসা নয়, রোদের একেকটা শিখা শিকের মতো খুলিতে বেঁধে। ইমাম-কাম মোয়াজ্জেন সায়েব আরেকজন শবযাত্রীকে ডেকে তার প্রস্তাব বুঝিয়ে বলে। মোবারক আলির মুখে প্রস্তাবটা শুনে চেয়ারম্যানের চাচাতো ভাই মন্তব্য করে না। তবে তার সায় বোঝা যায়।

জুম্মার নামাজের সময় হলে ইমাম সাহেব জুম্মার ঘরে চলে যায়। যাবার সময় চেয়ারম্যানের হাত ধরে ডাকলো। এই ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেন সায়েবকে চেয়ারম্যান তেমন পাত্তা দেয় না। কিন্তু আজ কী করতে হবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না বলে চেয়ারম্যান সুড়সুড় করে তার সঙ্গে চললো। এমন কি শবযাত্রীদের প্রতি প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে সে ভুলে যায়। চেয়ারম্যানকে অনুসরণ করা মোবারক আলির কর্তব্য।

জুম্মার ঘর একেবারে ভরে বারান্দায় পর্যন্ত মুসল্লিদের ভিড়। গোলমাল শুরু হবার পর থেকে মানুষের নামাজপড়া খুব বেড়ে গেছে। তার ওপর আজ জুম্মার নামাজ। জুম্মার নামাজের পর এখানে কতো কথাবার্তা হয়, কিন্তু আজ সবাই খুব চুপচাপ। মোবারক আলি নামাজে উপযুক্ত মনোনিবেশ করতে পারে না। নিরাকার আল্লার জায়গায় তার চোখ জুড়ে ঝাঁঝরা-বুকে বুলুর চিৎ-হয়ে-থাকা লাশ। বুলুর

চুল ধুয়ে যাচ্ছে খালের পানি। তার শরীর বড়ো ক্লান্ত, দেখে মনে হয় দিনমান খেটে এসে ছেলেটা না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। ওকে ডিস্টার্ব না করাই ভালো। ঘুমাক। নামাজের পরও ছেলেটা ওর চোখ-ছাড়া হয় না। তা থাক না! ওর জন্য মোবারক আলির কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

শ্যাওড়াতলায় ফিরে গিয়ে দ্যাখা যায় চেয়ারম্যানের ভাই আলিম আখন্দ মিলিটারির সঙ্গে কথা বলছে। এই সেপাই নতুন, দুপুরের পর ওদের ডিউটি বদল হয়। শবযাত্রীদের সংখ্যা খানিকটা কমে গেছে। যারা নামাজ পড়তে গিয়েছিলো তাদের অনেকেই বাড়ি গেছে খাওয়া-দাওয়া সারতে। আবার তারা নামাজ পড়তে গেলে এখান থেকে কেউ কেউ কেটে পড়েছে। নাকি প্রথম থেকেই একটু একটু করে সরছে. মোবারক আলি হয়তো খেয়াল করেনি।

'না যাবার দিবার লয়!' লাশের মাথায় ছাতা ধরে বসে কাবেজ এখনো বিড়বিড় করেই চলেছে। এবার সবাই তার দিকে তাকায়। মানুষজন কমে যাওয়ায় কাবেজকে এমনিতেই চোখে পড়ছে। আপন মনে বিড়বিড় করা তার এক মুহূর্তের জন্য থামেনি। চাষাভুষা না হলে তার ঠোঁট নাড়ানোকে কলেমা পাঠ বলে মনে হতো। একটু স্বর বাড়ায় কাবেজ, 'যি মিলিটারি হুকুম দিবি, তাঁই বলে কড়িতলাত গেছে। চ্যাংড়াপ্যাংড়া কড়িতলার থানা বলে খাম করিছে।'

'আস্তে।' চেয়ারম্যান তাকে ধমক দেয়, 'শালা বলদের বাচ্চা বলদ। চুপ কর!'

আলিম আখন্দ বলে যে ক্যাপ্টেন এখানে নাই। সকালবেলাতেই তাকে যেতে হয়েছে কড়িতলা। সেখানে যে কী হয়েছে আলিম আখন্দ ঠিক বলতে পারে না, তবে সাঙ্ঘাতিক একটা কিছু ঘটেছে।—চেয়্যারম্যানের ধমক খেয়ে কাবেজউদ্দিনের বিড়বিড় ধ্বনি ফের খাদে নেমে এসেছে। কাবেজ কী বলছে?—না, চেয়ারম্যান তখন যদি বুলুর সঙ্গে শাজাহানকে যেতে দেয় তো শাজাহানের এই পরিণতি হয় না। আজ সে ব্যস্ত থাকতো কড়িতলা থানা বিজয়-অভিযানে। শাজাহান তখন সঙ্গে গেলে বুলু কি তাকে না নিয়ে কড়িতলায় আসে!—বুলুর খবর তাহলে কাবেজ জানে না। মোবারক আলির মাথা থেকে পা পর্যন্ত ছটফট করে। মিলিটারির জিপ উল্টিয়ে ২/৪/১০ টাকে খতম করে বুলু কীভাবে মরলো—এর বিস্তারিত চলচ্চিত্র তার করোটির ছাদের ভেতর দিয়ে গলিয়ে টাকরা গড়িয়ে পড়ে শুকনা জিভের খসখসে জমিতে, জিভ সুড়সুড় করে। দাঁত দিয়ে মোবারক আলি নিজের জিভ চুলকায়।

আবার ওঠো, খাটিয়া তোলো, ঘুরে দাঁড়াও, আখন্দ-বাড়ির পেছন দিয়ে ঘুরে চলো গোরস্থানে। চেয়ারম্যানের বাড়ির পেছনে বাঁশঝাড় পেরোবার সময় বাড়ির মেয়েদের কান্না নতুন করে চড়ে। তাদের শোককে পরিচর্যা করার সময় শবযাত্রীদের নাই। দেরি হয়ে গেছে, অনেক দেরি হয়েছে. তাড়াতাড়ি দাফন করা দরকার। মেয়েদের দিকে দেখতে দেখতে কাবেজউদ্দিন বিড়বিড় করা অব্যাহত রাখে, 'আম্মারা সব এখন কান্দিচ্ছেন? বুলুর সাথে তখন যাবার দিলেন না? তখন

বার হয়া গেলে চ্যাংড়াটাক এতো জুলুম সওয়া লাগে?' বলতে বলতে শবযাত্রার সঙ্গে পা চালিয়ে কাবেজ বাঁশঝাড় পেরিয়ে উঠে পড়ে জোড়-পুকুরের উঁচু পাড়ের ওপর।

পুকুরের পাড় আসলে একটা রাস্তার অংশ, এই রাস্তায় হাঁটতে শবযাত্রীদের কোনো অসুবিধা হয় না। এমন কি সরু ও কাঁচা পথটি থেকে নিচে নামাটাও স্বচ্ছন্দে সম্পন্ন হয়। জমিতে নামবার ঢালে পানি সরে গেছে। নিচের জমিতে আমন ধান। ভালো করে দেখলে মনে হয় ধানের সবুজ শীষ বাতাসে একবার ফুলে ওঠে, একবার বসে যায়। জমিতে এখনো ইঞ্চি দেড়েক পানি। ৮/১০ দিন আগে পানি ছিলো ১/২ হাত, বর্ষা শেষ হয়ে গেলে কমতে কমতে ১ ১/২ পানি সরতে সপ্তাহের পুরোটাই লাগবে।

লাশের খাটিয়া যাদের ঘাড়ে তাদের একটি সারি যাচ্ছে জমির আলের ওপর দিয়ে, আরেকটি সারিকে হাঁটতে হয় ধানজমির ওপর। মোবারক আলির কাঁধে খাটিয়ার ডান দিকের প্রথম কোণ। তার আগে আগে ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেন সায়েব। ঐ সারির শেষ কোণ আলিম আখন্দের ঘাড়ে। তার পেছনে চেয়ারম্যান। তারপর চেয়ারম্যানের চাচাতো ভাই। এদের পেছনে লম্বা সারিতে অন্য সবাই। আর ওদিকে পাশের পঙক্তিতে খাটিয়ার প্রথম কোণ বহন করছে কাবেজউদ্দিন। তার আগে আগে চলছে চেয়ারম্যানের সবচেয়ে বড়ো বর্গাচাষী বিটলুর বাপ ও তার ছেলে বিটলু, বিটলুর কোলে তার আড়াই বছর বয়সের ন্যাংটা শিশু। ঐ সারিতে খাটিয়ার পেছনের কোণ কাঁধে নিয়েছে গুণাহারের আরজ আলি সাকিদার, এ লোকটি চেয়ারম্যানের ধানকলের কর্মচারী, তার সামনে খাটিয়ার নিচে হেঁটে যায় আরজ আলির ভাইপো, এই সারির সর্বশেষ ব্যক্তি হলো নিহত শুকলু পরামাণিকের ছেলে ওবায়েদ। এই সারিতে আর কেউ নাই। ধানজমিতে হাঁটা এখন রীতিমতো কঠিন কাজ। ধানগাছের ফাঁকে ফাঁকে খালি জায়গায় পা পড়লে ডুবে যায় কাদার মধ্যে। লালমাটির কাদা, এমনভাবে খামচে ধরে যে পা তুলতে খুব কষ্ট হয়। কিন্তু এই সারির এরা মাঠে মাঠে কাজ করে বলে মাঠ ওদের বেশ পোষা, মাঠের নাড়িনক্ষত্র এদের মুখস্থ। ধান গাছের গোড়ার একটু ওপর এমন করে পা ফেলবে যে একটুখানি হেলে ধানগাছ অনেকটা পাপোষের কাজ করবে। কাদার কামড় থেকে এইভাবে বাঁচতে হয়। আবার দেখতে হয় ধানগাছ যেন একেবারে চিরকালের মতো শুয়ে না পড়ে। অতো দ্যাখাদেখির দরকার পড়ে না, তাদের পায়ের সঙ্গে মাঠ ও কাদার বোঝাপড়া ভালো, সহজে কেউ কাউকে ঘাঁটায় না।

সতর্ক পা ফেলতে হয় জমির আলের উপর দিয়ে যারা চলছে তাদের। জমির আল মাত্রেই দিন দিন রোগা হয়ে আসছে, এর ওপর এতোদিন বর্ষার পানির নিচে থাকায় কোথাও কোথাও ক্ষয় হয়েছে। আলের ওপর তাই হাঁটতে হয় পা টিপে টিপে আলিম আখন্দ মাঝে মাঝে উপদেশ দিচ্ছে, 'সাবোধান, খুব সাবোধান! দেখ্যাশুন্যা কদম ফালাও। কাদার মধ্যে পড়লে বিপদ হবি!' সবাইকে সাবধান করার দায়িত্ব পালনে মগ্ন হয়ে লোকটা নিজের বাত-চুম্বিত চরণযুগলের প্রতি অবহেলা করে। কয়েক গজ মাত্র চলার পর ৭ম কি ৮ম সাবধানবাণী সম্পূর্ণ নিঃসৃত

হবার আগেই তার মোটাসোটা ডান পা আল থেকে পড়ে যায় নিচে। খাটিয়ার ওপর শাজাহানের লাশ অনেকটা ডানদিকে গড়ায়। মোবারক আলির বুকে ধড়াস করে আওয়াজ ওঠে; লাশ কাদার মধ্যে পড়ে গেলো! তবে আলিম আখন্দের পায়ের পতনের সঙ্গে সঙ্গে অন্য সবার মতো সেও খাটিয়ার কোণ এবং খাটিয়ার পা দুই হাত দিয়ে ধরে ফেলে। এইভাবে শাজাহানকে পতন থেকে উদ্ধার করা হয়। আলিম আখন্দের পা পড়েছিলো একটি ধান গাছের গোড়ায়, তাই রক্ষা। তবু বেচারার পায়ের পাতায় শামুকের খোলা লেগেছে, একটু রক্তও বোধহয় বেরিয়েছে। কিন্তু খাটিয়া বহনের কাজ থেকে তাকে রেহাই দেওয়া বড়ো সহজ কাজ নয়। কারণ জমির আলের সারির কারো পক্ষে কাউকে পেরিয়ে সামনে যাওয়া কঠিন, এরকম যেতে হলে তাকে আল থেকে নেমে কাদার ওপর দিয়ে যেতে হবে। যাক, আলিম আখন্দ সামলে নিয়েছে, অন্যদের সাবধান করার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে সে এখন সতর্ক পায়ে হাঁটছে। জমিতে খসখস শব্দ। মাঝে মাঝে পানির ওপর পা পড়লে পানি ও ধানগাছের মিলিত আওয়াজ। আর আলের ওপর দিয়ে যারা চলছে তাদের পায়ের নিচে শব্দ একঘেয়ে। তবে এই সারির পুরোভাগে ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেন সায়েব অবিরাম কলেমা পড়ে চলেছে, ফলে আলের ওপরেও বৈচিত্র্য আছে বৈ কি! মোবারক আলির ভয় হয় যে কলেমা পাঠে ইমাম সাহেবের অখণ্ড মনোযোগ নিজের কদমের প্রতি তাকে অসতর্ক না করে। এই ভয় ভালো করে দানা বাঁধতে না বাঁধতে ঘাড়ের ওপর খাটিয়া কেঁপে ওঠে, মোবারক আলির কাঁধ থেকে খাটিয়ার কোণ বলতে গেলে একটু সরেও যায় এবং সে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়ে। তার বন্ধ চোখের ভেতরটা পর্দার মতো কাঁপে এবং মোবারক আলি দ্যাখে যে শাজাহানের লাশ ধান খেতের কাদায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে গড়াতে থাকে বুলুর মুখ। কোথায় কোন বৌডোবা খালের ধারে বুলুর লাশ পানিতে ভেজে। না, বুলু ছিলো চিৎ হয়ে। তার বন্ধ চোখের মণি তাগ করা ছিলো আকাশের দিকে। মিলিটারি জিপ উল্টিয়ে দিয়ে, ২/৪/১০টা মিলিটারিকে খতম করে বুলুর তখন যা তেজ তাতে চোখের পাতা টাতা ভেদ করে সে সব দেখতে পাচ্ছিলো।—এ দৃশ্যটি মোবারক আলি আগেই দ্যাখে এবং এটা দেখতে দেখতে তার বাম পা হড়কে পড়ে যায় জমির কাদায়। আবার এও হতে পারে যে তার পা নিচে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শাজাহানের লাশের কথা ভেবে বিচলিত হয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলে এবং এই দৃশ্যটি দেখতে থাকে।

কাদা থেকে পা তুলতে মোবারক আলিকে একটু বেগ পেতে হয়। তার একজিমায় কাদাপানি লাগায় জায়গাটা বড়ো চুলকাচ্ছে। এখন সেখানে আর হাত লাগায় কী করে? কিন্তু চোখের বন্ধ পাতা ভেদ করে তাকানো বুলুর তেজি চোখজোড়া ঝেড়ে ফেলা দরকার, নইলে ফের পা হড়কাবার সম্ভাবনা। আবার ওদিকে একজিমার যন্ত্রণা। সেটাও ভোলা দরকার। অস্থির হয়ে মোবারক একটু জোরে পা চালাবার চেষ্টা করতেই কাবেজ ও আলিম আখন্দ এক সঙ্গে চিৎকার করে, 'আস্তে। আস্তে।' এবার মোবারকের পদস্খলন ঘটে না বটে, কিন্তু সে ধাক্কা খায় ইমাম-কাম মোয়াজ্জেন সায়েবের পিঠে। সামনে জমির আল হঠাৎ খুব সরু

হয়ে গেছে, ইমাম সায়েব সেজন্য প্রস্তুত ছিলো, কিন্তু মোবারকের ধাক্কায় তার সমস্ত প্রস্তুতি ভণ্ডুল হয়ে গেলো, আলের দুই পাশে কাদায় তার দুই পা গেঁথে যাওয়ায় লোকটার গতি একেবারে রুদ্ধ হয়। মনে হয় সাদা কাপড়ে জড়ানো ১জোড়া খুঁটি পুঁতে তাকে স্থাপন করা হয়েছে। এখন কেবল তার মুণ্ডুতে চাঁদ-তারা-খচিত নিশান কোনোভাবে একটা ফিট করে দিলেই ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেন সায়েব পত পত আওয়াজে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে শুরু করবে। কিন্তু তার মুখ দিয়ে বমির মতো তোড়ে বেরিয়ে আসে, 'শালা জালেমের বাচ্চারা!'

বিটলুর বাপ এদিকে এসে আলের ওপর বসে ইমাম সায়েবের চরণ উদ্ধারে আত্মনিয়োগ করে। এই জায়গায় কাদা বড়ো থকথকে। এক পা তুলতে গেলে শরীরের ভার পড়ে অন্য পায়ে এবং দ্বিতীয় পাটি কাদায় অনেক বেশি করে গেঁথে যায়। তার পেছনে লাশ ঘাড়ে নিয়ে এতোগুলো মানুষ অধীর আগ্রহের সঙ্গে বিটলুর বাপের প্রচেষ্টার অগ্রগতি লক্ষ করে। ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেন সকলের লক্ষ্যবস্তু হয়ে বিব্রত হয়। দিনে ৫ বার অবশ্য অনেক লোকের সামনে তাকে দাঁড়াতে হয়। তবে সেটা হলো মেলা দিনের অভ্যাসের ব্যাপার। আর সেখানে তার নিজের কিছুই করার নাই। মুসল্লিরা কাতার বেঁধে দাঁড়ালেই সে ইঞ্জিনের ঠেলায় চলতে-থাকা রেলগাড়ির মতো চাপ অনুভব করে এবং ১টির পর ১টি সুরা আবৃত্তি করে চলে। কিন্তু এখানে দৃশ্য বা অদৃশ্য কোনো চাপ নাই যে তার ওপর ভরসা করে পেছনের লোকদের উৎকণ্ঠাকে সে অগ্রাহ্য করে। সারির সামনে ইমাম সায়েব অচল বলে সবার গতি রুদ্ধ, দায়টা কি তবে তার ওপরেই বর্তায় না? ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেন প্রায় আজান দেওয়ার মতো আওয়াজ তুলে আল্লার কাছে নালিশ করে, 'আল্লাপরওয়ারদিগার, তুমি দ্যাখো মুসলমানের মুর্দার সাথে এরা কীরকম নাফরমানি করে, মুসলমানের মুর্দার দাফন দিতেও এরা বাধা দেয়, আল্লা, এরা কাফেরেরও অধম, জানোয়ার, সব হায়ওয়ান!' আল্লার উদ্দেশ্যে বললেও তার প্রকৃত লক্ষ্য শবযাত্রীরা এই আপাতঅভিযোগকে কৈফিয়ত বলে সনাক্ত করতে পারে এবং মেনেও নেয়। তবে এরকম না করলেও তার চলতো, কাদার ভেতর তার পা গেঁথে যাওয়ায় তার ওপর কেউ বিরক্ত হয়নি। এমন কি বিটলুর বাপ, যে কি-না গতবারের আগের বার চাষের সময় সার কেনার অর্ধেক টাকা যোগাড় করতে ইমাম সায়েবের কাছ থেকে ৪ মাসের কড়ারে ৫০ টাকা হাওলাত নিয়ে ৭ মাস পার করিয়ে দেওয়ায় ঐ শেষ কটা মাসের জন্য দ্বিগুণ হারে সুদ দিয়েও কেবল একবেলা খোরাকিতে তার পাতকুয়া সাফ করে রক্ষা পেয়েছিলো, সে পর্যন্ত তার পদসেবায় এতোটুকু ফাঁকি দিলো না।

'কন তো ইমাম সায়েব, আমার ব্যাটার সাথে অরা ইটা কী করিচ্ছে, কন তো।' চেয়ারম্যানের এই বিলাপে সবাই চুপচাপ মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রায় ফোঁপাতে ফোঁপাতে চেয়্যারম্যান জানতে চায় তার নিরীহ নিষ্পাপ মাসুম বাচ্চাটির ওপর আল্লার গজব নামে কেন? লেখাপড়ার বাইরে সে তো কিছুই জানে না, কোথাও কোনো ঝগড়াঝাটির আভাস পেলেও সে ওখান থেকে শতহাত দূরে

থাকে।—তো তার ওপর এরকম জুলুম কেন?—কেউ এর জবাব না দিলে গুনাহারের আরজ আলি সাকিদার জোর গলায় মনিবকে সমর্থন জানায়, 'কিসের ক্যাম্প খাড়া করছে, তার সামনে দিয়া যাবার দিবি না।—ক্যান?—মুর্দা কি কাফনের মধ্যে বন্দুক লিয়া যাচ্ছে? মুর্দার হাতে হাতিয়ার আছে?'

'তালে তো কামই হতো।' জমির ওপর থেকে খাটিয়া কাঁধে জবাব দেয় কাবেজ, তার বিড়বিড় এতোক্ষণে বাক্যের আকার পায়, 'বন্দুক কি কচ্চেন গো, মানষের হাতে পান্টি দেখলে শালারা বলে গোয়ার কাপড় তুল্যা কোটে দৌড় মারবি তার দিশা পায় না, কড়িতলাত গেলে দ্যাখা গেলোনি, সেটি বলে দুধের ছোলেরা এই জাউরাগুলাক খাম কর‍্যা দিলো—'

'প্যাচাল পাড়িস না কাবেজ! শালার চাষার মুখ বন্ধ হয় না।' আলিম আখন্দের ধমকে কাবেজ থামে, কিন্তু ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেনের চরণ-উদ্ধারের পর তার বিড়বিড় ফের শুরু হয়। শবযাত্রীরা কলেমা শাহাদত পড়ে, আর কাবেজ হলো জাহেল মানুষ, খোদার কালাম জানে না কলেমা জানে না, সে কেবল জপে যে, বুলুর সঙ্গে তখন শাজাহান যদি চলে যায় তো আজ কি তার এতো কষ্ট হয়?—কাবেজের জপপাঠ শোনে আর মোবারক আলির ঠোঁটজোড়া নিসপিস করে, বুলুর কথাটা কাবেজকে জানানো খুব দরকার।—বুকে গুলি লেগে বুলু মারা গেছে। না, এমনি মার খেয়ে মরেনি, মরার আগে হাত দিয়ে বোমা ছুড়ে মটোর ভর্তি মিলিটারি নিশ্চিহ্ন করে তাদের গাড়িগুলি সব উল্টিয়ে তারপর—। তারপর বুকে, নাকি পেটে? না, বুকেই গুলি লাগলে বুলু গড়িয়ে পড়ে বৌডোবা খালে, বৌডোবা খাল কোথায়?—আরে পুবে, যমুনা থেকে একটু পশ্চিমে। তা এতোদিনে বৌডোবা খালে সে কি আর আছে? সে কি বসে থাকার ছেলে? বর্ষার ঢলে বুলুর লাশ ঠিক পৌঁছে গেছে যমুনার স্রোতে। যমুনার স্রোতের কথা খিয়ার অঞ্চলের মানুষ কাবেজ জানবে কোত্থেকে?—যমুনার একেকটা ছোবলে ঘরবাড়ি, ফসলের জমি, হাটবাজার গ্রামকে গ্রাম, এমন কি গুণাহারের প্রদ্যোৎনারায়ণ হাইস্কুলের মতো দালানও টুপ করে ধসে পড়ে, কোনো চিহ্ন থাকে না। তো সেই স্রোতের ওপর সওয়ার হয়ে তার বুলু রওয়ানা দিয়েছে কোন দিকে? কোথায়? যমুনা গিয়ে মেশে কোথায়? পদ্মায়? না-কি মেঘনায়? তারপর আত্রাই পেরোতে হবে না? তারপর গুনাহারে কাপড়ের দোকানদারের বাড়ির পাশের নদী ধলেশ্বরী, সেটা কোথায়? মোবারক আলি সুরমা নদীর নাম জানে, কর্ণফুলির নাম জানে, করতোয়া তো তার চাচাতো বোন, স্কুলে তাদের ইতিহাসের মাস্টার ছিলো, বাড়ি তিতাস নদীর তীরে, কোথায় যেন ভৈরব, কোথায় শীতলক্ষ্যা—এতোসব নদীর নাম মনে করতে করতে মোবারক হাবুডুবু খায়, থই পায় না। নদী উপনদীর বিপুল স্রোতোধারা তার কানে এমন বেগে আছাড় খায় যে এমন কি বুলুর মায়ের কান্নাও চাপা পড়ে। এই বিশাল জলধারায় তার রোগা ঢ্যাঙা কালো ছেলেটার গুলিতে-ঝাঁঝরা বুক কানায় কানায় ভরে গিয়েছে। এই গুমোট গরমে সিন্দুকের মতো গর্তে মাটিচাপা হয়ে থাকতে হচ্ছে না বলে বুলু তার ইচ্ছামতো হাতপা ছড়াতে পারে। সে কি চিৎ হয়ে শোয়? না-কি উপুড় হয়ে? বুলু কি ভেসে ভেসে চলে? না-কি রুই কাৎলা চিতল বোয়াল খলসে

পুঁটির ঝাঁকের সঙ্গে পানির নিচে এগিয়ে যায়? কিন্তু এতোসব প্রশ্নের জবাব খুঁজে বার করা মোবারকের পক্ষে বেশ কঠিন। সময়ও হয় না। গোরস্থানে পৌঁছে খাটিয়া নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই চোখে পড়ে খেজুরতলার ধসে-পড়া এক কবরের ভেতর থেকে মোটাসোটা ১টা শেয়াল সরাসরি তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। মাটির ঢিল হাতে নিয়ে তাকে তাগ করে মোবারক খুব জোরে ছুড়ে মারে!

ফেরার সময় কয়েকজনের সঙ্গে মোবারক আলিও চেয়ারম্যানের বাড়িতে কিছুক্ষণ বসলো। মাইল তিনেক তফাৎ কড়িতলায় আজ খুব একচোট হয়ে গেছে, মিলিটারিও নাকি বেশ কয়েকটা সাফ।—খবর শুনে চেয়ারম্যানের পুত্রশোক মাথায় ওঠার দশা, এই ক্যাম্পে মিলিটারির ক্যাপ্টেনকে না হলেও ১০ বার সে বলেছে যে তার ইউনিয়ন সম্পূর্ণ পবিত্র, ঐসব মুক্তি ফুক্তির ছোঁড়ারা অন্তত রেললাইন পেরোতে পারবে না—এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত। যে মুকুন্দহাটের গ্রামভর্তি হিন্দুরা গোলমালের শুরুতেই বর্ডার পার হয়েছে, এখন গোটা এলাকায় সাচ্চা মুসলমান ছাড়া আর মানুষ নাই।—এখন মিলিটারি এসে তার হাল কী করবে তা জানে কেবল আল্লা পরওয়ারাদিগার আর মিলিটারি আর খানিকটা অনুমান করতে পারে সে নিজে। বাড়ির লোকজনও জান ভরে কাঁদতে পাচ্ছে না, কেবল শাজাহানের মায়ের ক্লান্ত ও বসা গলার কান্না মধ্যরাত্রির কুকুরের ইনিয়ে বিনিয়ে কান্নার মতো টানা আওয়াজ তুলে অশুভ ইঙ্গিত দিয়ে চলেছে। কড়িতলার শোধ নিতে মিলিটারি এই গ্রামে কতোরকম কায়দায় মানুষ-খুনের কেরামতি দ্যাখাবে তাই নিয়ে মানুষ নিজেদের মধ্যে আতঙ্ক বিনিময় করে। পশ্চিমপাড়া মক্তবের কয়েকটি তালেব-এলেম শাজাহানের ঘরে, ঐ ঘরের বারান্দায় এবং উঠানে যে যে জায়গায় শাজাহানের লাশ ছিলো,—বসে কোরান শরিফ পড়ছে। আগরবাতির ধোঁয়ার পাতলা পর্দার আড়ালে এদের মিনমিনে ঝাপসা আওয়াজ শুনে কে বলবে এরা আল্লাপাকের কালাম পড়ছে, না আগে আগে নিজেরাই নিজেদের জানাজা পড়ে নিচ্ছে,—মিলিটারির হাতে মরলে জানাজা হয় কি-না কে জানে? এদের সঙ্গে মোবারক আলি কথা বলে কী করে?

চেয়ারম্যানের বাড়ির বাইরের উঠানে কেবল কাবেজউদ্দিন। চেয়ারম্যানের গোরুবাছুর নিয়ে সে যাচ্ছে গোয়ালঘরের দিকে। বুলুর কথা শোনাবার জন্য তাকে দাঁড়াতে বলে মোবারক ফ্যাসাদে পড়ে, কথাটা শুরু করে কীভাবে? তা কাবেজউদ্দিনই তাকে উদ্ধার করে, 'দ্যাখেন তো চাচামিয়া, অল্যোয্য কথাটা হামি কী কনু, কন তো? তখন বুলুর সাথে গেলে শাজাহানের আজ বলে এতো দুক্ষু পোয়ান লাগে? শালারা অর সাথে এতো জুলুম করব্যার পারে?' হঠাৎ গলা নামিয়ে সে জিগ্যেস করে, 'কড়িতলাত কি বুলু আসিছিলো, সোম্বাদ পাছেন?' আজ বুলু বেঁচে থাকলে কড়িতলার আক্রমণ হয়তো তারই পরিচালনায় সম্পন্ন হতো, কে জানে? কিন্তু বুলু মরার আগে যে কাণ্ডটা করে গেছে,—সেটা? কাবেজের নিচু স্বরকে পরোয়া না করে মোবারক স্বাভাবিক গলায় বলে, 'কাবেজ, বুলুর খবর তুমি কি জানো? অর লাশ লিয়া শয়তানি করবি এই ইবলিশের পয়দা মিলিটারি? বুলুর লাশ বলে বৌডোবা খাল থেক্যো বার হয়া—।'

'লাশ? বুলুর লাশ? কী কচ্ছেন চাচামিয়া?

মোবারক আলি তখন বৌডোবা খালের ধারে পাটখেতের ভেতর থেকে বুলুর গ্রেনেড ছুড়ে মিলিটারি মারার গল্প বলে। মস্ত বড়ো গাড়ি ভর্তি মিলিটারি খতম করার পর ওদের এক গুলিতে বুলু গড়িয়ে পড়েছে খালে। বুলুর লাশের দীর্ঘ জলযাত্রা পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই গোরুর পালের পাটকিলে বাছুরটা দৌড় দেয় সামনের খড়ের গাদার দিকে, কাবেজ ছোটে তার পেছনে। একটুখানি দাঁড়িয়ে মোবারক রাস্তায় নামলো।

রাস্তা খাঁ খাঁ করছে। কেবল খুব জোরে পা চালিয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছে বিটলুর বাপ। তার ধ্যাবড়া পায়ের একেকটি কদমে রাস্তার নির্জনতা অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়। মোবারক হঠাৎ করে তার সামনে এসে দাঁড়ালে সে চমকে ওঠে। মোবারক বলে, 'এখনি বাড়িত যাস?'

'কড়িতলার সোম্বাদ শুনছেন? যাই। আত হয়া যাবি। ঘাটাত্ত যদি ধরে তো—।'

'কেটা ধরবি?'

'বেলা ডুবলে অরা ধরবি না?' এই বারবেলায় মিলিটারির নাম মুখে আনতে বিটলুর বাপের বুক ঢিপঢিপ করে, ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিসে ক্যাম্প হওয়ার পর থেকে সন্ধ্যা থেকে এখানে অঘোষিত কার্ফ্যু জারি হয়।

'আরে থো', মোবারক প্রায় ধমক দেয়, 'হামার বুলু বলে একো বন্দুকের গুলিত মটোর ভরা মিলিটারিক শ্যাষ করিছে সেই বিত্তান্ত জানিস?'

'কী কন?' বুলু ইন্ডিয়া গেছে এই নিয়ে সে কানাঘুসা শুনেছে, তা ঐ বোকাসোকা কাবেজের কথায় আমল দেয় কে? 'তাই তো, বুলুক অনেকদিন দেখি না। হামি কই তার কলেজ আছে, তাঁই বগুড়া থিকা আসবার পারিচ্ছে না।' বিটলুর বাপ স্থির হয়ে দাঁড়ালে মোবারক বুলুর কথা বলে। তবে বলতে বলতে সে একটু আনমনা হয়ে যাচ্ছিলো, অনেক দূর থেকে ভেসে আসা চাপা আওয়াজে তার বুক হু হু করে, আহারে, বুলুর মা আজ চোখ ভরে, গলা ভরে, বুক ভরে কাঁদে! এই সুযোগটা দেওয়ায় শাজাহানের জন্যে একটু বেশিরকম মায়া হয়, কিন্তু বুলুর গল্প বলার সুযোগ নষ্ট হয়ে গেলো; গাছপালা, ঘরবাড়ি, ফসলের জমি এবং বাতাসের ওপর দিয়ে ভেসে আসা সেই আওয়াজে হাওয়া লাগে, খুব বেগে তা এগিয়ে এলে দুজনই দক্ষিণে তাকিয়ে তার উৎস খুঁজতে থাকে। দেখতে দেখতে কড়িতলার মাইলখানেক দক্ষিণে রেললাইনের ওপরের অনেকটা জায়গা আগুনে, ধোঁয়ায়, চিৎকারে আর্তনাদে সামনে এগিয়ে আসে। বিটলুর বাপ ফিসফিস করে, 'মনে হয় আইলগর। অরা গেছে!' 'হু, মিলিটারি পড়িছে। রায়নগর মোকামতলা ঘোড়াঘাটের একটা পোকাও অরা রাখবি না, দেখিস। কুত্তার বাচ্চারা মানুষ সহ্য করবার পারে না।' মোবারক আলির গলা কাঁপে।

'বাড়িতে যাই ভাইজান, অনেকক্ষণ বেলা ডুবিছে, যাই।' পা বাড়িয়ে বিটলুর বাপ এগোয় না, বলে, 'তা ভাইজান, বুলু যখন বোমা না বন্দুক মারলো ঐ মটোরের মধ্যে অরা কয়জন আছিলো? ব্যামাক কয়টাই মরিছে?'

'তো তোমাক কলাম কি?'

বিটলুর বাপ হন হন করে হাঁটা দিলে ঝপ করে রাত নামলো, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ থেকে আলোর সঙ্গে অন্ধকার চোঁয়ায় প্রায় সমান সমান। আসমত সরকারের আমবাগানের পশ্চিম মাথায় ভাঙাচোরা, কেবল ১০/১২টি ইটসর্বস্ব শাহবাবার মাজারশরিফের শিয়রে মস্ত শিমুল গাছের নিচে বিড়ি টানতে টানতে রাতভোর বসে থাকে ভিখুপাগলা, ঐ গাছের পুরনো বাসিন্দা শাহবাবার পোষা জিনের কাছে সে গুপ্তবিদ্যার পাঠ নিচ্ছে আজ কম করে হলেও ৭ বছর তো হবেই। ভিখুপাগলাটাও আজ নাই, মনে হয় কড়িতলা রায়নগরের খবর তারও কানে গেছে। মোবারক একটু দমে গেলো, ভিখুপাগলাকে বুলুর গল্প বললে তার ধ্রুতে আসমানি জীবের এলাকায় বুলুর গলাটা ঠিক পৌঁছে যেতো। তবে একটু এগোলে এই ক্ষোভ মুছে যায়, জুম্মাঘরের অন্ধকার বারান্দায় বসে ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেন বদনা থেকে পানি ঢেলে অজু করছে। ইমাম সায়েবের কুলকুচো করার আওয়াজ আজ এতোটাই খাদে নেমেছে যে মনে হতে পারে লোকটা সবাইকে লুকিয়ে চুপচাপ কোনো নিষিদ্ধ পানীয়তে চুমুক দিচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তওবা করে তাই আবার নীরবে বমি করে ফেলছে। মোবারকের অবশ্য তা মনে হয় না। বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে সে আজকের কড়িতলা সংঘর্ষের বিবরণ ছাড়ে। তার বর্ণনা থেকে খুঁটিনাটি জিনিসও বাদ পড়ে না, কড়িতলায় আশেপাশে কোনো খাল না থাকায় মিলিটারির গাড়ি চুরমার হয়ে পড়ে যায় প্রাইমারি স্কুলের মাঠে। এখানে পাটখেত নাই, তাই রোগা ঢ্যাঙা কালো ছেলেরা বোমা ছুড়েছিলো স্কুলের উত্তরের বাঁশঝাড় থেকে। মিলিটারি যতোগুলো গিয়েছিলো প্রাণ নিয়ে কেউ ফেরেনি। ছেলেদের মধ্যে মারা গেছে একজন, হ্যাঁ প্রথম বোমাটি সেই ছুড়েছিলো। তারপর ফ্ল্যাশ ব্যাক করে মোবারক বুলুর গল্প করে। সবই বলে, এমন কি তার যমুনায় পৌঁছে যাওয়ার খবরটিও বাদ পড়ে না। মিলিটারি সম্বন্ধে সে বাঞ্চোৎ, বেজন্মা, বেশ্যার পয়দা, জাউরা, হারামির বাচ্চা ও হারামখোর এইসব বিশেষণ প্রয়োগ করলে অজু নষ্ট হতে পারে জেনেও ইমাম সায়েব লালচে কালো ধানখেতের দিকে তাকিয়ে শেষপর্যন্ত তার কথা শোনে।

ওদিকে বুলুর মা দাঁড়িয়ে ছিলো দরজার কপাট ধরে। গ্রামে মিলিটারি ক্যাম্প পড়ার পর থেকে বুলুর বাপ বেলা থাকতে থাকতে ঘরে ফেরে, মগরেবের নামাজ সে আজকাল ঘরেই পড়ে। আর আজ কি-না এশার আজান পর্যন্ত পড়ে গেলো, তার দ্যাখাই নাই।

ভেতরের বারান্দায় জলচৌকির ওপর গামছা ও বদনা ভরা পানি দিয়ে বুলুর মা রাগ করে, 'দেরি হলে খবর পাঠাবার পারো না? একটা মানুষ পাই না যে তোমার কথা পুস করি।'

তার জন্য স্ত্রীর এই দুশ্চিন্তা দেখে মোবারক আলি বিরক্ত হয়। যার ছেলে মারা গেছে মাস দুয়েকও হয়নি, সেই মা অন্য কারণে উতলা হয় কীভাবে? সন্ধ্যার পর ছেলের জন্য হামলে কেঁদে মা যদি সারা গ্রাম মাথায় না তুললো তো বুলু এরকম মরা মরতে গেছে কোন দুঃখে?

দোজখের ওম

আজ অনেকদিন পর কামালউদ্দিনের শরীরের প্রায় গোটাটাই শিরশির করে কাঁপে। এর মানে কী? নিজে নিজে পাশ ফিরে শুতে পারে না আজ ৫ বছরের ওপর, তা তো হবেই, আকবরের মা তো মারাই গেছে সাড়ে ৩ বছর, আকবরের মা পুরো ২টি বছর তার গুমুত টানলো,—তাহলে এই আধখানা গতর নিয়ে বেঁচে থাকা কি ৫ বছরের বেশি না কম? তা সেই মানুষ কি-না বালিশে বাম হাত ঠেকিয়ে একা একা উঠে বসতে চেষ্টা করছিলো। সুবিধা করতে না পেরে নিজের ডান হাতটিকে আকবরের মায়ের ডান বা বাম যে কোনো হাত ঠাউরে সেটাই আঁকড়ে ধরে। কিন্তু ১. হাতটি প্রকৃতপক্ষে তার নিজের, ২. এই হাতটি তার অচল ডান সাইডের আধ গজ টুকরা এবং ৩. রাত্রিবেলা আকবরের মা এখানে এসে ঘুরঘুর করলেও সে তার স্পর্শের বাইরেই রয়ে যায়—এই ৩টে প্রধান বিষয় তার মনে পড়ায় অন্ধকার মশারির ভেতর ফের ঘুমাবার জন্য কামালউদ্দিন তার এখন-পর্যন্ত-চালু বাম দিকটা শিথিল করার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু এখন তার ঘুম আসার কথা নয়, এখন আসবার কথা আকবরের মায়ের। তার কেমন ভয় ভয় করে। না, আকবরের মায়ের জন্য নয়, তার খোঁচা-মারা কথা সে শুনে আসছে ৬০/৬৫ বছর থেকে, মরার পরও কথার আদল তার বদলায় নাই এতে অবাক হওয়ার কী হলো? অল্প অল্প বিরতি দিয়ে কামালউদ্দিনের গা ছমছম করে, কারণ একটু আগে কে ১জন এসেছিলো তাকে সে চিনতে পারলো না কেন? মুত্তাকি মুসল্লির ফজরের আজানের জন্য প্রতীক্ষার মতো আকবরের মায়ের আশায় ঠিক সময়েই তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো। তারপর রোজকার মতো সে আধা-পঙ্গু ঘাড়খানা ফিরিয়েছিলো শিয়রের কাছে রাখা টেবিলের দিকে।—আকবরের মা যখনি আসে তার ছায়া-ছায়া হাত দিয়ে ওষুধপত্র, পানির জগ, গ্লাস, ইসবগুলোর ভুষিভেজানো বাটি, তসবি, টুপি এবং "মকসুদুল মোমেনিন" বইটা গুছিয়ে রাখে, গোছানো থাকলেও ফের গোছায়। তায়াম্মুম করার মাটির ঢেলাটি রেখে দেবে কামালউদ্দিনের বালিশের পাশে, তাহলে আজান শুনে পাশের তক্তপোষে শুয়েথাকা আবুবকরকে না ডাকলেও চলে। অতো ভোরে ১৪ বছরের নাতিটিকে ঘুম থেকে ছিঁড়ে আনাটা আকবরের মায়ের পছন্দ নয়।—তা চোখ মেলে কামালউদ্দিন আজও ঘরের

শূন্যতায় হালকা গোলাপি আভা দেখতে পায়। এটা হলো বেহেস্তের স্বাভাবিক রঙ। যাদের কবর আল্লা বেহেস্তের টুকরা করে সাজিয়ে রাখে তারা যেখানেই যাক, এই রোশনি তাদের সঙ্গে ঝালরের মতো লাগানো থাকে।—কিন্তু হলে কী হবে, এ তো আকবরের মা নয়। এর বয়স অনেক কম একটু হাবা হাবা চেহারার অল্প বয়সের মেয়েমানুষ। মেয়েটির কোলে কাঁথা-জড়ানো ১টি শিশু। বাচ্চার মুখে গোলাপি আলো ঘন হয়ে পড়ায় তার রঙ কি চেহারা বোঝা মুশকিল। কাঁথার ওপর আলো পড়েছিলো ছড়িয়ে, কাঁথাটা দ্যাখার মতো! এমনি মোটা দাগের সেলাই, কিন্তু লাল-নীল ম্যাজেঞ্জি মার্কা সুতা ব্যবহারের ফলে পুরনো কাপড়েও ঢেউ চিকচিক করে। ভালো বাহারি সেলাইয়ের দিকে কামালউদ্দিনের টান একটু বেশি, কিন্তু ইসলামপুরের ছাতা ও খেলার সরঞ্জামের দোকানের বারান্দায় সিঙ্গার মেশিনে লুঙি, বালিশের অড় ও মশারি সেলাই করে তার জীবন কাটলো, মনের আশ মিটিয়ে সেলাই করার সময় পেলো কোথায়? কাঁথা সেলাইয়ের হাত আকবরের মায়ের একেবারে মন্দ ছিলো না, কিন্তু সেলাই-ফোঁড়াইয়ের দিকে তার ঝোঁক বরাবরই কম। কাঁথার ঢেউখেলানো কাজ দেখে মনে হয় এই কাজ তার মামাতো বোন কামরুন বিবির হতে পারে। তবে কি কামরুন বিবি এসেছিলো? নাঃ! বেঁচে থাকতে গায়ের ফর্সা রঙের দাপটে কামরুন্নেসা মাটিতে পা ফেলতো না। মারার পর সে আসবে বিমারি ফুফাতো ভায়ের খবর নিতে? মেয়েটি কিছুক্ষণের জন্য তার চোখে সরাসরি তাকিয়েছিলো। চোখের চরম বিরক্তি তার ভুরুজোড়ার মাঝখানে এমন কারুকাজ তৈরি করে যে হাতের শিশু-জড়ানো কাঁথার সেলাই থেকে তাকে আলাদা করা মুশকিল। তখন তাকে খুব চেনা চেনা ঠেকছিলো, কে? ফ্যাসফ্যাসে গলায় কামালউদ্দিন জিগ্যেস করে, 'ক্যাঠা?' গ্রাম্য চেহারার তরুণীর ভুরুর ভাঁজ ভেঙে যায়, সে ফের ঘোরতর অপরিচিত হয়ে পড়ে, তাকে চিনতে পারার যে আয়োজন প্রায় সম্পন্ন হয়ে এসেছিলো তা গিয়ে ঠেকে একেবারে তলানিতে। কামালউদ্দিনের হয়রান গলা ও জড়ানো স্বর তখন কাঠকাঠ, 'ক্যাঠায়? কথা কও না?' জবাবে 'পোলায় কান্দে দ্যাহো না? বুইড়া মরদটা খাতির জমাইয়া নিন্দ পাড়ো?' বলতে বলতে মেয়েটি পা ঝাপটায়। গোলাপি আলো তখন নিভে যায়, ঘরে ঘনঘোট অন্ধকার। মেয়েটি কি দরজা খুলে বেরিয়ে গেলো? দরজার বাইরে আবছা আলো, দরজা একটু ফাঁক-করা। ইস! এই পোলাপানগুলি মানুষ হইলো না! চোরে আইয়া ঘরের মাল-সামান ব্যাকটি গায়েব কইরা দিবো, তয় ভি এ্যাগো হুঁশ হইবো না?—জড়ানো জিহ্বায় সে নাতিকে ডাকে, 'আবুবতল, আবুবতল!' সাড়া না পেয়ে চুপ করে, দূর! ছ্যামরাটারে অহন ত্যক্ত করার দরকার কী? এখানে তার আর কতোদিন? এই বাড়িঘর মাল-সামান এসবে তার কী এসে যায়? তার এই বৈরাগ্য আকবরের মা কিন্তু বিশ্বাস করে না। মরার পরও আকবরের মায়ের রাগ একটুও কমে নাই। দ্যাখো না, আজ আকবরের মা এলো না, মনে হয় তার রাগ আরো বেড়ে গেছে। কিন্তু কামালউদ্দিনের কী দোষ? আকবরের মা যখুনি আসবে

তার কেবল ১ কথা, ১সওয়াল, 'যাইবা না? খালি দুইটা খাওন আর নিন্দের লাইগা তোমার এমুন লালচ ক্যালায়? বুইড়া জইফ মরদ একখান, হাগামোতা ভি ঠিকমতোন করবার পারো না, তয় কিয়ের টানে পইড়া থাকো, এ্যাঁ?'—কিন্তু কামালউদ্দিন কি ইচ্ছা করলেই বৌয়ের ডাকে সাড়া দিতে পারে?

মরার পর প্রথমদিকে এসে আকবরের মা জানলার বাইরের দিকে আঙুল দিয়ে ইশারা করতো, 'লও যাই।'

'কৈ?'

'ঐহানে!'

কিন্তু বাইরে চাপা গলি। রহিমুল্লা সর্দারের ছেলে পুরনো দালান ভেঙে নতুন করে বাড়ি করতে গিয়ে কামালউদ্দিনের না হোক আড়াই হাত জায়গা গায়েব করে দিয়েছে। কামালউদ্দিন উসখুস করে, 'ঐদিক যাইবার দিবো? সর্দারের পোলায় না কবজা করছে।'

'আরে ভালো কইরা চাইয়া দ্যাহো। কানা হইলা?'

ভালো করে দেখলেও রহিমুল্লা সর্দারের নতুন বাড়ির প্রসারিত বারান্দাই চোখের ভেতর দিয়ে মাথায় ঢুকতে চায়। আকবরের মা রাগ করে চলে যায়। পরদিন ফের আসে, 'যাইবা না?' এমনি করে কয়েকদিন দেখতে দেখতে আঙুল দিয়ে চোখ ঘষলে রহিমুল্লা সর্দারের বাড়ি মুছে গেলো। একদিন সেখানে ফুটে উঠলো ১টি কালচে খয়েরি রঙের গম্বুজ। দিন যায়। আকবরের মায়ের তর্জনীর মাথায় ২টি ৩টি করতে করতে গড়ে ওঠে মোহাম্মদপুরের সাতগম্বুজ মসজিদ। পেছনে মসজিদের গা ঘেঁষে নদী, আকবরের মা মনে হয় ৩টে গম্বুজ ও ৪টে মিনার টেনে তুললো পানির ভেতর থেকে। তাদের শরীরে পুরনো মাছের গায়ের মতো নানারকম শ্যাওলার দাগ। নদীতে কতো নৌকা, কিন্তু সেগুলো চলে কি-না সেদিকে কামালউদ্দিনের লক্ষ নাই; তাদের গায়ে সব বুক-চিতানো পাল, কামালউদ্দিন তাই দেখে মুগ্ধ। কী সুন্দর সেলাই! একটা কাপড়ের সঙ্গে আরেকটার জোড়া এমনভাবে মিলে গেছে যে মনে হয় প্রত্যেকটি পাল নানা রঙ দিয়ে আঁকা। আকবরের মায়ের তাগাদায় কিংবা ঐসব বাহারে পাল দ্যাখার তাগিদে বৌয়ের পেছনে পেছনে গিয়ে একদিন একটা নৌকায় কামালউদ্দিন তার সচল বাম পা তুলে দিয়েছিলো, অচল ডান পা তোলবার আগেই নৌকা চলতে শুরু করে, নৌকার গতিতে কামালউদ্দিনের রগে ও মাংসে টান পড়ে, সে ডাঙায় পড়ে যায়। রগে খিচ ধরলে তার গোটা বাম দিক ব্যথায় টনটন করে ওঠে, কামালউদ্দিন বেশ জোরে জোরে গোঙাতে শুরু করে। আবুবকরের ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো, তার 'নানা, অ নানা' ডাকে সাড়া না পেয়ে আবুবকর চিৎকার করে মাকে ডাকে। মাকে দেখেও আবুবকরের ভয় কাটে না, 'নানায় যানি কেমুন করে। নানার মনে লয় দম যায় গিয়া!' বাপের কপালে হাত দিয়ে খোদেজা নিজেও ভয় পায়, 'ইস, ঘাইমা এক্কেরে নাহাইয়া উঠছেন। আব্বা, কি খোয়াব দেখছেন?' খোলা দরজা দিয়ে একটু একটু

হাওয়া আসছিলো, কপালে ও মাথায় মেয়ের হাতের স্পর্শে কামালউদ্দিন ঘুমিয়ে পড়ে।

পরদিন দুপুরবেলা বাপকে ভাত খাওয়াবার সময় কথায় কথায় খোদেজা সব জেনে নেয়। স্ত্রীর দৈনিক যাতায়াতের খবরটি গোপন রাখাই ভালো। আকবরের মায়ের ডাকে সাড়া দিতে না পারায় এমনি সে কুঁকড়ে আছে, এইসব ফাঁস করে সকলের সামনে জড়সড় হওয়ার দরকারটা কী? তবে কি-না সেদিন কৈমাছের ঝোল ছিলো, আলু ঝিঙা দিয়ে মাখামাখা করে রাঁধা, এক চিমটি মাছে আঠালো জিভে স্বাদটিকে আরো চটচটে করে নেওয়ার লোভে সে বলে, 'তর মায়ে আইছিলো।'

'আম্মা?' মাছের ঝোল দিয়ে ভাত মাখানো স্থগিত রেখে এই দুপুরবেলাতেও খোদেজা এদিক ওদিক তাকায়, স্বর তার আপনাআপনি নেমে আসে, 'কী কয়?' মাছভাত, লালা ও পক্ষাঘাতে জড়ানো জিভে কামালউদ্দিন বলে, 'আমারে ডাক পাড়ে। সাতগম্বুজ মসজিদ দ্যাহাইয়া কয়, লও যাই গিয়া! খোজেদা, তর মায়ে ঐ মসজিদ চিনলো ক্যামনে?' এটা একটা সমস্যা বটে। কিন্তু খোদেজা বেশ ভয় পেয়েছে অন্য কারণে, 'আব্বা, খোয়াবের মইদ্যে মরা মানুষ ডাকলে পরে যাইবা না, কিছুতেই যাইবা না।'

এইসব শুনে কৈ মাছে কামালউদ্দিনের অরুচি ধরে ঃ কটা বছর যেতে না যেতে খোদেজার কাছে তার মা মরা-মানুষের বেশি আর কিছু নয়? মেয়েকে সে কী করে বোঝায় যে এসব কোনো স্বপন-খোয়াবের ব্যাপার নয়, আকবরের মা আজকাল প্রায় প্রতি রাত্রেই তার ঘরে আসে, নইলে তার ঘরে রোজ রোজ জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখে কে? অজু করার মাটির ঢেলা তো আপনাআপনি তার শিয়রের কাছে এসে হাজির হতে পারে না। শীতশীত করলে পাতলা কাঁথাটা তার গায়ে বিছিয়ে দেয় কে?—তা মেয়েকে এসব কথা কি বোঝানো যাবে? বাপকে তার এতো আদর, 'এটা খাও ওটা খাও', কিংবা 'না আব্বা এইটা তোমার খাওয়া হারাম, ডাক্তারের মানা আছে', কিংবা 'বালিশ ঠেকা দেই, তুমি উইঠা বসো'—কামালউদ্দিনের দুনিয়ার মেয়াদ বাড়াবার জন্য এইসব ষড়যন্ত্র সে কি মিছেমিছি করে? বাপ হয়ে কামালউদ্দিন মেয়েকে চেনে না?—বাপটি চোখ বুজলেই ভাই দুজন একাট্টা হয়ে এই বাড়ি থেকে তাকে নির্ঘাত উচ্ছেদ করবে। ৭ বছর হলো খোদেজার স্বামী নাই, ভাসুর দেওর জায়ের মুখ-ঝামটা সহ্য করতে না পেরে মায়ের কাছে এসে প্যানপ্যান করতো, অতিষ্ঠ হয়ে কামালউদ্দিন নিজেই গিয়ে পাকাপাকিভাবে মেয়েকে নিয়ে এসেছে। বাপ মরলে ভাইরা তাকে জায়গা দেবে? আমজাদ যদি বোনকে দ্যাখেও তো তার ম্যাট্রিকফেল বৌটা? অতো সোজা। এইসব লেখাপড়া-জানা মেয়েদের কামালউদ্দিন কি কম চেনে? খোদেজাই কি হাড়ে হাড়ে চিনতে পাচ্ছে না? তাই তো বাপকে দীর্ঘায়ু করার জন্য তার এতো যত্ন, এতো তদবির! নইলে আধখানা অচল শরীরের ভার ও বাকি আধখানা সচল

শরীরের যন্ত্রণা নিয়ে এবং বৌছেলেমেয়েনাতি—একেকজনকে চোখের সামনে পটপট করে মরে যেতে দেখেও বয়সের নিয়মকানুন অস্বীকার করে বেঁচে থাকাটা যে কতো মজার—বাপের জন্য একটু মায়ামোহাব্বত থাকলে মেয়ে সেটা ঠিকই বুঝতো। যাই কও, ছেলেমেয়ে বড়ো হলে কেউ কারো নয়। দ্যাখো, বড়ো ছেলের চেয়ে বড়ো ধন আর কী? সেই আকবরের ব্যবহারটা দ্যাখো না! সে-ই বুড়ো হতে চললো, যুদ্ধের সময়, সেই ব্রিটিশ আমলের যুদ্ধ, ব্রিটিশ জার্মানে বড়ো লড়াই, সেই সময় আকবর ১০/১২ বছরের পোলা, মানে এখন তার ৫৫/৬০ হবো হবো করছে, সে তো বাড়িতে উঁকি দিতেও আসে না। কামালউদ্দিনের পেশাটা নিলো সে-ই, তাকে নিয়ে কামালউদ্দিনের কতো আশা ছিলো,—বশিরউদ্দিন মাস্টার টেলারের সাক্ষাৎ সাগরেদ হাসান মিয়ার দোকানে ঢোকাতে কামালউদ্দিনকে কম ঝামেলা পোয়াতে হয় নাই। নিজে সারাজীবন কাজ করলো বশিরউদ্দিন মাস্টার টেলারের কাছাকাছি।—হলে কী হবে? ছাতা ও খেলার সরঞ্জামের দোকানের বারান্দায় মানুষের লুঙি আর বালিশের অড় আর মশারি সেলাইয়ের বেশি তাকে দিয়ে আর কিছুই হলো না। ছেলে সেখানে সরাসরি ঢুকলো অতো বড়ো দোকানে, তাও বশিরউদ্দিনের সাক্ষাৎ সাগরেদের কাছে কাজ শেখার সুযোগ পেয়ে। তা লাভ কী হলো? কপাল! কপাল! সেই ছেলে কি-না নিজের ওস্তাদের বৌয়ের পাল্লায় পড়ে নিজের বাপ-মা ছাড়লো। ২/৩ টা ছেলের মা সেই ধাড়ি মাগীটাকে বিয়ে করার পর বছরখানেক তার কোনো পাত্তাই ছিলো না, তারপর আবার এই বাড়িতে একটু ঘেঁষবার চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু তার মায়ের সাফ কথা, 'আইলে একলা আইবো! খানকি উনকি লইয়া ঘর নাপাক করবার দিমু না!' বড়ো কঠিন মেয়েমানুষ, নইলে আকবরের বিয়ে-করা বৌ, সে খানকি হবে কেন? আকবরও তো ঐ মায়েরই পোলা, বৌ সম্বন্ধে মায়ের বচন শুনে সেই যে ঘর ছাড়লো, আবার এলো মা যখন তার একেবারে মৃত্যুশয্যায়। আকবরের মা মরলো সপ্তাহখানেকের জ্বরে, কিন্তু ঐ ৭/৮ দিন জ্বরের ঘোরে তার মুখে আকবর ছাড়া আর কথা শোনা যায় নাই।—'আকবর, বাবা, ও আব্বা, দুধ খাইবি না?' 'ও আকবরের বাপ, দেইখা যাও, তোমার পোলায় তোমার টুপি পইরা কেমুন হাসতাছে!' 'আকবর, আব্বা, আমার সোনাটা, আয়, নাহাইয়া দেই ভাত খাইয়া খেলবি, অহন আয় বাবা!' 'হায় হায়! আকবরে আউজকা নারিন্দার মোচড়ে গেছিলো গিয়া, পোলায় কেমুন বিচ্ছু হইছে, কুনদিন গাড়ির নিচে পড়বো!' মায়ের এইসব বিলাপ শুনে আমজাদ গিয়ে আকবরকে কোত্থেকে ধরে নিয়ে আসে। তার মা অবশ্য আকবরকে চিনতেও পারে নাই, ছেলেকে দেখেও তার বিলাপ অব্যাহত ছিলো। শেষপর্যন্ত তার সবটা দখল করে ছিলো শৈশবকালের আকবর।— কামালউদ্দিনের মাথায় হঠাৎ করে একটি সুই বেঁধে, আজকাল এ একটা নতুন ব্যারাম ধরেছে, একটু তন্দ্রার মধ্যে গেলেই মনে হয় যে সেলাই করতে করতে একটু ঝিমুনি এসেছে আর মেশিনের সুই বিঁধে গেছে তার তর্জনীতে। এখনকার সুইটি অবশ্য বিঁধলো কপালের মাঝামাঝি।

একটি কথা মাথায় ফিনকি দিয়ে ওঠে: যে তরুণী আজ এসেছিলো তার কাঁথায় জড়ানো শিশুটির মুখ কি অনেকটা আকবরের মতো?—কী জানি? ৫৫/৬০ বছর আগেকার শিশুটির চেহারা মনে করা কি তার আধখানা মগজের কম্ম? আকবরের এখনকার চেহারাই মাঝে মাঝে ভুলে যায়। সে কি বাপকে দেখতে আসে যে মুখটা সবসময় মনে থাকবে? মায়ের মৃত্যুর পর বৌছেলেমেয়ে নিয়ে বেশ ঘন ঘন আসতে শুরু করেছিলো, একবার মনে হলো এই বাড়িতেই বসবাস করবে। একটু ভয়ও হতো, বাড়িতে এতো সব লোকের জায়গা হবে? এর মধ্যে আমজাদের সঙ্গে কি কথা কাটাকাটি হলো, না, দুই বৌ কী নিয়ে মন কষাকষি করলো, ব্যস, আবার সব যোগাযোগ বন্ধ। আকবরের ছোটো মেয়েটা, বৌয়ের আগের পক্ষের একটিকেও কামালউদ্দিন দ্যাখে নাই আল্লার কাছে হাজার শুকুর, আর আকবরের বড়ো মেয়েটা কোন বিহারির সঙ্গে পাকিস্তান চলে গেছে,—ঐ মায়েরই তো মেয়ে!—তো ছোটো মেয়েটা কামালউদ্দিনের আশেপাশেই ঘুরঘুর করতো। আকবরের মা মারা যাওয়ার পর ওরা যতোদিন এ বাড়িতে এসেছে ঐ মেয়েটা প্রায় সব সময় কামালউদ্দিনের ঘরেই থাকতো। কৈ সে-ও তো আসে না। ছুঁড়ির নাম যেন কী?—কী নাম? কী নাম?—নাঃ মনে নাই। মেয়েটা এলেই তো পারে। আকবর কি ওর ভালো একটা বিয়েও দিতে পারবে? আকবরের যে টানাটানি, খাওয়াও ঠিকমতো জোটে কি-না সন্দেহ। এতো বড়ো দোকানে কামালউদ্দিন ঢুকিয়ে দিলো, কেলেঙ্কারি করে সেই দোকান ছাড়লো। এরপর কতো দর্জির ঘরে ঘরে যে ঘুরলো, কোথাও ১ বছর, ২ বছরের বেশি টিকতে পারে না। কাজ কিন্তু ভালো জানে, হাজার হলেও বশিরউদ্দিন মাস্টারটেলারের সাগরেদের হাতে শেখা; মা মারা যাবার কিছুদিন পর কামালউদ্দিনকে একটা পাঞ্জাবি রিপু করে দিয়েছিলো, দেখে বোঝা যায় না কোনটা আসল জমি কোনটা রিপু। হলে কী হবে, কোনো দোকানের প্রতি দরদ নাই, মহাজনকে ইজ্জত করে না, কাজের বরকত হয় কী করে? বুড়ো হতে চললো, এখনো সন্ধ্যা হতে না হতে বাঙলা মদ টানার জন্য তার হাঁইফাই। এসব লোক সংসার করতে পারে? বড়ো ছেলেটাকে কোন ইলেকট্রিসিটির দোকানে দিয়েছিলো, হাতখরচটা পাবে, কাজও শেখা চলবে। দোকানের মালপত্র গাপ করে সে নাকি কোথায় কেটে পড়েছে, তার আর কোনো পাত্তা নাই। আসলে পুরুষ মানুষ বৌয়ের ভাউরা হলে সংসার ছারেখার যায়। এসব নিয়ে কামালউদ্দিন কথাবার্তা বলে কার সঙ্গে? আকবর আর তার বৌছেলেমেয়ের নতুন নতুন কীর্তির কথা রোজরোজ শুনতেও ভালো লাগে না। খোদেজা আগে দিনরাত এসব কাহিনীই বয়ান করতো, আজকাল আকবরের বৌয়ের গিবত করায় খ্যান্ত দিয়েছে। কামালউদ্দিন সবই বোঝে, গতর আধখানা বিকল হলে কী হয়, দুনিয়া বোঝার জন্য তার সচল আধখানা মগজই যথেষ্ট। আসলে আমজাদের রোজগারে থাকতে হয় তো, ছোটো ভায়ের বৌয়ের কাছে মাথাটা নিচু হতে হতে খোদেজার হাল এখন এমন যে বড়ো ভাবীর ওপর রাগটা দিনদিন নেতিয়ে যাচ্ছে।

তাছাড়া প্যাঁচাল পাড়ার মতো সময়ও খোদেজার এখন কম। তার বলে শতেক ঝামেলা।—তার আবুবকর এখন এই মহল্লার উঠতি মস্তান, তাকে সামলাতে হয়। তার মেয়েটা বড়ো হচ্ছে, মস্তানদের হাত থেকে তাকে সামলাবার জন্য খোদেজার চোখকান অষ্টপ্রহর খাড়া। তার যে ছেলেটি গতবারের আগের বার সংক্রান্তির দিন রহিমুল্লা সর্দারের বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে মরে গেলো তার শোক মাঝে মাঝে উথলে ওঠে, খোদেজা তাও সামলায়। কামালউদ্দিনের চোখজোড়া বুজে এসেছিলো এই সুযোগে কে যেন ওর আঙুলপোষ খুলে নিয়ে গেছে, ওর আঙুলে আর একটি সুই বেঁধে: একটু আগে আসা তরুণীর কাঁথা জড়ানো শিশুটির মুখে কি খোদেজার ঐ মৃত ছেলেটির আদল আসে? সবাই কিন্তু আকবরের সঙ্গে তার ভাগ্নের চেহারার খুব মিল দেখতো। আকবর ঐ ভাগ্নেকে ভালো করে দ্যাখেও নাই কোনোদিন। তার জন্মের অনেক আগেই ঐ ধাড়ি মাগীর পাল্লায় পড়ে সে ঘরছাড়া হয়েছে। ছ্যামরার স্বভাবটি ছিলো বড়োমামার মতো। ছেলেবেলায় আকবরও কি কম শয়তান ছিলো? মহল্লার সব পাকা বাড়ির ছাদই ছিলো তার ঘুড়ি ওড়াবার জায়গা। কি সংক্রান্তি, কি শনিবার, কি মহরম, কি বৃহস্পতিবার—সুযোগ পেলেই ঘুড়ি-লাটাই নিয়ে এর ছাদে ওর ছাদে উঠে পড়েছে। কামালউদ্দিন দিব্যি দেখতে পায়, হাসমত ওস্তাগরের ছেলে ছাদের ওপর তার দাপাদাপিতে অতিষ্ঠ হয়ে আকবরের কান ধরে টেনে এনেছে কামালউদ্দিনের কাছে। তা তার ছেলের কান ধরার অধিকার হাসমত ওস্তাগারের ছেলের ছিলো বৈকি! সে তো কামালউদ্দিনের ছেলেবেলার দোস্ত, কী নাম যেন?—আরে, ওরা একসঙ্গে মুনীর হোসেন লেন, শাহ সাহেব লেন, শরৎ গুপ্ত রোড ধরে গোল্লাছুট খেলে বেড়িয়েছে না? একসঙ্গে ঋষিপাড়া গিয়ে মুচিদের ছেলেদের নিয়ে মার্বেল খেলতো না? ইস! কামালউদ্দিন ছটফট করে, আরে নারিন্দায় বিবির মসজিদের মক্তবে মকবুল মুন্সির কাছে আমপারা সেপারা পড়তো একসঙ্গে। ইস! তার নামটা মনে করতে পাচ্ছে না! একসঙ্গে, একসঙ্গে আর কী, আর কী?—ইসমাইল সাহেবের বাড়ির ছাদে ওঠার সিঁড়িতে তার লুঙি খুলে ফেলেছিলো তো ঐ ছেলেই, তারপর সে কী জড়াজড়ি, কী তুমুল জড়িয়ে ধরা—তওবা তওবা, এসব তার কী মনে হচ্ছে? জীবনের প্রথম যৌন অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ায় কামালউদ্দিন বারবার তওবা পড়ে। এগুলো হলো ইবলিসের উস্কানি। এসব আসলে মেয়াদের ওপর দুনিয়ায় বসবাস করার শাস্তি। আকবরের মা কি আর সাধ করে বকে, 'অহন তরি দুনিয়ার লালচ তোমার গেলো না। দোজখের কীড়া, দোজখের লাহান ঘরের মইদ্যে থাকো, তয় কি গতরখান উঠাইবা না!' কিন্তু কামালউদ্দিন কী করতে পারে? আল্লার ইচ্ছার ওপর একটি ফোঁড় বসাবার ক্ষমতাও কি তার কি আছে? নিজের ইচ্ছামতো মরা কি তার মতো নালায়েক বান্দার নসিবে থাকে? সেসব পারে বড়ো বড়ো পির সায়েব, কামেল শাহসায়েবরা। তার বাপের যে পিরসায়েব ছিলো তার এরকম ইচ্ছামৃত্যু ঘটেছিলো। ছি! ছি! কার সঙ্গে কার তুলনা! কামালউদ্দিন ফের তওবা পড়ে,

এরকম তুলনা যেন ভুলেও কোনোদিন করে না। পিরসায়েবের মতো কামেল মানুষ দুনিয়ায় কজন আসে? বড়োপির সায়েবের সাক্ষাৎ বংশধর, বাগাদাদ না মক্কা না মদিনা শরিফ না আজমির শরিফ থেকে এসেছিলো। জীবনে হজই করেছে ২৫/২৬ বার। আহা কামালউদ্দিনের বাপের হজ করার নিয়ত ছিলো, পয়সার টানাটানিতে মীরপুর মাজারেই যাওয়া হয়ে উঠতো না, হজে যাবে কোত্থেকে। হাজী সাহেব দেখলেই বয়সের বাছবিচার না করে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে কদমবুসি করতো। শেষদিকে বাপজান পিরসায়েবের দরগাশরিফে আস্তানা গড়ে। হুজুরের খানকা শরীফ ছিলো কোথায়? কোথায় যেন?—কলতাবাজার? না-কি একরামপুর?—না-কি রোকনপুর?—কী জানি? মনে নাই। তবে হুজুরের মাজারের পাশে বাপজানের দিনরাত বসে থাকার নকশাটি তার চোখে বেশ স্পষ্ট। হুজুরের ওফাতের পর কামালউদ্দিনের বাপ ওখানেই পড়ে থাকতো। বাপজানের বড়ো খায়েশ ছিলো তার কবরটা যেন হুজুরের পায়ের কাছেই হয়। না, হয় নাই। তাই কি হয়? কতো বড়ো বড়ো খাদেম ছিলো তার।—নবাববাড়ির লোক ছিলো; ইসমলামপুরের ব্যবসায়ীদের চাঁদায় তার ওরস শুরু হলো। সেখানে কোথাকার কোন দর্জির গোর হবে এতো বড়ো কামেল দরবেশের কাছাকাছি? এখন কামালউদ্দিনের মনে হচ্ছে যে হুজুর বেঁচে থাকলে তার পায়ের কাছে বাপজানের ৩ হাত জায়গা ঠিকই জুটে যেতো। সে কি যে সে পির? তেমন মুরিদ হলে সে যতো গরিবই হোক তার জন্য প্রাণ ভরে দোয়া করেছে। নিজের ইচ্ছায় যে মউত বরণ করতে পারে সে কি মুরিদের ভক্তির খবর রাখে না? প্রতিবছর রমজানের চাঁদ দেখে মুরিদদের নিয়ে তারাবি পড়েছে সকলের সঙ্গে সেহ্‌রি খেয়ে ভোররাত্রির দিকে হুজুরপাক ঢুকে পড়তো কবরের সাইজে কাটা মাটির কুঠরিতে। ঢুকেই একেবারে সোজা সটান চিত। এরপর মুরিদরা সব এক এক করে কবরের ওপর মাটি রাখতো। কাঠের নল ছিলো একটা, হুজুর সঙ্গে করে এনেছিলো মদিনা শরিফ না মক্কা শরিফ না আজমির শরিফ থেকে, সেটা লাগানো থাকতো তার মুখের সঙ্গে, তার এক প্রান্ত মাটির ওপর। প্রত্যেকদিন মাগরেবের আজান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খাদেমরা ঐ নল দিয়ে পানি আর এক পেয়ালা দুধ ঢেলে দিতো। ওটাই তার এফতার, ওটাই তার সেহ্‌রি। পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত ফের তার একটানা উপবাস। মাসের শেষ শাবানের চাঁদ ওঠার পর কবর একটু একটু করে কাঁপতো, মানে হুজুর এখন ফের মুরিদদের মধ্যে তশরিফ আনবে। মাটি খুঁড়ে ওপরে তুললে বরাবরই দ্যাখা গেছে তার রোগা শরীর থেকে গোলাপি রোশনি বার হচ্ছে। এইভাবে বছর গড়ায়, মহল্লার লোকজনের কাছে ব্যাপারটি রমজানের চাঁদ শাবানের চাঁদের মতোই খুব স্বাভাবিক ও নিয়মিত হয়ে পড়ে। একবার নিচে যাবার আগে হুজুর সাদা কাপড়ে নিজেকে জড়িয়ে নিলো। সেদিন হুজুরের গায়ে আতরের গন্ধ। চোখে সুরমা। কাউকে কিছু বলে নাই। এরপর নলে করে রোজ এফতার করা—তাও অব্যাহত রইলো। ২৭শে রোজার দিনও দিবাগত রাত্রে এক পেয়ালা দুধ দিয়ে এফতার ও সেহ্‌রি খাওয়ানো

হলো। কিন্তু পরদিন কয়েকটি বুদবুদ তুলে মুরিদের দুধ ফিরে আসে। সবার জান ঘাবড়ে গিয়েছিলো, তাদের কি কোনো অপরাধ হলো? কতো বড়ো বড়ো মানুষ এসে দুধ ঢালে, এমন কি নবাবসাহেব নিজে এসে সোনার না চাঁদির পেয়ালায় বাদাম-পেস্তা মেশানো দুধ ঢাললো। না, সবই ফেরত আসে। দুরুদুরু বুকে সবাই অপেক্ষা করে। শাবানের চাঁদ দ্যাখা গেলে এবার কবর আর কাঁপলো না। ভয়ে মুরিদদের জান ঠাণ্ডা। নবাব বাহাদুরকে ফের তশরিফ নিতে হলো। কোদালের প্রথম কোপ ফেলা হলো তার হাত দিয়েই। পির হুজুরের সারা গায়ে কাফন জড়ানো, মেশক অম্বর আতরের গন্ধে ভুরভুর করে সারা মহল্লা। হুজুরের মুখ পশ্চিম দিকে ফেরানো, সবাই বুঝতে পারে মরণের এরাদা নিয়েই হুজুরপাক এবার কবরে নেমে ছিলো। তারা গুনাগার, নাদান আদমি, তার কার্যক্রমের মানে বুঝতে পারে নাই। তার লাশ আর তোলা হয় নাই। এবার সবার মনে পড়ে যে রোজার চাঁদ দেখেই হুজুর মুরিদদের দিয়ে ভালো করে গোসল করিয়ে নিয়েছিলো।—বাপজান এই গল্প করতো আর কাঁদতো। পিরসায়েবের এন্তেকালের পর বাপজান ঘরে আসতোই না, ৩ দিন ৪ দিন পর এসে ২/১ দিন থাকতো, এই ২/১ দিন তার মুখে কেবল পিরসায়েবের কাহিনী। তা যে যাই বলুক, পিরহুজুরের খেদমত করে তার বাবার ফায়দাটা কী হলো? মরার পর তার পাশে মাটিটাও তো জুটলো না। অথচ হুজুরের ক্ষমতা কি কম ছিলো? বাপজানের মুখেই শোনা, হুজুরের দোয়ায় এই ঢাকায় একবার বৃষ্টি পর্যন্ত হয়েছিলো। কবে? কতো সালে? কামালউদ্দিনের তখন জন্ম হয়েছিলো? না, সে বোধহয় বহু আগে। কিন্তু কামালউদ্দিন তো দৃশ্যটি প্রায় স্পষ্ট দেখতে পারে। মেঘ নাই, বৃষ্টি নাই, পানি নাই: নারিন্দা, টিকাটুলি, একরামপুর, রোকনপুর, কলতাবাজার, বাঙলাবাজার, তাঁতিবাজার, সদরঘাট, গ্যাণ্ডারিয়া থেকে শুরু করে ওদিকে ইমামগঞ্জ, সোয়ারিঘাট, চকবাজার, বেগমবাজার, মাহুতটুলি, মোগলটুলি—সব, সব—এতোগুলো মহল্লার নাম মনে করতে পারায় কামালউদ্দিন বেশ চাঙা হয়ে ওঠে, এতে হলো কি ঐ তেজে পির সায়েবের কামেলির দৃশ্য বেশ স্পষ্ট হয়।—খরায় সারাটা শহর জরজর, বস্তিগুলো সব বসন্তে উজাড় হতে লাগলো। কতো বড়ো বড়ো মওলানা কতো দোয়া পড়ে, খোলা রাস্তায়, মাঠে দুপুরবেলা এস্তেকার নামাজ যে কতো পড়া হলো তার আর লেখাজোখা নাই। কোনো ফল হয় না। শেষপর্যন্ত সবাই গিয়ে ধরে পিরহুজুরকে। তো তার এক কথা, এসব কেয়ামতের লক্ষণ, মানুষ আল্লার কথা ভুলে গুণাগারিতে লিপ্ত। তার কী করার আছে? কোন মুরিদ নবাব বাহাদুরের কাছে হুজুরের কথা বলে। নবাব বাহাদুর—নবাব সলিমুল্লা না আহসানউল্লা—কী জানি নাম তো মনে নাই, নবাব সিরাজদৌল্লা না তো?—না কি নবাব শায়েস্তা খাঁ—কী জানি নাম মনে করাটা এখন তুচ্ছ কাজ, নবাব বাহাদুর গিয়ে হুজুরের হুজরাখানায় ধরনা দেয়, 'হুজুর, তামাম শহরমে আগ জ্বল রাহা, বারিশ নেহি হোগা তো তামাম আদমি একদম মর যায়েগা' ১০/১২ দিন আগে পিরসায়েব মাটির তলার একমাসের

বসবাস থেকে উঠে এসেছে, তার শরীর তখনো রোগা: কামেল পির, তাই সম্মানী মানুষের কথা কি ফেলতে পারে? হুজুর এস্তেকার নামাজ পড়াতে রাজি হয়, শর্ত ছিলো এই যে মুসল্লিদের সবাইকে খালি পায়ে হেঁটে যেতে হবে পল্টনের মাঠ পর্যন্ত। সেই আগুন-ঝরা রোদে খোয়া-বিছানো ও পিচ-ঢালা পথে সবাইকে খালি পায়েই যেতে হয়েছিলো। নবাব সলিমুল্লা না আহসানউল্লা, না-কি সিরাজদ্দৌলা?—আহা, নবাববাড়ি থেকে পল্টন ময়দান পর্যন্ত তার খালি পায়ে হাঁটবার বর্ণনা যতোবার দেয় ততোবার কামালউদ্দিনের বাপের চোখ থেকে ঝরঝর করে পানি পড়ে, তখন মাতৃভাষা কুলাতো না, 'মিয়া, কেয়া বলে, নবাব বাহাদুরকা দোনো পাঁওমে এতনা বড়া বড়া ফোসকা গিরা থা।' তো ফলও হয়েছিলো। ২ রাকাত নামাজ শেষ হতে না হতে আকাশ জুড়ে মেঘ করে আসে। নামাজের পর মাটিতে লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে হুজুর যখন খোতবা পড়ছে তখন টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হয়। তারপর সবাই বাড়ি ফেরে ঝমঝম বর্ষণের ভেতর। সেই বহুকাল আগেকার বৃষ্টির ঝাপটায় কামালউদ্দিনের চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। কামালউদ্দিন কি সেই নামাজে সামিল হয়েছিলো? বাপজানকে জিগ্যেস করলে হতো। তার বাবা তো আসেই না! আকবরের মা এতোবার আসতে পারে, কৈ বাপজান তো আসে না! মৃত্যুর পরও কি বাপজান তার পিরসায়েবের কদমমোবারকের খোদমতই করে চলছে? বাবার ওপর একটু রাগ হয়, মরণের পর কি ছেলেকে দেখতে একবারও আসতে পারে না? পিরসায়েব কি এখনও তাকে কবজা করে রেখেছে?—না, বাপজানের আর দোষ কী? একদিন ঠিকই এসেছিলো, হ্যাঁ, তাকে নিতেই আসে, তো কামালউদ্দিন যেতে পারলো না। সেও তো অনেকদিন হতে চললো। সেদিন কামালউদ্দিনের এই অসুখের শুরু। তার ভাড়াটের সঙ্গে সেদিন তার একচোট ঝগড়া হয়েছিলো। ভাড়াটে লোকটা এমনিতে ভালোই ছিলো, দ্যাখা হলেই 'খালুজান খালুজান' করতো, 'খালুজান কেমন আছেন', 'ব্লাড প্রেসার দেখিয়েছিলেন? এখন ব্লাড প্রেসার কতো?'—কতো মিষ্টি মিষ্টি কথা, এদিকে ২ মাস ভাড়া বাকি।—মিনসিপ্যালটি তোমার দোকান উঠাইয়া দিছে তো আমি তার কী করুম? একটা খালি জায়গা পাইলেই তোমার দোকান বানাইবা, মিনসিপ্যালটি তোমাগো উচ্ছেদ করবো না তো জমি কবলা কইরা দিবো? ঐগুলি কোনো কথা না, আমার ভাড়া বুঝাইয়া দাও নাইলে তুমি ঘর দ্যাহো। তুমি উঠলেই আমি ভাড়া বাড়াইতে পারি।—তার গলা বড়ো চড়ে গিয়েছিলো, চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতেই তার মনে হয় যে মাথার ভেতরকার রগগুলো তার সিঙ্গার মেশিনের ববিনের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে, এই জট বোধহয় জিন্দেগিতে খোলা সম্ভব হবে না। নিশ্বাস তার ছোটো হয়ে আসে এবং দেখতে দেখতে বাতাস ঢোকার পথ বন্ধ হয়ে যায়। তারপর সব অন্ধকার। কেবল মনে আছে তার বাপজান একবার এসেছিলো, মাথায় হাত বুলিয়ে বলছিলো, 'আমার লগে চল। এহানে বহুত তকলিফ, চল যাই গিয়া' সে চলেই যেতো, কিন্তু ঐ সময় চুতমারানি ডাক্তার কী ইঞ্জেকশন দিয়ে তার চোখ খুলিয়ে

দেয়। চোখ মেলে কামালউদ্দিন দ্যাখে যে তার পাশে হাউমাউ করে কান্নাকাটি করছে আকবরের মা, পায়ের কাছে আমজাদের বৌ, আমজাদ, খোদেজা। এমন কি আকবরও এসেছিলো। সেই সময় বাপজানের সঙ্গে যেতে পারলে তার কি এই দশা ঘটে? বাপজান তার কামেল পিরের খেদমত করে জীবন কাটালো, সে ঠিকই বুঝতে পেরেছিলো বেঁচে থেকে ছেলে কেবল দোজখের আগুনে পুড়বে। বাপজান আর একবার আসে তো কামালউদ্দিন আর ভুল করবে না। তার আঙুল ধরে সোজা উঠে চলে যাবে। কিন্তু হাঁটতে পারবে তো? বাপজান এতোবড়ো কামেল পিরের সঙ্গে ছিলো, এখনো হয়তো আছে, ছেলের হাঁটার ব্যবস্থা করতে পারবে না?—কিন্তু কৈ, বাপজান তো আসে না! তাকে আর কী দোষ দেবে? কামালউদ্দিনের নিজের ছেলে সোবহান—সবচেয়ে ছোটো ছেলে, সে কি খোয়াবের মধ্যেও একবার এসে দ্যাখা দিতে পারে না? এই একটা ছেলেকে কামালউদ্দিন যত্ন করে লেখাপড়া করাতে চেয়েছিলো। মাথা ছিলো ভালো, পোগোজ স্কুল থেকে এক চান্সে ম্যাট্রিকপাস করে জগন্নাথে ভর্তি হয়, তার কলেজে পড়ার ব্যাপারে আমজাদের খুব উৎসাহ ছিলো। এদিক ওদিক ফ্যান বাল্ব সুইচ সাপ্লায়ের ব্যবসা তার তখন একটু জমে উঠেছে, কলেজে ভর্তি হওয়ার টাকা, বইপত্র কেনা। সব ব্যবস্থা করে আমজাদই। মিলিটারির জুলুম শুরু হলো যখন, এই মহল্লার আরো কয়েকটা ছেলের সঙ্গে সে বেরিয়ে গেলো। যুদ্ধের পর বন্দুক ফোটাতে ফোটাতে কতো ছেলে ঘরে ফিরলো, পথের দিকে দেখতে দেখতে কামালউদ্দিনের চোখ কানা হবার দশা, তার ব্লাড প্রেসারের শুরু বলতে গেলে তখন থেকেই, কিন্তু না, সোবহান আর ঘরে ফেরে নাই। মহল্লার কোন ছেলে নাকি বলেছে, কোথায় কোন গ্রামে মাথায় মিলিটারির গুলি লেগে সে মারা গেছে। কোথায়? মরলেও তো মানুষ স্বপ্নে খোয়াবে দ্যাখা দেয়, তার মায়ের স্বপ্নেও সোবহান নাকি প্রায়ই দ্যাখা দিতো, কৈ তার কাছে তো আসে নাই। একদিন, সেও অনেক দিন হয়ে গেলো, আকবরের মায়ের পেছনে ঝাঁকড়া চুলওয়ালা একটি মাথা দ্যাখা গিয়েছিলো, চুল থেকে তার অঝোরে পানি ঝরছিলো। পরে কামালউদ্দিন বুঝতে পারে যে আসলে তার স্বপ্নের কালো-সাদা ছবিতে চুল থেকে ঝরা তরল জিনিসটি ছিলো রক্ত। সোবহান ছাড়া আর কার মাথা থেকে রক্ত ঝরতে পারে? আকবরের মায়ের গলার ঝাঁঝ সেই রাতে খুব বেড়ে গিয়েছিলো, 'পোলাপান ব্যাকটিরে খেদাইয়া দিয়া তুমি খাতির জমাইয়া খাইতে চাও, না? তোমার শরম করে না?' সকালবেলা সোবহানের কথা মনে হলে তার চোখ দিয়ে বেশ অনেকক্ষণ ধরে পানি গড়িয়ে পড়ে। ২/৩ বছর আগেকার কথা, আবুবকর তখনো এতোটা লায়েক হয় নাই, নানার চোখের পানি মুছে দিতে দিতে সে তাকে ভোলাতে চায়, 'নানা, কান্দো ক্যান? খাড়াও আমি তোমারে কেক আইনা দেই, মাইজা মামু আজ পূর্বাণী থাইকা কী সুন্দর কেক লইয়া আইছে।' খোদেজার এই ছেলেটির এখন পর্যন্ত ১৫ পুরো হয় নাই। তবু তার জন্য পিচ্চিটাকে কী কষ্টটাই না করতে হয়। রাত্রে তার পাশেই শুয়ে ঘুমায়, ডাকলে

উঠে প্রস্রাব করার চোঙাওলা পাত্রটি লুঙির মধ্যে ধরে, থুথু ফেলতে গেলে কামালউদ্দিনের দাড়ি টাড়ি সব লেপ্টে যায়, সেগুলো মুছে দেয়। এমন কি রাত্রে পায়খানা করলে তার ছোচার কাজটিও করতে হয় এই পিচ্চিটাকেই। কামালউদ্দিনের জন্য প্রত্যেকের এতো কষ্ট! সবার কাছে আর কতোকাল তাকে ছোটো হয়ে থাকতে হবে? আকবরের মায়ের কাছে তাকে আর কতোকাল মাথা নিচু করে থাকতে হবে? কিন্তু হায়াত মউত কি তার নিজের হাতে? একি মার্কিন কাপড়ের বালিশের অড় যে সুইয়ের দুটো ফোঁড় দিয়ে সে একটা কিছু করে ফেলতে পারে?—এই আধখান গতর লইয়া তার কিয়ের খাওন, কিয়ের নিন্দ আর কিয়ের হাগামোতা?—সোবহানের রক্ত-ঝরা মাথা দ্যাখার পরদিন মগরেবের পর সে অনেকক্ষণ ধরে মোনাজাত করেছিলো, 'আল্লা তুমি আমারে দুনিয়ার মইদ্যে দোজখ দ্যাহাও ক্যালায়? আমি তোমার কী করছি? আমারে উঠাইয়া লও। আমারে তুমি যতো খুশি গোরআজাব করো, মগর এই দুনিয়ার দোজখ থাইকা আমারে নাজাত দাও।' কিন্তু আল্লার কেরামতি বোঝে কে? কেয়ামত পর্যন্ত কি তাকে বেঁচে থাকতে হবে? কামালউদ্দিন তার মরণের আশ্বাস পায় কেবল রুমার কাছে, নানার মৃত্যুর অনিবার্যতা সম্বন্ধে আস্থা আছে কেবল এই মেয়েটির মনেই। খোদেজার এই মেয়েটি তার ঘরে এলেই একবার বলবে, 'নানা তুমি মরলে এই ঘরে থাকুম আমি আর আপা। আমাগো ঘরে এমুন গরম!' এক মিনিটেই সে তার নাতনীর নাম ভুলে যায়, কী নাম যেন?—এর সঙ্গে নুরুন্নাহারের কোথায় যেন মিল আছে। নুরুন্নাহারটা ছিলো সোবহানের পিঠেপিঠি। ভাইবোনে মারামারি করে, জড়াজড়ি করে মানুষ হয়েছে, ওরা এখনো বোধহয় একসঙ্গেই থাকে। বড়ো হতে হতে নুরুন্নাহারের মুখটা একটু লম্বাটে হয়ে যায়, রঙ একটু চাপা হয়। এই মেয়েটিকে কামালউদ্দিন একটু সমীহই করতো। নুরুন্নাহার তার শেষের দিককার সন্তান; তার জন্ম দেশে তখন খুব দুর্ভিক্ষ। আকবরের মা বাচ্চা বিয়াবার আর টাইম পায় নাই! কামালউদ্দিনের তখন খুব টানাটানি। জগদীশবাবুর সুদের হার নিয়ে লোকে যতো নিন্দাই করুক, ঐ সময় টাকাটা না পেলে আকবরের মাকে বাঁচানো যায় কি-না সন্দেহ। আকবরের মায়ের গাহাতপা খিচে খিচে আসছিলো। হানিফের মা ভাবী রীতিমতো ঘাবড়ে যায়, 'আকবরের বাপ, রেনুবালা দাইরে তুমি খবর দাও, আমার কেমুন ডর করতাছে।' এই ভাবীর হাতে আকবর, খোদেজা, আমজাদ সবাই হলো, আর আজ এ কী মুসিবত? রেনুবালা দাই অবশ্য পয়সা তেমন নেয় নাই, তবে তার স্বামী জিতেন কম্পাউন্ডার হালায় ওষুদের দামে ব্যাকটি উঠাইয়া লইছে।—আচ্ছা, ঐ টাকাটা কি জগদীশবাবু দেয়? না-কি মুড়াপাড়ার বাবুদের গোমস্তা রামেশ্বরবাবু? এই নিয়ে কামালউদ্দিন খটকায় পড়ে। তবে এটা মনে আছে যে, জগদীশবাবু দিক আর রামেশ্বর বাবু দিক, সদ্যোজাত মেয়েকে দেখে সুদের কথা, এমন কি ছেলে না হয়ে মেয়ে হবার দুঃখ ঘুচে গিয়েছিলো। কী সুন্দর মেয়ে হয়েছিলো তার! কিন্তু এখন মেয়ের চেয়ে বেশি স্পষ্ট হানিফের মা ভাবীর শ্যামলা মুখ। বিধবা এই ভাবীর

স্বামী এদের খুব দূর সম্পর্কের ভাই। সে সম্পর্ক ধরলেও কিছু এসে যায় না। কিন্তু মহল্লার যে কারো উৎসবে, বালা মুসিবতে হানিফের মা ভাবী ঠিক পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। নুরুন্নাহারের জন্মের রাত্রিটা কামালউদ্দিনের বড়ো বিপদে কাটে। ঘরের বারান্দায় একা একা ছটফট করছিলো, ভাবী বারবার এসে সান্ত্বনা দিয়ে গেছে। একবার ভাবী এসে বসেছিলো তার পাশেই একই বেঞ্চের এমাথা ওমাথা। পান সাজিয়ে সামনে ধরেছিলো 'ছোটোমিয়া, পান খাও, তাইলে জাগনা থাকবার পারবা। এই কিমামটা লও, লালবাগের কিমাম, মুখে দিয়া দ্যাহো, পান কেমুন মাখনের লাহান মিলাইয়া যাইবো।' হানিফের মা ভাবী এরকম নরম করে কথা বলতো, আর কারো কাছে সে এরকম কথা শোনে নাই। হানিফের মা না থাকলে সেই রাত্রিতে সে যে কী করতো! মনে আছে, একবার এসে বলেছিলো, 'এই হইয়া আইলো! রেনুবালা দাই ঠিক কইরা দিছে। আহারে তোমার চক্ষু দুইখান এক্কেরে মুইঞ্জা আহে যাও না, ঘরের মইদ্যে গিয়া নিন্দ পাড়ো, আমি তো আছিই।' সেই সময় একবার, না খুব অল্পক্ষণের জন্য তার মনে হয় আকবরের মা মারা গেলে এই হানিফের মা ভাবীকে নিয়ে সে ফের নতুন করে ঘর বাঁধতে পারে। না, না, ঠিক এরকম ভাবে নাই। তাই কি হয়, হওয়া উচিত? তবে সেই রাত্রির পর ভাবীকে দেখলে তার মাথার ভেতরকার সাজগোজ ঠিক থাকতো না, সব সিজিল ভেঙে যেতো। বেচারা ভয়ে ভয়ে থাকতো, ভাবীর সামনে পড়ে গেলে অতিরিক্ত আদব দ্যাখতো, হাজার হলেও বড় ভাইয়ের বিবি, মুরুব্বি মানুষ। একটু বড়ো হয়ে হানিফ তেজগাঁয়ে কোন কারখানায় কী কাজ নিয়ে ওদিকেই চলে গেলো, কিছুদিন পর মাকেও নিয়ে যায়। এরপর আর যোগাযোগ নাই। হানিফের মা ভাবীর সঙ্গে তার শেষ দ্যাখা কবে? কবে যেন?—নুরুন্নাহারের সঙ্গে হানিফের বিয়ে দিলে যোগাযোগটা থাকতো। এই মেয়েটিকে হানিফের মা ভাবী বড়ো পছন্দ করতো, 'পয়দা হওনের টাইমে ছেমরি তুই বহুত জ্বালাইছস। তরে আমি বৌ বানাইয়া খাটাইয়া লমু।' নুরুন্নাহারকে ভাবী ঠাট্টা করে বৌ বলেই ডাকতো। হানিফের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা কিন্তু কামালউদ্দিনের একটু একটু ছিলো। ছিলো কি? মনে হয় ছিলো। এ নিয়ে সে বেশ ধান্দায় পড়ে। হানিফের মুখে ওর মায়ের চেহারা বেশ স্পষ্ট। ছেলেটার সঙ্গে কথা বলতে কামালউদ্দিনের বড়ো ভালো লাগতো। দামাদ করতে পারলে বেশ হতো, না? নুরুন্নাহারের বিয়ের কথাবার্তা যখন চলছে, হানিফের কথা তার বারবার মনে হয়েছে। কিন্তু একবারও আকবরের মায়ের সামনে মুখ ফুটে বলতে পারলো না। কেন যে পারলো না সে সম্বন্ধেও কামালউদ্দিনের ভাবনা পরিষ্কার নয়। ইস, এই বিয়েটা দিতে পারলে মেয়েটা এভাবে মরে? কী সুন্দর মেয়ে তার, যেমন দেখতে, তেমনি পয়মন্ত। দুর্ভিক্ষের সময় জন্ম, অথচ তার জন্মের পরপরই কামালউদ্দিনের কপাল গেলো খুলে। ন্যাশনাল হাসপাতালে বালিশের বড় সাপ্লায়ের অর্ডার পায় জগদীশবাবু, এর আট আনি মাল কামালউদ্দিনের হাতের। বাড়ির লাগোয়া ৩ কাঠা জমি বেচে বাপের তৈরি অসম্পূর্ণ

ভিতের ওপর পাকা বাড়ি তৈরি করলো, তার দোতলার ভাড়া আসছে বলেই আমজাদের বৌ এখন পর্যন্ত একটু চুপচাপ থাকে। তো মেয়ের চেহারার মতো মেজাজটাও ছিলো বড়োলোকি। আকবরের মা থেকে শুরু করে আকবর বলো, আমজাদ বলো, খোদেজা বলো—এদের সকলের কাপড়চোপড় সেলাই করেছে কামালউদ্দিন নিজে। কিন্তু বাপের কাটা কাপড় নুরুন্নাহারের পছন্দ হয় নাই। 'আব্বায় খালি বাদামতলী আর সোয়ারি ঘাটের ব্যাপারিগো লুঙি সেলাই করে, আমার ব্লাউজ কাটছে মনে লয় বালিশের খোল বানাইয়া রাখছে।' নুরুন্নাহারের জন্য কাপড় বানাতে হতো বড়ো দোকান থেকে, খরচটা বেশি পড়তো, কিন্তু তা কামালউদ্দিনের গায়ে লাগে নাই। মেয়েটা তাকে বড়ো মায়া করতো। ইসলামপুরের সেই দোকানে মেশিন টেশিন গুছিয়ে রেখে বাড়ি ফিরতে তার যতো রাত হোক, কামালউদ্দিন বাড়ি ফিরে দেখেছে নুরুন্নাহার তার ভাত আগলে বসে রয়েছে। আকবরের মা রাত জাগতে পারতো না, সন্ধ্যার পরপরই বিছানায় না গেলে তার চলে না। কামালউদ্দিন ঘরে ফিরলে একেকটি ঝাঁঝালো কথা, যেমন, 'বাদামতলীর ব্যাকটি ব্যাপারি আর কুলিগো লুঙি সিলাইয়া আইলেন? রাইত হইছে কতো, সেই হিসাব রাখেন?' বলতে বলতে তাওয়ার ওপর হাঁড়ি রেখে নুরুন্নাহার ভাত গরম করেছে। না, বাপকে নুরুন্নাহার কোনোদিন ঠাণ্ডা ভাত খেতে দেয় নাই। সেই মেয়ে—কামালউদ্দিন পঙ্গু গলায় ঢোঁক গেলে, ঐ ঢোঁক বেঁধে সুইয়ের মতো—সেই মেয়ে কি-না দম বন্ধ হয়ে মরে রক্তের মধ্যে। সবই কপাল। চেহারা সুরত দেখে নবাবপুরের এক হার্ডওয়ারের দোকানের কর্মচারীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলো, তার স্বভাব যে এরকম কে জানতো? বিয়ের আগে জগদীশবাবু একটু সাবধান করে দিয়েছিলো, 'ছ্যামরা শুনি প্রত্যেক দিন লায়ন সিনেমা না গেলে ভাত হজম করবার পারে না। একটু খবর লইস তো!' তা নুরুন্নাহারের জন্য একটু সৌখিন ছেলেই ভালো। সবসময় ফর্সা লুঙি জামা পরা ছেলেটির কথাবার্তাও কামালউদ্দিনের খুব পছন্দ হয়েছিলো। কপাল! কপালে না থাকলে মানুষ কী করতে পারে?

বিয়ের পর আস্তে আস্তে শোনা গেলো যে লায়ন সিনেমাই শেষ নয়। সিনেমার চেয়েও বড়ো আকর্ষণ তার কুমারটুলির খানকিপট্টি। নুরুন্নাহার বাপমাকে কোনোদিন কিছু বলে নাই। তবে বলবার লোকের কি অভাব হয়? মেয়ে তার নিজের কষ্টে নিজেই পুড়লো, কথার ঝাঁঝ পর্যন্ত তার একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছিলো। আজ এতোদিন পর কামালউদ্দিনের সচল ও অচল কানদুটো খাঁ খাঁ করে, সেখানে নুরুন্নাহারের ঝাপটা-মারা কথা পড়ে না কতোকাল! ৭ কি ৮ মাসের অন্তঃসত্ত্বা, তখন তার গর্ভপাত ঘটে, টাকের হাট লেনের অন্ধকার ঘরে মেয়ে তার একা একা মরে গেলো, দামাদ হালা তখন কোথায় কোন খানকি মাগীর সঙ্গে রঙ করছে কে জানে? কার মুখে খবর পেয়ে আকবরের মাকে নিয়ে কামালউদ্দিন যখন সেখানে পৌছলো তখন সব শেষ। কুমারটুলির মস্তান আসে তাদের অনেক পরে।

খানকির বাচ্চার হাউমাউ কান্না কামালউদ্দিনের অসহ্য ঠেকে, তার ইচ্ছা করছিলো চুতমারানির পাছায় লাথি দিয়ে কুমারটুলি পাঠিয়ে দেয়। ছোকরা কিন্তু পরে আর বিয়েশাদি করে নাই। কেন করলো না সে-ই জানে। একদিন তন্দ্রার ভেতর কামালউদ্দিন দ্যাখে কি ঐ ছোকরা দাঁড়িয়ে সিগ্রেট ফুঁকছে। পাশে একটি মেয়ে। দেখে তার মেজাজ চড়ে যায়, বেয়াদব ছ্যামরা, শ্বশুরবাড়ি আহে খানকি লইয়া! কিন্তু এখন মনে হচ্ছে মেয়েটি যেন তাকে কষে ধমক দিয়েছিলো, 'গতরের উপরে একখানা তাম্বু খাটাইয়া ভ্যাটকাইয়া পইড়া থাকো, শরম করে না? আম্মায় ডাক পাড়ে, কানের মইদ্যে লুঙি দিয়া রাখো?' মেয়েটি কি নুরুন্নাহারই ছিলো?—মৃত্যুর পরও কি ভ্যাদাইমা ছ্যামরার কবজা থাইকা মাইয়া বারাইবার পারে নাই?—না কি সে তার কবজায় থেকেই সুখ পায়? সে কি সত্যি নুরুন্নাহার? ঐ মেয়ে ছাড়া তার সেলাই-করা পাঞ্জাবির সঙ্গে তাঁবুর তুলনা করতে পারে আর কে?—তার মাথার ভেতর কে যেন একটি সুই বিঁধে দিলে কামালউদ্দিন হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, 'মা রে, আমি কী করুম? আল্লায় আমারে উঠাইয়া না লইলে আমি কী করবার পারি?' প্রচণ্ডরকম একটি কাশির দমক আসে, কাশতে কাশতে দম বন্ধ হবার দশা হলে বাম হাত দিয়ে নিজের মাথা চেপে ধরে। বুকের কষ্টটা দমাবে কোন হাত দিয়ে? সেখানে চিনচিন করে, আহারে, আল্লারে, এই দমটাই আমার শেষ দম কইরা দাও। কিন্তু প্রায় একসঙ্গে লুঙির ভেতর একটি গরম কেঁচোর তরল গতি টের পায়, দেখতে দেখতে ভিজে লুঙি ঠাণ্ডা হলে কামালউদ্দিন বড়ো বিচলিত হয়। ঠাণ্ডা প্রবাহটি নেতিয়ে-পড়া নুনু ও উরু গড়িয়ে পাছায় ছড়িয়ে পড়লে তার ভয় হয়, পেচ্ছাবের সঙ্গে পায়খানা হলো না তো? তার সারা গায়ের সচল এমন কি অচল ভাগটিও ঘিনঘিন করে। পবিত্র হবার জন্য কামালউদ্দিন তখন শিয়রের কাছে মাটির ঢেলা হাতড়ায়। সেটা হাতে ঠেকলে কামালউদ্দিন টের পায় যে আকবরের মা তবে ঠিকই এসেছিলো। কিন্তু কৈ, তাকে তো দ্যাখা দিলো না! তবে কি সেই তরুণীটিই? তাহলে তার কোলের শিশুটি কে?—এই ঝামেলার সমাধান না হতেই আজান শোনা গেলো। আল্লার নাম তার কানে ঠিক মধু ঢেলে দেয় না, বরং পেচ্ছাব অথবা পেচ্ছাব-পায়খানায় মাখামাখি গতর আরো ঘিনঘিন করে। এখন দরকার আবুবকরকে। প্রথমে তার গলা একটু মিনমিনে শোনায়, এর কারণ এই হতে পারে যে বেঁচে থাকার জন্য এবং বেঁচে থেকে লুঙিতে হাগামোতা করার জন্য দোষী দোষী ভাবটা তার বেড়ে গিয়েছিলো। কিন্তু এইসময় তার গোটা মাথা ও শরীরে খোদেজার হামলানো কান্না আছড়ে পড়লো। তখন ফের নতুন করে চোখে পড়ে যে দরজাটা খোলা, পাশের তক্তপোশের মশারি ভোরবেলার হাওয়ায় একটু একটু কাঁপে। ঐ বিছানা শূন্য! কামালউদ্দিন আঁতকে উঠলো, তবে কি আবুবকর মারা গেলো? তাহলে এখন তার গুমুত ধোবে কে? এই উদ্বেগ তার চিরে যায় খোদেজার আর এক চিৎকারে। এবার সে একবারে নেতিয়ে পড়ে ঃ আল্লা তুমি আমারে দোজখের মইদ্যে আর কতোদিন রাখবা? খোদেজারে অহন আমি মুখ দ্যাহাই ক্যামনে?

'নানা, জাগনা পাইছেন?' ঘরে আবুবকর ঢুকলে কামালউদ্দিন তার ওপর ভয়ানক বিরক্ত হয়। ভোর হতে না হতে ছ্যামরা কোথায় মরতে গিয়ে ছিলো? কিন্তু কামালউদ্দিন তার অভিযোগ যা প্রকাশ করে তা অন্যরকম, 'আজানের আগেই আমি জাগনা পাই না?' আবুবকর হঠাৎ করে বলে, বড়োমামুর খবর ভালো না।'

'এ্যাঁ? কী কইলি?'

দারুণরকম চমকে ওঠায় তার উচ্চারণ খুব স্পষ্ট। এমন কি তার মাথার অচল দিকটাও কতোকাল আগে বয়ে যাওয়া হাওয়ায় একটু কাঁপলো। আবুবকর ফোঁপাতে আরম্ভ করে 'বড়োমামু বেহুঁশ হইয়া রইছে। রাইতে হাসপাতালে গেছিলাম, মাইজা মামু অহন তরি হাসপাতালে বইসা রইছে।'

কামালউদ্দিন কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক তাকায়। সে যেন আগেই এই খবর পেয়ে গেছে, কিংবা এই নিয়ে সে অনেকক্ষণ ধরে কারো কাছে মেলা তদবির করে ফিরলো। তাই 'আল্লা! আল্লা গো!' বলে চ্যাঁচালে তার গলায় শোকের বদলে ফোটে অভিযোগ। এখন সব কিছু তার কাছে স্পষ্ট ঃ ৫৫/৬০ বছর আগে ফিরে গিয়ে আকবরের মা আজ রাত্রে এসেছিলো, কোলে ছিলো তার ৮/৯ মাস বয়সের আকবর। প্রথম সন্তানকে সে কাঁথায় জড়িয়ে নিয়ে চলে গেলো, কামালউদ্দিন কোনো বাধাই দিতে পারলো না।

কামালউদ্দিনের জিভের সচল সাইডের 'আল্লা গো' শুনে এই ঘরে ছুটে এসেছে খোদেজা। 'আব্বারে কইছস?' কাঁদতে কাঁদতে ছেলেকে সে ধমকাবার চেষ্টা করে, কিন্তু এই উদ্যোগ নিতে গিয়ে তার নিজের কান্না আরো উথলে ওঠে। ঐ অবস্থাতেই খোদেজা আকবরের শারীরিক অবস্থার একটি দীর্ঘ বিবরণ ছাড়ে।

রাত্রি দেড়টার দিকে ঘরে ফিরে আকবর অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। ঘণ্টাখানেক পর আকবরের ছোটো ছেলে এই বাড়িতে এসে খবর দিলে আমজাদ ও আবুবকর চলে যায় মালীবাগ চৌধুরীপাড়া। আকবর তখনো বেহুঁশ। অতো রাতে কোথায় এ্যাম্বুলেন্স, কোথায় কী? ফজরের আজানের আগে আগে একটা স্কুটার পাওয়া যায়। মেডিক্যাল কলেজে কোনো ভরসা দিতে পারে নাই।—কামালউদ্দিনের কাছে এসব কথা বলা অর্থহীন। রাত দেড়টায় আকবর যদি বেহুঁশ হয়ে থাকে তো তার বাঁচার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, আকবরের মা ঐ সময়েই শিশু কোলে তার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

বেলা ১২টার দিকে তাকে বারান্দায় বসিয়ে দিলে ৫৫/৬০ বছরের ছেলের মৃতদেহের মুখে রায়ের বাজারের মাটির হাঁড়িপাতিল বানানো কুমারের মতো করে হাত ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে কামালউদ্দিন সেখানে ৮ মাসের একটি শিশুর আদল নিয়ে আসে। তার সচল আধখানা জিভ ও ঠোঁটের একপাশ থেকে কীসব আওয়াজ বেরোয় কেউ বোঝে না, বোঝবার চেষ্টাও করে না। তাতে কামালউদ্দিনের কী এসে যায়? সে জানে আকবরের মা আশেপাশেই ঘুরঘুর করছে, এবার আকবরকেও হাত করে ফেললো। আকবরের মা কি এক এক করে সবাইকে টেনে নিয়ে যাবে?

হাসপাতাল থেকে লাশ নিয়ে আসা, লাশ গোসল করানো থেকে শুরু করে দাফন করা পর্যন্ত যাবতীয় কাজে নানাভাবে জড়িত থেকে এবং এরই মধ্যে কখনো একা কখনো কোরোসে, কখনো ভেউ ভেউ করে ও কখনো উঁ উঁ করে কেঁদে ক্লান্ত আবুবকর রাত্রে বেঘোরে ঘুমোয়। আকবরের ১৩ বছরের ছেলেটিও আজ তার পাশে। ছেলেটির বোধহয় সর্দি, কিংবা সারাদিন কান্নাকাটির ফলেও হতে পারে,—চাপা নিশ্বাসের সঙ্গে নাক দিয়ে তার কোঁকোঁ আওয়াজ আসছে। ভেতরের একটি ঘর থেকে খোদেজার সবিরাম কান্না মাঝে মাঝে পাড়া তোলপাড় করে তোলে। বারান্দার জলচৌকিতে জোড়াহাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে আকবরের বৌ, খোদেজা ও আমজাদের বৌ হাজার চেষ্টা করেও তাকে ঘরে নিয়ে শোয়াতে পারে নাই। বৌটা বড়ো জেদি, এখন এতো জেদ কি ভালো? তো এ নিয়ে কামালউদ্দিনের মাথা ঘামাবার দরকারটা কী? তার ঘুম আসে না। ভয়ে ভয়ে সে আকবরের মায়ের জন্য অপেক্ষা করে। আজ তাকে সে মুখ দ্যাখাবে কী করে? আকবরের মা আজ একা আসবে না। আকবর তো এখানেই আছে। এই যে বারান্দার ঠিক নিচে চাদর দিয়ে আড়া করে নিয়ে যেখানে আজ তাকে গোসল করানো হলো ঐ জায়গা তার ৪০ দিনের ঠিকানা। মাকে দেখলেই ৫৫/৬০ বছর উজিয়ে ৮ মাসের শিশু হয়ে সে দিব্যি হাজির হবে। তারপর নুরুন্নাহার। রক্তাক্ত মাথায় দাঁড়িয়ে থাকবে সোবহান। খোদেজার ছাদ-থেকে-পড়ে-মরা ছেলেটা, এখন নাম মনে পড়লো, ফিরোজ, হ্যাঁ, ফিরোজই তো, সে-ও আসবে তার ব্যান্ডেজ-বাঁধা পা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। এই ঘরে এতোসব লোকের জায়গা হবে? না, তারা কোনো জায়গা নেয় না। তাদের গতরে কি সের সের রক্ত-মাংস থিকথিক করে যে তারা এলে ঘর-দোর সব গিজগিজ করবে? জায়গা লাগে কামালউদ্দিনের। আর কতোকাল সে দখল করে থাকবে? সচল বাম হাত ও অচল ডান হাত বুকে রেখে কামালউদ্দিন শুয়ে শুয়েই রাকাতের পর রাকাত নামাজ পড়ে, নামাজের নিয়ম পালনের জন্য এখন সে পরোয়া করছে না, তার মোনাজাতও এসে ঠেকছে কেবল একটিতে,—আল্লা তাকে এক্ষুনি দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিক, আগামীকাল ফজর যেন দেখতে না হয়। যদি সে নেকদার বান্দা হয় তো আল্লা তার কথায় সাড়া দেবে না কেন? সুরা, দোয়া তার এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, ব্যাকুলভাবে সে অনুসন্ধান চালাচ্ছে, কবে, কীভাবে সে কী গুনা করলো যে আল্লা তাকে এভাবে দোজখ খাটায়। কবে সে কী অপরাধ করলো? আচ্ছা, ঐ ব্যাপারটিকে কি আল্লা গুনা বলে সনাক্ত করবে? ঐ যে বহুদিন আগে রায়সাহেবের বাজারে এক জেলের কাছ থেকে গলদা চিংড়ি নিয়ে দাম না দিয়ে চলে এসেছিলো, তারপর একবছর ওদিকে পা মাড়ায় নাই। কিন্তু আল্লা জানে তার দোষ নাই। ঐ সময় তার শাশুড়ি বেড়াতে এসেছিলো, আকবরের মা তাকে গলদা চিংড়ি খাওয়াবার জন্য একেবারে পাগলা হয়ে উঠলো। রোজ রোজ গলদা চিংড়ি গলদা চিংড়ি করে তার জানটা নাস্তানাবুদ করে ফেলে। তখন অতো দাম দিয়ে মাছ কেনার সামর্থ কোথায়? আল্লা কি এটুকু

বুঝবে না? তবে জগদীশবাবুর বাজারের ঝুড়ি থেকে কয়েকদিন মাছটা তরকারিটা সরিয়েছে, এটাই কি তার অপরাধ? রায়টের সময় জগদীশবাবুর বাজারটা করে দিতো কামালউদ্দিন। জগদীশবাবু দাঁড়িয়ে থাকতো লোহার পুলের ঠিক ওপারে. কামালউদ্দিনের হাতে ঝুড়ি দিয়ে বলতো, 'মাছটা দেইখা কিনিস। মাছ নরম হইলে ধীরেনের মায়ে চেতবো।' তা কামালউদ্দিন নিজের ঝুড়িতে মাছ কিছুটা সরাতো বৈকি! জগদীশবাবু কোনোদিন কিছু বলে নাই, কিন্তু তার শালাটা, ভ্যাদাইমা ছ্যামরাটা, রায়টের পর এই নিয়ে হাউকাউ করতো, 'কী বে কামাইল্যা. আষ্ট আনার পাবদা মাছ হইলো ঐ কয়টা? মানুষের বিপদের সুযোগ লস, না?'—তা তুমি মালাউন, তুমি হইলা কী কও তোমরা. ধোয়া তুলাসি পাতাটা? ঐ যে তাঁতিবাজারের বরজের দাস, বছর বছর রায়টের টাইমে একটা দুইটা মোসলমান না মারলে যার বলে প্যাটের ভাত হজম হয় না. তার লগে তোমার কিয়ের এতো গুজুরগাজুর, কিয়ের ফুসুরফাসুর?—কিন্তু এসব কথা বলা কামালউদ্দিনের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। জগদীশবাবুর ওপর তাকে অনেক নির্ভর করতে হতো, টাকা হাওলাত দিয়ে চড়া সুদ নিলে কী হবে. তার হাত দিয়ে কাজও এসেছে মেলা। আল্লা জানে, তার হাতে জগদীশবাবুর কোনো লোকসান হয় নাই। পার্টিশনের পর তাদের বাড়ির বড়ো বড়ো সব ট্রাঙ্ক, তামার কাঁসার বড়ো বড়ো বাসনকোসন, দুটো পালঙ. চেয়ার টেবিল—সব বেচে দিয়েছিলো এই কামালউদ্দিনই। জগদীশবাবুর মতো লোক কি-না খুশি হয়ে তার সুদের ২৪টা টাকা মাফ করে দিয়েছিলো, সে কি এমনি এমনি?—তাহলে আল্লা তাকে শাস্তি দেয় কেন? তাহলে কি হানিফের মা ভাবী—? না না এটা ঠিক নয়। তাড়াতাড়ি করে কামালউদ্দিন অন্য কোনো পাপের খোঁজ করে। সোবহানের দুজন বন্ধুর কথা মনে পড়লে সে একটু হাঁফ ছাড়ে। তাদের রুহ কি আল্লার কাছে তার বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করলো? মিলিটারির সঙ্গে যুদ্ধের সময় এক কারফ্যু-রাতে টিকাটুলির ইলেকট্রিক টেরান্সফর্মার না কী বলে, তাই উড়িয়ে দিয়ে সোবহানের দুই বন্ধু তার ঘরে আশ্রয় নেয়। সোবহানের সঙ্গে পড়ে, এদিকেই কোথায় বাড়ি। খুব বিপদের কাজ সেরে তাদেরই একজন সহযোদ্ধার বাপের কাছে আশ্রয় চাইবে না তো কোথায় যাবে? কিন্তু আমজাদের কথা শুনে কামালউদ্দিন তাদের বেশিক্ষণ ঘরে রাখতে পারে নাই। হাত জোড় করে বলেছিলো, 'বাবারা. আমার পোলায় তোমাগো লগে গেছে, মহল্লার ব্যাকটি মানুষ সন্দ করে। কেউ বুঝবার পারলে তোমাগো বিপদ, আমাগো ভি জেতা রাখবো না।' কারফ্যুর রাতে ছেলে দুটো বেরিয়ে গেলো. তাদের আর খবর পাওয়া যায় নাই। হয়তো শহর ছেড়ে ওরা ঠিকই বেরিয়ে গিয়েছিলো। হয়তো আর কেউ জায়গা দিয়েছিলো। কিংবা পাঞ্জাবিদের হাতে ধরা পড়ে গেছে। তাহলে তো বাঁচার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু তার কী দোষ? আমজাদ যেভাবে ভয় দেখিয়েছিলো, তাতে তার মতো মানুষ কী করে তাদের ঘরে রাখে? আর দোষ যদি হয়েও থাকে. তো যুদ্ধ করতে করতে মরে গিয়ে সোবহান কি বাপের গুনা

মাফ করিয়ে নেয় নাই? তাহলে? চিত হয়ে শুয়ে অন্ধকারে কামালউদ্দিন তার গুনা খুঁজে মরে। মশারির ওপার হালকা ঘি রঙের পাখার ব্লেড অন্ধকারে আলগোছে ঝোলে। এই পাখা নেওয়া কি পাপ হয়েছে? স্বাধীনতার পর মহল্লার দিল্লিওয়ালা জুতার দোকানদারের বাড়ি লুট হলে আমজাদ দুটো ফ্যান নিয়ে এসেছিলো। তার একটি সে ফিট করে বাপের ঘরে। আকবরের মা তখন বেঁচে। বলতে কি, তার কথাতেই আমজাদ এই পিতৃসেবার উদ্যোগ নেয়। ছেলেকে কি ছেলের মাকে বাধা দেওয়ার সাহস কামালউদ্দিনের ছিলো না। কিছুদিনের মধ্যে এমন হলো যে ফ্যান ছাড়া সে ঘুমোতেই পারে না।—ছেলে ফ্যান এনে দিয়েছে, তো তার কী দোষ? আবার এও বলি, দিল্লিওয়ালা জুতাওয়ালা না হয় লোক ভালোই ছিলো, কিন্তু তার জাতভাইরা? আরে, রহিমুল্লা সর্দারের ছেলে, যে কি-না ছিলো মিলিটারিদের শান্তি কমিটির পাণ্ডা, ঐ ৯টা মাস খাজা খয়েরুদ্দিনের হোগার পিছে ঘুরলো, প্রধানত যার ভয়ে ঘরে সোবহানের বন্ধুদের জায়গা দেওয়া গেলো না, সেই লোকের বাড়িতে ভাড়া ছিলো এক শালা মাউড়া, মিলিটারি নামার পর থেকে সর্দারের পোলারে ১টা পয়সা ভাড়া দেয় নাই। তাহলে? তাহলে ওদের মাল লুট করতে দোষ কী? না, আল্লা মালুম, এই ব্যাপারে তার কিছু করার ছিলো না। আল্লা তার কোন গুনার জন্য তাকে এই দোজখবাস করায়? তাহলে কি হানিফের মা ভাবী? ভাবীকে তার ভালো লাগতো, কিন্তু তাতে দোষ কী? হিন্দু মেয়েদের সঙ্গে ভাবীর মেলামেশা ছিলো, তাদের মতো সুন্দর করে কথা বলতে পারতো, সেই সময় ভাবী চা বানাতে পারতো, লুচি ভাজতো। প্রথম প্রথম চা খেতে কামালউদ্দিনের জিভে ছ্যাকছ্যাক করতো। এই হানিফের মা ভাবীর হাতে চা খেতে খেতে তার চায়ের নেশা ধরে। এছাড়া? না, আর কিছু থাকলে কি আকবরের মায়ের চোখ এড়াতো? তবে এমন হয়েছে যে ভাবীর কথা মনে করতে করতে মেশিনের সুইয়ের নিচ থেকে কাপড় বেরিয়ে গেছে, সে বুঝতেই পারে নাই। আর একদিন, সেবার খুব শীত পড়েছিলো, কাজ করতে করতে হানিফের মা ভাবীর মুখ তার মুণ্ডুর ভেতরে ঢুকে এমন ঝাঁকাঝাঁকি আরম্ভ করে যে, মগরেবের আজান পড়ার আগেই মেশিন তুলে রেখে কামালউদ্দিন বেরিয়ে পড়ে। তারপর কী করে যে কান্দুপট্টির ভেতর ঢুকে পড়েছিলো সে নিজেও ভালো করে জানে না। কিন্তু আল্লা জানে সেখানে সে নিজে থেকে কোনো একটি প্রাণীকে এমন কি স্পর্শ পর্যন্ত করে নাই। তার ভ্যাবাচ্যাকা ভাব দেখে কিংবা তার রোগা পটকা শরীরে একটি চাল্লির বিভিন্ন লক্ষণ আবিষ্কার করে খানকিরা তাকে নিয়ে হাসাহাসি শুরু করে। সে রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। মুখ নিচু করে সে পালিয়ে আসছে, এমন সময় এক খানকি মাগী তার গায়ের সুতির র‍্যাপার টেনে নেয়। প্রায় দৌড়ে রাস্তায় নামে কামালউদ্দিন। পেছন থেকে 'এ মানু, এই কাউঠ্যা, তর ত্যানাখান লইয়া যা, আমাগো পাতিল ধরনের কাপড়ে অভাব নাই' এইসব বচন এক একটি থাপ্পড়ের মতো তার পাছায় পড়তে থাকে এবং তার গতি বৃদ্ধি করে। শীতের ভেতর পাতলা জামা গায়ে তাকে সেদিন

অনেকটা পথ হাঁটতে হয়েছিলো, কিন্তু তার ঠাণ্ডা লাগে নাই। এমন কি জিনভূতের ভয় থাকা সত্ত্বেও ভিক্টোরিয়া পার্কে সে অনেকটা সময় বসে বসে কাটায়। রাত্রে কিন্তু ভাবীর ওপর সাঙ্ঘাতিক রকম রাগ হয়েছিলো, এই মেয়েমানুষ সকলের সঙ্গে এতো ঢলাঢলি করে কেন? সব কথায় হাসির কী থাকতে পারে? নিজের এই রাগের মাথামুণ্ডু সে আজও বুঝতে পারে না। তো এখানে সে কোন গুনাটার কাম করলো? তাহলে? কামালউদ্দিন কাঁদতে শুরু করে। আকবরের মৃত্যু বা নিজের অবাঞ্ছিত নরক-বাস অথবা এই দুইটাই তার কান্নার কারণ হতে পারে। প্রথমে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো, ফোঁপানোতে বেশিক্ষণ আটকে থাকা সম্ভব হয় না, একটু পরই গোঙাতে শুরু করে, বলতে গেলে সে প্রায় হামলে ওঠে, 'আল্লা! তুমি আমারে উঠাইয়া লও।' তার মুখ দিয়ে লালা গড়ায়। ভাঙা ও পঙ্গু গলা এবং জড়ানো ও পঙ্গু জিভে লালা বলকানো স্বরে আল্লার প্রতি তার এই ব্যাকুল আকুতিতে পাশের বিছানায় ঘুমিয়ে-থাকা আকবরের ছোটো ছেলের ঘুম ভাঙে এবং সে 'আম্মা আম্মা' বলে চিৎকার করে। কান্না এখন কামালউদ্দিনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। কাঁদতে কাঁদতে বার কয়েক নাতিকেও ডাকে। কিন্তু আল্লা কি তার উদ্দেশ্যে বলা কথা আকবরের ছেলের চিৎকারকে এতেটুকু দমাতে পারে না! কামালউদ্দিন কী করবে? একটু পর দরজায় করাঘাত শুনে তার আশা হয় যে খোদেজা এসে পড়েছে, এবার একটা ব্যবস্থা হবেই। আবুবকর উঠে ঘুমঘুম চোখে দরজা খুলে দিলে বারান্দা থেকে আকবরের বৌ ক্লান্ত ও কঠিন গলায় ছেলেকে বকে, 'কইলাম, আমার লগে থাক। না, কথা শুনবো না। আয় কুত্তার বাচ্চা আয়, বারাইয়া আয়।' সদ্যস্বামীহারা মেয়েটি সদ্যপুত্রহারা রুগ্ন শ্বশুরের দিকে কিছুমাত্র না তাকিয়ে ছেলের হাত ধরে তাকে প্রায় ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে নিয়ে যায়। বৌয়ের শোকগ্রস্ত গলার অসন্তুষ্ট বিড়বিড় ধ্বনি অস্পষ্ট হলেও কামালউদ্দিন জানে যে সমস্ত দোষ বৌ ঠিক তার ঘাড়েই অর্পণ করে গেলো। ছেলে মরার পরও সে বেঁচে থাকে কেন? তার লজ্জা করে না?

তার কোঁচকানো শরীর আরো কাঁপে। সচল ও অচল অঙ্গগুলোকে একটিমাত্র অবিভাজ্য কাঠামোতে রূপ দেওয়ার জন্য সে কুণ্ডলী পাকিয়ে শোয়। ঘন নিশ্বাসে কামালউদ্দিন নিঃশব্দে মোনাজাত করে, 'আল্লা, তুমি তোমার বান্দার দিলের খবর রাখো। এই রাইত যানি আমার শ্যাষ রাইত হয়। আমারে এই দোজখ থাইকা উঠাইয়া তুমি যা খুশি করো। কেয়ামত তক আমারে গোর আজাব দাও, মুনকির নকুর আইয়া কেয়ামত তক আমারে আগুনের দোররা মারুক, তাও ভি ভালা, মগর এই হাবিয়া থাইকা আমারে উঠাইয়া লও। এই দোজখের ফজর যানি আমারে চোক্ষে দেখতে না হয়।' জীবনে যতো সৎ কাজ সে করেছে সব সওয়াব সে প্রত্যাহার করে নিতে প্রস্তুত, বিনিময়ে তার কাম্য কেবল তার মৃত্যু। কী সওয়াব আছে তার?—কামালউদ্দিন নতুন ঝামেলায় পড়ে। বাপের পিরহুজুরের দরগায় বছর বছর ওরসে চাঁদা দেওয়ার কথা তার হিসাবে আছে বটে, কিন্তু দেওয়ার

ক্ষমতা তার কতোটা? নবাববাড়ির মুরিদ, বলিয়াদির জমিদারবাড়ির মুরিদ, ইসলামপুরের বড়ো বড়ো কাপড়ের দোকানদার মুরিদ,—ওরসের টাকা যোগায় তো এরা, তার ঐ ৫ টাকা ১০ টাকা ওরসের কী কাজে লাগে? পিরসায়েবের ভাগ্নে কি ভাগ্নের ছেলে এখন গদ্দিনশীন, আমজাদ তার মুরিদ, আমজাদ নাকি মেলা পয়সাকড়ি ঢালে; তা ছেলের সওয়াবে কি বাপের হিস্যা থাকে? বাপ কি ছেলের ওয়ারিশ?—ন্নাঃ! হুজুরের ওখানে তার সওয়াব কিছু নাই বললেই চলে। নামাজটা কিন্তু কামালউদ্দিন প্রায় নিয়মিতই পড়তো। ইসলামপুরের ছাতা ও খেলার সরঞ্জামের দোকানের বারান্দায় কাজ করার সময় অনেকদিন আসর বাদ পড়েছে, কিন্তু যতোটা সম্ভব পরে সে কাজা আদায় করে নিয়েছে। জগদীশবাবু হাসপাতালের বালিশের অড় সাপ্লায়ের অর্ডার নিলে তার কাজের চাপ এতো বেড়ে গিয়েছিলো যে একদিন রোজা মুখে কামালউদ্দিন বেহুঁশ হয়ে পড়ে। এরপর ৭/৮ টা রোজা তার বাদ পড়ে। তবে পরে কিন্তু অনেকগুলো রোজা করে কামালউদ্দিন পুষিয়ে নিয়েছিলো। এছাড়া সাওয়াবের কাজ সে আর কী করেছে? কী করেছে? সওয়াবের কাজ আর কী করেছে?—নিজের সৎ কাজ খুঁজতে খুঁজতে তার তন্দ্রা আসে এবং তন্দ্রা থেকে ঘুমের মধ্যে গড়ালে আকবরের মা এবং আকবরের বৌকে রান্নাঘরে পাশাপাশি বাঁটতে বসে আলু বেগুন কুটতে দ্যাখে। তাদের এই সহ-অবস্থান ভালো করে দেখতে না দেখতে আজান শোনা গেলো।

আল্লা তার সওয়াব ফিরিয়ে নেওয়ার মোনাজাত কবুল করে না কিংবা কবুল হওয়ার মতো সওয়াব তার জীবনে হয় নাই। সকালবেলা কামালউদ্দিন বেঁচেই থাকে এবং ফজরের নামাজ পড়ে। শুয়ে শুয়ে সে জোহর পড়ে, আসর মাগরে, কোনোটাই বাদ যায় না। আকবরের বৌয়ের কীরকম এক বোন এসে তারস্বরে কাঁদে এবং তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাঁদে আকবরের বৌ। এইসব কান্নায় দেওয়ালের নোনা বাড়ে এবং খসে-পড়া চুনের ধকে কামালউদ্দিনের চোখ খচখচ করে। তার মাথায় হাত দিয়ে কখনো ফুঁপিয়ে কখনো চুপচাপ কাঁদছে আকবরের ছোটো মেয়ে। মেয়েটা খালার বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলো, খবর পেয়ে আজ খালার সঙ্গেই চলে এসেছে। শোক এখনো তার টাটকা বলে মেয়েটা ঠিক নেতিয়ে পড়ে নাই। পরশু রাতে এর নাম মনে ভুলে গিয়েছিলো বলে কামালউদ্দিন প্রথম প্রথম তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলো। কেউ বলার আগেই নাম মনে পড়লো তার, পারভীন। এই নাম মনে পড়াতেই কামালউদ্দিন খানিকটা চাঙা হয়ে উঠলো, নিজে নিজে বিড়বিড় করলো, এই ধরনের নাম তাদের পরিবারে কোনোদিন ছিলো নাকি যে সবসময় মনে রাখতে পারবে? তার কী দোষ? এ্যাঁ, তার কী দোষ? নাতনী এখনো তার ন্যাওটাই রয়ে গেছে, এসেই কাঁদতে কাঁদতে ঠিক দাদার ঘরেই ঢুকেছে। না, এসব মায়া ভালো নয়। এগুলো শয়তানের খেলা, মানুষের দোজখের মেয়াদ বাড়ানোই হলো ইবলিসের এক নম্বরের চাকরি। তবে এখন শয়তানের চেয়ে তার বেশি রাগ হচ্ছে আকবরের ওপর। এতো বড়ো মেয়েটাকে সে বিয়ে

দেয় নাই কেন? এই মেয়ে যে কার হাতে পড়ে। আমজাদকে ভালো করে বলতে হবে, আল্লা দিনদিন তার অবস্থা ভালো করছে, তার আরো ভালো হবে, আমজাদ যেন আকবরের ছেলেমেয়েদের নিজের মনে করে মানুষ করে। আকবরের বৌয়ের তেজটা একটু বেশি। আমজাদের বৌ এখন জাকে বেশিদিন সহ্য করলে হয়। তা ওরা যা ইচ্ছা করুক। দোজখের ভেতরকার ঝামেলা যতোই বাড় ক, তার কী? অবিরাম সে তসবি টিপে চলেছে, আল্লা আজরাইলকে যতোদিন না তার কাছে পাঠাচ্ছে ততোদিন তার নামাজ পড়া আর দোয়া পড়ার বিরতি নাই। আল্লা তাকে কতোদিন অচ্ছুৎ করে রাখতে পারে সেও দেখবে!

তবে কি-না প্রাণ যখন একটা আছেই, কিছু করতে পারুক আর না-ই পারুক, তার প্রতি আজরাইলের অরুচির কারণেই কামালউদ্দিন হলো এই বাড়ির মুরুব্বি। আকবরের কুলখানির দিন আধখানা সচল গা ঝেড়ে বাকি অচল আধখানা বোরখা-পরা খোদেজা ও কপালে ওড়না-ঢাকা পারভীনের ওপর রেখে বারান্দায় এসে তাকে বসতে হয়। সকালবেলা আমজাদ এসে তাকে রেডিমেড পাজামা-পাঞ্জাবি দিয়ে গেলো, 'পিরহুজুরে আইবো, সাফসুরুত হইয়া থাইকেন। হুজুরের লগে কয়জন ভিআইপি—বহুত খানদানি মানুষ ভি আইবার পারে। আব্বা, আপনে রেডি হইয়া থাইকেন।' নওশা সাজতে কামালউদ্দিন মন থেকে সায় পায় না, বিশেষ করে পাজামা পরার অভ্যাসও তার নাই। এর ওপর শৌচকার্যের ব্যাপারটি নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয় না বলে পাছার সচল সাইডটা তার প্রায় সব সময় চড়চড় করে। নতুন পাজামা নষ্ট করে লাভ কী? কিন্তু আমজাদ ধমক দেয়, 'ঐগুলি নখরা ছাড়ান দ্যান। হুজুরে নাপাক মানুষ দ্যাখবার পারে না।'

পিরসায়েবের চেহারা সুরত দেখে চোখ ফেরানো দায়। গায়ের রঙ লালচে ফর্সা। কালো কুচকুচে দাড়ির মাঝে মাঝে সাদা কয়েকটি রেখা, আহা কালো মখমলের কাপড়ে জরির মিহি কাজ। সাদা সার্জ্জিকিনের শেরোয়ানির ভেতর পিরসায়েবকে দ্যাখায় নবাববাড়ির নওশার মতো। এক বশিরউদ্দিন ছাড়া আর কারো হাতে এ শেরোয়ানি কাটা হতে পারে না। এখন একজন পাঞ্জাবরদারের খুব দরকার। এরা আজকালকার পোলাপান কিছুই জানে না। এতোই খরচ করতে পারে তো একটা পাঞ্জাবরদারের জন্য আর কটা পয়সাই না হয় যেতো। হুজুরের পেছনে পেছনে আরো খানদানি মানুষের সারি। আমজাদ এদের সম্বন্ধে কী একটা ইংরাজি কথা যেন বললো, কথাটা মনে নাই বলে কামালউদ্দিন হায় হায় করে না। কাপড়ের কাট দেখলেই বোঝা যায় কে কী দরের মানুষ।

আমজাদের সঙ্গে বারান্দায় উঠে এসে পিরসায়েব তার সঙ্গে মোসাবা করার জন্য লালচে ফর্সা হাতজোড়া এগিয়ে দিলে কামালউদ্দিনের প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবার দশা ঘটে। আমজাদ তাড়াতাড়ি তাকে ধরে ফেলে এবং বাপের হয়ে কৈফিয়ত দেয়, 'হুজুর, আব্বা বিমারি মানুষ। আব্বার লাইগা দোয়া কইরেন।'

মিলাদের পর নাজাতের দোয়া পড়ে একটুখানি ফিরনি মুখে দিয়ে হুজুর চলে গেলো। হুজুরের পেছনে আমজাদের এক পিরভায়ের গাড়িতে গেলো বিরিয়ানির

ডেগচি, রেজালার হাঁড়ি, টিফিন ক্যারিয়ারের মস্ত মস্ত বাটিতে টিকিয়া, জর্দা। বড়ো বড়ো মুরিদদের প্রায় কেউই রইলো না, এদেরই কার যেন কাপড়ের মিল চালু হবে আজ, হুজুর সেখানে যাচ্ছে খাস দোয়া পড়তে। এদের কার কীরকম মর্যাদা সেটা ঠিকমতো বুঝতে না পারলেও বিরিয়ানি, রেজালা, জর্দা ও আগরবাতির মিলিত খসবু ধোঁয়ায় কামালউদ্দিনের সচল ও নিমচল চোখজোড়া ছলছল করে ঃ হায়রে, আকবর বেঁচে থাকলে কী তৃপ্তিটাই না পেতো! বেচারার তামাম জিন্দেগি বড়ো কষ্টে কেটেছে। তাকে দোয়া করার জন্য আজ এখানে কতো বড়ো বড়ো খানদানি মানুষ। ঐ যে রহিমুল্লা সর্দারের নাতি খেয়ে উঠে ড্রামের পানিতে হাত ধুচ্ছে। ২ জন পুলিস দেখে ইজি চেয়ার থেকে উঠে বসার জন্য কামালউদ্দিন উসখুস করে। না, ভয়ের কিছু নাই, গলিতে গাড়ি কন্ট্রোল করার জন্য আমজাদ এদের পয়সা দিয়ে নিয়ে এসেছে, এরা এখন খাবে বলে সামিয়ানার নিচে পাতা লম্বা টেবিলের দিকে যাচ্ছে। আহা, আকবর যদি এসব দেখতে পেতো! আমজাদ যে বলে, ঠিকই, 'হুজুরপাকের দোয়ার বরকতে দেইখেন এই বাড়ি ভাইঙা আমি কেমুন বিল্ডিং বানাই।' আমজাদ বলে তার যাবতীয় উন্নতি পিরহুজুরের দোয়ার বরকতে। আবার দ্যাখো তার পিরের প্রতি ভক্তিতেই বাপজান ঘর সংসার ছেড়ে রাতদিন মাজার শরিফেই পড়ে থাকতো। আল্লার খেয়াল কে বুঝতে পারে? তার বাপজানের মোনাজাতে সাড়া দিয়ে আল্লা তাকে দুনিয়া থেকে তাড়াতাড়ি উঠিয়ে নেয়, ওপারে গিয়ে বাপজান তার হুজুরপাকের সঙ্গে নিশ্চয়ই মিলিত হয়েছে। আল্লার করুণার প্রতি কামালউদ্দিনের আস্থা হয়, আল্লাপাক এবার তার কান্নায় নিশ্চয়ই কান দেবে।

'দাদা, একলা বইয়া কান্দেন?' আকবরের মেয়েটা কাঁদো কাঁদো গলায় কথা বলতে বলতে তার পাশে দাঁড়ায়। কামালউদ্দিন ঠিক কাঁদছিলো না। নতুন পাঞ্জাবির ভেতর তার পিঠ ও ঘাড়ে খুব চুলকাচ্ছিলো। ফলে তার পক্ষাঘাতগ্রস্ত চোয়ালে নতুন ধরনের বিকৃতি ঘটায় তার চেহারা অমন কাঁদো কাঁদো দেখাচ্ছে। তার একটিমাত্র সচল হাতে ঘাড় চুলকাতে গিয়ে তার মুখের এই দশা। কেঁদে কেঁদে লাল চোখ খচিত মেয়েটির কালো ও মিষ্টি মুখের দিকে তাকিয়ে কামালউদ্দিনের বুক খাঁ খাঁ করে ওঠে। পিঠের অস্বস্তিটা তেমন টের পাওয়া যায় না। তার কথার কী জবাব দেবে ভাবতে না পেরে সে জিগ্যেস করে, 'খাইচস? তর মায়ে খাইছে?' কামালউদ্দিন আপন মনে বলেই চলে, 'বহুত মানুষ খাইলো, না রে? তর বাপের লাইগা এতোগুলি মানুষে দোয়া করলো, আল্লায় শুনবো।' কামালউদ্দিন তার মৃত পুত্রের প্রতি ঈর্ষা বোধ করে কি-না তার ভাঙাচোরা গলা থেকে তা ঠাহর করা কঠিন। তার আরো কিছু কথা শুনলে হয়তো অনুমান করা যেতো, কিন্তু তার আগেই পারভীন বলে, 'দাদা, আম্মায় না কিছু খায় নাই।'

'মানা আছে? হুজুরের মানা?'

'না।'

'তয় খায় নাই? কী হইছে?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটু তেতো ও একটু ভীতু গলায় পারভীন বিড়বিড় করে, 'চাচায় না আইজ আম্মারে বহুত শাসাইছে।'

কামালউদ্দিনের সচল, এমন কি নিমচল মুণ্ডু খাড়া হলো, 'কী হইছে?'

'চাচায় কয়, আম্মায় ফন্দি কইরা আব্বারে এই বাড়ি থন বাইর কইরা লইছে।' বলতে বলতে পারভীনের গলা ধরে আসে, 'চাচায় কয়, "তুমি আবার আমাগো কিয়ের ভাবী? ভাই তোমারে বিয়া করছে আমরা জানি নাকি?" এই বাড়ির মইদ্যে নাকি আমাগো হিস্যা নাই।'

বুঝতে কামালউদ্দিনের ১ সেকেন্ড সময়ও লাগে না। এই নিয়ে বহুকাল ধরে বাড়িতে মেলা কথা চলে আসছে। আমজাদের এই কথাগুলো আসলে কামালউদ্দিনের নিজের উক্তি। আকবরকে তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবার সংকল্প সে বহুবার ঘোষণা করেছে। কিন্তু আকবরের মৃত্যুর ৩ দিনের মধ্যেই তার সংকল্পটি আমজাদের মুখ থেকে প্রচারিত হওয়ায় সে ধান্দায় পড়ে। এই মুহূর্তে কিছু বলা তার সাধ্যে কুলায় না। কারণ পিঠ ও কাঁধের অস্বস্তি বাড়ছে খুব তাড়াতাড়ি।—রেডিমেড পাঞ্জাবি মানযে ক্যামনে পড়ে? তলার সাইডটা ঢিলা করছে তো পিঠটা এমুন টাইট কি মনে লয় গর্দানের লগে আঁকশি একখান ফিট কইরা টান মারতাছে।—চুলকাবার জন্য কামালউদ্দিন তার সচল বাম হাতটা ঘাড় ডিঙিয়ে পিঠে ঢোকাবার চেষ্টা করছে, বেশ কঠিন কাজ, এমন সময় আকবরের মেয়ের নরম আঙুলের মসৃণ গতি অনুভব করে, সঙ্গে সঙ্গে ফের মনে হয়, হায়রে মেয়েটা যে কার হাতে পড়ে! পারভীন এবার জিগ্যেস করে, 'দাদা, চাচায় আমাগো থাকবার দিবো না?' কামালউদ্দিন তার কী জানে? আমজাদ তার সাবালক ছেলে, তার ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা কামালউদ্দিন কী করে বলবে? 'দাদা, মায়ে খালি কান্দে আর কয়, এতিম পোলাপান লইয়া আমি অহন কই যাই? দাদা, চাচার খালি এক কথা, "তুমি ভাইজানরে ফুসলইয়া বিয়া করছো, তারে এই বাড়িতে আগে পাঠাইয়া দিবার পারো নাই?" আমজাদকে কামালউদ্দিন কী করে দোষ দেয়? এসব তো তারই কথা, তার কথা দিয়ে আমজাদ তার আকবরের বৌছেলেমেয়েদের পথে বসাবার আয়োজন করছে। আমজাদকে সে ঠেকায় কী করে? আমজাদ এখন মস্ত বড়ো মানুষ, এতো বড়ো পিরের মুরিদ, নামীদামি সব খানদানি মানুষ তার পিরভাই। এর সঙ্গে পেরে ওঠা কী আকবরের এতিম ছেলেমেয়ের পক্ষে অতো সোজা? আকবরের রুহের মাগফেরাতের জন্য আমজাদ কী বিরাট আয়োজন করেছে, তার ছেলেমেয়েদের সে যদি এখন বাড়ি থেকে বার করে দেয় তো কেউ কিছু বলতে পারবে না।—দুত্তোরি, এই দোজখের আগুন নতুন নতুন শিখায় জ্বলে উঠছে! কামালউদ্দিন বিরক্ত হয়, দূর, তার কী? আল্লা তার কথা শুনলে এই দোজখে তার আর কদ্দিনই বা মেয়াদ? তার কী?—তার গোটা মাথা ঝিমঝিম করে, মাথাটাকে ভালো করে ঝাড়বার জন্য উঠানের দিকে তাকায়, দ্যাখে, উঠান থেকে

সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে আসছে আকবরের মা। এইবার আকবরের মা তাকে আর কিছুতেই ছাড়বে না। তার শক্তির কোনো শেষ নাই। শরীরটা দুনিয়ায় ফেলে গেলে কী হয়, বেহেশতের আলোতে তার রুহের তেজ এখন শরীরের তুলনায় শতগুণ। অতো বড়ো ৫৫/৬০ বছরের বুড়ো ছেলেকে ৮ মাসের শিশুতে গড়িয়ে নিয়ে যে কি-না হাওয়া হয়ে যেতে পারে, কামালউদ্দিন তো তার কাছে এক ববিন সুতার সমান নয়। এতো সব লোকজনের ভেতর আকবরের মা তাকে আজ কী হেনস্তাটাই না করবে। এই তো এসে পড়লো বলে সিঁড়ির সবগুলো ধাপ ডিঙানো শেষ করে আকবরের মা বারান্দায় উঠে পড়েছে, একটু কুঁজো হয়ে ধীরেসুস্থে এগিয়ে আসছে তার দিকে।

'দাদা তোমার কাছে ক্যাঠায় জানি আহে।' পারভীনের কথায় কামালউদ্দিন বুঝতে পারে যে আকবরের মা আজ সবাইকে জানান দিয়ে আসছে। তাহলে?—আঙুলে আর একটি সুই বিঁধলে কামালউদ্দিন তার জিভটিকে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে, ঠিক আছে, কামালউদ্দিনও আজ পাল্টা নালিশ করবে। পারভীন তো সামনেই আছে। এই ছেলেমেয়েদের এতিম করে আকবরকে উঠিয়ে নিয়ে আকবরের মা খুব বাহাদুরির কাজ করলো, না? মরে গেলেই কি মানুষের মায়া মমতা বিবেচনাবোধ সব রসাতলে যায়? নিচের দিকে তাকিয়ে কামালউদ্দিন এইভাবে তৈরি হচ্ছে, এমন সময় শুনলো, 'এইটা আকবরের মাইয়া, না?' তার গলা একেবারে চেনা যাচ্ছে না, বুড়ি তবে কে?

'হায়রে ছেমরি, তর দাদারে পছন্দ করছস?' ঠাট্টার ধরন শুনেই কামালউদ্দিন ঠিক বুঝতে পারে।—হানিফের মা ভাবীর দিকে ভালো করে তাকিয়ে তার বুক মুচড়ে ওঠে, ভাবীর সঙ্গে কতোকাল পর দ্যাখা! হাজার কথায় তার গলা কানায় কানায় ভরে ওঠে, কিন্তু কোনো শব্দ বেরোয় না। ভাবী, ভাবী,—বলার জন্য সে বেশ কয়েকবার চেষ্টা করলো, কিন্তু তার জড়ানো জিভ একেবারে টাইট, কোনো কথাই বলতে পারে না, তার জবান কি চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেলো?

হানিফের মায়ের কথা বলার ভঙ্গি ঠিক আগের মতোই রয়ে গেছে, 'তোমরা অহন বড়লোক হইয়া গেছো, কুনো খবর উবর কিছু দ্যাও না। আউজকা মিল থাইকা গিয়া হানিফে কয়, "অ মা, আকবর ভাই মইরা গেছে। আউজকা কুল পড়বো, আমজাদে যাইতে কইছে।" তোমার কথা জিগাই তো কইতে পারলো না। আমি কই আকবরের বাপ কি আর আছে? কতোদিনের মানুষ, অহন কি আর বাঁইচা আছে?' একটু ধরে-আসা গলা সামলে নিয়ে হানিফের মা ফের ঠাট্টা করে, 'আইয়া দেহি, বারিন্দার মইদ্যে বইয়া নাতনীর লগে দিললাগি করো।'

কামালউদ্দিন ফের ইজি চেয়ারের ক্যানভাসে নাচার গতরটা এলিয়ে দেয়, তার বেঁচে থাকার খবরটা এরা হানিফের মা ভাবীকে জানায়নি পর্যন্ত। আকবর মারা গেছে, তাকে নিয়ে আজ আমজাদের মহফিল, বাপ মরলে আমজাদ না জানি কী বিরাট ওয়াজ মহফিলের এন্তেজাম করবে।

আকবরের মেয়ে একটা মোড়া এনে দিলে হানিফের মা বেশ জাঁকিয়ে বসলো। কামালউদ্দিনের পাতলা চুলে পারভীন এখন আস্তে আস্তে বিলি কেটে দিচ্ছে। একনাগাড়ে অনেকগুলো বাক্য বলার পর হানিফের মা ভাবী এখন হঠাৎ চুপচাপ! কামালউদ্দিনের শীতল নীরবতায় ভাবী উসখুস করছে। একটু পর সে বলে, 'যাই, আমজাদে কারে যানি রিকশা ডাকতে কইলো, তোমারে দেইখা আমি আইলাম। তুমি অহন তরি বাঁইচাই আছো?' কামালউদ্দিন তবু কথা বলতে পারে না। কী বলবে? আকবরের মা ছেলেমেয়ে দুজনকে তো আগেই খেদিয়ে খুব তারিয়ে তারিয়ে কিছুদিন পতিসেবা করলো, তারপর একদিন নিজেই বেশ সুড় ৎ করে কেটে পড়লো, কারো দিকে একবার তাকালো না পর্যন্ত। এটা তার কী ধরনের কাজ? আবার দ্যাখো, এক লোকমায় গিলে ফেললো বড়ো ছেলেটাকে। তার এতিমগুলো কি এখন পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াবে? এদের এখন দ্যাখাশোনা করে কে? এদিকে কামালউদ্দিনের দিকে দেখতে দেখতে হানিফের মায়ের বিস্ময় ক্রমাগত বাড়ে, উঠতে উঠতে সে ফের বলে, 'তুমি অহন তরি বাঁইচাই আছো?' তার সচল হাত দিয়ে তার মাথার ওপর বিলি কাটতে থাকা পারভীনের হাত ছোঁয়ার জন্য কামালউদ্দিন একটি ক্ষীণ প্রচেষ্টা চালায়! পারে না। পারভীন সামনে এগিয়ে এসে একটু ঝুঁকে জিগ্যেস করে, 'কী দাদা?'

পারভীনের একটি হাত তার সচল হাতের ভেতর নিয়ে কামালউদ্দিন বলে, 'সিধা হইয়া খাড়া।' নাতনীকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্য তার হাতে সে একটু ঠেলাও দিলো। যাবার জন্য পা বাড়িয়ে হানিফের মা বলে, 'খবর দিও। বাঁইচা আছো একটা খবর ভি পাই না।'

'বাঁচুম না ক্যালায়?' কামালউদ্দিনের এই বিড়বিড় ধ্বনি ভালো করে শোনবার জন্য হানিফের মা ভাবী মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ালো। দ্যাখে ডান হাতে ধরা লাঠিতে ভর দিয়ে কামালউদ্দিন উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। পারভীন চট করে এগিয়ে না ধরলে সে ঠিক পড়েই যেতো। লাঠি এবং নাতনীর ওপর ভাঙাচোরা শরীরের ভার রেখে ডান দিকের গতর ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে সে রওয়ানা হলো নিজের ঘরের দিকে। ঠোঁট, জিভ ও গলার সচল, অচল ও নিমচল টুকরাগুলো জোড়াতালি দিয়ে কামালউদ্দিন একটি লালা-বলকানো হঙ্কার ছাড়ে, 'তর চাচারে কইস, দাদায় অহন তরি বাঁইচা আছে।'

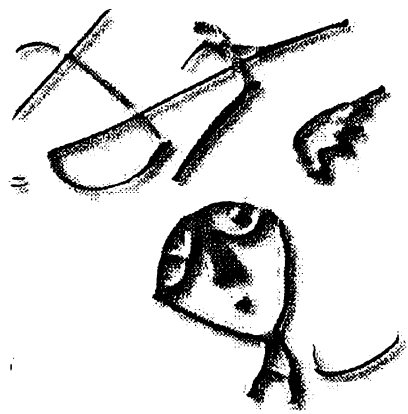

জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল

প্রেমের গপ্পো

'মাগো! তুমি এত মজা করে কথা বলতে পারো! তারপর? মেয়েটা তোমাকে কি বলল?' বুলার হাসি আর থামে না, স্বামীর প্রাক্-বিবাহ প্রেমের গল্প শোনে আর হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে, খিলখিল এবং খিকখিক আওয়াজ বন্ধ হবার পরেও গোলগাল ফর্সা মুখের এ-কোণে ও-কোণে হাসির কুচি চিকচিক করে। উৎসাহে জাহাঙ্গীরের ঠোঁট উপচে পড়ে, 'আমাকে বলে পুরুষ মানুষ, তার বডি হবে পুরুষ মানুষের মতো। হেঁটে গেলে মাটি কাঁপবে।'

'ধ্যাৎ' বুলা ফের হাসে, 'মেয়েরা এভাবে কথা বলে নাকি?'

'বললাম না, অন্য কিসিমের মাল।' বলেই জাহাঙ্গীর তার ভাষা ঠিক করে, 'অন্য ধরনের মেয়ে। বুঝলে না? সব সময় খেলাধূলা নিয়ে থাকে। আমার সঙ্গে আলাপ হয় স্টেডিয়ামে। আমি তখন ডিসকাস থ্রো প্র্যাকটিস করতে যাই, তো একদিন শাহীন বলল—'

'শাহিন কে? পরশু না নাম বললে শাহনাজ!'

'ঐ তো ভালো নাম শাহনাজ। ডাকনাম শাহীন।' জাহাঙ্গীর একটু থেমে বলে, 'মানুষের দুটো নাম থাকে না? তোমার নাম।'

'বুঝেছি। শাহীন না শাহনাজ কী বলল?'

'আমার থ্রো দেখে বলে, আপনার হাতের মুভমেন্ট খুব ম্যাজেস্টিক, আবার খুব ফাস্ট।

—ওর বড়োভাই ভালো জিমন্যাস্ট ছিল, আমাকে একদিন বলে, 'আপনি যদি শাহীনকে একটু দেখিয়ে দিতেন তো ভালো হয়। এবার মেয়েদের মধ্যে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ান না হলে পাগল হয়ে যাবে।'

'তারপর?'

'গাড়ি করে ওদের বাড়ি নিয়ে গেল। গুলশানের বাড়ি। বিরাট বাড়ি, সামনে লন, পেছনে মাঠ। মনে হয় হাফ স্টেডিয়াম। বাড়িতে টেনিস থেকে শুরু করে ক্রিকেট বলো, বাস্কেট বল বলো : সব কিছুর ফুল অ্যারেঞ্জমেন্ট। সুইমিং পুল পর্যন্ত আছে। একটা সাইডে শটপুট প্র্যাকটিসের জায়গা করা হলো, আমি সপ্তাহে চারদিন যাই আর কায়দা টায়দাগুলি দেখাই।

'তুমি ছাড়া আর কে যেত।'

'বিকেল হইল আর লাইন দিল মনে হয় কসকরের দুধ ছাড়তাছে।'

বুলা ফের হাসে, 'আবার ঢাকাইয়া ল্যাঙ্গুয়েজ।'

কিন্তু জাহাঙ্গীরের তখন ফ্লো এসে গেছে। 'এক্কেরে লাইন। বনানী, গুলশান, ধানমন্ডির বড়লোকের বাচ্চাগুলি গাড়ি হাঁকাইয়া আসত। ইস্কাটন থাইকাও মনে হয় একজন আসত।'

'তোমাদের শাহীন বোধহয় সবাইকে নাচাত?' বুলার কথায় একটু ঈর্ষার খোঁচা থাকায় জাহাঙ্গীর আরো চাঙ্গা হয়, 'আরে সেইগুলির একেকজনের শালা একেকরকম নকশা।' জাহাঙ্গীর এবার অঙ্গভঙ্গি করে শাহীন বা শাহনাজের প্রেমপার্থীদের চেহারা ও হাঁটবার বৈশিষ্ট্য দেখায়, 'একটা আসত, চিকনা, হাঁটতে গেলে হাড্ডিগুলো বাজে, চশমার আড়াল থাইকা কুৎকুতাইয়া চায়। শুনি সেইটা নাকি ইউনিভার্সিটিতে পড়াইত, এইবার পরীক্ষা দিয়া ফরেন সার্ভিস পাইছে। আমি কই, এইটা ফরেন সার্ভিস পাইয়া ভালো হইছে। ক্যান?—ফরেনাররা অ্যারে দেখলেই লগে এইড পাঠাইয়া দিবো।—আরেকটা হোঁৎকা মোটা, সোজা হইয়া হাঁটতে পারে না। টেনিস র‍্যাকেট দুলাইতে দুলাইতে আসত, শুনি সেটা নাকি কোনো সেক্রেটারি না জয়েন্ট সেক্রেটারির পোলা।—তা যত বড়ো মানুষ আসুক, আমার কি? . . . আমি এসবের মধ্যে নাই। আমার ডিউটি আমি করি, শটপুট দেখাইয়া দেই। ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ান করা চাই।'

'হয়েছিল? সেবার ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল?'

'ক্যামনে হয়? আমিই তো কাইটা পড়লাম।'

'আবার তোমার ঢাকাইয়া শুরু হলো?' বুলার এই আঠালো ধমকে জাহাঙ্গীর এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেলে বুলা নিজেই অপ্রস্তুত হয়, 'হ্যাঁ কেটে পড়লে কেন!'

এর আগেও একবার-বলা গল্পটার উপসংহার টানে জাহাঙ্গীর, 'মাঝে মাঝে গ্যাপ গেলেই স্টেডিয়ামে লোক পাঠায়। সেবার আগা খানা টুর্নামেন্ট নিয়ে আমি খুব ব্যস্ত, কয়েকদিন যেতে পারিনি। তো যেদিন গেলাম, ড্রয়িংরুমে অপেক্ষা করছি, এসে আমাকে দেখে আর কথা বলে না। কথাই বলে না। আমি বলি, চলেন প্র্যাকটিস আরম্ভ করি। হঠাৎ আমার পাশে এসে দাঁড়াল। জিগ্যেস করে, আচ্ছা সত্যি করে বলেন তো আপনাকে কেউ কিছু বলেছে?—আমাকে? না। কেন?—না আপনি প্রায়ই আসেন না কেন? আপনাকে কি কেউ থ্রেট করেছে? আমি তো অবাক! আমাকে কী বলবে! আমার সঙ্গে লাগতে আসবে কে?' বলতে বলতে জাহাঙ্গীর নিজের হাতের মাসল ফুলিয়ে দেখায়। বুলা গদগদ গলায় বলে, 'তারপর?'

'আমি বললাম, না—আমাকে কে কী বলবে?—তা শাহীন বলে, না আপনি জানেন না, এরা আপনাকে হিংসা করে।—আমাকে? কেন?—বোঝেন না? এই রাতদিন বকবক করা ছাড়া ওদের আছে কী? খালি প্যাঁচাল, খালি প্যাঁচাল। বড়ো-বড়ো কথা, খালি বড়ো-বড়ো কথা। নিজেদের সব ইন্টারন্যাশনাল ফিগার

মনে করে। আমিও বলে দিচ্ছি এখানে লাস্টিং করবেন শুধু আপনি, আর সব আউট হয়ে যাবে।—মানে? লাস্টিং করব মানে?—বোঝেন না? দুর, আপনি না এক্কেবারে একটা ইসে।'

'ইসে কী? ইয়ে বলো।' বুলার এই ভাষাশুদ্ধির প্রচেষ্টা জাহাঙ্গীরের বাক্যপ্রবাহে এতটুকু বিঘ্নের সৃষ্টি করতে পারে না. শাহীন বা শাহনাজ নামে মেয়েটির উক্তিকে সে বুলার কাছে প্রতিষ্ঠিত করে ছাড়বে, 'ঠিক বলেনি? বুলা. ঠিক বলেনি? খালি চালবাজি করলে পুরুষমানুষ হইতে পারে।'

'আচ্ছা মেয়েটা ঐভাবেই বলল?'

'আরে বড়োলোকের মেয়ে, ওদের কথাবার্তা অন্যরকম।'

'তুমি কী করলে?' বুলা জানতে চায়, তবে জানা-জবাব শোনবার আগেই হাসতে শুরু করে।

'আমি তো ঘাবড়াইয়া গেছি। বললাম, মাথাটা ধরছে, যাই। বলে, যাবেন মানে? ওষুধ দিচ্ছি, মাথা টিপে দিই। আমি কি আর থাকি? শাহীন ডাকে, আরে দাঁড়ান, ড্রাইভারকে বলি, গাড়ি করে দিয়ে আসুক।—গাড়িগুড়ির গুলি মারি, স্লামালেকুম—খোদা হাফেজ কইয়া করাইয়া একবারে ছয়নম্বর বাস ধরছি, জিন্দেগিতে আর বনানী যাই নাই।'

হাসতে হাসতে বুলা হাঁপায়। জাহাঙ্গীর তেলতেলে চোখ করে বৌকে দেখে। বুলাটা একেবারেই ছেলেমানুষ। অথচ এত বড়ো মেয়ে, কলেজে পড়ছে আজ তিন বছর, ছাত্রীও ভালো, এসএসসি, এইচএসসি দুটোতেই সেকেন্ড ডিভিশন। ওদের কলেজে নাকি চোথাও চলে না। অথচ দেখো কী রকম সাদাসিধা মেয়ে, যা বলা যায় তাই গোগ্রাসে গেলে। স্বামীকে বিশ্বাস করার জন্য একেবারে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে, শুধু কথা বলার অপেক্ষা। বিশ-বাইশদিন হলো বিয়ে হয়েছে, অথচ মনে হয় একে ছাড়া এতদিন ছিল কী করে? হাসি এবং আঁচল সামলে বুলা জিগ্যেস করে, 'তুমি চলে এলে, তোমার মোটর সাইকেল?'

জবাব দিতে জাহাঙ্গীরের একমিনিটও দেরি হয় না, 'সেদিন বললাম না মাথা ধরেছিল। মোটর সাইকেল রেখে গিয়েছিলাম।'

'তা তুমি ওরকম পালিয়ে এলে কেন? গুলশানের বাড়ি, গাড়ি সবই পেতে। এত বড়লোকের মেয়ে।'

'আল্লায় বাঁচাইছে, নিজের নাক ও কানে আঙুল ছুঁয়ে জাহাঙ্গীর তওবা করার ভঙ্গি করে, 'বড়লোকের মাইয়া বিয়া কইরা তারে কৈ রাখুম, কী খাওয়ামু! গাড়ি-বাড়ির আমার দরকার নাই বাবা।' তার শেষ বাক্যটি সে আবার সঙ্গে-সঙ্গে সংশোধন করে, 'গাড়ি-বাড়ি আমি নিজে করতে পারি না? হবে না? ম্যানেজিং ডিরেক্টর এই তো পরশু কইল, জাহাঙ্গীর, অর্ডার তো ভালোই আনতাছ। গুড। দুইদিন পর পাখনা গজালেই অন্য ফার্মে যাবার তাল উঠবে। এখানেই ভালো করে কাজ করো, ফার্মটারে তোলো, তোমরাও উঠতে পারবা। এখানে সিনসিয়ারলি

কাজ করলে তোমার গাড়ি-বাড়ি সবই হবে।—বেশিদিন লাগে না, বুঝলা, আমাদের ইসেকে দেখলাম—।

এই হলো তার স্বামীর আরেকটা দোষ। কথা বলতে-বলতে সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে এল তো মূল বিষয় তার মাথায় উঠল! এখন কোথায় গিয়ে যে থামবে! বুলা তাই স্বামীর মনোযোগ ঠিক করার জন্যে তাড়াতাড়ি বলে, 'তা মেয়েটার সঙ্গে তোমার আর দেখা হয়নি?'

'পাগল! আমি আর ওদিকে যাই?'

'ও, এই মেয়ে তাহলে সেই পুলিশের মতো ধাওয়া করেনি, না?'

'পুলিশ? পুলিশ আমারে কী করবে?' জাহাঙ্গীরের আত্মসম্মানবোধ আহত হয়, 'আরে পুলিশ আমারে বাপ ডাকছে, বুঝলা? কলেজের অ্যাথলেটিক সেক্রেটারি আছিলাম, কলেজ তো কলেজ, কলেজের চারপাশে যতটি মহল্লা আছে এর কোনো জায়গায় কোনো গ্যানজাম হইলে ওসি নিজে আসছে। কী ব্যাপার ওসি সাব?—জাহাঙ্গীর ভাই, কেসটা ট্যাকল করেন!—আবার আমার কলেজের একটা হোস্টেলের লগে সিনেমা হল আছে, পোলপানে দুই-একদিন শয়তানি কইরা মাগনা বই দেখতে চায়। ওসি আবার আসছে।—এইবার কী?—না জাহাঙ্গীর ভাই, আপনার পোলাপানেরে সামলান। আমি উলটা ধামকি দিছি, আরে রাখেন। সিনেমার মালিক মালপানি বহুত কামাইছে, আমার পোলাপান মাগনা দুইটা শো দেখব তো এত হাউকাউ কীসের?—শুইনা পুলিশে কথা কয় নাই। শোনো, পুলিশের কথাই যখন তুললা তো কই—।

'আরে না, না! বুলা অধৈর্য হয়ে বলে, তোমার পুলিশের ভয়ের কথা কে বলল? ঐ যে এক মহিলা-পুলিশ তোমার প্রেমে পড়েছিল, ঐ যে সেদিন বললে না?'

'ও! 'এতক্ষণে জাহাঙ্গীর থিতু হলো, 'তুমি হিপ-হিপ-হুররের কথা কও?'

'কী নাম বললে?' বুলা হাসে, 'হিপ হিপ হুররে? মেয়েছেলের নাম?'

'আরে নাম না, টাইটেল, উপাধি!'

'ও মা!' বুলা অবাক হয়, 'পুলিশের নাম দিয়েছিল হিপ-হিপ-হুররে?'

'পুলিশ তো হইল অনেক পরে। কলেজে আমাদের সঙ্গে পড়ত। তখনি ওর হিপ দুইটা, মানে পাছা ছিল খুব প্রমিনেন্ট, তাই দৈইখা ছেলেরা টাইটেল দিল হিপ হিপ হুররে।'

'ম্যাগো! তোমরা কী অসভ্য ছিলে? ক্লাসমেটের এই নাম দিতে?' এই ধিক্কার দিলেও বুলার ফের হাসির একটা দমক আসে, কোনোরকমে নিশ্বাস টেনে নিতে নিতে বলে, 'তোমরা সব ভারি অসভ্যতা করতে, না?'

'কেন, তোমাদের কলেজের ছেলেরা তোমাদের নিউ ইয়ারের টাইটেল দেয় না? ঐগুলো মনে হয় ম্যাদামার্কা মতো না?' বলে জাহাঙ্গীর নিজেই তার বিবৃতি সংশোধন করে, 'ও হো! তোমার তো উইমেন্স কলেজ, পর্দা-টাঙানো হারেম শরীফ। তোমাদেরটা আবার ডবল প্রোটেক্টেড জোন! উঁচু দেওয়াল।'

'আব্বা আবার কো-এডুকেশন পছন্দ করে না।'

'তোমার বাবা একেবারে উডেন মোল্লা।'

'মানে?'

'কাঠ মোল্লা আর কি! মেয়েকে ছেলেদের সঙ্গে পড়তে দেয়নি, ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়নি কো-এডুকেশনের ভয়ে, তাই না?'

বুলার গলা একটু ভারি হয়, 'আমার বাবা কি তোমার কেউ নয়?' সঙ্গে-সঙ্গে জাহাঙ্গীরের আফসোস হয়, বৌ-দের কাছে তাদের বাবা-মা সম্বন্ধে একটু সাবধানে কথা বলা দরকার। 'ওরে আমার পিচ্চু রানী, রাগ করলে?' বুলার মাথা সামনে টেনে জাহাঙ্গীর তার গালে দুটো চুমু খায়। দুটো চুমুর পর খ্যান্ত দেওয়ার বান্দা সে নয়। তবে এখন গল্প বলার বেগ এসেছে, চুমু-টুমুর ব্যাপার পরে দেখলেও চলবে। বুলা মাথা নিচু করে বলে, 'আব্বা কিন্তু মোটেই কনজারভেটিভ নয়। তাহলে কি আমাকে গান শেখাত? পাড়ার কলেজ, পড়াশোনা ভালো হয়, তাই ওখানে দিয়েছে।' 'আচ্ছা, আমার ভুল হয়ে গেছে। এই মাপ চাইলাম।' জাহাঙ্গীর হাত জোড় করে এমনভাবে তাকায় যে বুলা হেসে ফেলে। বুলা আসলে ঠিকই বুঝেছিল। বিয়ের পর সপ্তাহখানেকের মধ্যেই স্বামীটিকে সে চিনে ফেলেছে। লোকটা একেবারে খোলামেলা, মানুষ এত ফ্রাঙ্ক হতে পারে! বাপ-মা, শ্বশুর-শাশুড়ি যার সম্বন্ধে যা মনে হচ্ছে সঙ্গে-সঙ্গে বলে ফেলছে। আবার দেখো, বাপ-মা তো বটেই শ্বশুর সম্বন্ধেও সিরিয়াসলি কেউ খারাপ কিছু বললে সঙ্গে-সঙ্গে রুখে দাঁড়ায়। কোথাও কোনো রাখোঢাকো নেই, যা বলার অকপটে বলে ফেলে। মিষ্টি-মিষ্টি মুখ করে বুলা স্বামীর দিকে তাকায়, 'আমি এমনি বলেছি। যাক, তারপর? তোমাদের হিপ-হিপ-হুররের কথা বলো?'

'হ্যাঁ, শোনো।' জাহাঙ্গীর নতুন উদ্যমে শুরু করে, 'সবসময় তার বুক উঁচু করে চলা, কাউকে কেয়ার-না-করা—এইসব দেখে ছেলেরা মাঝে মাঝে সাউন্ড দিত।'

'সাউন্ড দিত মানে?'

'আ—! তুমি কিচ্ছু বোঝ না।' স্ত্রীর অজ্ঞতায় জাহাঙ্গীরের উৎসাহ বাড়ে, 'সাউন্ড দিত মানে একটু রিমার্ক পাস করতো। তো হিপ-হিপও চেইতা যাইতো, একদিন কয় আপনাদের বাড়িতে মা বোন নেই? পোলাপান কি কম? কয়, আছে, কিন্তু বাপেরা আর দুলাভায়েরা সেইগুলি দখল কইরা রাখছে।'

'ছি ছি! এ-রকম বলে, অ্যাঁ!'

বুলার বিস্ময় ও ধিক্কারে জাহাঙ্গীর হাসে, 'যাই কও পোলাপানে ভালোই জবাবটা দিছিলো, না?' হিপ হিপ হুররে মেয়েটি সম্বন্ধে গল্প তার অব্যাহত থাকে। ছেলেরা একদিন করল কী, হিপ-হিপের গায়ে কলম ঝাড়ে, এবার হিপ-হিপ নালিশ করল প্রিন্সিপালের কাছে। প্রিন্সিপাল আর কী করতে পারে? ঐ ক্লাসে নিজে গিয়ে ছেলেদের খুব বকে দিলেন। ছুটির পর মেয়েটির অবস্থা সেদিন খুব খারাপ। ছেলেরা সব এখান থেকে সাউন্ড মারে, ওখান থেকে সাউন্ড মারে। জাহাঙ্গীর তো

এসবের মধ্যে কখনো যায় না। ক্লাশও করে না, মেয়েদের পেছনে ঘোরাঘুরিও করে না। সে আছে তার নিজের ও কলেজের খেলাধুলা নিয়ে, তার কাজ হলো কলেজের খ্যাতি যেন কোনোভাবেই নষ্ট না হয়। আর কী করে? কলেজে কোন বিচিত্রানুষ্ঠান হলে জানপ্রাণ দিয়ে খাটা এবং স্টেজে একবার দাঁড়িয়ে শরীরচর্চা প্রদর্শন করা। যাক, সে সেদিন ওদিক দিয়ে যাচ্ছিল, মেয়েটা কাঁদো-কাঁদো গলায় এসে বলে, 'দ্যাখেন তো! সবই কী করছে আমার সঙ্গে?' জাহাঙ্গীর বুলার কাছে তার সেদিনকার প্রতিক্রিয়ার কথা বলে. 'বুঝলা বুলা, আমি হাঁক দিয়া কই, কী তোমরা পাইলা কী? ক্লাশমেটের সঙ্গে ইয়ার্কি মারো, রাস্তায় দেখলে তারে সাউন্ড দাও, এইগুলি কী? কলেজের বেইজ্জতি না?'

বুলা বলে 'তোমার সাহস তো কম না। এতগুলো ছেলেকে বললে, সবাই মিলে তোমাকে যদি ধরত? তোমাদের কলেজের যা নামডাক!'

'আরে, আমারে কে কী কইব? কলেজের আমি অ্যাথলেটিক সেক্রেটারি। মহল্লা কন্ট্রোল করি আমি—।'

ফের শুরু হলো। বুলা বলে, 'তারপর?'

তারপর কয়েকটা ছেলে এগিয়ে এসে তাকে বলে, 'জাহাঙ্গীর ভাই, আমাদের ধরার আগে বিচার চাই।'—বিচার? কীসের বিচার?—তাদের অভিযোগ খুব স্পষ্ট। তাদের ক্লাশমেট প্রিন্সিপ্যালের কাছে গেল কেন? প্রিন্সিপ্যাল সবাইকে অপমান করল, এর বিচার করবে কে? জাহাঙ্গীর ভেবে দেখল, তাও বটে। মেয়েটাকে সে ধমকায়, 'আপনে স্যারেরে কইলেন ক্যান? আমরা নাই?' মেয়েটি ভ্যাবাচ্যাকা খায়, দারুণ দাপটের ডাকু টাইপের লড়কি, তার গলা কাঁদো-কাঁদো হয়ে পড়ে, 'আপনিও তাই বললেন?'

বুলা জিগ্যেস করে, 'মানে তোমাকে আলাদা করে দেখে?'

'আরে আমি কী ঐ বিচ্ছুগুলির লগে হাউ-কাউ করি? আমি ক্লাশও করতাম না, জানিও না কোন ছেমরি কী পড়ে?'

'ক্লাস করনি তো বি. এ. পাস করেছ কীভাবে?' বুলার প্রশ্নের ভঙ্গিতে জাহাঙ্গীর একটু থতমত খায়। ছ-সাত দিন আগেও পরীক্ষার হলে ওর নকল করার বাহাদুরি নিয়ে খুব গল্প করেছে। স্যাররা ওর ভয়ে হলের ভেতর ঢুকত না, বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করে তিনটে ঘন্টা কাটিয়ে দিত। কিন্তু এখন ঐ গল্প করতে একটু বাধো-বাধো ঠেকছে, সে তার পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে যায়, 'আমি কই আপনে স্যারেরে কইয়্যা কামটা ভালো করেন নাই। পোলাপানে কয় আর জাহাঙ্গীর ভাই, আপনার কাছে কইলেও তো পারত।'

'কী করি? ছেমরিটা কাঁদতে আরম্ভ করল। আমি নিয়া রিকশায় উঠাইয়া দিলাম, তো কয়, আপনারেও যাইতে হইব। পাগল নাকি? এক রিকশায় তার বাড়ি যাই আর একটা কেলেঙ্কারি। আমি তখন কলেজের অ্যাথলেটিক সেক্রেটারি, বুঝলা না?'

গল্পটা কেবল জমে উঠেছে, এমন সময় এসে পড়ে বুলার বড়ো ভাই হাফিজ, পুরু লেন্সের চশমা পরে। ছাত্রও খুব ভালো, ফিজিক্সে ফার্স্টক্লাস পেয়ে অ্যাটমিক এনার্জিতে ঢুকেছে, অ্যামেরিকান ইউনিভার্সিটিগুলোতে একটার পর একটা দরখাস্ত পাঠাচ্ছে, লেগে গেলেই উড়াল দেবে। এমনিতে লোকটা ভালো, যখনি আসে হাতে জাহাঙ্গীরের প্রিয় মিষ্টির প্যাকেট। তবে গম্ভীর টাইপের এই লোকটার সঙ্গে জাহাঙ্গীরের ঠিক জমে না, সম্বন্ধীর সামনে জাহাঙ্গীর সব সময় উসখুস করে। হাফিজ আজ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে তার এক বন্ধুকে। এটার নকশা অবশ্য অন্যরকম। রোগা ও লম্বা, পাজামা, পাঞ্জাবি, চোখে চশমা নাই, মুখে পান, হাতে সিগারেট জ্বলছে। ড্রয়িংরুমে বসেছিল দুজন, জাহাঙ্গীর ঢুকতেই লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ায়, বুলার ভাই নাম বলে পরিচয় করিয়ে দেয়, 'আমার বন্ধু, নাম শুনেছেন নিশ্চয়, সরোদ বাজায়—'

জাহাঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'টিভিতে প্রায়ই দেখি।'

হাফিজ হেসে ফেলে, 'কী মুশতাক, তুমি কি আজকাল জনগণের মনোরঞ্জনে মগ্ন নাকি?'

'মুশতাক ভাইকে রেগুলার প্রোগ্রাম দিলে পাবলিক চটে যাবে না?' বুলা যে কখন এসেছে কেউ টের পায়নি। তার কথা শুনে মুশতাক চমকে ওঠে, একটা ঢোক গিলে হাসতে হাসতে বলে, 'আমাকে প্রোগ্রাম দেয় কোন শালা? তার চাকরি যাবে না?'

লোকটাকে জাহাঙ্গীরের ভালোই লাগছে। আসতে না আসতে কেমন সহজ হয়ে উঠেছে। আহা, টেলিভিশনে প্রোগ্রাম পায় না! মাঝে মাঝে প্রোগ্রামের ব্যবস্থা তো সে-ই করে দিতে পারে। চেনাজানা কয়েকজন আছে, একটু ধমক গিলে বাপ-বাপ করে প্রোগ্রাম দেবে। কিন্তু কথাটা কিভাবে পাড়বে ভাবতে ভাবতেই মুশতাক বলে, 'বুলা, কেমন আছো? তোমার বিয়েতে আসতে পারলাম না। কুমিল্লা গিয়েছিলাম। জানো বোধহয় সুনীলদার শরীর খুব খারাপ।'

'হ্যাঁ, শুনেছিলাম। এখন কেমন?'

'ভালো না।'

শুনে বুলার মুখটা ঝুলে পড়ে। জাহাঙ্গীর এদিক-ওদিক দেখে। কে এই সুনীলদা যার শারীরিক অসুস্থতার খবরে বুলা এভাবে ভেঙ্গে পড়ে! জাহাঙ্গীরকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসে মুশতাক, 'সুনীল সেনগুপ্ত। জানেন বোধহয় আমাদের দুজনের হাতেখড়ি হয় সুনীলদার হাতে। হারমোনিয়াম ধরতে শেখায় সুনীলদা। তখন কী রাগী ছিল, না? একটু এদিক-ওদিক হলে কী রকম ধমক দিত মনে আছে?'

আমাদের দুজনের বলতে মুশতাক কী বোঝাচ্ছে?—মানে মুশতাক আর বুলা?

—জাহাঙ্গীর একটু অস্বস্তিবোধ করে,—বুলা গানবাজনার চর্চা করে—এ খবর সে জানে, কিন্তু এই ব্যাপারে তার আবার সঙ্গীও আছে একজন, সে আবার তার ভাইয়ের বন্ধু—বুলা তো কোনোদিন বলেনি! কেন বলেনি?

'ধমক দেয়ার কথা কী বলছো? কিঞ্চিৎ উত্তম-মধ্যমও পিঠে পড়ত, সেটা কি ভুলে গিয়েছ?' হাফিজের মাইনাস পাঁচ লেন্স ও ভাঙ্গাচোরা গাল পেরিয়ে এই রসিকতা পড়তে না পড়তে বুলা খিলখিল করে হাসে, 'সেটা মুশতাক ভাইয়ের পিঠে। সুনীলদা আমাকে কখনো মারেনি।'

'তোমার পিঠটা অক্ষত কারণ সুনীলদা তোমার ব্যাপারে বেশিরকম উইক। এবারও বারবার জিগ্যেস করে, বুলা রেওয়াজ করে তো?' বলতে বলতে মুশতাক নিজেই প্রশ্নটা করে, 'রেওয়াজ করো না? আমি বললাম বুলা কী ছাড়তে পারে?'

জাহাঙ্গীর উসখুস করে। হাফিজ বলে, 'আর গান-বাজনা? মেয়েদের ব্যাপার, বোঝো না? বিয়েও হলো, গান-বাজনা, পড়াশোনা সব মাথায় উঠল। সেরকম পরিবেশ পেলে অবশ্য—'

জাহাঙ্গীর এবার উঠে দাঁড়ায়, 'আপনারা বসেন। আমি একটু আসি। এই যাব আর আসব, পাঁচ মিনিট।'

হাফিজ বলে, 'বসেন, আমাদের জন্য কিচ্ছু আনতে হবে না। বুলা চা করুক।' বুলার সঙ্গে জাহাঙ্গীরও রান্নাঘরে ঢোকে। এই মেয়েটাকে একটু আগে মনে হচ্ছিল নিজেরই হাত পা-নাক-কানের মতো। এখন এরকম অপরিচিত মনে হচ্ছে কেন? বুলা বলে, 'কোথায় যাবে? ভাইয়া তো মিষ্টি নিয়েই এসেছে।'

'তাই হয়? মেহমানের খাবার দিয়া মেহমানদারি চলে? দেখি হান্নানের দোকানে যাই। পাঁচ মিনিটও লাগবে না।'

'বাদ দাও। আমি চা করি, তুমি বরং ওদের সঙ্গে গল্প করো।' গল্পে সুবিধা করতে পারবে না বলেই জাহাঙ্গীর তাড়াতাড়ি বাইরে যেতে চাইছে। 'তুমি চা পরে কইরো। আমি দেখতে-দেখতে ব্যাক করুম।' বলে জাহাঙ্গীর আরো একবার বাথরুমে যায়। তারপরে বসার ঘরে ঢুকে ঠুকঠুক শব্দ করে ক্যাসেট বদল করে টেপরেকর্ডার চালিয়ে দিয়ে বলে, 'গান শোনেন। মাহমুদ শাহেদের এই রেকর্ড খুব হিট করেছে। আমার ফ্রেণ্ড। টিভিতে উইকে দুইটা-তিনটা প্রোগ্রাম করে।' বাংলা ভাষায় পপ গান বিকট জোরে বাজে ; পা পাছা পিঠ ও ঘাড় দোলাতে দোলাতে জাহাঙ্গীর উঠে বাইরে যায়। তার ভেস্পায় স্টার্ট দেওয়ার আওয়াজ এই উচ্চকণ্ঠ ধ্বনিসমষ্টিতে একটুও বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে না।

কাঁঠালপাতার ঠোঙা থেকে মোরগ-পোলাও প্লেটে সাজানো হয়। জাহাঙ্গীর নিজেও বুলাকে সাহায্য করে। এখন কী প্রসঙ্গ নিয়ে কথা শুরু করবে ভাবতে-ভাবতে জাহাঙ্গীর খেয়াল করল যে টেপরেকর্ডারটা বন্ধ। কী ব্যাপার? মাহমুদ শাহেদের এতগুলো গান।—'কী ব্যাপার? বন্ধ কইরা দিছেন?'

'হ্যাঁ, কথা বলছিলাম।' বুলার ভাইয়ের এই কৈফিয়ৎ জাহাঙ্গীরের আরো খারাপ লাগে। কথা বলছিল তো আমি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল কেন? মুশতাক বলে, 'মাহমুদ শাহেদ আপনার বন্ধু? এখন তো টপে আছে, না?' এবার জাহাঙ্গীরের জড়তা কাটে, 'হ্যাঁ। অনেকদিনের বন্ধু। আমরা একসঙ্গে একই ক্লাবে খেলাধুলা করছি। এখন এত ফেমাস হইয়াও পুরানো ফ্রেণ্ডদের ভোলে নাই।

কলেজে আমি অ্যাথলেটিক সেক্রেটারি ছিলাম। তো, অরে দুইবার ফাংশনে নিয়া গেছি। তারে দেইখা আর সব গান ক্যান্সেল করতে হইল। পোলাপানে আর কিচ্ছু শুনতে চায় না। তার গান শুইনা সমস্ত হল নাচতে শুরু করল। উই নিজেও নাচে, আমরাও নাচি। আরে তার গান শুনলে আমি তো চেক দিতে পারি না। নাচতেই হয়!' মুশতাক বলে, 'অনেক কষ্ট করে গান করে। বেচারাদের কোমরে ব্যাথা হয়ে যায়।'

'তা তো করেই। তবে কিনা অভ্যাস হইয়া গেছে।' জাহাঙ্গীর তার প্রিয় গায়কের নৈপুণ্যে একটু গর্ববোধ করে বৈ কি!

'বেচারাদের গলায় তো তেমন পরিশ্রম হয় না, সুর তালের জন্যেও কোনো পরোয়া না করলেও চলে। বেচারাদের খাটনি সব শরীরে।'

হাফিজ হো-হো করে হেসে ওঠে। জাহাঙ্গীরের থতমত-খাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে একটু সামলাবার চেষ্টা করে, 'কেন? টিভিতে তো দেখি বেশিরভাগই আজকাল শরীর দুলিয়ে গান করে।'

'সেজন্যেই ওদের গান বন্ধ করা উচিত নয়, গলা বা সুর তো এদের কাছে মাইনর ব্যাপার। তবে ধরেন গান বন্ধ করলে এদের বাত ধরে যেতে পারে।'

'বাত?' জাহাঙ্গীর অবাক হয়, কিন্তু হাফিজ ও বুলা দুজনেই হাসতে শুরু করে। মুশতাক গম্ভীর মুখ করে বলে, 'ওদের গান মানে তো ফিজিক্যাল মুভমেন্ট। গান বন্ধ হলে বাত হবে না? রিকশাওয়ালাদের শেষ জীবনে কী হয়?'

সবাই হাসে। জাহাঙ্গীরও হাসে, তবে ঠোঁটে হাসির দাগটা ফুটিয়ে তুলতে ওর জান বেরিয়ে যাবার দশা হয়।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে বুলা বলে, 'মুশতাক ভাইয়ের কথাবার্তা খুব ফ্রাঙ্ক, ঠিক তোমার মতো, না? যা মনে হয় তাই বলে। কেমন হাসাল আজ, দেখলে না?'

'বহুত মজা করল, গান-বাজনা করে না?'

'হ্যাঁ। সরোদ বাজায়। সুনীল সেনগুপ্তের খুব প্রিয় ছাত্র। মুশতাক ভাই খুব সিনসিয়ার আর্টিস্ট। ক্ল্যাসিক্যালের নিচে নামবে না। দেখলে না টিভির ওপর কেমন চটা?'

'প্রোগ্রাম না পাইলে চেতবো না? আরে একটা প্রডিউসারকে কইলেই তো প্রোগ্রাম দেয়। উনার পুরা নামটা কও তো।'

'না, না, উনি ইচ্ছা করেই প্রোগ্রাম নেন না। এইসব ন্যাকামো বাঁদরোমো ছ্যাবলামো মুশতাক ভাই সহ্য করতে পারে না।'

জাহাঙ্গীরের কাছে ব্যাপারটি স্পষ্ট হয় না। হাজার হাজার নরনারীর সামনে নিজেকে দেখাবার এরকম সুযোগ কি কেউ ইচ্ছা করে হারায়? বুলা তো মিথ্যা কথা বলে না। নিশ্চয়ই ঠিকঠাক জানে না। জাহাঙ্গীর বলে, 'একটা দুইটা প্রোগ্রাম পাইলেই দেখবা মুশতাক ভাইও নাচতে শুরু করবো, টিভির পর্দা ফাটাইয়া ফালাইবো।'

'বললাম তো মুশতাক ভাই অন্যধরনের লোক। সঙ্গীত উনার রক্তের মধ্যে, তাই ইয়ার্কি মারা সহ্য করতে পারে না।' বুলার কথা শুনে জাহাঙ্গীর একেবারে চুপ

করে যায়। কিছুক্ষণ পর বলে, 'তোমার আসলে বিয়ে হওয়া উচিত ছিল ঐসব হাই-থটের গান বাজনা করা লোকের সঙ্গে। আমি ঐগুলি বুঝি না।'

বুলার যেন চৈতন্য ফিরে আসে। জাহাঙ্গীরের পিঠে হাত রেখে বলে, 'তুমি রাগ করলে?'

'না, না। রাগ করিনি। গলা খাঁকরে সমস্ত এক্সট্রা রসালো ভাব ঝেড়ে ফেলে জাহাঙ্গীর বলে, 'রাগ করব কেন? মানে আমি তো এইসব ঠিক বুঝি না। তোমাদের ঐসব গান বাজনায় আমার ইন্টারেস্ট নাই। ধরো ঐ লাইনের মানুষকে বিয়ে করলে তোমাকে হেলপ করতে পারত, মানে একই লাইনের হাজব্যাণ্ড-ওয়াইফ হলে—!'

'এসব কথা আর বলবে না!' বলতে-বলতে বুলা ডানহাতের চারটে আঙুল দিয়ে জাহাঙ্গীরের ঠোঁট চাপা দেয়। একটু আগে পাঙ্গাশ মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়েছে, বুলার হাতের আঁষটে গন্ধ নাকে থাপ্পর মারলে নিশ্বাস বন্ধ করে জাহাঙ্গীর বুলার আদর নেয়। বুলা বলে, 'আমি ঠিক এইরকম লোকই চেয়েছি। এইরকম হাসিখুশি, এইরকম কাজের লোক, এইরকম ফিগার, হেঁটে গেলে মাটি কাঁপে—এই আমার ভালো!'

'তবে ধরো আমার পক্ষে গান বাজনার ব্যাপার—।'

'আবার! চোপ!' বুলার হাত আরো চেপে বসে, 'ঐসব লোক গুণীলোক, ওদের খুব শ্রদ্ধা করি, কিন্তু ওদের ভালোবাসা মুশকিল। বুঝলে না, রাতদিন বিছানার ওপর বসে খালি রেওয়াজ করে, বাইরে যায় না—এসব পুরুষমানুষের সঙ্গে ঘর করা যায়?'

জাহাঙ্গীরের কোনো সাড়া না পেয়ে বুলা ফের বলে, 'একই লাইনের হাজব্যাণ্ড-ওয়াইফের কথা বলছ? তুমি তাহলে গুলশানের মেয়েটাকে বিয়ে করলে না কেন? এইবার বলো তো?'

জাহাঙ্গীর কী বলবে? গুলশানের মেয়েটিকে বিয়ে করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তবে ওরকম কোনো মেয়ের সঙ্গে সত্যি সত্যি আলাপ থাকলে মাঝে মাঝে যাওয়া যেত। বুলা বলে, 'বলো তো, এইসব গুণীলোক কি তোমার মতো এরকম বেপরোয়া মোটর সাইকেল চালাতে পারে?'

বুলার আঙুলে জাহাঙ্গীর চুমু খায়। এমনকি তার তর্জনী নিয়ে একটু চুষতেও শুরু করে। বুলা ফের বলে, 'বলো ওরা পারে?'

জাহাঙ্গীর এবার আত্মসমর্পন করে, 'আমাদের হিপ-হিপ-হুররেও আমার ভেস্‌পা চালাবার ভঙ্গি দেখেই ধরে ফেলল।'

'ও হ্যাঁ, গল্পটা শেষ করলে না? ভাইয়েরা এসে সব মার্ডার করল।'

মহা-উৎসাহে হিপ-হিপের গল্প শুরু করলেও এবার তেমন জমে না। সেই যে সাউন্ড-মারা ছেলেদের হাত থেকে উদ্ধার করে জাহাঙ্গীর তাকে রিকশায় উঠিয়ে দিল এরপর থেকে—

'তা মেয়েটার সঙ্গে তোমার যোগাযোগ কেটে গেল কী করে?' গল্পটা তো আগেও শোনা হয়েছে। সেই স্মৃতি থেকে বুলা এই প্রশ্ন করে।

কিন্তু জাহাঙ্গীর এবার অন্যরকম কথা বলে, 'যোগাযোগ বন্ধ হইবো ক্যান? না মানে ধরো, একই ক্লাসে পড়ি, রোজ দেখা হয়। আবার কোনো অসুবিধা হইলে আমারেই ধরত।' বলতে বলতে জাহাঙ্গীর একটু লাজুক মতো হাসে, 'ছেলেরা একটু ঠাট্টাও করত। একবার পিকনিক করতে গেলাম চন্দ্রা, আমরা কয়জন হাঁটতে-হাঁটতে একটু নির্জন ঝোপের দিকে গেছি তো হঠাৎ দেখি, বুঝলা আমাগো দুইজনের একলা ফালায়া বিচ্ছুগুলি কৈ ভাগছে। আমরা হাসি। ইসে কয়, 'আরে বসো না।'

'তোমার নিশ্চয়ই ভালো লাগল।' বুলা প্রায় উঠে বসে।

'তা অস্বীকার করতে পারব না, একটু ভালো তো লাগতই।'

'সত্যি? ডুবে ডুবে জল খেয়েছ না?' বুলা আরো শোনার জন্য উদগ্রীব। এই গল্পের আগেকার ভার্সনে কিন্তু জাহাঙ্গীরের সঙ্গে হিপ-হিপের এতটা মাখামাখি বা পিকনিক এইসব ব্যাপার ছিল না।

'আমাকে বলে, আমাদের বাসায় তো আসলেন না। আমার মা আর বড়ো আপা আপনাকে দেখতে চায়।'

'মানে মেয়েটি তাহলে বাড়িতেও সব বলেছে।' বুলার এই উদ্বিগ্ন জবাবে জাহাঙ্গীর বলে, 'মনে হয়।'

'তুমি ওদের বাসায় গেছ?'

'আমি' জাহাঙ্গীর একটু ভেবে বলে, 'বাসায়-টাসায় যাইতে ভালো লাগে না। মেয়েদের বাসায়-বাসায় ঘোরা, কার্পেটের উপরে বইসা হারমোনিয়াম একখান লইয়া প্যাঁ-প্যাঁ করা আমার পোষায় না।'

বুলা কিছু বলে না। জাহাঙ্গীরের কথায় এ-ধরনের ঝাঁঝ আগে কখনো দেখেনি। জাহাঙ্গীর বলতেই থাকে, 'মেয়ে ক্লাশমেটের বাড়ি গিয়ে ডাক দিমু ও মিনু, ও ডলি, একটা গান ধরো তো! তারপর শিঙাড়া, চানাচুর, চা খাইয়া ঘরে ফেরা—এইগুলি পুরুষমানুষের কাম না, বুঝলা? এইগুলি করে হিজড়ারা, বুঝলা? হঠাৎ বেড-সুইচে খুট করে শব্দ হয়, ঝলমলে আলোয় জাহাঙ্গীর ঝুঁকে বুলার মুখ দেখে। ফর্সা মুখ কাগজের মতো ফ্যাকাশে, 'কী হলো?'

'তোমার মুখটা দেখতে ইচ্ছা করল।' বুলার জন্যে তার মায়া হয়, হাজার হলেও মেয়েমানুষ, এভাবে কথা না বললেই পারত। কিন্তু তাকে চুমুও খায় না। মেরামত করার চেষ্টা করে এইভাবে, 'তোমার গালের রঙ এত সুন্দর।'

চোখ বন্ধ করে বুলা হাসে, 'তারপর?'

জাহাঙ্গীর একটানা কথা বলে। মেয়েটির সঙ্গে সে দু-একবার চাইনীজও খেয়েছে। কিন্তু মেয়েদের মন বুঝে চলা তার স্বভাবে নেই। সে ছিল কলেজের অ্যাথলেটিক সেক্রেটারি, কত ছেলে কত মেয়ের সঙ্গে তার মেলামেশা করতে হয়। একটি মেয়েকে নিয়ে হিপ-হিপ তাকে সন্দেহ করতে শুরু করে। অথচ দেখো মেয়েটার সঙ্গে এমন কিছু মাখামাখি হয়নি—তার বড়ো ভাই ছিল জাহাঙ্গীরের বন্ধু, একদিন এসে বলে, দেখ্ তো, আমার বোনটা ভর্তি হতে পাচ্ছে না, দেরি করে ফেলেছে, দে না তোদের কলেজে ম্যানেজ করে। তা সে হলো কলেজের

অ্যাথলেটিক সেক্রেটারি, প্রিন্সিপ্যালকে গিয়ে বলে 'স্যার খেলাধুলা করে, এই মেয়েটাকে চাই।' নাজমা তো অবাক। জাহাঙ্গীরকে ডেকে 'আমি খেলাধুলা করি আপনাকে কে বলল?' জাহাঙ্গীর বলে, 'নাজমা—'

'সেদিন না বললে পারভীন?' বুলা হঠাৎ বাধা দিলে জাহাঙ্গীর দমে যায়।

'পারভীন? ও এর কথা বলেছি?'

'বলনি? বলেছ। আগে তোমার হিপ-হিপের কথা বলো। আমার ঘুম পাচ্ছে।'

এইসব গল্প শুনতে তার ঘুম পায়? জাহাঙ্গীর একটু থেমে ফের শুরু করে। তারপর অনেকদিন কোনো যোগাযোগ ছিল না। মাস তিনেক আগে জাহাঙ্গীর খুব স্পীডে ভেস্‌পা চালিয়ে রামপুরা যাচ্ছে, মালিবাগে পুলিস-বক্সের ভেতর থেকে একদল মহিলা-পুলিশ ট্রাকে ওঠার জন্যে বেরিয়ে আসছে। এদের একজন হঠাৎ তার দিকে বাঁশি বাজিয়ে হাত তোলে। ভেস্‌পার ব্রেক কষতেই সামনে এসে বলে, 'এত ওভারটেক করতে চান কেন? দেখি লাইসেন্স। দেখি।' মহিলা-পুলিশের ধৃষ্টতা দেখে জাহাঙ্গীরের মাথায় রক্ত চড়ে গেল। কী সাহস! চোখমুখ লাল করে জাহাঙ্গীর তার দিকে তাকালে পুলিশ ফিক করে হেসে ফেলে। আরে এ তো শালার সেই হিপ-হিপ-হুররে।—'কী জাহাঙ্গীর, কোথায় যাও?'—বুলা একটু সংশোধন করার জন্য উসখুস করে। কারণ এর আগে গল্পটা বলার সময় সংলাপে মেয়েটি জাহাঙ্গীরকে 'জাহাঙ্গীর ভাই' বলে সম্বোধন করেছিল এবং তাকে আপনি করে বলেছিল—কিন্তু জাহাঙ্গীরের বাক্যবেগে বাধা দেওয়া যায় না। তার বাক্যধারা তুমুল প্রবাহিত হয়, 'আমি জিগাই তুমি?—আমি তো পুলিশে ভর্তি হইছি—খুব ভালো।—তুমি কৈ যাও? জানো তোমারে আমি এক্ষুণি অ্যারেষ্ট করতে পারি—তা তো পারই, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে অ্যালিগেশন কী?—চলো, তোমার সঙ্গে যাবো, যাইতে যাইতে বলবো।—তারপর সে করল কী আমার পেছনে উইঠা আমারে জাপটাইয়া ধরল।' বুলা এখানেও তাকে একবার থামাতে পারত। পরশুদিন বলার সময় এই পর্যন্ত ছিল, 'চলেন, আপনার সঙ্গে যাব।' কিন্তু জাহাঙ্গীর তাকে নেয়নি, 'না, আজ একটু কাজ আছে, আরেকদিন আসব।' জাহাঙ্গীর তাকে রেখেই স্পীডে মোটর সাইকেল চালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন জাহাঙ্গীরকে থামানো অসম্ভব।

'আমারে কয় তোমার বিরুদ্ধে অ্যাবস্কন্ডিং হওয়ার অ্যালিগেশন। তোমাকে আমি সব জায়গায় খুঁজি—কেন আবার কী? তোমাকে চাই।' আবার কি আলো জ্বালাবে? বুলার মুখটা দেখা যেত। কিন্তু সুইচে হাত দেয়ার আগেই বুলার মিহি স্বরের নিশ্বাস শোনা যায়। আরে, এ তো ঘুমিয়ে পড়েছে! তার পাতলা ফর্সা রোগা হাতটা জাহাঙ্গীরের ঘাড়ের ওপর আলগোছে রাখা।—হাতটা ধরে জাহাঙ্গীর পাশে রেখে দেয়, নিজেও শোয়, একটু দূরে সরে। এই মেয়েটা স্বামীর প্রেমের গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে। জাহাঙ্গীরের ব্যাপারে কি তার কোনো মনোযোগ নেই? জাহাঙ্গীর উঠে বাথরুমে যায়। ফের এসে খাটের ধারে বসে থাকে। মনে হয় একা শুয়ে থাকাটা অনেক আরামের। এইটুকু সেমি-ডবল খাট, সেখানে দুজনে ঘুমানো? বিশ্রী!—কাল ভোরবেলা বেরিয়ে যাবে,—সারাদিন, এমনকি রাত্রি পর্যন্ত অফিসের কাজ করবে। কত কাজ বাকি পড়ে আছে। বায়তুল মোকাররম-গুলিস্তান এলাকার

বড়ো দোকানদাররা দেশি ফার্মের ওষুধ রাখতে চায় না। তাদের কনভিন্স করা দরকার। ম্যানেজিং ডিরেক্টর দিন দিন তার ওপর বিরক্ত হয়ে উঠছে, 'অর্ডার আসে না কেন? কবীর অর্ডার আনে, বেলাল অর্ডার আনে, তুমি করো কী?' কবীর কী বেলাল তো তার মতো এরকম এলিয়ে পড়েনি। সকাল নেই বিকাল নেই রাত নেই—বৌয়ের সঙ্গে ম্যাদামার্কা ছেলেদের মতো দিনরাত কেবল ফুসুর ফুসুর করবে তো অর্ডার আনবে ওর কোন বাবা?—তাও যদি মেয়েটা ওকে বিশ্বাস করত—তা বুলা ওকে বিশ্বাস না করলে সে কী করতে পারে? দোষ তো শালার মহিলা-পুলিশের। হিপ-হিপ-হুররে যদি সত্যি সত্যি ওকে ডেকে একটু কথা বলত তা হলে বুলা কি অবিশ্বাস করে এত সহজে পার পায়? হিপ-হিপ-হুররে কি তার সঙ্গে পড়ত না? তারা কি এই মেয়েটিকে হিপ-হিপ-হুররে উপাধি দেয়নি? তবে অবশ্য কলেজে পড়তে কোনো মেয়ের সঙ্গেই জাহাঙ্গীরের কথাবার্তা হয়নি। না, হিপ-হিপের সঙ্গেও হয়নি। তো, পুলিসে পরিণত হওয়ার পর কথা বললে মেয়েটার কী এমন ক্ষতি হতো?

সকালে ঘুম ভাঙে তার বেশ দেরিতে। মুখ ধুয়ে এসে দেখে চা-টা সাজিয়ে অপেক্ষা করছে বুলা। এর মধ্যেই বুলার গোসল-টোসল সারা। তার খোলা ভিজে কালো চুলের মধ্যে ফর্সা মুখটা ভারি কচি ও নিষ্পাপ। কী সুন্দর না? ভেস্পায় স্টার্ট দিতে দিতে জাহাঙ্গীর ঠিক করে, বিকেলবেলার আগেই ঘরে ফিরবে। বুলাকে ধরে ঠেসে চুমু খাবে। তারপর ওকে পেছনে বসিয়ে নিয়ে অনেক দূর ঘুরে আসবে। মালিবাগের ওদিকটাও যাবে। পুলিশবক্সে মেয়েটা থাকলে চোখজোড়া মেলে একটু দেখবে। দেখানো দরকার।

কিন্তু বিকেলবেলা ভেস্পার আওয়াজে বুলা বেরিয়ে এলে ওর মুখটা ভার-ভার ঠেকে। কী ব্যাপার? মুশতাক ভাই এসেছিল। আবার মুশতাক ভাই?—দুর! ফার্মেসিগুলো একবার ঢুঁ মেরে এলে হতো, কিছু না কিছু অর্ডার কি আর পেত না?—কেন, মুশতাক ভাই কেন? সুনীলদাকে আজ সকালে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়েছে, মেডিক্যাল কলেজে আছে। বুলা এক্ষুণি দেখতে যাবে। জাহাঙ্গীরকেও যেতে হবে।—আবার সুনীলদা! আবার মুশতাক ভাই!

'আমি কী করব? তুমি যাও।'

'ওমা! তাই কি হয়? সুনীলদা তোমাকে দেখবে না? আমাদের ছোটেবেলার গানের ওস্তাদ। আমাকে কী আদর করতো!'

'যাব?' জাহাঙ্গীর চা খেতে খেতে বলে, 'কিন্তু আমার তো অফিসের খুব জরুরি কাজ। তোমারে বরং মেডিক্যালে নামাইয়া দিয়া যাই।'

'ফিরব কী করে?'

'একলা আসতে পারবা না? মুশতাক সাহেব পৌঁছাইয়া দিতে পারব না?'

'থাক। আমার আর গিয়ে কাজ নেই।' বুলার একটু ভিজে গলার স্বর ও একটু ঝাপ্সা নোনতা চোখের কোঁচকানোটা এত সুস্বাদু লাগে যে জাহাঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে কাত হয়, 'আচ্ছা চলো।'

ভেস্‌পার পেছনে বসে বুলা বকবক করে যাচ্ছিল, কথা একবার শুরু করলে মেয়েটা থামতে পারে না। কথাও বলে এত মিষ্টি করে, এর আগে এ-রকম মিষ্টিভাষায় কথা-বলা মেয়ের সঙ্গে জাহাঙ্গীর কোনোদিন আলাপ করেনি। জাহাঙ্গীর সিনা টান করে মাথা সোজা রেখে ভেস্‌পা চালায়। বুলা একনাগাড়ে কত কথা বলে। বেশিরভাগই তাদের ছেলেবেলার কথা। খুব ছেলেবেলায় তারা কুমিল্লায় থাকত।—সুনীল সেনগুপ্ত না থাকলে তার গান শেখাই হতো না।—মুশতাক থাকত তাদের পাশের বাড়ি। তারা একসঙ্গে গান শিখেছে।—কুমিল্লা কী সুন্দর শহর, ঢাকার মতো এ-রকম মানুষ গিজগিজ করে না—ঢাকায় সুনীলদার মতো লোক একটাও নেই।—বেচারা বিয়ে-থা করেনি।—এখন বয়স ষাটের কোঠায় পড়েছে, দেখার লোক নেই একটাও—দেখো, বিধবা বড়োবোনও ছেলেমেয়েদের মানুষ করার জন্যেই বিয়ে করল না, অথচ ভাগ্নে-ভাগ্নীগুলো চাকরি নিয়ে বিয়ে করে সব ড্যাং-ড্যাং করে চলে গেল ইণ্ডিয়ায়, এখন তাকে দেখবে কে?—বুলাকে এত ভালোবাসত, এত যত্ন করে গান শিখিয়েছে, বলত, তুই কোনোদিন গান ছাড়িস না।—সুনীলদা যদি শোনে যে বুলা গান ছেড়ে দিয়েছে তো এত কষ্ট পাবে। জাহাঙ্গীর ভাবে, কেন? বুলা গান ছাড়বে কেন? বুলাকে তার বলতে ইচ্ছা করে, তুমি গান শিখতে চাও, শেখো। যতো টাকা লাগে আমি রোজগার করে আনব। দরকার হলে কোথাও পার্ট-টাইম কাজ নেব। দেশের বেস্ট ওস্তাদকে রেখে দেব। তোমার কথা এত মিষ্টি, এই কথায় সুর দিলে না জানি কী সৃষ্টি হবে—কিন্তু এসব কথা বলাটা মুশকিল। এ ছাড়া মেডিক্যাল কলেজের গেটও এসে পড়ে। দোতলায় ওয়ার্ডের এককোণে নাকে অক্সিজেনের পাইপ-গোঁজা রোগা সুনীল সেনগুপ্তকে দেখে জাহাঙ্গীরের বুক উথলে ওঠে। হায় রে, মানুষটা একেবারে নি—সঙ্গ শুয়ে রয়েছে! বুলা পায়ে হাত রেখে সালাম করলে জাহাঙ্গীরও নি—শব্দে তাকে অনুসরণ করে। সুনীল সেনগুপ্ত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে মুশতাক এসে পড়ে, তার হাতে ফ্লাস্ক। মুশতাক ঝুঁকে বলে, দাদা, বুলার হাজব্যাণ্ড, চিনতে পেরেছেন? সুনীলদার ঠোঁট কাঁপে, ঠোঁটে হাসির চিকন একটি রেখা তৈরির চেষ্টা তার ব্যর্থ হয়।

নার্স এসে টেম্পারেচার নেয়, খাটের মাথায় ঝোলানো চার্টে লেখে। স্ট্যান্ডে ঝোলানো ব্যাগ থেকে নল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা স্যালাইন ঢুকছে সুনীলদার হাতের শিরায়। জাহাঙ্গীর টুলে বসে চুপচাপ দেখে। অন্য হাতের তালুতে জাহাঙ্গীর একটা হাত রাখে। সুনীলদার হাত ও আঙুল একটু একটু কাঁপে। আঙুল দিয়ে লোকটা জাহাঙ্গীরকে কী বলছে? হয়তো বলছে, 'বুলার গলা একেবারে তৈরি, গান ওর রক্তের মধ্যে। তুমি দেখো।'—জাহাঙ্গীরের চোখ ছলছল করে। আস্তে আস্তে উঠে দেখে, বুলা কিংবা মুশতাক ঘরে নেই। কোথায় গেল? মস্ত বড়ো ওয়ার্ডের এ-মাথা থেকে ও-মাথা—কোথাও নেই। পেছনের দিককার বারান্দায় বুলার শাড়ি দেখা যাচ্ছে। জাহাঙ্গীর বারান্দায় যায়। রেলিঙে ঝুঁকে দুজনে কাঁদছে। জাহাঙ্গীরকে দেখে

বুলা কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'সুনীলদার গলায় ক্যান্সার। বাঁচবে না।' মুশতাকও রুমাল দিয়ে চোখ মোছে, ক্যান্সার প্রথম দিকে ধরা পড়লেও ট্রিটমেন্ট করা যেত। সেবার কুমিল্লা গেলাম, কত বললাম, সুনীলদা, ঢাকায় চলেন। ভালো করে ডাক্তার দেখান। না—একটা ভালো ছেলে পাওয়া গেছে, গলাটা এত মিষ্টি। ওকে একটু দেখিয়ে দিয়ে তারপর যাব।—এখন এসে কী লাভ হলো?' বুলাও কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'কেন? আমাদের একটা দিন কামাই দিতে দিত না। মুশতাক ভাই, মনে নাই?'—জাহাঙ্গীরের ছলছল চোখ থেকে জল বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, চোখ বড়ো-বড়ো করে সে এদের একই বেদনা ও একই স্মৃতির ছোঁয়াছুঁয়িটা দেখে, তার চোখ খটখটে হয়ে আসে। হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে কী মনে পড়ে তার, বলে, 'বুলা ভুল কইরা আমার অফিসের চাবি নিয়া আসছি। যাই, পিওনটারে দিয়া আসি। না হইলে কাল ওরা বিপদে পড়বে।'

মুশতাক ও বুলার নীরব কান্না অব্যাহত থাকে। জাহাঙ্গীর ফের বলে, 'মুশতাক সাহেব কষ্ট কইর‍্যা বুলারে একটু পৌঁছাইয়া দেবেন।'

বুলা বলে, 'চলো, আর দশ-পনেরো মিনিট পরে একসঙ্গে যাই।'

'না-না, উনারে একলা ফালাইয়া যাইবা? থাকো না, কিছুক্ষণ থাকো।'

'ছ'টার পরে থাকতে দেবে না, চলো।'

'আরে রাখো! কে থাকতে দেবে না?' জাহাঙ্গীরের আবার কলেজের অ্যাথলেটিক সেক্রেটারি হয়ে যাবার উপক্রম হয়, 'ক্যাঠায় কী কইবো? আমি মেট্রনরে বইলা যাই।'

ভেস্‌পায় স্টার্ট দিতে দিতে জাহাঙ্গীর শিস দেয়, হাম-তোম এক কামরেমে বন্দ হ্যায় আওর চাবি খো যায়—হাতের মুঠোয় স্পীড দিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে চলে আসে মতিঝিল। অফিসের কথাটা যখন বলেছে এদিকে একবার ঘুরে যাওয়াটা উচিত। অফিসের সামনে একটা চক্কর দিয়ে বাঁদিকে গিয়ে স্টেডিয়ামের পিছন দিয়ে বায়তুল মোকররমের পেছনটাকে বাঁয়ে রেখে জাহাঙ্গীরের ভেস্‌পার চাকাজোড়া মোড় নিল বিজয়নগরের রাস্তায়। এই রাস্তায় শেষ মাথায় ট্রাফিক সিগনালের লাল আলো জ্বলে উঠলে জাহাঙ্গীর ভেস্‌পা থামায়। এটার দরকার ছিল না, কারণ সে তো যাচ্ছে বাঁদিকে। তবে ধীরে-সুস্থে যাওয়াই ভালো। কাকরাইলের মোড় ঘুরে শান্তিনগর চৌরাস্তায় এসে সিগন্যালে নীল আলো থাকা সত্ত্বেও ওর স্পীড একেবারে জিরোতে নামে। তবু মালীবাগের পুলিশবক্স এসে পড়ে। পুলিশবক্সের একটু সামনে গিয়ে জাহাঙ্গীর ভেস্‌পা থামিয়ে রাস্তায় নামে। পুলিশবক্সের বারান্দায় কেউ নেই। ভেতরে? না, ভেতরে কোনো মহিলা-পুলিশ নেই। তার শরীরে স্বস্তির হাওয়া খেলে। তবু ভালো করে দেখা দরকার। বারান্দায় উঠলে একজন পুলিশ বলে, 'কী ভাই?' জাহাঙ্গীর বলে, 'টেলিফোন করব।' 'টেলিফোন নষ্ট।' জানলা দিয়ে ভেতরটা ভালো করে দেখে জাহাঙ্গীর ভেস্‌পায় ফেরে। না—ভালোই হলো। মেয়েটা থাকলেই বা কী হতো? ওর সঙ্গে জীবনে কোনদিন সে কথাও বলেনি। এর মধ্যে একদিন এদিক দিয়ে যাবার সময় দেখে কি, আরো কয়েকজন

মহিলা-পুলিশের সঙ্গে ট্রাকে ওঠার সময় তার দিকে বারবার তাকাচ্ছে। তা তো হতেই পারে। যারা কলেজে তাকে হিপ-হিপ-হুররে বলে সাউন্ড মারত জাহাঙ্গীর তাদের একজন গৌণ সদস্য ছিল। তো, এখন দেখা হলেই বা তাকে কী বলত? কলেজে থাকতেই কথা বলা হলো না, আর অ্যাদ্দিন পর এখন সে কী বলবে? তা বলতে পারত, আমাকে চিনলেন না? এখনো কি মস্তান পোলাপানের দলে পেছনে দাঁড়িয়ে মেয়েদের টিটকারি দেন নাকি? এখন কিন্তু আমি অ্যারেস্ট করতে পারি জানেন?' তা অ্যারেস্টেড হতে ওর আপত্তি কী? তারপর ওরা না হয় ট্রাকের ওপর উঠেই কিছুক্ষণ গল্প করত। আর কিছু না হোক বাংলার ইয়াসিন স্যারের তোতলামো নিয়ে হাসাহাসি করতে পারত। না, এতকাল পর ইয়ার্কি-ফাজলামো ভালো না। ঠিক আছে, তাহলে ওদের হিস্ট্রি পড়াতেন আজম সাহেব, খুব ভালো পড়াতেন, লোকও খুব ভালো, বছরখানেক হলো মারা গেছেন, তাঁকে নিয়ে মন খারাপ করতে কী আপত্তি ছিল? আজম সাহেব কীভাবে মারা গেছেন? মনে হয় ক্যান্সার হয়েছিল। ক্যান্সার? কোথায়? বোধহয় গলায়। ট্রাকের রেলিঙে ঝুঁকে দুজন কথা বলত, দুজনের চোখে জল, নিজের শরীরের দিকে স্যারের কোনো খেয়াল ছিল না। তোমার মনে নাই হিপ-হিপ—দুর নামটাও মনে নেই।—নাঃ হলো না। তারা একসঙ্গে মন খারাপ করবে কী নিয়ে? জাহাঙ্গীরের ভেস্‌পা চলছে ভোঁ ভোঁ করে। রেলগেট বন্ধ বলে ব্রেক কষতে হয়। আরে মহাখালি এসে গেছে! তাহলে গুলশান-বনানীটা একবার ঘুরে আসা যাক।—গুলশান-বনানীর ছোট-বড়ো রাস্তাগুলো ছবির মতো পেছনে সরে যায়। কিন্তু শাহীন না শাহনাজ—বুলাকে সে কোন্ নামটা যেন বলেছে—তার বাড়ি তো তার চেনা নেই। মেয়েটাকে একদিন দেখেছিল স্টেডিয়ামে। একদিন কি দুদিন। খালেক ভাই দেখিয়ে দিয়েছিল, 'শটপুটে এবার মেয়েদের মধ্যে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ান হবে, দেখিস।' আরেকদিন খালেক ভাই আর কাউকে, না তাকে নয়, বলেছিল, 'আরে ওরা বাড়িতেই প্র্যাকটিস করে। গুলশানে বিরাট বাড়ি, সবরকম খেলার অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে।'—তা কোন্ বাড়ি, কার বাড়ি, কত নম্বর রোড, কত নম্বর প্লট—কিছুই জানে না। দাঁড়াবে কোথায়?—সুতরাং অ্যাবাউট টার্ন।—দুই নম্বর মার্কেটের সামনে ছয়নম্বর বাস; এই বাসে করেই না জাহাঙ্গীর পালিয়ে গিয়েছিল ওর নাছোরবান্দা প্রেমিকার বাড়ি থেকে। সুতরাং এই বাসের পেছনে সে ভেস্‌পা চালায়। বাস যেখানে দাঁড়ায়, সেও একটু দাঁড়ায়। কিন্তু পুরনো এয়ারপোর্টের কাছাকাছি এসে ধৈর্য থাকে না। বাসটাকে ওভারটেক করে চলে যায়। একটু দূর থেকে ফার্মগেটের ওভারব্রীজের গায়ে লেখা বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। কিন্তু একটি বর্ণও তার মাথায় ঢোকে না। হঠাৎ করে স্পীড বাড়িয়ে মগবাজার দিয়ে মালিবাগ এসে পড়ে। না, পুলিশবক্সের সামনে দাঁড়িয়ে লাভ কি? মেয়েটার নামটাও যদি মনে রাখত! তবে? সুতরাং ভেস্‌পার চাকাজোড়া তার কেবল গড়িয়েই চলে।

রচনাকাল : ১৯৭৯

ফোঁড়া

রিকশাটা এসে দাঁড়াল মামুনের গা ঘেঁষে, 'যাবেন?'

'কাটনারপাড়া।'

'চলেন।'

'কত? করোনেশন স্কুলের পেছনে।'

'ওঠেন না। ভাড়া যা দেন তাই দিবেন।'

রিকসা পেতে মামুনকে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো পাক্কা পনেরো মিনিট। অথচ হাসপাতালের গেটের উল্টা দিকে শিরীষ গাছের নিচে চার-পাঁচটা রিকসা। প্যাসেঞ্জারের সিটে বসে ঠ্যাংগুলো নিজেদের আসনে ফিট করে বাঁ হ্যাণ্ডেল পর্যন্ত সম্প্রসারিত করে রিকশাওয়ালারা বিড়ি টানে, যানবাহন ও পথচারীদের দেখে, নিজেদের মধ্যে গপ্পো মারে। দুই-একজন যেতে রাজি হয় তো ভাড়া হাঁকে দ্বিগুণ-তিনগুণ। ঘন্টাখানেক আগে মামুন অবশ্য আরো-বেশি ভাড়া দিয়ে হাসপাতালে এসেছে। তখনো রিকশার জন্য হাঁটতে হয়েছে আধমাইল। রাস্তায় তখন মেলা রিকশা, কিন্তু প্রত্যেকটিতে প্যাসেঞ্জার, কোনো-কোনোটায় তিনজন এমনকি একটিতে চারজন পর্যন্ত লোক বসে ও দাঁড়িয়ে মহা হৈ চৈ করতে করতে যাচ্ছে। মামুনের হাতের এই টিফিন ক্যারিয়ারের তিনটে বাটিই তখন পোলাও, কোর্মা, টিকিয়া এবং সেমাই-জর্দায় ঠাসা। তাতে কোনো অসুবিধা হয়নি। রিকশা না পেলে হেঁটে হেঁটে হাসপাতাল চলে আসত। তাড়াতাড়ি করতে হলো নইমুদ্দিনের কথা ভেবে। ঈদের দিন বেচারা নামাজও পড়তে পারল না, ছেলেমেয়েও সঙ্গে নাই,—ভালোমন্দ কিছু মুখে পড়লে ফাটা মাথা নিয়ে হাসপাতালে থাকার দুঃখ খানিকটা লাঘব হয়।

কিন্তু হাসপাতাল থেকে ফেরার সময় মামুন কিছুতেই বেশি ভাড়া দেবে না। রিকশা পেতে দেরি হয় আর সংকল্প ক্রমে শক্ত হয়ে ওর মুখের শিরা-উপশিরাগুলোকে আড়ষ্ট করে তোলে। এর কারণ স্পষ্ট নয়। তবে অনুমান করি নইমুদ্দিনকে না পেয়ে ওর মেজাজ বেশ ভেতর থেকে খিচড়ে গেছে।

রিকশায় ওঠার পর মামুনের চোখমুখের বাঁধন শিথিল হয়। রিকশাটা চলছে রাস্তার এক পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে। এটা বরং ভালো। লোকটা রিকশাই চালাচ্ছে, রিকশার প্যাডেলকে ট্রাকের গিয়ারের গৌরব দেওয়ার চেষ্টা করছে না।

আস্তে আস্তে প্যাডেল ঘোরাতে ঘোরাতে রিকশাওয়ালা তার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়, 'হাসপাতালে আসিছিলেন কিসক?'

'কাজ ছিল।'

মামুনের সংক্ষিপ্ত জবাবে রিকশাওয়ালা দমে না, 'হামাক চিনলেন না? নুইমুদ্দি হামার মামাতো ভাই।'

মামুন চিনতে পারল না।

'আপনার মনে নাই? তার এই খবর পায়া হামিই তো তার বৌ-ব্যাটা-বিটিকে লিয়া হাসপাতাল আসিছিনু, আপনার মনে নাই?'

না, মামুনের মনে নাই। তবে নইমুদ্দিনের আত্মীয় হওয়ায় এই লোকটার ওপর রাগটা ঝাড়া যাবে বলে মামুনের রগটগগুলো আরেকটু শিথিল হয়।

'নইমুদ্দিন হাসপাতাল থেকে পালাল কেন?'

'পলাবি কিসক? ছোলপোলের সাথে ঈদ করব্যার বাড়িত গেছে?'

'ঈদ করার জন্যে হাসপাতাল থেকে রোগী বাড়ি যেতে পারে?'

'ছুটি লিয়া গেছে।'

'এ কী অফিস না কারখানা যে ছুটি নেবে? এই শরীর নিয়ে হাসপাতাল ছাড়ল, অবস্থা কী হতে পারে, জানো?'

রিকশাওয়ালা চুপসে গেল। কিন্তু মামুনের রাগ কমে না। ঈদের দিন, তার বাড়ি-ভরা আত্মীয়স্বজন। এমনকি পার্টির নেতা ঢাকা থেকে এখানে এসেছে শ্বশুরবাড়িতে ঈদ করতে, যে-কোনোসময় পার্টির ওয়ার্কারদের নিয়ে তার বাড়িতে আসতে পারে। আর সে কিনা তড়িঘড়ি করে আম্মা ও ভাবীর ওপর একরকম জুলুম করে একগাদা খাবার নিয়ে চলে এল হাসপাতালে। ২ নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকে দেখে অর্ধেক ঘর ফাঁকা, ১২ নম্বর বেডেও কেউ নাই। কী ব্যাপার?

ব্যাণ্ডেজ ও স্যালাইনের বন্ধনের ভেতর থেকে মিনমিন করে ১১ নম্বর বেডের রোগী 'পরশুদিন ডাক্তার সাহেব লিজে কত বুঝ দিল, পুরা তিন দিন বেহুঁশ আছিলা, এখন এট্টু ভালোর দিকে—এখন লড়াচড়া করলে হামরা দায়িত্ব লিবার পারমু না। তখন কিছু কলো না। লে শালা কাল পাছবেলা বিছনা থ্যাকা উঠ্যা মর্দ ছোলের ঘাড়ত হাত দিয়া হাঁটা দিল। কী?—না, ঈদের দিন বৌ-ব্যাটা-বিটির সাথে থাকবার না পারলে তাঁই বলে দম বন্ধ হয়া মরবি! ল্যান ঠ্যালা!'

মামুন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। হাতের টিফিন-ক্যারিয়ার এত ভারি ঠেকে যে ঠক করে রেখে দেয় ১১ নম্বর বেডের খাটের পা ঘেঁষে। মোজাইক-করা মেঝের নোঙরা চিটচিটে পরতে ভোঁতা আওয়াজ হয়। সেদিকে তাকালে চোখে পড়ে রোগীর ব্যবহৃত বেডপ্যান। গোটা ওয়ার্ডের গন্ধের উৎসটি পাওয়া গেল।

তবে এটাই একমাত্র উৎস না-ও হতে পারে। আরো দুটো বিছানার নিচে বেডপ্যান শোভা পাচ্ছে। সেগুলো খালি কী ভরা কে জানে?

দরজার পাশে ১ নম্বর বেডের রোগীর ঘাড়ের সঙ্গে ঝোলানো ট্রাকশন। ঐ অবস্থাতেই নইমুদ্দিনের সমালোচনায় মুখর হতে তার অবশ্য অসুবিধা হয় না, 'ছেলেমেয়ের সঙ্গে ঈদ করার জন্যে একেবারে হন্যে হয়ে উঠেছিল। বলে ঈদের দিনও যদি বাড়ি যেতে না পারে—।' অন্য-একটি দৃষ্টিকোণ থেকে এই সমালোচনার সূত্রপাত করে ওয়ার্ডের আরেক প্রান্তের রোগী, তার প্লাস্টার-জড়ানো ঠ্যাং ঝোলানো রয়েছে একটা স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে। তা নামাজ-রোজায় কারো গাফিলতি দেখলে ক্ষোভ প্রকাশের হক তার আছে বৈ কি! এই লোকটি মালতীনগরের নতুন মসজিদের মোয়াজ্জিন। দোসরা কি তেসরা রোজার দিন তারাবি পড়ে রওয়ানা হয়েছিল চাঁদনি বাজারের দিকে। রোজার মাসটা লাচ্ছা সেমাইয়ের সারি সারি দোকান রাত এগারোটা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত জমজমাট থাকে। ওখানে রাস্তার একধারে টেবিল পেতে সাজানো মোয়াজ্জিনের আতর সুর্মা ও তসবির দোকান। দোকানে যেতে তড়িঘড়ি করতে গিয়ে মসজিদে পানির লাইন নেওয়ার জন্যে খুঁড়ে-রাখা গর্তে পড়ে তার ডান পায়ে ফ্র্যাকচার হয়েছে। গোটা মাসের তারাবি নামাজ ও সুর্মা-আতর-তসবি বেচা—দুই-ই মাটি। পরকাল ও ইহকালের এই লোকসানে লোকটা বড়ো ভেঙে পড়েছে, রোজগারের মাস বলতে তার একটাই, তার পুরোটাই এবার পণ্ড হলো। নইমুদ্দিনের প্রসঙ্গ অনেকদিন পর তাকে চাঙা করে তোলে, 'এই জাহেলগুলির ঈদের সখ একটু বেশি।'

রিকশাওয়ালার মাধ্যমে এই কথাগুলো নইমুদ্দিনের কানে পৌঁছে দিতে পারলে মামুন স্বস্তি পায়। তার আগে রিকশাওয়ালাই বলে, 'কাল বেনবেলা অর বাড়িতে গেছিনু। হামাগোরে ধরেন একই গাঁও, একটু বাঁশের আড়া পার হলেই অর ঘর। অক হামি পুছ করনু, ক্যারে তুই বাড়ি আসলু কিসক?—তা কয় ওটি ফাঁপড় ঠেকে। কয়, ডাক্তোর ঢাকাত গেল, হামিও বাড়িতে আনু।'

'ডাক্তার ছুটি নিতে পারে, ও ছুটি নেয় কীভাবে?' মামুনের রাগ হয়, কী যুক্তি, অ্যাঁ? এত কষ্ট করে বাঁচিয়ে তোলা হলো, এখন হুট করে বাড়ি চলে গেল। আর ফাঁপরের কী হলো? পার্টির লোক সবসময় কেউ না কেউ যাচ্ছিল, ওর বৌকে পর্যন্ত একদিন পরপর আসা-যাওয়ার ভাড়া দেওয়া হচ্ছিল।

রিকসাওয়ালা আমতা আমতা করে, 'না মনে করেন লিজের বাড়ি এক কথা, আর ইটা হলো হাসপাতাল। ধরেন—।'

'হাসপাতাল ভালো লাগে না তা হাসপাতালে না নিয়ে এলে প্রাণটা বাঁচত?' রিকশাওয়ালা আস্তে প্যাডেল ঘোরায়। একটা পায়ে বোধহয় জোর কম, বাঁ পাটাই বেশি তৎপর। ব্যাপারটা কী? কিন্তু এখন মামুনের সারা মাথা জুড়ে কেবল নইমুদ্দিন। তার অন্তর্ধানের কারণ ধরতে পেরেছে ৭ নম্বর বেডের পেশেন্ট। রাজমিস্ত্রির জোগানদার এই ছেলেটি তিনতলা একটা বাড়ির বাইরের দেওয়ালে

চুনকাম করার সময় বাঁশের ভারা থেকে পড়ে হাত-পা ভেঙে ফেলেছে। নইমুদ্দিনের আচরণ সে ব্যাখ্যা করে প্রাঞ্জলভাবে, 'বুঝলেন না? ট্যাকা পায়া শালার মাথা খারাপ হচ্ছে। আপনে ট্যাক্যা দিলেন, ট্যাকা লিয়া বাড়িতে গেছে, এখন তাই খরচ করিচ্ছে।'

দিন দুয়েক আগে মামুন একশোটা টাকা নইমুদ্দিনের হাতে দিয়ে এসেছিল। না দিয়ে করবে কী? সকালে ডাক্তার একবার রাউন্ড দিয়ে যায় আর নার্স এসে একটা স্লিপ রাখে বালিশের পাশে, 'এটা বাইরে থেকে আনিয়ে নেবেন।' এটা বলতে ওষুধপত্র, ব্যাণ্ডেজ, তুলা, স্যালাইন—যে-কোনো কিছু হতে পারে। এমনকি শালার সরকারি হাসপাতালে ইঞ্জেকশনের সুঁচটা পর্যন্ত রোগীদের কিনে দিতে হয়। যে-তিনদিন অজ্ঞান হয়ে ছিল সেই কয়েকদিন নইমুদ্দিন কথা বলেনি, জ্ঞান ফেরার পর থেকে প্রথমে মিহিসুরে এবং পরে ক্রমে জোরে প্যানপ্যান করতে শুরু করে, 'মামুন ভাই, দশটা ট্যাকা দিয়া যান, এই ওষুধ আনা লাগবি।' 'পাঁচটা ট্যাকা দ্যান, পরটা লিয়া অ্যাসা খামু, এটিকার ভাত মুখোত দেওয়া যায় না।' মুখে যা তোলা যায় না পেটের ভেতর তাই চালান করে দিতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। তবু টাকা না দিয়ে উপায় কী? ওদিকে পার্টি থেকে বারবার বলা হচ্ছে, নইমুদ্দিন যেন হাতছাড়া না হয়। মালিকপক্ষের লোকজন নাকি ওর বৌকে পটাবার তালে আছে, ওকে দিয়ে পাল্টা ইউনিয়ন দাঁড় করাবে। বৌটাকে ঠিক রাখার দায়িত্ব পার্টির যে মহিলার ওপর অর্পিত তার কাজের কোনো লেখাজোকা নাই। একটা কিণ্ডারগার্টেন চালায়, গানের স্কুলের প্রধান, সেলাই শেখায়, আবার মহিলা সমিতির মিটিংগুলো ব্যবস্থা করতে হয় তাকেই। তার ওপর কতটা ভরসা করা যায়? সুতরাং ওসব বৌ-টৌয়ের পিছে বেশি না ঘুরে বরং সমস্ত মনোযোগ দাও স্বামীটার ওপর। শালার ঝামেলা কি কম? মামুন তো অষ্টপ্রহর হাসপাতালে বসে থাকতে পারে না। তাই একশোটা টাকা নইমুদ্দিনের হাতে দিয়ে বলল, 'একটু সাবধানে রেখো। যখন যা লাগে খরচ করো।'—তা সেই টাকার সদ্ব্যবহার করার জন্যে কি তাকে হাসপাতাল ছাড়তে হলো? এই ধরণের দায়িত্বহীন কর্মী নিয়ে পার্টি কী করতে পারবে? ডাক্তার এতবার বলল যে তিনমাস বিশ্রাম না নিলে সম্পূর্ণ সুস্থ ও কোনোদিনই হতে পারবে না। সে জায়গায় পঁচিশদিনও তো হয়নি। হ্যাঁ, ঐ রকমই হবে। গতমাসের বারো কি তেরো তারিখে নইমুদ্দিনের কারখানায় ছাঁটাই হলো, মামুনদের পার্টি এর প্রতিবাদে স্ট্রাইক কল করল পনেরো তারিখে। এই ডাকে সাড়া দিয়ে মিছিলের সঙ্গে মিল-এলাকা থেকে বেরুবার সময় মালিকপক্ষের গুণ্ডার ডাণ্ডার বাড়িতে নইমুদ্দিনের মাথা ফাটল। তাহলে পঁচিশদিন হলো না?—পার্টির কর্মীদের নিয়ে মামুন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওকে হাসপাতালে নিয়ে আসে। অবস্থা যা হয়েছিল, আর পনোরো মিনিট দেরি হলে গুণ্ডারা তাকে জ্যান্ত গুম করে ফেলতে পারত। মালিকপক্ষ এমনকি ওকে নিজেদের কব্জায় নিয়ে মামুনদের পার্টির নৃশংস আক্রমণের শিকার বলে খবরের কাগজে ওর ছবি পর্যন্ত ছাপিয়ে দিত। সরকারি উদ্যোগে নতুন শ্রমিক সংগঠন দাঁড়

করানো হচ্ছে। কল-করখানার মালিকদের কাছে সামরিক কর্তাব্যক্তিরা তাদের বেসামরিক কর্মচারীদের দিয়ে, কখনো-বা নিজেরাই নির্দেশ পাঠাচ্ছে। উ ৎপাদনমুখী রাজনীতি চালু করার জন্যে নবীন বঙ্গ শ্রমিক সঙ্ঘের বিকাশ ঘটানো চাই, নইলে কল-কারখানায় তালা লাগাবার ব্যবস্থা করা হবে। এ তো ইনকাম-ট্যাক্স কমিশনারের চিঠি নয়, সুতরাং এই নির্দেশ পালনে মালিকদের আগ্রহের অভাব থাকবে কেন? নইমুদ্দিনের সঙ্গে আহত হয়েছিল আরো পাঁচজন। এদের দুজনকে ফার্স্ট-এইড দিয়ে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, আর বাকি তিনজনের একজন পালিয়ে গেছে, দুজনকে নিয়ে গেছে মালিকের লোক। তাদের পটিয়ে কর্তৃপক্ষ নিজেদের পক্ষের আধা-শহিদ বলে ঘোষণা করেছে। নইমুদ্দিনকে হাত করার চেষ্টা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

তবে সুবিধা করতে পারেনি। ওর ভার মামুনের ওপর। মামুনের ওপর পার্টির আস্থা প্রায় নিরঙ্কুশ। তা মামুন করেও তো যাচ্ছে। ভাগ্যটা ভালো, হাসপাতালের সিনিয়ার কনসালট্যান্টের সঙ্গে একটা কানেকশন বের করা গেল, মামুনের এক বন্ধুর ভগ্নীপতি। সেই বন্ধু আবার মামুনদের পার্টির সাপোর্টার ছিল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যখন পড়ত মামুনদের পোস্টার-টোস্টার লিখে দিত, পাশ করে চাকরি পাবার পরও ওদের কালচারাল ফ্রন্টের গানবাজনার আসরে তার যাতায়াত ছিল। এখন সে চাকরি করে লিবিয়ায়, যোগাযোগ করলে ভগ্নীপতিকে চিঠিও লিখত। দরকার হয়নি। ডাক্তার সায়েব মামুনকে যথেষ্ট পাত্তা দিল। বড়ো ডাক্তার পাত্তা দেওয়ায় মেজো ডাক্তার, নার্স, ব্রাদার, ওয়ার্ড-বয় সবাই নইমুদ্দিনের দিকে একটু মনোযোগী হলো। নইলে ইহজীবনে ওর জ্ঞান ফিরত কী না সন্দেহ। তবে তিনমাসের পূর্ণ বিশ্রামটা একেবারে অপরিহার্য। মাথা তার এখনো টলে, বিছানায় ঘন্টাখানেক বসে থাকলে মাথা ঢুলতে শুরু করে,—আর দেখো সেই রোগী কিনা রিকশা করে বাড়ি চলে যায় ঈদ করতে।

'ডাক্তার সায়েব পারমিশন দিলেন কীভাবে?'—ডাক্তার সায়েবের ওপর মামুনের ক্ষোভ টেঁকে না। ওয়ার্ডের প্রায় সব রোগী কলরব করে ওঠে, ডাক্তার সায়েব ঢাকায় গেছে ঈদ করতে, কাল বেলা এগারোটার কোচে গেছে, কয়েকটা দিন ছুটি কাটিয়ে ফিরবে।

'তার পরিবার ছোলপোল সোগলি তা ঢাকাত থাকে। তার বড়ো ব্যাটা ডাক্তারি পড়ে, বেটিও বলে ডাক্তারি পড়বি।' ডাক্তার সায়েবের ছেলেমেয়েদের নিয়ে ১১ নম্বর বেশ গর্বিত, 'দুই বেটি, এক বেটা—' অন্যান্য ডাক্তার? তারা এই শহরেই আছে, তবে আজ হাসপাতালে আসবে না। মোয়াজ্জিন সাহেব প্লাস্টারের ভেতর হাত ঢুকিয়ে চুলকাবার চেষ্টা করে আর বলে, 'তারাও তো মানুষ! তাদের ঈদ নাই? তাদেরও তো আত্মীয়স্বজন আছে!'

আর নার্স? একজন নার্সকে মামুন অবশ্য দেখল, বারান্দায় হেঁটে যাচ্ছে, আরেকজন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছিল। তাহলে কি দু'জন নার্স হাসপাতাল

চালাচ্ছে?—না তা কেন? মেথর এবং ওয়ার্ড-বয়ও আছে। মেথরের ওপর এই ওয়ার্ডের সবাই চটা। ঈদের দিন তো তোর কী?—সকাল থেকে ব্যাটা একবার উঁকিও দিয়ে যায়নি। ওয়ার্ড-বয়দের বিরুদ্ধেও রোগীরা খুব ঐক্যবদ্ধ। তরুণসুলভ উত্তেজনায় ৭ নম্বর ছটফট করে, 'ঈদের বকশিস লিবার জন্যে উগল্যান খালি নাফ পাড়িচ্ছে। পয়সা দিলেন তো কাম করবি, না হলে কুটি যায় যে থাকে তামাম দিন চিক্কুর পাড়লেও ছায়াটাও দেখব্যার পারবেন না।'

মোয়াজ্জিন সায়েব এই ব্যাপারে তার সঙ্গে একমত। তার গলা চড়ে যায় আজান দেওয়ার উচ্চগ্রামে, 'টাকা-পয়সা হাতে পড়লে ছোটোলোকের ঈমান ঠিক থাকে না। এই নইমুদ্দিনকে দেখেন না, আপনি টাকাটা দিলেন আর—।'

এখন নইমুদ্দিনের টাকা খরচের হিসাব দিচ্ছে এই রিকশাওয়ালা, 'কাল যায়া দেখি ব্যাটাক দিয়া আজভোগ চাল কিনিছে দুই সের, গোকুলের হাটোত গরু জবাই হছে, গোশত লিয়া আসিছে দ্যাড় সের। তারপর ধরেন লাচ্ছা, সেমাই, দুধ—।'

তাহলে কী ভোজনের লোভে নইমুদ্দিন হাসপাতাল থেকে পালাল? কিন্তু হাসপাতালেও তো বিরিয়ানি দেওয়ার কথা। এ সম্বন্ধে ২ নম্বর ওয়ার্ডের রোগীরা অবশ্য একমত নয়। মোয়াজ্জিনের আশাবাদ নস্যাৎ করে দেয় ৭ নম্বর, 'কীসের বিরিয়ানি? বিরিয়ানি পাক করলে বাস্না আসত না?'

১১ নম্বরের হতাশাই সবচেয়ে চূড়ান্ত, সে একরকম নিশ্চিত যে বিবিয়ানি হলেও গোশতো-টোশতো তাদের বরাতে জুটবে না, সেগুলো ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেবে হাসপাতালের ডাক্তার ও নার্সেরা। এর চেয়ে বরং যারা বাড়িতে গেছে তারাই সুখে আছে। 'বুঝলেন না? বছরগার একটা দিন, ভালোমন্দ দুইটা মুখোত পড়বি, ছোলপোলের সাথে বস্যা খাবি!'

কিন্তু বাড়ি গেলে সুস্বাদু খাবার জুটবে এ নিশ্চয়তা এরা পায় কোথায়? তবে নইমুদ্দিনের ব্যাপারে বলা যায় যে ঈদ উপলক্ষে বাড়িতে সে ভালোরকম ভোজের আয়োজন করেছে। সাক্ষী তার ফুফাতো ভাই এই রিকশাওয়ালা। জনাকীর্ণ থানা রোড ধরে ধীরগতিতে রিকশা চালায় আর ঘুমের ঘোরে কথা বলার মতো সে বিড়বিড় করে, 'শালার বাড়িত খালি ঘিয়ের বাস্না।' মামাতো ভাইয়ের বাড়িতে ভালো খাওয়াদাওয়ার আয়োজন দেখে বুকটা ছিঁড়ে যাচ্ছে, এরকম ইতরামি মামুনের কাছে অরুচিকর, 'ও কী খাচ্ছে না খাচ্ছে তারই খোঁজ নিতে ওর বাড়ি গিয়েছিলে?'

ভিড়ের মধ্যে রিকশা ইচ্ছা করলেও তাড়াতাড়ি চালানো যায় না। রাস্তা জুড়ে রিকশা আর মানুষ। এইটুকু রাস্তায় দুটো সিনেমাহল, সিনেমাহলের সামনে 'হাউস ফুল' ঝোলে, দুই 'হাউস ফুল'-এর মাঝখানে স্পেস জুড়ে টিকেট ব্ল্যাক হচ্ছে, ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার একেকজনের পেছনে দশজন ক্রেতা। কে কোন্ সিনেমার টিকেট কিনছে বোধহয় ভালো করে বুঝতেও পারছে না। বোঝার তেমন ইচ্ছাও আছে

বলে মনে হয় না। ঈদের দিন ছবি একটা দেখলেই হলো। আবার পথচারীদের ভেতর কম করে সিকিভাগ হলো ভিখারি। এমনি নিয়মিত ও যথার্থ ভিখারি তো আছেই, এ ছাড়া পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে গ্রাম থেকে ভিখারি বা অভিখারি অনেকেই এসেছে। পবিত্র ঈদুল আজহায় কিন্তু ভিখারিদের ভিড় এতটা হয় না। তখনো গ্রাম থেকে ভিখারি আসে বটে, কিন্তু মাংস সংগ্রহের ব্যাপক অভিযানে এখানকার অনেক ভিখারি তখন চলে যায় ঢাকায়। ফলে একটা ব্যাল্যান্স হয়।

'না ভাইজান' রিকশাওয়ালা মামুনের অভিযোগ অস্বীকার করে, 'হামি গেছিলাম ট্যাকা করজ করবার, বেশি লয়, পঞ্চাশটা ট্যাকা হলে হামার ঈদের খরচটা হয়া যায়। আপনারা তো পার্টি থ্যাকা অক পাঁচশো ট্যাকা দিলেন—।'

'পাঁচশো টাকা কে বলল? একশোটা টাকা দেওয়া হয়েছে চিকিৎসার জন্যে, ঈদের দিন খাওয়া-দাওয়ার জন্যে নয়।'

'অর ঘরোত যায়া দেখি হুলুস্থুল কাবরার!' টাকার অঙ্ক সম্বন্ধে মামুনের সংশোধনী উক্তিকে রিকশাওয়ালা আমল দেয় না, 'মালিকের মানুষ মাখা ফাটায়া শালাক লবাব বানায়া দিছে। প্যাটেত ভাত জোটে না, সেই মানুষ বলে পোলোয়া কোর্মা খায়!'

ঝাউতলা রেলওয়ে ক্রসিং বন্ধ। রিকশা থামিয়ে রিকশাওয়ালা ডান পায়ের উরুর নিচে হাত বুলায়।

'কয়দিন গাড়ি চালাবার পারি নাই। বাড়িত একদম বসা, পসাকড়ি নাই। মনে করনু লইমুদ্দি এতগুলো ট্যাকা পালো—।'

'কাজ করোনি কেন?'

ঢাকা মেল চলে গেলে রেলওয়ে ক্রসিঙের গেট খুলে গেল, সেই সঙ্গে খোলে রিকশাওয়ালার মুখ। উরুতে নিচের দিকে বাঁদিক ঘেঁষে একটা ফোঁড়া হয়েছিল তার। মস্ত বড়ো ফোঁড়া, তার মুখ নাই, সেটা পাকেও না। ফোঁড়ার ব্যাথায় রিকশাওয়ালার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ওর আরেক রিকশাওয়ালা বন্ধু কী-এক গাছ থেকে গোল-গোল পাতা এনে দিল, সেটা বেঁধে দেওয়া হলো, তোকমার পট্টি দেওয়া হলো, কিন্তু শালার ফোঁড়া দিন দিন কেবল বেড়েই চলে। ফোঁড়ার জন্যে লোকটা বেরুতে পারে না, রোজগারপাতি বন্ধ। তার বৌ এক ভদ্রলোকের বাসায় কাজ করে, বিবিসাহেবের হাতে-পায়ে ধরে কুড়িটা টাকা নিয়ে এলে রওশন ডাক্তারের কাছে গিয়ে ফোঁড়া কাটিয়ে নেওয়া হলো। সেও প্রায় তিন-চারদিনের ঘটনা, ব্যথা এখন পর্যন্ত সারেনি, দূষিত রক্ত বোধ হয় এখনো রয়েই গেছে। আজ রিকশা নিয়ে বেরিয়েছে বটে, এটা তার দ্বিতীয় ট্রিপ, কিন্তু প্যাডেল ঘোরাতে তার জান বেরিয়ে যাবার দশা।

মামুন এবার বুঝতে পারল যে উরুতে কষ্ট হচ্ছে বলে লোকটা এত আস্তে রিকশা চালায়, নিয়ম পালন বা দুর্ঘটনা এড়াবার তাগিদে নয়।

রিকশাওয়ালার ফোঁড়ার বিষ তার গলায় উঠে এসেছে, তেতো গলায় সে মামাতো ভাইয়ের উদ্দেশে সেই বিষ ঝাড়ে। আপন মামাতো ভাই, মাথা ফাটিয়ে

এতগুলো টাকা কামাই করল, অথচ দেখো, তাকে একটা পয়সা ধার দিল না। উপরন্তু তাকে বলেছে যে সে আজরাইলের হাঁ থেকে ফিরে এসেছে, সে কি মাগনা মাগনি? উল্‌টো টাকা চেয়ে বসেছে তার কাছেই।

'আরে হামার বলে বৌ-ছোল-বিটি লিয়া মরার দশা, হামার কাছে তাঁই হাত পাতে, কন তো শালার বিবেচনাটা কেমন? আরে এই ফোঁড়াটা না হলে হামি অর বাড়িতে মুতবারও যাই না।' নইমুদ্দিনের জন্য তাকে দণ্ডও তো কম দিতে হয়নি। মাথা ফাটিয়ে ব্যাটা হাসপাতালে গেল, তার বৌ-ছেলে-মেয়েকে নিজের রিকশায় চাপিয়ে এই রিকশাওয়ালা তাদের নিয়ে গেল হাসপাতালে, এতে ওর প্রায় আট টাকার ট্রিপ নষ্ট।

'এই ফোঁড়া হামার সাড়ে সর্বনাশ কর‍্যা দিলো ভাইজান! না হলে—।'

ঝাউতলা রোড পার হয়ে বড়োগোলার মোড়ে এসে লোকটা হঠাৎ করে নিজের লুঙি হাঁটুর ওপর ওঠায়। কিন্তু ফোঁড়া তার আরো ওপরে এবং উরুর নিচের দিকে। এইভাবে প্যাসেঞ্জারের সিটে বসে মামুনের পক্ষে সেটা দেখা বোধহয় বেশ কঠিন। এদিকে বড়োগোলার দিক থেকে একটা মিলিটারির জিপ আসছে, উরুর ফোঁড়া দেখার জন্য রিকশাওয়ালা এখানে বসে কসরৎ করতে থাকলে জিপটা রিকসার ওপর চড়ে যেতে পারে। মামুন বলে, 'ঠিক আছে চলো, আমার বাসায় গিয়ে দেখব।' ফোঁড়া দেখাতে না পেরে রিকশাওয়ালা বোধহয় আরো ধীরগতি হয়ে পড়ল। তার গেঞ্জির পেছনটা ঘামে ভিজে গেছে, মনে হচ্ছে ফোঁড়ার ব্যথা বোধ হয় পিঠ পর্যন্ত উঠে পিঠটাকে আরো নুইয়ে নুইয়ে দিচ্ছে। মামুন জিগ্যেস করে, 'তা টাকা পেলে?'

না। নইমুদ্দিনের কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় দুঃখে রিকশাওয়ালা অনেকক্ষণ কথা বলে না। দত্তবাড়ির উল্‌টোদিকে বাঁদিকে কাটনারপাড়া ঢোকার রাস্তা। সেদিকে মোড় নিতে নিতে তার দুঃখ লাঘব করে এইভাবে, 'ট্যাকা কি খালি উঁই দিবার পারে? আর মানুষ নাই, কন? অর কাছে না পায়া গেনু মাঝিড়া।'

শহরের ওপর দিয়ে বাসে করে সে গেছে মাঝিড়ায় তার ভায়রার বাড়ি। ভায়রার কাছে পঁচিশটা টাকা তার পাওনা, ভায়রা কয়েক কিস্তিতে ধার নিয়েছে, শেষবার নিল সাত টাকা,—সেও প্রায় মাস দেড়েক আগে। না-না, ভায়রার অবস্থা ভালো। বগুড়া-মহাস্থান রুটে টেম্পো চালায়, মালিককে দিয়ে-থুয়ে যা থাকে তাতে তার দুধে-ভাতে থাকার কথা। কিন্তু লোকটার বদভ্যাস একটাই, পকেটে দুটো পয়সা বেশি এলেই ঢুকে পড়ে বাংলা মদের দোকানে এবং সর্বস্বান্ত না হওয়া পর্যন্ত বোতলের পর বোতল সাবাড় করে। না হলে তার মতো লোককে কারো কাছে হাত পাততে হয়!

ভায়রা বাড়ি ছিল না। রিকশাওয়ালার শালি জানায় যে সকালবেলা উঠেই সে টাউনে গেছে, ওর টেম্পোর সিরিয়াল বেলা এগারোটায়। ঈদের আগের দিন, প্যাসেঞ্জার খুব বেশি পেলে শিবগঞ্জ পর্যন্ত ট্রিপ মারবে। আর রিকশাওয়ালার বাড়ি

হয়েই তো যাবে। কেন?—আগের রাত্রে বৃষ্টির পর বাড়ির পেছনে বিলের ধারে গিয়ে টেম্পো-ড্রাইভার অনেকগুলো কৈ মাছ ধরেছে, কয়েকটা দেবে ভায়রাকে। কৈ মাছের কথা শুনে রিকশাওয়ালা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে।

মাঝারি আকারের ছটা কৈ, বাজারে কম করে হলেও দশটা টাকা তো নেবেই। বৌকে কৈ মাছ কুটতে দেখে রিকশাওয়ালা খুশি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটি কাঁটা বেঁধে। না, মাছের কাঁটা নয়, মাথাটা খচখচ করে! ভায়রা এই মাছ কটা নিয়ে পাওনা টাকাটা মেরে দেবে না তো? ওদিকে মাছ দেখে বৌয়েরও দুশ্চিন্তা। কেন?

'না মাছ তো আপনি আলো, আল্লাই জোটাল, কিন্তু খাবি কী দিয়া? উটি দিয়া কি কৈ মাছ খাওয়া যায়?'

'কেন, তোমরা ভাত খাও না?' মামুন অবাক হলে রিকশাওয়ালা বলে, না ভাতই খাই। তো কয়দিন হামার উজি ওজগার বন্দ, হামার পরিবার যে বাসাত কাম করে সেটি থ্যাক্যা গম পাচ্ছিল। তাই—।'

'বাসায় কি কাজের বিনিময়ে গম চালু হয়েছে নাকি?'

'না ভাইজান, তাও লয়।'

তাহলে কী?—ঐ সায়েব ঈদ করতে চলে গেছে কুমিল্লা। বিবিসায়েবটা ভালোমানুষ, যাবার আগে ঠিকা-ঝির হাতে ওর বেতনটা তুলে দিয়ে বলে গেছে, এবার তাদের গমটা যেন সে-ই তুলে নেয়।

'মানে ওদের রেশনের গম?'

'না, এশনের গমের মদ্যে বারো আনাই বালু, খাওয়া যায় না।'

'তাহলে?'

বিবিসায়েবের ভাই মিলিটারির সায়েব। কী রকম সায়েব—মামুনের এই কৌতূহল রিকশাওয়ালা মেটাতে পারে না। ক্যাপ্টেন, না মেজর, না মেজর-জেনারেল—এসব সে জানে না। তবে বড়ো ধরনের সায়েবই হবে, কারণ লোকটা ক্যান্টনমেন্টে রেশন যা পায় তাতে তার মতো দশজন লোক খেয়ে কুলিয়ে উঠতে পারে না। খাওয়ার পর যা থাকে তার অর্ধেক ঢালে বোনের বাড়ি, বাকিটা বিক্রি করে। 'ধরেন মিলিটারির মানুষ, খোরাকটা বেশিই লাগে! আল্লা অগোর গাওত বল দিছে, আবার খোরাকও দিছে তার সাথে মিলায়া!' 'গায়ের বলের তুলনায় খোরাকটা বোধহয় একটু বেশিই পায়।'

মামুনের এই বিদ্রূপটা রিকশাওয়ালা ধরতে পারে না। সে দুঃখ করে বলে যে বিবিসায়েবের প্ররোচনায় তার বৌ বেতনের পুরো পঁচিশ টাকা দিয়ে মিলিটারির গম কিনে নিয়েছে। মিলিটারির সায়েবরা প্রায় বিনা পয়সায় গম-চিনি-তেল-চাল পায় বলে লোকজন তাদের হিংসা করে। কিন্তু রিকশাওয়ালা মামুনকে একটু ভেবে দেখতে অনুরোধ করে, 'অরা তিনগুণ চারগুণ এমনকি পাঁচগুণ লাভ কর‍্যা গম বেচলেও ঐ গম বাজারত কিনব্যার গেলে কম কর‍্যা হলেও পঁয়ত্রিশটা ট্যাকা লাগত!'

'তাহলে তোমার বৌ অন্যায়টা করল কী?'

'না, তার দোষ দেই না। কিন্তু ব্যাটা-বিটি হামার বায়না ধরিছে, ভাত খামো। হামাগোর বাঙালি জাতের এই এক দোষ। ঐ মিলিটারির সায়েব একদিন বেড়াবার অ্যাসা গপ্‌পো করিচ্ছিলো—।'

'তোমার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল?'

মামুনের এই প্রশ্নটিকে ভয়াবহ উদ্ভট বলে বিবেচনা করে রিকশাওয়ালা তার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়। মামুনকে তবে পাগল ঠাওরায়নি, এর পরেও তাই তার প্রসঙ্গ পাল্‌টায় না।—মিলিটারির সায়েব গিয়েছিল তার বোনের বাড়িতে, সেখানে হতাশা ব্যক্ত করেছে এই বলে যে বাঙালির খাবার অভ্যাস বদলাতে না পারলে কোনো আশা নাই। হাজার ঢালো, বাঙালির খিদে মেটানো অসম্ভব। কারণ একটাই, এই জাত খালি ভাত খাবে আর ভাত খাবে।

'চাল কিনেছ?' মামুনের পক্ষে ধৈর্য রাখা শক্ত হয়ে পড়ছে। রিকশাওয়ালা সরাসরি জবাব দেয় না। বলে, 'আসরের নামাজের আজান পড়লে গেনু হামার মহাজনের বাড়িতে।' মহাজন সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ পরিচিতি দেয়, তারপর জানায় যে সে সরাসরি উপুড় হয়ে পড়েছে তার পায়ে। এতে তার ফোঁড়া থেকে একটু পুঁজ বেরিয়ে লুঙিতে লাগে। ঐ লুঙিটাই তার ভালো, রাত্রে এসে ধুয়েও দিয়েছিল, কিন্তু শুকায়নি বলে ঈদের দিন তাকে ছেঁড়া লুঙি পরে থাকতে হচ্ছে, এমনকি নামাজও পড়া হলো না, এই ছেঁড়া লুঙি পরে নামাজ পড়লে নামাজ কবুল হবে কিনা সেই ব্যাপারে সে খুবই সন্দিহান।

'টাকা পেলে?'

হ্যাঁ, মহাজন তাকে তিরিশ টাকা দিয়েছে, মহাজনের রিকশা চালিয়ে প্রত্যেকদিন ভাড়ার ওপর পাঁচ টাকা করে দেবে, এইভাবে আটদিন দিলেই টাকা শোধ, সব ল্যাটা শেষ।

'তাহলে তো চল্লিশ টাকা নেবে।'

'দশটা ট্যাকা লাভ তো লিবিই! তাই তো দিল, লইমুদ্দি হামার আপন মামাতো ভাই, আপনারা পাট্রি থ্যাকা তাক লগদ পাঁচশো ট্যাকা দিলেন—।'

'পাঁচশো না, একশো। চিকিৎসার জন্যে দেওয়া হয়েছে। আমাদের কি দালাল পার্টি পেয়েছ নাকি যে শ্রমিকদের ঘুষ দেব?'

মামুনের এই ধমকে লোকটা মিইয়ে যায়। মামুন বলে, 'টাকা দিয়ে চাল কিনেছ?'

'জে।' বলে রিকশাওয়ালা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তবে চুপ করে করে থাকা তার স্বভাবে নাই। কিংবা এমন হতে পারে যে তার ফোঁড়ার ব্যাথার প্রকোপ কমাবার জন্য তাকে কথা বলতেই হয়। কিংবা অন্য কারণও থাকতে পারে। একটু পর সে বলে, 'দুইসের চাল কিনলাম বারো ট্যাকা দিয়া। একসের সেমাই নয় ট্যাকা। একপোয়া চিনি পাঁচ ট্যাকা, তেল-মশলা তিন ট্যাকার।'

মামুন হিসাব করে বলল, 'আর এক টাকা?'

'ব্যাটার হাতোত দিল্যাম। ঈদের দিন ফকির-ফাকরাক ভিক্ষা দেওয়া লাগে না? কন তো?'

'সেমাই কিনলে কেন?' মামুন ওর অপচয়ে বিরক্ত, 'সেমাইয়ের টাকায় তোমার দেড়সের চাল হতো।'

'তা ধরেন ঈদের দিন, বছরকার একটা দিন। ব্যাটা হামার হাউস করছে, তার আবার লাচ্ছা খাবার শখ। ধরেন সাতমাথা থ্যাকা ওদিকে বড়োগোলার মাথা—তামাম ঘাটাত খালি লাচ্ছা ভাজার ঘেরান। গরিব মানষের ব্যাটা হলে কী হয়, ব্যাটার হামার লজরখানা বড়ো!' নয় বছরের ছেলের বড়ো নজরের দৃষ্টান্ত দিতে দিতে রিকশাওয়ালা সোজা হয়ে বসে।

'লাচ্ছাই কিনলে?'

'না ভাইজান। লাচ্ছার সের পঞ্চাশ-ষাট টাকা। এমনি সেমাই কিনল্যাম।'

'আজ কি সেমাই খেয়ে বেরিয়েছ?'

'না, সেমাই পাক করছে কাল আত্রে।'

'ঈদ করতে তুমি সেমাই কিনলে আর সেই সেমাই খেয়ে ফেললে ঈদের আগের রাত্রে?'

'কী করি, কন? আটার উটি খাতে খাতে ব্যাটা-বিটি-পরিবার—সোগলির জিভাত বাত ধরিছে, জিভা বলে বলে খালি শুলায়! ঐ মিলিটারির সায়েব কয়, বাঙালি যদি ভাত খাবার অভ্যাস—।'

আবার মিলিটারি! নিরস্ত্র মানুষের মধ্যে মিলিটারির হামলা ঠেকাবার জন্য মামুন তাকে থামিয়ে দেয়, 'ঈদের আগের রাত্রে সব সেমাই খেয়ে ফেললে কেন?'

'না, আল্লা রেজেকে থোয় নাই, সেমাই আর খাওয়া হলো না।'

'মানে? খাওনি?'

এখন বাঁয়ে করোনেশন স্কুল। স্কুলের লাল দালানের পেছনে মামুনদের বাড়ি। নাঃ! বড্ডো দেরি হয়ে গেল! দলের কেন্দ্রীয় নেতা নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে। ঈদের দিন এরকম একজন অতিথিকে বসিয়ে রাখাটা কেমন দেখায়?

হামিদ ভাই কালকেই চলে যাবে দিনাজপুর, তারপর পার্বতীপুর হয়ে রংপুর, রংপুর থেকে ট্রেনে ফিরবে ঢাকা। মাসখানেকের মধ্যে দেখা হবে না। অথচ এখানকার সমস্যা নিয়ে অনেক কথাবার্তা বলা দরকার। দুটো কারখানায় ওদের পার্টি খুব সফল হরতাল করল। সিগ্রেট ফ্যাক্টরিতে মালিকপক্ষের গুণ্ডাদের আক্রমণ সত্ত্বেও ওদের প্রভাব কমেনি। কটন মিলের শ্রমিকদের বেশির ভাগ ওদের হাতে ছিল, পাকিস্তান-আমল থেকেই ওদের হাতে। মিলিটারির লোকজন খুব হাম্বিতাম্বি করছে, নবীন বঙ্গ শ্রমিক সংঘ প্রতিষ্ঠা করা চাই। কটন মিলের মালিক ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়েছে পঞ্চাশ লাখ টাকার ওপর, মিলিটারির দাপটে তারা একটু বেসামাল। নবীন বঙ্গের গুণ্ডাপাণ্ডাদের কারখানার আশেপাশে টিনের ঘর তুলে দিয়েছে, তারা

প্রত্যেক দিন একবার করে হামলা চালায়। বাস-টারমিনালে ঐ গুণ্ডারা ছুরি দেখিয়ে চাঁদা আদায় করছে, ক্যান্টনমেন্ট থেকে নাকি আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, বড়ো ধরনের সংঘর্ষ বাধলে সেগুলো এসে পড়বে। তখন মানুষেরা ওদের ঠেকাবে কীভাবে?—এত সব সমস্যা, হামিদ ভাইয়ের পরামর্শ খুব দরকার। রিকশাটা খুব স্লো। পায়ের চেয়ে রিকশাওয়ালার মুখ অনেক বেশি সচল। এখন সে ব্যাখ্যা করছে সেমাই না খাওয়ার কারণ, 'সেমাই পাক করার আগে ভালো করা ভাজা লাগে, তাই লয়? তাই লয় ভাইজান?'

এ-সম্বন্ধে মামুনের ধারণা স্পষ্ট নয়। সুতরাং সে জবাব দেয় না। তাতে রিকশাওয়ালার কিছু আসে যায় না। সে বলেই চলে, তার বৌ করেছে কি হাঁড়িতে পানি, চিনি, তেল ও মশলা দিয়ে তার ভেতর সেমাই ঢেলে খুন্তি দিয়ে খুব করে নেড়েছে। ফলে সব সেমাই পরিণত হয়েছে আটার দলায়।

'আহা! মামুন সত্যি সত্যি দুঃখিত হলো, 'বৌকে মারধোর করনি তো?'

'না। খালি মাথায় একটা ঠোনা মারিছি। চিনি গেল, তেল গেল, মশলা গেল। বৌয়েক কলাম, তুই খা, আত্রে তোর এটাই খাওয়া লাগবি। উই একলাই ঐ আটার দলা খালো।'

'আর তোমরা?'

'হামার পরিবার আটা লিয়া বসল উটি বানাবি, তা ব্যাটা হামার জেদ ধরল, না উটি খাবি না, ভাত রান্দা লাগবি। তা কী করা যায়, হামিও কলাম, ভাতই পাক করো। আত্রে কৈ মাছ দিয়া ভাত খাওয়া হলো।'

'আর আজ? ঈদের দিন খাবে কী?' মামুন থ হয়ে যায়। লোকটা কী পাগল নাকি? ধারকর্জ করে জোগাড়-করা ঈদ-উদযাপনের সমস্ত উপাদান সে শেষ করে ফেলল ঈদের আগের রাত্রে!

'সোগলি মিল্যা কৈ মাছ দিয়া আত্রে ভাত খাওয়া হলো।' কৈ মাছ দিয়ে ভাত খাওয়ার কথা বারবার বলে সে জিভে কৈ মাছের স্বাদ অনুভব করে, 'ভাত রান্দিছিল দেড়সের চাউলের, বৌ তো খালো না, কড়কড়া ভাত এ্যানা আছিল, মাছের সুরুয়া দিয়া খায়া হামি গাড়ি লিয়া বারালাম।'

'বৌকে ভাত খেতে দিলে না?'

'একসের সেমাইয়ের দলা খালো, আবার ভাত খাবি কি?'

স্ত্রীর সঙ্গে রিকশাওলার এই ব্যবহার মামুন অনুমোদন করে না, ওরা বাপ-ছেলেমেয়ে কৈ মাছ দিয়ে ভাত খেল আর বৌকে খেতে হলো আটার দলা, এসব কী? কিন্তু রিকশাওয়ালা স্ত্রীকে শাসন করার ব্যাপারে খুব কড়া, 'বুঝলেন ভাইজান, শাস্ত্রে কয়, গোরু আর জরু,—জগতের এই দুইটা জীব লাঠির ডাং না খালে ঠিক থাকে না।' মামুন তবু তার সঙ্গে একমত না হলে সে জানায় যে কৈ মাছ তো তিনটে আছেই, চালও আছে আধসের। বৌকে সে নির্দেশ দিয়ে এসেছে, ভাত রেঁধে ছেলেমেয়েকে নিয়ে ঐ মাছ কটা দিয়ে খেয়ে নেবে।

এবার মামুন বলে, 'তোমার ছেলেকে একটা টাকা দিয়ে এসছ না? ঐ টাকা দিয়ে কিছু কিনে খেতে বলতেই তো পারতে!'

'কোন্ ট্যাকা?'

'ঐ যে বললে ফকিরকে ভিক্ষা দেওয়ার জন্যে দিয়ে এসেছ?'

'ঐ ট্যাকাত হাত দিবি কিসক? নিয়ত যখন করিছি তখন ভিক্ষাই দেওয়া লাগবি!'

'তোমরা খেতে পাও না, এদিকে ফুটানিটা আছে ষোলোআনা!' মামুন রাগ করে, 'খাবার জন্যে টাকা ধার করো, আবার ভিক্ষা দাও। ভিক্ষা করে ভিক্ষা দাও, লজ্জা করে না?'

মামুনদের গলিতে ঢোকার পর রিকশার গতি আরো কমে, প্রায় ডেড-স্লো বলা যায়। 'রাস্তা সংস্কারের কাজ চলিতেছে' বলে এই বর্ষাকালে রাস্তায় খোঁড়াখুঁড়ি চলছে, একপাশের অনেকটা জুড়ে লাল মাটির কাদা। এর মধ্যে রিকশা চালানো মুশকিল। আবার রিকশাওয়ালার উরুর ফোঁড়াও হয়তো টনটন করছে, তার মন্থরতর গতির এটাও একটা কারণ হতে পারে।

মামুনের ধমক খেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর রিকশাওয়ালা কৈফিয়ৎ দেয়, 'এই ফোঁড়াটা না হলে ইগল্যান ঝামেলা হয়? আপনে কোদ্দ করেন আর আগ করেন, হামি কই এই ফোঁড়া না হলে হামি আজ পোলোয়া কোর্মা না হলেও খিচড়ি আর গোরুর গোশতো ব্যাটা-বিটির মুখোত ঠিকই তুল্যা দিতাম। এই শালার চুতমারানি ফোঁড়া, শালার ফোঁড়ার হামি গোয়া মারি!'

মামুনদের বাড়ি এসে পড়েছে। বাড়ির সামনে পার্টি কর্মীদের দেখে বোঝা যাচ্ছে যে কেন্দ্রীয় নেতা এসে পড়েছে। হয় এক্ষুণি এল, না হয় বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করছে। রিকশাওয়ালা বলে, 'দ্যাখেন না, শালার কত বড়ো ফোঁড়া! এখন পুঁজ সব বার হয়া যায় নাই। পুঁজগুলা বার কর্যা দিবার পারলে আরাম হয়!' রিকশা থামিয়ে ডান পা তুলে সে লুঙির অনেকটা ওপরে ওঠায়। কিন্তু ফোঁড়াটা দেখা মামুনের পক্ষে বেশ কঠিন, অন্তত প্যাসেঞ্জারের আসনে বসে ওটা দেখা একেবারেই অসম্ভব।

'দেখবার পারিছেন না?'

মামুনের জবাব শোনার আগেই রিকশাওয়ালা তার নিজের আসনে বসে পা উল্‌টিয়ে ফোঁড়া দেখাবার চেষ্টা করে।

'আহা, থাক না! দাঁড়াও, আমি আগে রিকশা থেকে নামি।' কিন্তু ওখানে নামা সম্ভব নয়। নামলেই পা পড়বে লাল মাটির কাদায়। পাজামা তো যাবেই, ঐ আঠালো কাদা থেকে পা তুলতেও বারোটা বাজবে। রিকশা আরেকটু সামনে বাড়ালে একেবারে ওদের বাড়ির গেটে নামা যায়।

মামুনের নির্দেশকে তোয়াক্কা না করে রিকশাওয়ালা তার ডান পা উল্‌টিয়ে ফোঁড়া দেখাবার তৎপরতায় লিপ্ত হলো। না—! মামুনের এবার নেমে পড়াই

ভালো। নইলে সম্পূর্ণ পুঁজমুক্ত না-হওয়া এবং ব্যাথায় টনটন করা ফোঁড়া দেখাতে গিয়ে রিকশাওয়ালা সিট থেকে পড়ে যেতে পারে।

উরুর ফোঁড়া দেখাবার জন্যে মরিয়া হয়ে রিকশাওয়ালা তার সংশ্লিষ্ট ঠ্যাংটিকে সম্পূর্ণ ঘোরাবার উদ্যোগ নিলে মামুনের অনুমান যথার্থ প্রমাণিত হয়। রিকশাওয়ালা একরকম চিৎ হয়ে রাস্তায় পড়ে গেল। রিকশাটা একটুখানি দুলে উঠতেই মামুন লাফিয়ে পড়ল। কাদায় পতন থেকে বাঁচার জন্যে সে ছোট্টো কিন্তু নিপুণ একটি লং-জাম্প দিলে তার ডান পায়ের স্যাণ্ডেলশুদ্ধ পাটা পড়ল রিকশাওয়ালার বাঁ হাতের কব্জির ওপর।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সামলে উঠে মামুন শুকনো জায়গায় দাঁড়িয়ে রিকশাওয়ালাকে উঠে বসতে সাহায্য করে। ওর লুঙির ওপর দিকটা রক্তাক্ত, আবার গেরো খুলে যাওয়ায় কিছু পয়সা ছিটকে পড়েছে কাদার ওপর এবং লুঙি খানিকটা নেমে পড়ায় লোকটার নিমাঙ্গের বেশির ভাগই এখন অনাবৃত। সেদিকে আমল না দিয়ে রিকশাওয়ালা মিনতি করে, 'ভাইজান, ফোঁড়াটা দ্যাখেন, এই-যে দ্যাখেন! অক্ত বারাচ্ছে গো! পুঁজগুলা সব বার করবার পারলে শালাক আটো করবার পারি। দ্যাখেন না!'

কিন্তু তার আহবানে সাড়া দিতে গেলে মামুনের চোখে পড়ে রিকশাওলার নুনু ও বিচি। ফোঁড়ার ব্যাথায় লোকটা কি পাগল হয়ে গেল? 'আরে মিয়া কাপড় ঠিক করো!' বলে তার দিকে পাঁচ টাকার একটা আস্ত নোট ছুঁড়ে মামুন বাড়ির দিকে পা ফেলে।

বাড়ির ভেতর ঢুকে গেট বন্ধ করার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে মামুন দেখে যে লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে রিকশাওয়ালা পা মেলে বসে পড়েছে কাদার ওপর। কাপড় সামলাবার দিকে তার খেয়াল নাই। দুই হাতে ফোঁড়ার চারদিকে টিপে টিপে পুঁজ বার করার কাজে রিকশাওয়ালা মহা ব্যস্ত।

রচনাকাল : ১৯৮০

জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল

'ডাইনে সালাম ফিরাইয়া বামে সালাম ফিরাইতে গর্দান ঘুরাইচি তে দেহি আমার বগলে নমাজ পড়ে বুড়া এক মুসল্লি। সত্তুর পাঁচাত্তুর বছর বয়স হইবো। কিয়ের পাঁচাত্তুর? মনে লয় আশি পাঁচাশি হইচে। নব্বুই ভি হইতে পারে।'

'আপনার চিনা মানুষ? আগে দেখচেন মালুম হয়?'

'কী জানি?—না, আগে দেহি নাই।—বুইড়ার দাড়ি বহুত লাম্বা, এক্কেরে ধলা ফকফক্কা। মনে লয়, দুধের নহর নাইমা আইচে গাল দুইটা থাইকা।'

'গালের রঙ? কালা মালুম হইলো?'

'হইতে পারে।—তা সালাম ফিরাইতে গিয়া—।'

'মুখের মইদ্যে বসন্তের দাগ আছে?'

'আরে ন্নাহ্? কালাকুলা হইব ক্যালায়? মোমের লাহান পিছলা মুখ, টোকা দিলে রক্ত বারাইবো। হোন না।—কী যানি কইতেছিলাম? কী কইলাম? তুই খালি গ্যানজাম করস। কী কইতেছিলাম?'

'সালাম ফিরাইতে বাম গর্দান ফিরাইছেন। আপনের বগলে নমাজ পড়ে—।'

'হ। সালাম ফিরাইতে গর্দান ঘুরাইচি তে দেহি আমার বগলে নমাজ পড়ে বুইড়া এক মুসল্লি। বহুত বুইড়া, বয়স মনে লয় নব্বুই পঁচানব্বুই হইবো। মগর জইফ হয় নাই, এক্কেরে তাগড়া রইচে। বুইড়া মিয়ার পাওয়ের দিকে নজর পড়চে তে দেহি—'

'বুক দেখলেন না? সিনা না দেইখা পাও দ্যাহেন ক্যামনে? সিনার মইদ্যে গুলির দাগ আছে?'

'আরে খামোস মাইরা হোন না ছ্যামরা!—বুইড়া মুসল্লি, মুরুব্বি, আমাগো মুরুব্বির মুরুব্বি।—তাজিম কইরা পাওয়ের দিকে দেখলাম। বুইড়া মিয়ার পাওয়ের দিকে দেখচি তো, নজরে পড়লো পাওয়ের পাতা দুইখান। হায়, হায়! পাওয়ের পাতা দুইখান তার পিছন দিকে।'

'পিছন দিকে? কেমুন?'

'বুঝলি না?—এই দ্যাখ্ আমাগো পাওয়ের পাতা থাকে কৈ?—পাওয়ের সামনে। পাওয়ের পাতার উপরে ভর দিয়াই তো আমরা হাঁটি, চলাফিরা

করি।—নাকি? আর ঐ মুসল্লির পাওয়ের পাতা দুইখান বারাইছে গিরার পিছন দিকে। বুঝলি না?—এই দ্যাখাই—।'

'নমাজে বইসা আপনে আপনের লগের মুসল্লির পাওয়ের পাতা কোনদিকে ফিটকরা এইটা দ্যাহেন ক্যামনে? সিনা, প্যাট, কমোর না দেইখা ঠ্যাঙের পাতা ক্যামনে দেখবেন?'

'খাবের মইদ্যে খোদায় কহন কী দ্যাহায়, ক্যামনে দ্যাহায়, তুই বুঝবি? আমিই কি ব্যাক কইতে পারি?'

শ্রোতার মুহুর্মুহু সন্দেহ প্রকাশ এবং এ নিয়ে নিজের ধারণা সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও লালমিয়া তার গতরাত্রে-দেখা স্বপ্নের বয়ান অব্যাহত রাখে। কোন্ মসজিদে নামাজ পড়ছিল তা ঠিক ঠাহর করতে পারেনি, নারিন্দার বিত্তাবিবির মসজিদ হতে পারে, তবে স্বপ্নের মসজিদের জানালা দিয়ে দেখা যায় মস্ত কোনো বিলের টলটলে পানি। নারিন্দায় এরকম বিল কোথায়? আবার মসজিদের ছাদটা অনেক উঁচু, ছাদ জুড়ে খোদাই-করা অজস্র তারা। সেগুলো সত্যিকারের তারাও হতে পারে, নইলে অমন মিটমিট করে জ্বলে কী করে?

'মসজিদের ছাদ মনে লয় আসমান দিয়া বানাইছে। ছাদ ভালো কইরা দেখছেন?'

কিন্তু নামাজে বসে মসজিদের অবস্থান বা গঠন কি স্থাপত্যের দিকে খেয়াল করা লালমিয়ার ধাতে নাই। এশার নামাজের ফরজ ও সুন্নৎ আদায় করে বেতেরের শেষে কাঁধের অদৃশ্য ফেরেশতাদের সালাম করতে গিয়ে তার বাঁদিকের মুসল্লির দুই পায়ের পাতার বিপরীত বিন্যাস দেখে লালমিয়া খুব ভয় পায়। আল্লা তাকে এটা কী দেখাচ্ছে? এর মানেটা কী? নিজের গুনাগাতার মাফ চেয়ে এবং ভয় থেকে রেহাই পেতে, হয়তো সেই ওল্টানো-পায়ের মুসল্লির রূহের তসল্লিতেই কিনা কে জানে, লালমিয়া মোনাজাত করে অনেকক্ষণ ধরে। 'হাত দুইখান তুইলা আল্লার দরবারে মোনাজাত করলাম। আধা ঘন্টা, এক ঘন্টা তো হইবোই, দ্যাড় ঘন্টা, না, দুই ঘন্টা ভি হইবার পারে। আল্লার কাছে বহুত কান্দলাম।'

'আধা ঘন্টা, না এক ঘন্টা, না দুই ঘন্টা? টাইম বুঝবার পারলেন না? দুই ঘন্টা ধইরা খালি মোনাজাত করলেন, তে মসজিদ বন কইরা দিবো না? মসজিদ থন বারাইলেন ক্যামনে?'

এই ছোকরার জন্যে লালমিয়ার স্বপ্নবয়ান দিন দিন কঠিন হয়ে পড়ছে। জাগ্রত অবস্থায় চাল, মুরগি, মশলা, তেল, ডালডা, মেওয়া ও চুলার গ্যাসের পরিমাণ এবং বাবুর্চি, বয়-বেয়ারা-মেসিয়ারদের কাজকাম নিয়ে যতই হুঁশিয়ার থাকুক, স্বপ্নে কি সবকিছুর হিসাব রাখা যায়? দুনিয়াদারির হিসাবনিকাশ থেকে রেহাই পেতেই তো লালমিয়া ঘুমোতে চায়, স্বপ্ন তো ফোটে ঘুমের তাপেই। সেখানে অত খেয়াল করা কি সম্ভব? আর এই বুলেট ছোঁড়াটা কাজে ফাঁকি দিতে ওস্তাদ হলে কী হয়, লালমিয়ার স্বপ্নের খুঁটিনাটি ভুল ধরতে সবসময় ওঁৎ পেতে

রয়েছে। আস্ত খচ্চরটা। তা বুলেটের আর দোষ কী? বাপটা কী ছিল? লালমিয়ার রাগ হয় বুলেটের বাপের ওপর। বাপটা মরে গেছে, তার উপর রাগ করাটা নিরাপদ বলে নিজের রাগে লালমিয়া আরো গ্যাস ছাড়ে। ইচ্ছামতো গ্যাস ছাড়ে আর রাগ জ্বলে ওঠে দাউদাউ করে। বেইমানের বেইমান. ঐটা ছিল হালার নম্বরি বেইমান। ঐ বেইমানেরই তো ছেলে,—রক্তের দোষ মোচন হয় কী করে? ইমামুদ্দিন তাকে কোনোদিন বিশ্বাস করেনি, ঐ অবিশ্বাস সে গেঁথে রেখে গেছে ছেলের ভেতর।—লালমিয়াকে অবিশ্বাস করে ইমামুদ্দিনের লাভটা কী হয়েছে?—রথখোলার মোড়ে ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মার উড়িয়ে পালাবার সময় মিলিটারির গুলিতে সে ধপাস করে পড়ে গেল বংশালের মাথায়। ওদিকে ঐ রাস্তায় ছুটতে গেল কোন আক্কেলে? নাবাবপুরের চওড়া রাস্তায় দৌড়ে পালাবার ঝুঁকিটা সে নেয় কোন সাহসে? গ্রেনেড নিশ্চয়ই ছুঁড়েছিল ঐ ট্রান্সফর্মারের উলটোদিকে গোলক পাল লেনের মাথায় পানির কলের সামনে দাঁড়িয়ে। কাজ সারার সঙ্গে সঙ্গে তো তার ঢুকে পড়ার কথা গোলক পাল লেনের ভেতরে, তাই না? কয়েক ধাপ গিয়ে বাঁয়ে কান্দুপট্টির ভেতরে কোনোমতে পিছলে পড়তে পারলে খানকিপাড়ার অজস্র গলি উপগলি শাখাগলি, ঘরের ভেতর দিয়ে ঘর পেরিয়ে ঘন বস্তিটা পেরোলেই ইংলিশ রোড, রাস্তাটা ক্রস করে একটু ভেতরে ঢুকতে পারলে নাজির আলির নতুন দখল-করা লন্ড্রি, লন্ড্রির একমাত্র কর্মচারী লালমিয়া রাত্রে তখন লন্ড্রিতেই থাকে। গ্রেনেড ছুঁড়ে ট্রান্সফর্মার উড়িয়ে ও এক মিলিটারি জখম করে ইমামুদ্দিন কোনোমতে যদি তার ঘরে একবার পৌঁছে যায় তো লালমিয়া কি ময়লা কাপড়ের স্তূপে তাকে লুকিয়ে রাখতে পারে না? খুব পারে। কিন্তু ইমামুদ্দিনের মন পরিষ্কার নয়, দিলটা তার সাফ হলে ছেলেবেলার দোস্তকে কি সে এরকম অবিশ্বাস করতে পারে? নাজির আলি হলো লালমিয়ার মনিব, তার মহাজন। লন্ড্রিটা দখল করে তাকে ওখানে নিয়োগ করেছে। নাজির আলি মিলিটারির ভাউরা, মিলিটারির হোগার পিছে পিছে ঘোরে, তাতে লালমিয়ার অপরাধটা কোথায়? এজন্যে ইমামুদ্দিন তাকে সন্দেহ করবে কেন? তাদের দুজনের বন্ধুত্ব কি আজকের নাকি? বলতে গেলে জন্মের পর থেকে দুজনে দুজনকে চেনে। রায়সাবাজার পুলের ওপর মসজিদে হাফিজুল্লা মুনসির কাছে কায়দা আমপাড়া পড়া শুরু করে মাঝখানে খান্ত দেওয়া, বড়ো হতে হতে এর ছাদে ওর ছাদে উঠে ঘুড়ি ওড়ানো, চৈত্রসংক্রান্তির দিনে ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে পড়ে গিয়ে ছাদের কার্নিশ ধরে ঝোলা, আরেকটু বড়ো হলে মুকুলে-নাগরমহলে গেটম্যানদের ফাইফরমাস খেটে দিয়ে মাগনা সিনেমা দেখা, বাংলাবাজার মেয়েদের ইস্কুলের সামনে ১০টায়-৫টায় টাঙ্কি মারা,—সব ডিউটি তো পালন করল তারা একসঙ্গেই। তবে একটু বড়ো হয়ে নাগরমহলে বই দেখার সুযোগ অবশ্য লালমিয়া পেয়েছে একাই। তা বাপু এতে লালমিয়ার দোষটা কোথায়? তার চেহারা-সুরত ভালো, গায়ের রঙ ফর্সার ধার ঘেঁষে। অনেকদিন চুল না কাটালে নাগরমহলের টিকেট-মাস্টার তার চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে গালে একটা

টোকা দিয়ে বলত, 'হারামজাদা চুল কাটস না? রঙবাজ হইচস?' কিন্তু লালমিয়ার ঝাঁকড়া চুলের চেহারাই লোকটার পছন্দ। নাইট শোর পর সিনেমা হলের সিঁড়ির নিচে তাকে মালিশ করে দিলেই পরদিন বিনা পয়সায় লালমিয়াকে সে ঢুকিয়ে দিত ফ্রন্ট স্টলে। একদিন তো ঠেলে দিয়েছিল দোতলার ব্যালকনিতে। তা, এতে লালমিয়ার দোষটা কোথায়? ১২ না ১৩ পেরোতেই ইমামুদ্দিন লম্বা হয়ে গেল সাঁ সাঁ করে, ঐ ব্যাটা টিকেট-মাস্টারকে ছাড়িয়ে গেল আর একবছরের মধ্যে। তার কালো গালে বসন্তের দাগ, ঠোঁটের ওপর মোচের রেখা উঠল গাঢ় পিচের মতো। ওর দিকে টিকেট-মাস্টারের নজর পড়বে কোন দুঃখে? আর, এর ওপর ইমামুদ্দিনের চোপা! চোপা একখান। কথায় কথায় রাজা-উজির মারা, কথায় কথায় মুখ খারাপ। মা-বাপ না তুলে কাউকে কিছু বলতেই পারত না।—এসব ছোঁড়াকে আদর করা কি ভদ্দরলোকদের পোষায়?—আরো আছে। কী?—না, মানুষের ভুল ধরা, কথায় কথায় খালি তক্কো, খালি বাহাস। রাত্রে ভালো কোনো ফাইটিং পিকচার দেখে পরদিন লালমিয়া হিস্টোরিটা কেবল বলতে শুরু করেছে তো পদে পদে তার বাধা দেওয়া চাই। প্রতি কথায় খালি প্রশ্ন, প্রশ্ন করা শুধু তাকে জব্দ করার জন্যে। নাজির আলির বাসাবাড়ি লেনের ছোটো চায়ের দোকানে লালমিয়ার প্রথম চাকরি। সকাল ১০টা-১১টায় নাজির আলি বেরুত অন্য ধান্দায়। দোকানে তখন ভিড় একটু কম। ছাকনিতে চা ঢালতে ঢালতে লালমিয়া আগের রাতে দেখা বইটার গপ্পো ছাড়ত খুব জমিয়ে। চায়ে দুধ-চিনি বেশি দিয়ে শ্রোতাদের ধরে রাখার কায়দা সে তখন নতুন রপ্ত করছে। তা সবাই শুনত, নিজের নিজের মতামত ছাড়তে ছাড়তে হলেও শুনত শেষ পর্যন্ত। কিন্তু ইমামুদ্দিন থাকলে তার একটা প্যাঁচ কষা চাই। লালমিয়া নায়কের বীরত্বে অভিভূত গত রাত থেকে, হাত-পা নেড়ে সেই বীরপুরুষের তৎপরতার বিবরণ দিতেই ইমামুদ্দিন মুখ বাঁকাল, 'বাহাদুরে খালি হাতে চটকানা দিয়া ফালাইয়া দিল একশো জন দুষমুনরে, আবার ছেমরি ভি অর সিনার মধ্যে ছুপাইয়া থাকল? চাপাবাজি করনের আর জায়গা পাস না, না?'

'কী যে কস! জালেমগুলিরে মারতে না পারলে নার্গিসরে বাঁচায় ক্যাঠায়?'

'তর বাপে।'

ইমামুদ্দিনের বাধা গায়ে না মেখে ছবির নায়কের বিশাল বপু, পাথরের মতো শক্ত মুখ, মুখের সঙ্গে মানানসই গোঁফ, লোহার পিলারের মতো গর্দান প্রভৃতির বিবরণ দিয়ে, এমনকি নায়কের শক্তির সঙ্গে ইমামুদ্দিনের তেজের সাদৃশ্য ঘোষণা করেও তাকে নরম করা যায়নি। শেষ পর্যন্ত লালমিয়াকে আত্মসমর্পণ করতে হতো এইভাবে, 'আমি কী করুম? যেমুন দেখচি তেমুন কই। নাগরমহলের মইদ্যে ঐ বই আউজকাও খেলে। ল, সেকেন্ড শো মাইরা দেই। যাবি?'

'টিকেট-মাস্টারের ঠাপ খাইয়া আমি বই দেহি না।'

মুরোদ নাই দেখার তো নাই বা দেখলি। কিন্তু গল্পটা শুনতে তোর বাধাটা কোথায়? নিজেও শুনবে না, আর পাঁচজনের কাছে যে বলবে তাতেও তার গা

জ্বলে। ইনসানিয়াৎ—আরে বাপ, একটা বই করেছিল! সেখানকার মহৎহৃদয় পুরুষের নিঃস্বার্থ প্রেমকে গৌরব দিতে গিয়ে দিলীপকুমারের গায়ে লালমিয়া টকটকে লাল একটা জামা পরিয়ে দিয়েছিল, 'দিলীপকুমাররে লাগতেছে না, বুঝলি? কেমুন?—হালায় লাল একখান শার্ট পিনচে, কলার কিরিচ মারা—।'

'তর এই শার্টখান দিলীপকুমাররে ভাড়া দিছিলি? আরে মান্দারের পো, বই দ্যাহস মাল টাইনা? লাল-নীল-হলুদ-সবুজ—ব্যাক দ্যাখবার পারস?'

ইমামুদ্দিনের ধমকে লালমিয়া চুপসে যায়। তার এই লাল জামাটা সে দিলীপকুমারের গায়ে চড়াল কীভাবে? দিলীপকুমারের জায়গায় নিজেকে কিংবা তার নিজের জায়গায় দিলীপকুমারকে ফিট করে দেওয়ার গোপন কারসাজি সে নিজেও বুঝতে পারেনি। অনেকক্ষণ ধরে লালমিয়া কোনো কথাই বলতে পারে না।

কিন্তু লালমিয়া তাহলে কথা বলবে কোথায়? ইমামুদ্দিনের উৎপাত কলেরার মতো, বসন্তের মতো ছড়িয়ে পড়ে চায়ের দোকানের আর-আর খদ্দেরের ভেতর। লালমিয়া গল্প শুরু করতেই তারা ঠোঁট বাঁকা করে রাখে, সুযোগ পেলেই একটু হেসে তার সবকথাই তুচ্ছ করে ফেলবে। বেশি চালাক যারা তারা হঠাৎ করে তোলে সম্পূর্ণ অন্য-প্রসঙ্গ। আর ঐসব ফালতু গপ্পো শুনতে কারো আপত্তি নাই। বাখোয়াজি করতে ইমামুদ্দিনের জোশ কি কারো চেয়ে কিছু কম? বিদ্যা তো হাফ-আমপারা, আর সে নাকি রোজ রোজ চিঠি পায় বাংলাবাজার ইস্কুলের সেভেন-এইটের মেয়েদের কাছ থেকে, তারাও সব বড়ো ঘরের মেয়ে। হালা, চিঠি পড়া পারস?—কথাটা বলতে না পারায় লালমিয়ার রাগ বাড়ে, রাগে তার হাত থেকে দুধচিনি বেশি পড়ে চায়ের স্বাদ আরো বাড়িয়ে দেয়, তাই চুমুক দিতে দিতে খদ্দেররা ইমামুদ্দিনের চাপাবাজিতে মশগুল হয়ে যায়। ঐ তো একখান হুলিয়া—মুখভরা বসন্তের দাগ, এমনিতে কালো, যতই বড়ো হচ্ছে মনে হয় যেন নতুন নতুন আলকাতরার টিন ঢেলে দিচ্ছে ওর গায়ে। ঢ্যাঙা শরীরে মালমশলা কম। আর তার জন্যে পাগল হয়ে গেছে গোটা মহল্লার ব্যাক ছেমরি! বলে কি, 'কাউলকা প্রেসে যাইতাছি তো সিংটোলার মোড়ের কাছে রিকশার লাইগা খাড়াইয়া রইচে আমাগো খসরু ভাইয়ের মাইয়া, আরে মতি সর্দারের নাতনিটা। আমারে দেইখা হাসে, কয়, ইমাম ভাই চিঠি দিলেন না? আমি কই, আরে মুখ থাকতে চিঠি কিয়ের? তে হাসে। আবার আউজকা পাঠাইচে অর ভাইরে, চিঠি লেইখা দিছে, কেলাশ এইটের নোটবই চায়।' নিজের কথা বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যে সে যোগ করে, 'প্রেসে কাম করি তো, বইপুস্তক লইয়া কারবার, মনে করে হালায় ব্যাক বইয়ের মালিক আমি। আরে আমি হালায় আনপড় মানুষ, অহন আমি ছেমরিরে লইয়া কী করি, কও তো?'

দীর্ঘ বাখোয়াজির শেষে নিজেকে নিয়ে ইমামুদ্দিন একটু ঠাট্টামতন করায় শ্রোতাদের ঈর্ষা গলে যায় এবং তার গল্প অন্তত তখনকার মতো বিশ্বাস করতে

তাদের আপত্তি থাকে না। এমনকি লালমিয়াও এই প্রেমের গল্প অনুমোদন করে এবং এক কাপ মালাই-ভাসানো চা তার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে কয়েকদিন আগে দেখা বানজারান বইয়ের হিস্টোরি বলার জন্যে শ্রোতাদের আকর্ষণ তৈরি করার ফন্দি তৈরি করতে করতে একটুখানি ভূমিকা ছাড়ে, 'বানজারান বইয়ের মইদ্যে নীলোর রাণ দুইখান দ্যাখচস দোস্ত? এক্কেরে উদাম—।'

'উদাম রাণ দেখবার লাইগা তুই মনে লয় সিটের নিচে উপ্তা হইয়া হুইছিলি?' ইমামুদ্দিন খ্যাক করে ওঠে, 'সিনেমার মইদ্যে ছেমরির উদাম রাণ তুই কেমতে দ্যাহস?'

আজ এতগুলো বছর পর একইরকম খাসলৎ ফের জেগে উঠেছে ইমামুদ্দিনের ছেলের জবানে। কতকাল হয়ে গেল, যৌবন পার করে দিয়ে লালমিয়া বুড়ো হতে চলেছে, তার ফর্সা গাল বাদামি হয়ে গেল, বাদামি গালে এখন কয়েক গাছা দাড়িও ঝুলিয়ে দিয়েছে, যদিও এত পাতলা দাড়িতে চেষ্টা করেও নাজির আলির মুরুব্বি-মুরুব্বি ভাবটা আসে না, সেই দাড়িতেও সাদা রঙ ধরেছে, আর কটা দিনই বা সে বাঁচবে? সিনেমা দেখা সে বাদ দিয়েছে অনেক আগেই, আর যাই করুক জুম্মার নামাজটা বাদ দেয় না, শবেবরাতের রাতে রাতভর পড়ে থাকে মীরপুরের মাজার শরীফে। তা আল্লা তাকে খাব দেখায়, খাবের ভেতর মানুষ তো কত কিছুই দেখে, তাই নিয়ে বুলেট যদি কেবলি প্রশ্ন করে, কেবলি সন্দেহ করে, পদে পদে খালি খুঁত ধরে তো নিজের দেখা স্বপ্ন লালমিয়া সবাইকে দেখায় কী করে? আজকাল স্বপ্নের সঙ্গে একটা কাঁটা লালমিয়ার পাতলা-হয়ে-আসা চুলের নিচে খুলির ভেতরের দিকে খচখচ করে : বাপের খাসলৎ এই ব্যাটা পাইল ক্যামনে?—মিলিটারির ব্রাশ ফায়ারে ইমামুদ্দিন যখন মরে, এই ছোঁড়া তখন আটমাসেও পড়েছে কিনা সন্দেহ। এরও মাসতিনেক আগে, মিলিটারির জুলুম শুরু হওয়ার আড়াইমাস পর ইমামুদ্দিন গেল ইন্ডিয়া, তারপর থেকে ছেলের সঙ্গে তার তো কোনো যোগাযোগই ছিল না। ছেলের কথা কি সে লালমিয়াকে বলে গিয়েছিল? মনে হয় না। বলতে তার বাধাটা ছিল কোথায়? ইন্ডিয়া যাবার আগে লালমিয়াকে ছেলে সম্বন্ধে একটি কথাও যদি ইমামুদ্দিন বলে যায় তো 'তর বাপে আমারে কইয়া গেছিল, দুধের পোলারে রাইখা যাই, দেখবি', মৃত বন্ধুর মুখে এই ডায়ালগটা ফিট করে দিতে তার একটুও বেগ পেতে হয় না। অনেকবার চেষ্টা করেও লালমিয়া বুলেটের সামনে এই সংলাপ ছাড়তে পারেনি। বেইমানটা স্বপ্নেও যদি আসে তবু তো অনেক কথা বলা যায়। মরার পর কি জাগরণে কি স্বপ্নে ইমামুদ্দিন তার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখল না। তার মৃত্যুর জন্যে ইমামুদ্দিন কি তাকে দায়ী করে? কেন? ইন্ডিয়া যাওয়ার ব্যাপারে লালমিয়ার পরামর্শে সে তো কিছুমাত্র সায় দিল না। তাহলে? বাংলাবাজারে যে প্রেসে সে কাজ করত সেখানে কী সব হাবিজাবি কাগজপত্র ছাপাতে আসত জগন্নাথ কলেজের কয়েকটা ছাত্র। তাদের কথাতেই তো সে ছুটল যুদ্ধ করতে, তাহলে লালমিয়ার দোষটা কী?

যাওয়ার আগে কারফ্যুর ভেতরেও ইমামুদ্দিন তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তাই না এসে কি পারে? হাজার হলেও তারা বচপনের দোস্ত। রায়সাবাজার পুলের ওপর মসজিদে কায়দা-আমপাড়া পড়া শুরু করে মাঝখানে খাস্ত দেওয়া থেকে রূপমহল মুকুল নাগরমহলে একসঙ্গে সিনেমা দেখা, বাংলাবাজার ইস্কুলের সামনে ১০টায় ৫টায় টাঙ্কি মারা, চৈত্র সংক্রান্তির দিন ঘুড়ি ওড়াতে এর ছাদ থেকে ওর ছাদ থেকে পড়তে গিয়ে কার্নিশ ধরে ঝোলা, এমনকি বলতে নাই, তওবা আস্তাগফেরুল্লা, খানকিপট্টিতে কয়েকবার ঘোরাফেরা করা—সব তো সম্পন্ন করা হয়েছে একসঙ্গে, একই সাথে। যত বিপদই হোক, ইন্ডিয়া যাবার আগে সে কি লালমিয়ার কাছে একবার না এসে পারে?—তা লালমিয়া তাকে একবার মিনমিন করে বলেছিল, এইসব শিক্ষিত ঘরের কলেজে-পড়া ছেলেদের সঙ্গে তার খাতির টিকবে কতদিন? আজ তারা যতই আদর করুক, যুদ্ধের সময় তাদের সামনে সে কি আর দাপট খাটাতে পারবে?—তা তার কথা কি আর তার কানে ঢোকে? কারফ্যু-চাপা, মিলিটারির সশব্দ ভারি নিশ্বাসে দমবন্ধ-করা সেই রাত্রিতে ইমামুদ্দিনের তেজ দেখে লালমিয়ার মাথাটা কিন্তু হাল্‌কা হাল্‌কাই ঠেকছিল। ইমামুদ্দিন বলে, 'তরে কই, পাকিস্তান আর বেশি দিন নাই। বহুত পোলাপান বর্ডার পার হইচে, ট্রেনিং লইয়া আইতাছে, হালায় মিলিটারি আর কয়দিন? আমার লগে চল, বেশিদিন লাগবো না, আইয়া পড় ম। ল, যাই গিয়া।' লন্ড্রিতে ইস্ত্রি করার টেবিলে পা ঝুলিয়ে বসে বসে লালমিয়া শোনে ইমামুদ্দিনের চাপা গলার কথা। ছেলেটা তখনি কত বদলে গেছে, এখানেই কি তার ট্রেনিং শুরু হয়ে গেল নাকি? এভাবে ফিসফিস করে তাকে কেউ কখনো কথা বলতে শুনেছে? কিন্তু তার ফিসফিস কথায় লালমিয়ার কান ফাটার দশা হয়। এই যে কিছুক্ষণ পর পর মিলিটারির ফুটফাট, ধুমধাম—ইমামুদ্দিনের চাপা গলার কথার কাছে এসব কিছুই নয়। হয়তো নিজের কান দুটো বাঁচাবার তাগিদেই লালমিয়া তাকে থামিয়ে দিতে বলে, 'মগর মাহাজনে কয়, এইগুলি ইন্ডিয়ার শয়তানি। হিন্দুগো লগে সাট কইরা ইন্ডিয়া এইগুলি করে, কয়টা গাদ্দার জুটাইছে, আর আমাগো পোলাপানে না বুইঝা খালি ফাল পাড়ে। পাকিস্তানের মিলিটারির লগে বলে ইন্ডিয়াই কুনোদিন পারলো না, আর এই পোলাপানে করব কী?' 'তর মাহাজনের মারে বাপ!' উত্তেজিত হওয়ায় ইমামুদ্দিনের মুখ থেকে তার যথাযথ লবজ বেরিয়ে আসায় চেনা স্বরের আওয়াজে লালমিয়া স্বস্তি পায়। তার কানে স্বস্তি দিতে নয়, নিজের তেজ দেখাতেই ইমামুদ্দিন ফের বলে, 'দুইটা মাস বাদে তর মাহাজন খানকির বাচ্চারে না ধইরা ভিট্‌টোরিয়া পার্কের মইদ্যে একটা গাছের লগে না বাইন্দা অর হোগাখানের মইদ্যে বন্দুক একখান ফিট কইরা গুলিটা করুম আমি নিজে, বুঝলি? অর রোয়াবি থাকবো কৈ? এই লন্ড্রি দখল করছে, এইটা অর থাকবো? মালিকে আইয়া লাথি মাইরা উঠাইয়া দিবো না?' তাহলে লালমিয়ার চাকরি থাকে কী করে? চাকরির নিরাপত্তার কথা ভেবেই হয়ত সে বলে, 'কার্তিকবাবুরে মিলিটারি তো

পয়লা দিনই মাইরা ফালাইলো। অর পোলাপানে কি আর ইন্ডিয়া থন আইবো?' ইমামুদ্দিন পাল্‌টা জিগ্যেস করে, 'আইবো না?' তবে মালিকের ছেলেদের ফিরে আসা নিয়ে তারও একটু সন্দেহ হয়ত ছিল, একটু ভেবে বলে, 'না আইলে কী? গরিব মানুষের মইদ্যে বিলাইয়া দেওয়া হইবো। তর মাহাজনে নবেন্দু বসাক লেনের মইদ্যে রাধাগোবিন্দ পোদ্দারের মনিহারির দোকান দখল করছে ; ধনঞ্জয় সাহার কাপড়ের দোকান মিলিটারি পুড়াইয়া দিলো, ঘরটা দখল করল তর মাহাজনে। খানকির বাচ্চা আর দুইটা মাস ভি এইগুলি রাখবার পারে নাকি দ্যাখ!' বলতে বলতে ইমামুদ্দিনের গলা ফের নিচে নামে। বাইরে মিলিটারি লরির চলাচলে বিরতি হওয়ায় সে কি মিইয়ে পড়ল? এই কারফ্যু-রাত্রির অকালস্তব্ধতায় তার কি ঘুম পাচ্ছে? সে কি এইসব কথা বলে ঝিমাতে ঝিমাতে? তার জিভ চলে গড়িয়ে গড়িয়ে, তারা নাকি নাজ-গুলিস্তান সব দখল করে নেবে, ইচ্ছামতো ছবি দেখবে। কলেজে-পড়া ঐসব ছেলে তার মাথায় এসব কি ঢুকিয়ে দিয়েছে? গুলিস্তান রেস্টুরেন্টে ঢুকে তার যা মনে হয় তাই খাবে। সেখানকার কাবাব পরোটা লালমিয়া কি কোনোদিন চেখে দেখেছে? চু-চিন-চৌ রেস্টুরেন্টে বিলাতি বোতল সব খুলে দেওয়া হবে সবার জন্যে। বিলাতি মদের আগাম চুমুকে কি ইমামুদ্দিন এরকম টলোমলো কথা বলছে? সমস্ত দেশ থেকে মিলিটারি নিশ্চিহ্ন করে তাদের দালাল ভাউরা যা আছে সবাইকে তারা একটি একটি করে সাফ করবে।—শুনতে শুনতে লালমিয়ার বুকের ছোটোখাটো খাঁচা একটু একটু কাঁপে : সত্যি এই মিলিটারি আর কত সহ্য করা যায়? এগুলোকে তাড়াতে পারলে এই শালার মহাজন দালালরা আপনা-আপনি খসে পড়বে। কিন্তু আবার এটাও তো ঠিক, এই নাজির আলিরা দালাল ভাউরা হলে কী হয়, এদের তেজ কি কম? পাকিস্তানের মিলিটারি হলো দুনিয়ার সেরা ফৌজ, তাদের সঙ্গে লড়াই করে পারবে কে? নাজির আলিও তো বলে, 'আর কয়টা দিন দ্যাখ, পাকিস্তানের মিলিটারির লগে গিয়া আমরা ঈদের নমাজ পড় ম কইলকাতা গড়ের মাঠে। দিল্লির লাল কেল্লার নাম জানস? ঐ কেল্লার উপরে পাকিস্তানের নিশান উড়বো, দেহিস। এই পোলাপানে আর কাম পায় না তো, গাদা বন্দুক আর বঁটি আর ছুরি লইয়া লাগতে গেছে মিলিটারির লগে। দূর!'—কিন্তু নাজির আলির মুখে দিনরাত-শোনা এইসব কথা তো ইমামুদ্দিনকে শোনানো যায় না। তার যে তেজ! তার ফিসফিস-করে-বলা অট্টহুঙ্কারে থতমত খেয়ে লালমিয়া ঘরের এদিক-ওদিক তাকায়। ঘরের সব দিক, সব কোণ, টুলের ওপর রাখা ইস্ত্রি, মেঝেতে ময়লা কাপড়ের ডাঁই, দেওয়ালে কাচের আলমারিতে থাক-থাক সাজিয়ে-রাখা ইস্ত্রি-করা শাড়ি, ধুতি, প্যান্ট, শার্ট, পাঞ্জাবি—সব দেখার সুযোগ করে দিয়ে এগুলোর নিহত বা পলাতক মালিকেরা তাকে ইমামুদ্দিনের চোখের দিকে তাকানো থেকে রেহাই দিয়েছে বলে লালমিয়া তাদের প্রতি কাঁচা কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়। কিন্তু ইমামুদ্দিন তাকে রেহাই দেবে না, অদৃশ্য লোকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ভোগ করা থেকে তাকে বঞ্চিত করে ব্যাটা উঠে দাঁড়ায়, চোখ

জোড়া ছোটো করে, মুখ ছুঁচলো করে বলে, 'বয়স তো তর কম হইল না। তরে আর কী বুঝাই? তর মাহাজন নাজিরা কুত্তার বাচ্চারে ঠাপ লাগায় মিলিটারি আর তুই হালায় ঠাপ খাস নাজিরা ভাউরাটার। কিড়ার পয়দা কিড়াটা! যাই। দুইটা মাস বাদে আইতাচি। তহন দ্যাহা হইবো!'

ঐ যে যুদ্ধে গেল, ইমামুদ্দিন কি এরপর আর এখানে আসেনি? ও যাবার পর থেকে এই ঘরে ঐ ইস্ত্রি করার টেবিলের ওপরেই রোজ রাতে গ্রেনেডের আওয়াজ পাওয়া গেছে। গ্রেনেড, রাইফেল, এল এম জি, এস এম জি আর আরো কী কী সব অস্ত্রের এলোমেলো শব্দ ক্রমেই নিয়মিত সুর হয়ে বাজে, বাজনা দিন দিন তীব্র হয়, তীক্ষ্ণ হয়, বাজনার ভেতর অচেনা কোনো অস্ত্রের বোল দ্রুততালে রাত্রির কারফ্যুকে আরো ঘন করে তোলে এবং নিজের বুকের ধুকধুক আওয়াজে লালমিয়া কারফ্যু-ছুঁয়ে-আসা অস্ত্রসঙ্গীতের প্রতিধ্বনি শোনে। ইমামুদ্দিন ছাড়া এরকম হারামিপনা তার সঙ্গে আর কে করবে?

দিনের বেলা আসত নাজির আলি। গোলমাল বাড়ার সঙ্গে তার আসা কমতে থাকে। খুঁটিনাটি হিসাবপত্র শেষের দিকে প্রায় দেখতই না, বাইরে তার কাজের চাপ অনেক বেশি। তখন একটা সুযোগ গেছে লালমিয়ার, টাকাপয়সা হাতানো গেছে ইচ্ছেমতন, খরচও করেছে দেদার। কিন্তু ঐ এলাকার বাড়িঘর যাদের দখলে তারা তখন দাপট মারে বেশি, কাপড় ধুইয়ে নিয়ে পয়সা দিতে চায় না। আবার শহরে একেকটা হুজুগ ওঠে, অমুক দিন ইন্ডিয়ার সঙ্গে সরাসরি লড়াই শুরু হচ্ছে, তমুক দেশের বিমানবাহিনী এই নামল বলে, আর শহরের মানুষ সব ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটে গ্রামের দিকে। ব্যবসার হাল খারাপ, দেশের হাল মনে হয় আরো খারাপ। নাজির আলি লন্ড্রিতে এলে তার দিকে তাকিয়েই লালমিয়া অনেক কিছু আঁচ করে। নাজির আলির দাড়ির আড়ালে ফ্যাকাশে ফর্সা গালে কখনো লাল রঙের আভা, কখনো কালচে অন্ধকার। কালো দাড়ির ভেতর লাল আভা ছিল তার খুশির সিগনাল বাতি। গতকাল দুপুরে মালিবাগ বাজারের সঙ্গে বস্তি রেইড করে মিলিটারি ৪ জন মিসক্রিয়েন্ট ধরেছে, ১ জন মারা পড়েছে মিলিটারির গুলিতে। ওদের ধরতে মিলিটারি বস্তিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ায় ৭/৮ জন মেয়েমানুষ আর ১২/১৪ জন শিশু আগুনে পুড়ে অঙ্গার হয়েছে বলে নাজির আলি 'ৎচ ৎচ' করে দুঃখ করে। কিন্তু মিসক্রিয়েন্টরা বস্তিতে আশ্রয় নিলে মিলিটারির আর কী করার থাকে? দুষমনের চরদের আদর করে ঘরে জায়গা দিয়েছ ; এটুকু খেসারত তো বাবা তোমাদের দিতেই হবে। মিলিটারির অ্যাকশনে লোকটা অভিভূত, তাদের টার্গেট কখনো মিস হয় না দেখে সে স্বস্তি পায়, পাকিস্তান এবার টিকে গেল। লালমিয়ার সন্ত্রস্ত চোখে অভয় দিতে সে তার পিঠ চাপড়ায়, 'সোচো মৎ বেটা!' এর বেশি উর্দু তার আসে না বলে কিংবা লালমিয়ার বোঝার জন্যে সে মাতৃভাষার আশ্রয় নেয়, 'ইয়াহিয়া খান সাবের লগে আমাগো লিডারে দ্যাখা করচে। টাইম দিছিল দশ মিনিট, মগর কথা শুরু কইরা পাঁচচল্লিশ মিনিটের আগে আর শ্যাষ করবার পারে

নাই।' তাদের দলের কাগজে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দলনেতার ছবি ছাপা হয়েছে. নাজির আলি খবরের কাগজ খুলে লালমিয়ার সামনে মেলে ধরে, তাদের নেতা কাঁচুমাচু মুখে বসে রয়েছে, প্রেসিডেন্ট ঢুলুঢুলু চোখে তাকে দেখছে। এই চোখ লালমিয়ার কেমন চেনা চেনা ঠেকে. কিন্তু অনেকক্ষণ দেখেও ঠাহর করতে পারে না। নাগরমহল সিনেমার সিঁড়ির নিচের অন্ধকার তার চোখের সামনে সব কালো করে ফেলে।

নাজির আলির ফ্যাকাসে ফর্সা মুখে কালো রঙ ঘনিয়ে আসে, লালমিয়া তাও কিন্তু বেশ বুঝতে পারে। তার গালের অন্ধকার মেঘ থেকে বৃষ্টি নামে কালো দাড়ি ধরে, কালো ধারা স্থির হয়ে থাকলেও তার অস্থির জলপ্রপাত বেশ স্পষ্ট ; কাল বুড়িগঙ্গার ওপারে চুনকুঠিয়ায় মিসক্রিয়েন্টরা মিলিটারির ক্যাম্পে হামলা চালিয়ে ৪ জন মিলিটারি মেরে ফেলেছে। কোথায় কোথায় নাকি আরো সব ক্যাম্পে হামলা করা হয়েছে। দেশে গাদ্দারের সংখ্যা কি বেড়েই চলবে? এই দেখো না, এই ঢাকা শহরেই মগবাজারে কয়েকজন রাজাকারকে ধরে জখম করে তাদের হাতের রাইফেল নিয়ে চলে গেল কয়েকটা ইন্ডিয়ার চর, লোকজন সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। পাকিস্তান শেষ হয়ে গেলে ইসলাম টিকবে? এই যে মুসলমানরা একটু করে খাচ্ছে, হিন্দুরা কি এটা সহ্য করতে পারে? নাজির আলির ব্যবসাবাণিজ্য চলছে বলে তো লালমিয়ারও রুজির ব্যবস্থা হয়েছে একটা। মিলিটারি যদি না থাকে তো সব ওলটপালট হয়ে যাবে না? নাজির আলির কালো দাড়ির ভেতরকার মেঘ আরো কালো হয়, তার ছায়া পড়ে লালমিয়ার চোখে। নাজির আলি, আল্লা না করুক কোনো বালা মুসিবতে পড়লে বিপদ তো তারও।

বিকালের অনেক আগেই নাজির আলি ঘরে ফিরে যায়। তার তো মেলা ঘর এখন, কোন্ রাত্রে কোথায় কাটাবে কাউকে সে জানায় না। বিকালের পর কারফ্যু. লন্ড্রির দরজা বন্ধ করে লালমিয়া বসে বসে ঝিমায়। রাত্রি হলে বন্ধ ঘরের ভেতর আজকাল ঢুকে পড়ে গোটা তাঁতিবাজার, পারে তো শাঁখারিবাজারও ঢোকে। হঠাৎ করে রাইফেলের বাঁটের বাড়িতে লালমিয়া চমকে ওঠে, ইমামউদ্দিনের গলা না? 'ওঠ, কত নিন্দ পাড়বি? তর মাহাজনের লাশটা ফালাইয়া আইচি জনসন রোডের মইদ্যে, যা উইঠা ফালাইয়া দিয়া আয়। হালায় বহুত বদবু ছাড়ছে। ওঠ, যা।' ভয় কাটাবার জন্যে লালমিয়া ইমামুদ্দিনের চোখের কোণে হাসির ঝিলিক খোঁজে। তার চিহ্নমাত্র দেখতে না পেয়ে সাহস সঞ্চয়ের ফন্দি বার করতে হয় তাকে নিজেকেই। ফন্দিটা কেমন? না,—নাজির আলিটা সাফ হলে একদিক থেকে ভালোই, এই লন্ড্রি তাহলে তার দখলে আসে। মালিক তো সাফ হয়েছে মিলিটারির হাতে, তার ছেলেরা কি আর ইন্ডিয়া থেকে কোনোদিন এখানে আসবে? কাচের আলমারিতে কয়েকটা ধুতি পরিপাটি হয়ে সাজানো রয়েছে, সেগুলো এমনি থাকবে। তা লালমিয়া মালিকানা পেলে ইমামুদ্দিনকে না হয় রেখে দেবে তার সঙ্গেই। ইমামুদ্দিনকে তেমন কিছু করতে হবে না, কাস্টমারদের ময়লা কাপড় নিয়ে কাপড়ে

কালো কালির দাগ দিয়ে রশিদ লিখে দেবে। ধোয়া ইস্ত্রি কাপড় ডেলিভারি দেওয়ার কাজটা লালমিয়া নিজের হাতেই রাখবে। ক্যাশ তো আসে তখনি, ওটা কারো হাতে না দেওয়াই ভালো। আর, এখানে গাঁট হয়ে বসে সন্তোষ-সাবিহা কি জেবা-মোহাম্মদ আলি কি নীলো-ওয়াহিদ মুরাদ কি সুচন্দা-রাজ্জাকের অ্যাকশনের হিস্টোরি ছাড়বে এক এক করে। ইমামুদ্দিন তখন তার গপ্পের বাগড়া দেওয়ার সুযোগ পাবে কোথায়? আরে, সে তো তখন লালমিয়ার কর্মচারী, নাকি? কোন্ বইয়ের হিস্টোরি শুরু করবে এই নিয়ে সে একটু ভাবনায় পড়ে গেছে, এমন সময় দরজায় গ্রেনেড ফাটার আওয়াজে সে লাফিয়ে উঠল। গ্রেনেড ফাটিয়ে দরজা ধাক্কায় কোন হারামজাদা? দরজাটা তো ভেঙে পড়ল বলে। ইস্ত্রি করার টেবিলের বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার ছিটকিন, শেকল এবং ডাঁশা খুলে দেখে গোটা তাঁতিবাজার জুড়ে খালি মিলিটারি আর মিলিটারি। এইটা হালায় কোন্ পিকচার? এদের মধ্যে নীলো-ওয়াহিদ মুরাদ কি সুচন্দা কি কবরীর মুখ খুঁজতে গিয়ে সে তার পাশেই দেখতে পায় কালো দাড়ির থমকানো বৃষ্টিপাতের আড়ালে নাজির আলির মেঘলা মুখ। নাজির আলি গম্ভীর গলায় বলে, 'জলদি চল্, ইমামুদ্দিনের বাড়ি যাইতে হইবো। ঘরের তালা লাগা!' ঘর থেকে চাবি এনে তালা লাগাতে গেলে তার পাছায় মিলিটারি বুটের সলিড একটা লাথি পড়লে চাবিটা হাত থেকে পড়ে যায়। মিলিটারি বলে, 'শালা গাদ্দারকো দোস্ত হ্যায়? চল শালা বাহনচোত!'

দরজায় তালা কাঁপতে লাগল। নাজির আলির সঙ্গে মিলিটারির জিপে উঠে সে চলল ইমামুদ্দিনের বাড়ি। গাড়িতে মিলিটারি হাতিয়ার তাক করে রয়েছে তার দিকে। এরই মধ্যে সে জেনে ফেলে যে, গত রাত্রে, এই তো ঘন্টা দুয়েকও হয়নি, গ্রেনেড ছুঁড়ে রথখোলার ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মার উড়িয়ে ও এক মিলিটারিকে জখম করে পালাবার সময় মিলিটারির গুলিতেই ইমামুদ্দিন এক্কেবারে সাফ। তাহলে, ইমামুদ্দিন যে মহাজনকে সাফ করার কথা বলল, এর মানে কী? এরা ব্লাফ ছাড়ছে না তো? মিলিটারির জুলুম, আরেকদিকে ইমামুদ্দিনের পোংটামি—এই দুয়ের ঝামেলায় লালমিয়া একদম নাস্তানাবুদ হয়ে গেল!

বস্তি ঘেরাও করে রাইফেল, এস. এম. জি. এবং কয়েকটা গ্রেনেড পাওয়া গেল। ঐ ঘরের লোকজন সব আগেই হাওয়া, তাদের ধরতে না পেরে বস্তির যাবতীয় মেয়ে, বুড়ো, বুড়ি ও শিশুদের একচোট বানানো হলো। ইমামুদ্দিনের ১২/১৩ বছরের ভাই ও ইমামুদ্দিনের বাপকে আচ্ছাসে জখম করা হয়েছিল, তাদের তোলা হলো মিলিটারির লরিতে। মারধোর ও ধরাধরির কর্তব্য অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করে মিলিটারি এবার বস্তিতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে ব্রাশ ফায়ার শুরু করল। তাদের যাবতীয় তৎপরতার মধ্যে সবচেয়ে উৎসাহ এই আগুন-লাগা ঘরের দিকে টার্গেট করে ব্রাশ ফায়ারের কাজে। হাজার হলেও দুনিয়ার সেরা ফৌজ, হাতিয়ারের ট্রিগার টেপার চেয়ে তাদের বড়ো সুখ আর কীসে থাকবে? ব্রাশ ফায়ারের উচ্চাঙ্গ সংগীতের সঙ্গে সংগত করে বেজে ওঠে ইমামুদ্দিনের খুনখুনে বুড়ি

দাদীর খনখনে গলা, 'আল্লায় সইজ্য করব না, সইজ্য করব না। তগো উপরে গজব পড়বো, গজব পড়বো!' লোকজন ভয় পাওয়ার সঙ্গে বিরক্ত হয়, বুড়ির নাতি কিনা কাল রাত্রে মারা পড়েছে এই ব্রাশ ফায়ারেই, তার লাশ পাওয়া যায় কিনা তার নাই কোনো ঠিক, আর বুড়ি কিনা সবার ওপর আরো বিপদ টেনে আনার পাঁয়তারা করছে! মিলিটারির সঙ্গে নাজির আলিও বুড়ির অভিশাপের অন্যতম লক্ষ্য, 'এই কুত্তার বাচ্চা, খানকির বাচ্চা নাজিরা আউজকা মিলিটারির ভাউরা হইয়া আজরাইলগো লইয়া মহল্লার মইদ্যে ঢুকচে। আমাগো ব্যাকটিরে ধরাইয়া দিতে আইচে। আরে ভাউরার ভাউরা, মিলিটারি দিয়া তর মায়েরে চোদা, তর বুইনেরে চোদা।' ইমামুদ্দিনের দাদীর নির্দেশ পালন করতে নাজির আলি সব সময়েই প্রস্তুত, কিন্তু তার মা না থাকায় এবং তিনটে বোনের প্রত্যেকটি আস্ত আস্ত খাণ্ডারনি হওয়ায় ও তাদের প্রত্যেকের এক বা একাধিক ছেলে মিসক্রিয়েন্টদের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় ঐ ফরজ কাজটি সম্পন্ন করা তার পক্ষে খুব কঠিন ও বিপজ্জনকও বটে। নাজির আলির ওপর একটি তাৎক্ষণিক গজব বর্ষণের জন্যে ইমামুদ্দিনের বুড়ি দাদী আল্লার দরবারে অস্থির মিনতি জানায়, কিন্তু এই আবেদনে আল্লা সাড়া দেওয়ার আগেই বীরপুরুষ এক মিলিটারির কয়েকটি গুলিতে বুড়ির অভিশাপ-বর্ষণ চিরকালের জন্যে মিটে যায়। মাটিতে লুটিয়ে-পড়া বুড়ির চামড়াসর্বস্ব শরীর দেখে বস্তির মেয়েরা এদিক-ওদিক ছুটতে শুরু করে এবং এই অসংগঠিত ও অপরিকল্পিত ছোটাছুটির ফলে কেউ কেউ ছিটকে পড়ে মিলিটারির জিপের সামনে। এদের মধ্যে একজন হলো ইমামুদ্দিনের বৌ, কোলে শিশুকে নিয়ে মেয়েটি দাঁড়িয়ে কাঁপছিল। মিলিটারির সায়েব গোছের একজন লোক তাকে জিগ্যেস করে, 'নাম কেয়া?' দাদীশাশুড়ির টাটকা লাশের দিকে এবং মাটির দিকে তাকিয়ে সে ঢোক গেলে, মিলিটারির 'নাম কেয়া?' প্রশ্নটির মুহুর্মুহু পুনরুক্তি সত্ত্বেও তার ঢোক গেলা অব্যাহত থাকে। শেষ পর্যন্ত সব ঢোক গেলা শেষ হলে মরিয়া হয়ে নিশ্বাস ছাড়ার মতো মেয়েটি বলে ফেলে, 'বুলেট!'

নিজেকে আব্রুতে রাখার জন্যে নিজের নামটা আড়ালে রাখার তাগিদে কিংবা ঘাবড়ে গিয়ে নিজের নামটা ভুলে যাওয়ায় কিংবা শিশুটিকে জন্ম দেওয়ার পর থেকে পরিবারে ও মহল্লায় অমুকের মা বলে পরিচিতি অর্জন করায় নিজের নামের বদলে ইমামুদ্দিনের বৌ বলে ফেলে তার ছেলের নাম। আকিকা করে ছেলের নাম রাখা হয়েছিল মোহাম্মদ কাসেম। বুলেট নামটা তার বাপের দেওয়া। কীভাবে?—জন্মের কয়েকদিনের মধ্যেই এই শিশু একদিন পেচ্ছাব করে কয়েক হাত দূরে ঘুমিয়ে-থাকা ইমামুদ্দিনের বুক ভিজিয়ে দেয়। ইমামুদ্দিনের ঘুম ভাঙে সঙ্গে সঙ্গে এবং নবজাতকের প্রস্রাবের সন্তোষজনক তীব্র বেগকে সম্পূর্ণ অনুমোদন করে সে মন্তব্য করে, 'প্যাসাব করে, মনে লয় বুলেট ছাড়তাছে।' সংক্ষিপ্ত মন্তব্যটি তরুণ দম্পতির ভেতর একটু গর্বমিশ্রিত কৌতুকের সৃষ্টি করে। সবার আড়ালে কেবল স্ত্রীর সামনেই ইমামুদ্দিন ছেলেকে ডাকত বুলেট বলে। তবে ছেলে এই নামে

সাড়া দেওয়ার আগেই সে যুদ্ধে যায়। ছয় মাসে এই নাম ইমামুদ্দিনের বৌয়ের পক্ষে ভুলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তখন মিলিটারির ব্রাশ ফায়ারের ভেতর ছেলের আসল নাম মনে করার সাহস তার লুপ্ত হয় এবং চারদিকে রোদের চেয়েও যা তার চোখে পড়ছিল বেশি নিজের কিছুমাত্র চেষ্টা ছাড়া কেবল সেটুকু উচ্চারণ করাই তার পক্ষে সম্ভব ছিল।

কিন্তু এই নাম শুনে সায়েব গোছের মিলিটারি হাসে, 'ইয়ে বাচ্চা ভি এক বুলেট হ্যায়? বহুত আচ্ছা।' হঠাৎ গম্ভীর হয়ে সে বলে, 'তুমহারা বাচ্চা? তুমহারি কোক সে নিকলা হ্যায়, তব তো তুম রাইফেল হোগি!' বুলেট যেখান থেকে বেরিয়েছে তাকে অবশ্যই রাইফেল হতে হবে—এই শাণিত যুক্তি প্রয়োগ করে নিজের বুদ্ধিবৃত্তিতে সন্তুষ্ট মিলিটারি কর্তা তার অসাধারণ মেধার পুরস্কার দাবি করে, 'ইয়ে রাইফেল সিজ করো।'

ইমামুদ্দিনের বৌ সুতরাং মিলিটারির হাতে বাজেয়াপ্ত হলে তাকে গাড়িতে ওঠানো হয় এবং শেষ মুহূর্তে বুলেট পাচার হয় তার দাদীর কোলে। এই সময় মার খেয়ে অচেতন ইমামুদ্দিনের বাপকে তারা লরি থেকে নিচে ফেলে দিয়ে তার বদলে তুলে নেয় লালমিয়াকে।

নাজির আলি লালমিয়াকে মিলিটারির হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে দুই সপ্তাহের মধ্যেই। কিন্তু ইমামুদ্দিনের ভাই ও বৌকে ছাড়িয়ে আনা তার সাধ্যের বাইরে। মিলিটারিকে জখম করে ইমামুদ্দিন মারা পড়ল, 'কিছু গুনাগারি তো দিতেই হইবো!' নাজির আলি লালমিয়াকে বোঝায়, 'তুই বেশি ফাল পাড়স ক্যালায়? তরে আবার ধরলে ছাড়াইতে পারুম না, কইয়া দিলাম। আমাগো নায়েবে আমির ঐদিন কইলো, পাকিস্তান মিলিটারির একোজনেরে আল্লায় চোখ দিছে না হইলেও দশখান কইরা। যারে ধরে বুইঝাই ধরে। দুষমুনের লাইগা বেহুদা তদ্‌বির করুম ক্যান্?'

তবু নাজির আলি তদ্‌বির যে একেবারে করেনি তা নয়। মিলিটারির হাতে জখম ইমামুদ্দিনের বাপটা মাসখানেকের মধ্যে মরে গেলে ইমামুদ্দিনের মা বৈধব্যের কষ্ট ভোগ করা স্থগিত রেখে দগ্ধ ঘরটা মেরামত করার আয়োজন করে, তাকে টাকা-পয়সা দেয় লালমিয়া। এর আগে কয়েকদিন তারা লালমিয়ার মায়ের সঙ্গেই ছিল। এখন নিজের বাড়িতে উঠে নতুন বায়না ধরল, 'লালমিয়া, বাবা, ইমামুদ্দিনের বৌটারে দ্যাখ্ না, ছাড়াইয়া লইয়া আয় বাবা। এই দুধের বাচ্চারে লইয়া আমি কী করি?' নাজির আলির ধমক খেয়েও লালমিয়া তার কাছে গিয়ে ঘ্যানঘ্যান করে, 'এক্কেরে মাসুম বাচ্চা, মায়ে না থাকলে বাঁচে ক্যামনে?' তা অবশ্য ঠিক। এছাড়া ইমামুদ্দিনের বৌটা কালো হলেও দেখতে ভালো।—না, না, তওবা আস্তাগফেরুল্লা, নাজির আলির ওসব খাসলৎ নাই। ঘরে তার পরহেজগার বিবি, তার ছয় ছেলে, এইসব দোকানপাট যদি তারা ঠিকমতো চালাতে পারে তো আল্লার কাছে হাজার শুকুর। কিন্তু আমার দীনের জন্যে হাজার মাইল দূর থেকে মিলিটারি

এসে জান কোরবান করে দিচ্ছে, তাদের শরীরের তো কিছু চাহিদা থাকে। সেটুকু মেটাতে না পারলে নিমকহারামি করা হয় না? নাজির আলি এদিক-ওদিক ঘোরে, এর কাছে ওর কাছে যায়। কিন্তু মেয়েটিকে তারা কোথায় রেখেছে তার কোনো হদিস পায় না। মিলিটারির মধ্যেও স্বার্থপর মানুষ থাকে : টাকাপয়সা, ধনদৌলত, মেয়েমানুষ—সব একা একা ভোগ করার লালচ তাদের মধ্যেও দোজখের আগুনের মতো জ্বলতে দেখে নাজির আলি মনখারাপ করে। তার এসব দুঃখ অবশ্য কখনো সে কাউকে বলে না। কিন্তু কালো দাড়ির আড়ালে তার গালে রঙের বিচিত্র আভা দেখে লালমিয়া মহাজনের সুখদুঃখ ঠিক ঠাহর করে ফেলে।

ঐ বছরের শেষে শীতের ভেতর কুয়াশায় রোদ জ্বালিয়ে পাড়ার ছেলেরা পাড়ায় ফেরে। নাজির আলি যে কোথায় সটকে পড়ল কেউ কোনো হদিস পায় না। কলেজে-পড়া যে ছেলেদের উস্‌কানিতে ইমামুদ্দিন যুদ্ধে গিয়েছিল তারা এসে ইমামুদ্দিনের মাকে ওঠাল নাজির আলির দখল-করা নবেন্দু বসাক লেনের দোকানঘরে। পাকা ঘরে এসে ইমামুদ্দিনের মা খুশি হবে, না স্বামী ও ছেলেদের জন্যে দিনরাত মনখারাপ করে থাকবে ঠিক বুঝতে পারে না। নাজির আলির খবর পাওয়ার জন্যে তারা লালমিয়াকে আচ্ছা করে পেটাল। কিন্তু শহিদ ইমামুদ্দিনের মা একেবারে হামলে পড়ে ঐসব রাইফেলওয়ালা ছেলেদের পায়ে, 'বাবারা, এই লালমিয়া আমাগো লাইগা কম করে নাই। এই পোলায় না থাকলে নাজির আলি আমাগো ব্যাকটিরে একটা একটা কইরা মিলিটারির হাতে তুইলা দিত।' ইমামুদ্দিনের মা তাকে তাদের সঙ্গেই রেখে দেয় এবং লালমিয়া নিজেও বিশ্বাস করতে শুরু করে যে তার বন্ধুর মা ও ছেলের প্রাণরক্ষা হয়েছে তার জন্যেই। এটা বিশ্বাস না করে তার উপায় কী? ওদিকে লন্ড্রিটা নিয়ে নিল মালিকের ছেলেরা, সবগুলোই ইন্ডিয়া থেকে ফিরে এসেছে। ধনঞ্জয় সাহার কাপড়ের দোকানটাও হাতছাড়া হলো, কোন এম. পি. না কে সেখানে করল হার্ডওয়ারের দোকান। গরিব মানুষের ভেতর সব বিলিয়ে দেওয়ার কথা ছিল, তা লালমিয়াও তো ধরতে গেলে একজন গরিব, তার ভাগে কিছুই পড়ল না। গুলিস্তান-নাজে সিনেমা দেখার সুবিধাও তো হলো না। ইমামুদ্দিন বেঁচে থাকলেও বিলাতি বোতল তার হাতে উঠত কিনা সন্দেহ। এখন এই বাড়ির একদিকে দোকান আর অন্যদিকে ইমামুদ্দিনের মা-বেটার সঙ্গে থাকতে হলে লালমিয়াকে এখন অনেক কিছুই বিশ্বাস করতে হয়।

ইমামুদ্দিনের মা তাকে খুব খাটিয়ে নেয়, দোকান চালায় লালমিয়াই, কিন্তু হিসাব দিতে হয় ইমামুদ্দিনের মাকে। এমনিতে মানুষটা ভালো, লালমিয়ার খাওয়া-দাওয়ার দিকে খেয়াল রাখে, যুদ্ধের সময় নাজির আলির সঙ্গে লালমিয়ার মাখামাখি নিয়ে কেউ কিছু বলতে এলে ভালোভাবেই সামাল দেয়। না, ইমামুদ্দিনের মায়ের মতো মানুষ হয় না। তার সবই ভালো, দোষের মধ্যে খালি একটা, ইমামুদ্দিনের মা কথা বলত বড্ডো বেশি। কথার প্রায় সবটাই জুড়ে থাকত

ইমামুদ্দিন। রাতদিন নাতিকে সে কেবল ছেলের গপ্পোই করে গেল। ছেলে নাকি তার মস্ত এক বাহাদুর, দেশের আনাচে-কানাচে তার হাতে মারা পড়েছে শয়ে-শয়ে মিলিটারি। তার গ্রেনেডের একেকটা ধাক্কায় মিলিটারি ভ্যান উল্‌টে পড়ে নিমেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আরে, রথখোলায় দুই লরি মিলিটারি সাফ করার পরেই না ইমামুদ্দিন টার্গেট করল ঐ ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মার। সে তো নাজির আলিকেও পাকড়াও করেছিল। নাজির আলি, মিলিটারির ভাউরাটা তো সবসময় তাদের হোগার পেছনে পেছনে ঘুরত। মিলিটারি চলত ভ্যানে-লরিতে-জিপে, আর ওকে ছুটতে হতো পায়ে। ঐদিন মিলিটারি খতম করে ইমামুদ্দিন যাচ্ছিল বংশাল পুলিশ-ফাঁড়িতে হামলা চালাতে, নাজির আলিকে পেয়ে তাকে বেয়নেটের খোঁচায় শেষ করতে যাবে, তা কুত্তাটা পড়ে গেল তার পায়ের ওপর। হাজার হলেও মহল্লার মানুষ, মুরুব্বিই বলা যায় একরকম, জানে না মেরে পাছায় একটা লাথি মেরে ইমামুদ্দিন এগিয়ে চলল সামনের দিকে। এই যে তাকে মাফ করতে গিয়ে সময়টা নষ্ট হলো এতেই মিলিটারি সুযোগ পেল। নইলে তাকে মারে এমন সাধ্য কোনো মিলিটারির ছিল নাকি?

ইমামুদ্দিনের মা তো রেখে-ঢেকে কথা বলার মানুষ নয়, গলার স্বর তার বরাবরই চড়া। নাতির কাছে বলা তার সব গল্পই লালমিয়া শোনে। সিনেমার হিস্টোরি বলতে গিয়ে ইমামুদ্দিনের কাছে জীবনভর খালি বাধা পেয়েও এবং ইমামুদ্দিনের উস্‌কানিতে ও ইঙ্গিতে আর সবাই গল্প বলার সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করলেও অন্যের মুখে গল্প শুনতে সে সহৃদয় মনোযোগ দিয়ে এসেছে বরাবরই। ইমামুদ্দিনের মায়ের গল্প শুনতে তার ভালোই লাগে। কিন্তু একটু-একটু অস্থিরও হয়ে পড়ে। এসব কথা বলা একটু বিপজ্জনক। নাজির আলি আজও জীবিত, মনে হয় বহাল তবিয়তেই আছে। এই গল্প তার কানে গেলে কী যে করে কে বলতে পারে? লালমিয়া একটু-আধটু খবর পায়, নাজির আলি নাকি চিটাগাং না খুলনা না কুমিল্লা কোথায় গিয়ে ঘাপটি মেরে থেকেও ধুমসে বিজনেস করে যাচ্ছে, তার পার্টনার নাকি কোন মন্ত্রীর ভাই, সেই ভাইও যুদ্ধে গিয়েছিল। আবার একজন বলল, নাজির আলি তার দলের আমির না নায়েবে আমিরের সঙ্গে কেটে পড়েছে সৌদি আরব, তার হাতে কাঁড়ি-কাঁড়ি সোনা, সুযোগ পেলেই ঐসব নিয়েই দেশে ফিরবে।

সুযোগ যে এত তাড়াতাড়ি আসবে তা কে জানত? এসব নিয়ে লালমিয়ার ভয় জুৎ করে জমে উঠতে না উঠতে খানিকটা ওলট-পালট হয়ে গেল। নতুন মিলিটারির নতুন কিসিমের দাপট শুরু হলে লালমিয়া একদিন বায়তুল মোকাররমের সামনে নাজির আলির পার্টির এক নিমপাণ্ডাকে দেখে, সে ব্যাটা টেবিল সাজিয়ে তসবি আতর সুরমা বিক্রি করছে। লালমিয়ার বুক ধুকপুক করে : যুদ্ধের শেষের দিকে এই ইবলিসটা আরো কয়েকটা ইবলিসের সঙ্গে মিলিটারির গাড়িতে ঘুরে ঘুরে ইউনিভার্সিটি, মেডিক্যাল কলেজের সব জুয়েল জুয়েল মানুষকে

তুলে রায়েরবাজার নিয়ে গিয়ে তাদের জবাই করেছে নিজের হাতে।—কুত্তাটা অহন তরি জিন্দাই রইচে?—ইমামুদ্দিনের মাকে এই ভয়াবহ খবরটা দেওয়ার জন্যে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে ঘরে ফিরে লালমিয়া দেখে বুড়ি একলা বসে কাঁদছে। এতে অবশ্য সে মোটেই বিচলিত হয় না। বুড়ির কথার তোড় আজকাল মিইয়ে আসছে এবং ইমামুদ্দিনের বাহাদুরির গল্প করার বিরতি দিয়ে সপ্তাহে অন্তত দুদিন সে কাঁদে। তার কান্নার সময় ইমামুদ্দিন স্থগিত থাকে, তখন ইনিয়ে বিনিয়ে সে মনে করে তার স্বামী ও ছোট ছেলের বিভিন্ন বয়সের দৈনন্দিন তৎপরতা।

দাদীর কান্নায় বুলেটের আগ্রহ নাই বললেই চলে। এই কান্না শুরু হলেই সে বাইরে যায় এবং কান্নার সময়সীমা সম্বন্ধে তার অনুমান প্রায় অভ্রান্ত হওয়ায় ফিরে এসে দেখে কান্না শেষ করে ইমামুদ্দিনের গল্প বলার জন্যে দাদী গলার ও নাকের নোন্‌তা পানি ধুয়ে ফেলছে। তার কান্নায় সাড়া না দিলে কী হয়, দাদীকে ছাড়া তখনো সে ঘুমাতে পারে না। ছোঁড়াটার বড়ো দোষ, মাসে ৫/৬টা দিন সে বিছানায় পেচ্ছাব করে। ইমামুদ্দিনের মায়ের তখন ঝামেলার আর শেষ নাই, বুলেট বিছানায় পেচ্ছাব করলে চাদর তো বটেই, এমনকি বালিশের ওয়াড়, মশারি কাঁথা পর্যন্ত ধুতে হয়। এইসব ধুতে ধুতে ইমামুদ্দিনের মা গজর গজর করে, 'তুই কি পাইপ দিয়া প্যাসাব করস? তামাম বিছনা ভিজাইছস, বালিশ, তোষক, মশারি, ল্যাপের ওয়াড়, খ্যাতা ব্যাকটির মইদ্যে প্যাসাবের দাগ!' এছাড়া তার আরেক দোষ, ঘুমের মধ্যে সে প্রায়ই কথা বলে এবং কখনো কখনো চিৎকার করে জড়িয়ে ধরে তার দাদীকেই। দিনের বেলা একেক দিন সুযোগ করে ইমামুদ্দিনের মা বলে, 'রাইতে ডরাস ক্যান? কেউরে দ্যাহস্? তর বাপেরে দ্যাহস?'

'না তো। আব্বারে দেহি নাই।'

ইমামুদ্দিনের মা ভাবনায় পড়ে, দেখলেই কি সে তার বাপকে চিনবে? তা বাপকে স্বপ্নে দেখলে পোলা এত ভয় পাবে কেন? দাদীর জোরাজুরিতে বুলেট অনেক ভেবে বলে, 'খাবের মইদ্যে এক বুইড়ারে দেখলাম। কয়, আমারে কয়টা ডাইলপুরি আইনা দিবি?'

'মুখে বসন্তের দাগ আছে?'

'না। কইলাম না বুইড়া। মুখ ভরা দাড়ি।'

'তর বাপে ডাইলপুরি খুব পছন্দ করছে।' বলতে বলতে ইমামুদ্দিনের মায়ের মনে হয়, নাতিকে দেখতে বুলেটের দাদা আসেনি তো? বংশের একমাত্র বাতি তো আছে কেবল এই বুলেটটাই। কিন্তু ডালপুরি তার প্রিয় খাবার নয়, সে খেত মিষ্টি। সংসারের অর্ধেক টাকা সে উড়িয়ে গেছে সীতারামের দোকানে। তা হতে পারে, মৃত্যুর পর মিষ্টির ওপর তার অরুচি ধরে গেছে। হতে পারে, শহিদ ছেলের রুচিকে সম্মান দিতে সে ঝুঁকেছে ডালপুরির দিকে। কালকেই ফকির ডেকে কিছু ডালপুরি খাওয়ানোর কথা ভাবতে ভাবতে সে বলে, 'ছ্যামরা, খাবের মইদ্যে মুরুব্বিরে দেখলে তাজিম করতে হয়, খাবটা বারে বারে দেইখা তার কথা হোনন লাগে।'

'ক্যামনে? ক্যামনে দেখুম?'

'ক্যামনে দেখবি?—জাগনা পাইয়া শিওরের বালিশ উল্‌টাইয়া দিবি। ঐ বালিশের উপরে মাথা দিয়া ডাইন পাশ ফিরা হুইবি। তাইলে মানুষটা আবার দ্যাহা দিবো।' ব্যাপারটা স্পষ্ট করতে দাদী একটা শ্লোক বলে :

খোয়াবে দরবেশে দেখি নেকি বান্দা তার।
খোদার দরবারে শুকুর করে বেসুমার ॥
দেখিতে এরাদা যদি হয় পুনরায়।
শিওরে বালিশখানি উল্‌টায়া ঘুমায় ॥

কিন্তু বুলেট তো দরবেশকে দেখেনি। তার স্বপ্নের বুড়োটি রোগা, কালো কুচকুচে ও বেঢপ লম্বা ; তার দাড়ি এলোমেলো ও নোংরা এবং তার পরণে ছেঁড়া লুঙি। শুনে ইমামুদ্দিনের মায়ের বুক ঠেলে কান্না আসে, লোকটি তার স্বামী না হয়ে যায় না। তার স্বামী অত লম্বা ছিল না, তার দাড়িও অল্প এবং ছেঁড়া লুঙি সে পরেনি। কিন্তু মরার পর মানুষের বালামুসিবত কতই তো হতে পারে। স্বামীর জন্যে সে কাঁদতে শুরু করলে বুলেট বাইরে যায়।

ইমামুদ্দিনের মায়ের মুখে ইমামুদ্দিনের গল্প শুনতে শুনতে বুলেটের মুখে বোল ফুটেছিল। কয়েকবছরে ঐ বোল ফেটে বেরোল কথা। কথার সিংহভাগ সে খরচ করতে লাগল বাইরে, ১৯১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত রহিমুদ্দিন সরদার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তার সহপাঠীদের মধ্যে এবং লালমিয়ার দোকান নামে বেশি পরিচিত তাদের মুদির দোকানে লজেন্স, আমসত্ত্ব, আচার, মার্বেল কিনতে-আসা পিচ্চিদের সঙ্গে। বলত সে বাপের গল্পই, তবে সবটাই নিজের নামে, সব গল্পের হিরো সে নিজে। মিলিটারির লরি সে উড়িয়ে দিয়েছে কয়েকশোবার। নাজির আলিকে সে চেনে না এবং ভাউরা শব্দটির মানে সে জানে না। তবু ভাউরা নাজির আলিকে সে হত্যা করেছে অন্তত ৫০০ বার।

বুলেটের এসব গল্পে লালমিয়ার ভয় বাড়ে আরো দশগুণ। এই ছোকরার পরিণতি কি বাপের মতো হবে? বাপ তবু মরেছে মিলিটারিকে জখম করে, আর এর মরণ ঘটবে স্রেফ চাপাবাজির কারণে। লালমিয়া একে নিয়ে কী করবে?

এর মধ্যে এক শুক্রবারে জুম্মার নামাজের পর মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে মাথা নুইয়ে মুসল্লিদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে সালাম করতে দেখা গেল নাজির আলিকে, 'আসসালামোআলায়কুম, ভাই সাহেব, ভালো আছেন?' তার চেনা-অচেনা সবাই তার লম্বা সফেদ দাড়ির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, তার লালচে ফর্সা গালে আলোর আভা, ঘাড়ে ঝোলানো গামছার মতো কাপড়ের টুকরা, আলখাল্লা এত বড়ো যে পাজামা না পরলেও তার চলে। প্রত্যেকের সঙ্গে সে মোসাবা করে এবং বয়স্কদের বুকে বুক মেলায়। এরপর কয়েকদিন ধরে লোকটা পাড়ার ঘরে ঘরে যায় এবং সেইসব ঘর ভরে ওঠে আতরের খসবুতে। কয়েকটা বছর সে কাটিয়ে এসেছে মক্কা শরিফে, সেখানে হাওয়ায় রসুল করিমের নিশ্বাসের

রহমৎ এবং মাটিতে রসুল করিমের কদম মোবারকের বরকৎ। তার জীবনে এখন অপার শান্তি, মানুষের দোয়া ছাড়া আর কিছুই তার কাম্য নয়। দোয়া পাওয়ার জন্যে বাঁচতে হলে কিছু করতে হবে বলে বায়তুল মোকাররমে সে সামান্য একটা সোনার দোকান করেছে। বায়তুল মোকাররমে থাকতে পারলে তার আর কিছুর দরকার নাই। ঐ এরাদা নিয়েই রুজির ব্যাপারটাও সে আয়োজন করেছে ঐ মসজিদের সঙ্গেই।

লালমিয়ার সঙ্গে নাজির আলি অনেক আলাপ করে। না, লালমিয়ার কাছে সে একটি পয়সাও দাবি করে না, তার দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে তার অন্তত একটি বাড়ি সে যে আগলে রেখেছে এতেই আল্লা তাকে অনেক রহমৎ দেবেন। নাজির আলির দখল-করা বাড়ি যে শহিদ ইমামুদ্দিনের পরিবারের নামে বরাদ্দ করা হয়েছে এই কথা শুনে নাজির আলি মিষ্টি করে হাসে—ঠিক আছে ওরা আছে, তো থাক, বাড়িঘর নিয়ে তো আর কেউ কবরে যাবে না। ইমামুদ্দিনের মা মুসলমানের বেওয়া, ইমামুদ্দিনের ছেলে মুসলমানের এতিম। যতদিন খুশি এরা ঐ বাড়িতে বাস করুক, এদের জন্যে কিছু করতে পারলে তো সে কৃতার্থ। কিন্তু বেশিদিন তার খেদমৎ করার সুযোগ না দিয়ে ইমামুদ্দিনের মা মারা গেল হুট করে। ঠিক আছে, বুলেট থাকবে, তাতেও সে খুশি।

কিন্তু বুলেটের ঝোঁক ঘরের দিকে নয়। সে ঘোরে বাইরে বাইরে। কোথায় সিদ্দিক বাজারে ভিসিআর-এ ছবি দেখাবার গোপন একটা জায়গা নাকি করা হয়েছে, বুলেট দিনরাত পড়ে থাকে সেখানে। ছবি দেখতে দেখতে সেই বেড়ার ঘরের গেটে দাঁড়িয়ে সে পুলিশকে আড়াল করে টিকেট বেচতে শুরু করল। দুই বছরেই ঘরে ভিসিআর রাখতে সরকারের আর নিষেধ রইল না। তখন ঐসব গোপন কেন্দ্র উঠে গেলে বুলেট ফের এসে পড়ল লালমিয়ার কাছে। ঐ মুদির দোকান ততদিনে উঠে গেছে, নাজির আলি ওখানে বসিয়েছে মোরগ-পোলাওয়ের হোটেল। বুলেটকে নিয়ে লালমিয়া কী করে? এখানে রাখলে নাজির আলি আবার কী ভাবে এই ভয়ে লালমিয়া তাকে একটা কাজ জুটিয়ে দিল স্টেডিয়ামের একটা বড়ো হোটেলে। বড়ো হোটেল, বেতন যাই হোক, বকশিসের টাকাতেই তার মতো ছোঁড়ার খাওয়াদাওয়া সব হয়ে যায়। মাস-তিনেক পর লালমিয়া তার খোঁজ নিতে গিয়ে শোনে ছ্যামরা হাওয়া হয়ে গেছে। হোটেলের মালিক লোকটা জানায়, ওর স্বভাব বড্ডো খারাপ। চুরি করে খেত, মালিক এটা তেমন ধরেনি, ও তো বয়-বেয়ারার, সবাই কমবেশি করেই। কিন্তু মুশকিল হলো রাস্তায় হৈ চৈ দেখলেই ব্যাটা কাজকাম ছেড়ে বাইরে ছোটে। গোলমাল হলেই গাড়ি ভাঙে ঢিল মেরে, রাস্তার মাঝখানে বড়ো বড়ো টায়ার পোড়াবার কাজে তার উৎসাহ খুব বেশি। কবে হরতালের দিন বারুদ-ঠাসা জরদার কৌটা ছুঁড়েছিল পুলিশের গাড়ির দিকে, পেছন থেকে পুলিশের আরেক গাড়ি থেকে পুলিশ নেমে তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। মাসখানেক পর খালাস পেয়ে এসেছিল, মালিক ফিরিয়ে দিয়েছে। কী

মুশকিল! ওকে নিয়ে লালমিয়া এখন করে কী? বাপটা ছিল বেইমান। যাবার সময় যদি বলে যায়, 'লালমিয়া, পোলাটারে রাইখা গেলাম, নজর রাখিস!' তাহলেই সম্মানজনক একটা দায়িত্ব পালনের ইজ্জৎ সে পায়। এখন এসব ঘোরাঘুরি, ছোটাছুটি, খোঁজখবর নেওয়া তার কীসের জন্যে? নাকি নিহত বন্ধুকে টেক্কা দেওয়ার উত্তেজনায় লালমিয়া এত কষ্ট করে? এর মধ্যে একদিন শুনল, মতিঝিল-বনানীর রুটে ৬ নম্বর বাসে হেল্‌পারি করছে, মোরগ-পোলাওয়ের দোকানের বাবুর্চি ঐ বাসের গায়ে চাপড় মারতে মারতে প্যাসেনজার ডাকতে দেখেছে বুলেটকে। এসব শুনেও লালমিয়া এবার আর যায়নি। এরও প্রায় ৭/৮ মাস পর ছোঁড়া নিজেই একদিন এসে হাজির। হাতে বেশ কয়েকটা খালি টিফিন-ক্যারিয়ার। কী ব্যাপার?—এগুলো সে বিক্রি করতে চায়। সব কথা বুলেট না বললেও লালমিয়ার বুঝতে কিছু বাকি থাকে না।

৬ নম্বর বাসের কাজ ছেড়ে বুলেট কাজ নেয় মতিঝিলের এক অফিসে। কাজটা অফিসের নয়, অফিসের সায়েবদের বাড়ি-বাড়ি ঘুরে তাদের টিফিন-ক্যারিয়ারে তাদের জন্যে দুপুরবেলার খাবার নিয়ে যাওয়ার কাজ। প্রতি সাহেবের টিফিন-ক্যারিয়ার থেকে একটু-একটু করে ভাত তরকারি নিয়ে দুপুরের খাওয়াটা তার চলছিল ভালোই। তাতে গায়ে-গতরে একটু গোশত লাগল, কিন্তু সেই উন্নত শরীরের চাহিদা মেটাতে ভাত তরকারি বেশি-বেশি করে সরাতে লাগলে সায়েবদের একটু একটু সন্দেহ হতেই সে নানা বাড়ির নানা পদ্ধতিতে রাঁধা নানা স্বাদের ভাত তরকারি মাছ গোশত ডাল, এমনকি অভিন্ন স্বাদের নুন ও কাঁচা মরিচ শুদ্ধ সবগুলো টিফিন-ক্যারিয়ার নিয়ে উধাও হলো। ভাত-তরকারি সব তিন বেলায় শেষ করে খালি টিফিন-ক্যারিয়ারগুলো নিয়ে হাজির হলো কিছুদিন আগে তাদের বাড়ি বলে পরিচিত, এখনকার লালমিয়ার মোরগ-পোলাওয়ের দোকানে। বেচে দেওয়ার জন্যে টিফিন-ক্যারিয়ারগুলো নিয়ে লালমিয়া বলল, 'তুই বাবা এহানেই থাক। কামকাজ করবি। রাইতে না হয় আমার বাড়ি গিয়া থাকবি।'

তার মানে এটা এখন লালমিয়ার বাড়িও নয় তাহলে?—এই দোকান তো নাজির আলির। তার নামে পাকা দলিল করা হয়েছে, দোকান তো তারই, লালমিয়া হলো ম্যানেজার। এই শুনে ছোঁড়া জেদ ধরে, রাত্রেও সে এখানে শোবে। তাই সই। তবু তো চোখের সামনে থাকবে। ব্যাটার বেইমান বাপটাকে টাইট করতে হলে এর দিকে একটু খেয়াল রাখা দরকার।

না, নাজির আলিরও আপত্তি নাই। সে গার্মেন্টসের ফ্যাক্টরি করার আয়োজন করছে, সেখানে মেলা ঝামেলা, ছেলেদের ওপর সম্পূর্ণ ভরসা করা যায় না। আবার রাজনীতিটা একেবারে রক্তের ভেতর, ওটা ছাড়ে কীভাবে? মসজিদের সামনে মিটিংগুলো শুক্রবারে-শুক্রবারে জমে উঠছে, সেখানে একটু কথাবার্তা, ওয়াজ-নসিহৎ না করলে দেশটা কাফেরদের হাতে চলে যাবে। এই দোকান ঠিক রাখতে হলে লালমিয়া ছাড়া আর কাকে বিশ্বাস করবে? লালমিয়া যাদের নিয়ে

পারুক দোকান চালাক। আর একটা শহিদ মুক্তিযোদ্ধার ছেলে মানে একটা অ্যাসেট, কখন কী হয় কে জানে? যদি তেড়িবেড়ি করে তখন দেখা যাবে। ঘাপটি মেরে থাকার সময় তখনকার মন্ত্রীর মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়ের সঙ্গে ব্যবসা করে যে টাকা করেছে তা কি ব্যাঙ্কে জমাবার জন্যে? গার্মেন্টিস চালু হলে তো কথাই নাই। এই মহল্লা কিনে নিতে তখন তার কতক্ষণ? তখন এই বুলেট তো বুলেট, তার মুরুব্বি যে লালমিয়া তাকেও লাথি মেরে বার করে দিতে একটুও বেগ পেতে হবে না। আরে, এইগুলি হইল প্যাসাবের ফেনা—এই আছে, এই নাই। কমোডের সামনে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাব করতে করতে নাজির আলি প্রস্রাবের বিলীয়মান হাল্‌কা হলুদ ফেনায় বুলেট আর লালমিয়াকে একসঙ্গে বুদ্‌বুদে মিলিয়ে যেতে দেখে। তলপেট সম্পূর্ণ খালি করেও বিলীয়মান ফেনা থেকে সে চোখ ফেরাতে পারে না, বরং বুঁজে-আসা চোখ জোড়ায় মহল্লার মসজিদে বসে ছড়ি হাতে বিচার করার ছবি দেখতে পায়।

বুলেটকে নিয়ে বরং ঝামেলার শেষ নাই লালমিয়ার। সে সিনেমা দেখা ছেড়ে দিয়েছে আজ কত্ত বছর। এখন বইয়ের হিস্টোরি বলার সুযোগ আর নাই। কিন্তু আল্লা এখন তাকে রোজ রাতে খাব দেখায়, মানুষের কাছে সেগুলো বলতে না পারলে তার চোখের কোণে পিচুটির মতো তাই জমে থাকে, নতুন স্বপ্ন সেখানে স্বচ্ছ হয়ে দানা বাঁধবে কী করে? মোরগ-পোলাও কি ভাত-তরকারির মতো স্বপ্নকেও কোনো-না-কোনো ফাঁক দিয়ে বের করে দিতে হয়, নইলে সারা শরীর জুড়ে তার বড়ো হাঁসফাঁস করে। আর স্বপ্নের কথা বলতে গেলেই এই পোংটা পোলা খালি বাধা দেবে, পদে পদে সন্দেহ করবে। অথচ যতই বাগড়া দিক, লালমিয়ার স্বপ্নের খুঁটিনাটি নিয়ে তারই উৎসাহ সবচেয়ে বেশি। পয়সা ফেললে কথা শোনার মানুষের অভাব হয় নাকি? এতগুলো বয়-বেয়ারা-মেসিয়ার তো রোজই তার স্বপ্ন শোনার জন্যে রাত্রে কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়ায়। তাতে লাভ কী? সে শুরু করতেই তো সবগুলো একসঙ্গে ঝিমাতে থাকে। এদিক থেকে বুলেট একটু বাঁকাটেরা প্রশ্ন করে তাকে বরং আরো চাঙা করে তোলে।

আজ সে ফের জিগ্যেস করে, 'চাচা, মুসল্লির মুখে বসন্তের দাগ দেখছিলেন?'

বিরক্ত না হয়ে বরং চোখ বুঁজে একটু ভেবে নিয়ে লালমিয়া বলে, 'না বাবা, ধলা মুখ, দাড়ি এক্কেরে ধলা ফক্‌ফকা। বহুৎ খাবসুরাৎ মুসল্লি। দেখলেই তাজিম হয়।'

তার বাপটা কি লালমিয়ার স্বপ্নে কখনোই আসে না? বুলেট মনখারাপ করে, তা লালমিয়ার আর দোষ কী? ইমামুদ্দিন কি তার একমাত্র সন্তানের স্বপ্নেও কোনোদিন উঁকি দিয়েছে?

দুদিন পর রাত্রে দোকান বন্ধ করার আগে আগে লালমিয়া ডাকে, 'ও বুলেট, কাউলকা রাইতে ঘুমাইতে এট্টু দেরি হইছিল। হুইয়া চোখ দুইখান মুজছি তে দেহি ঐ মুসল্লি, ঐ শাহ্ সাবে বইয়া নমাজ পড়ে। আমি যানি কৈ থাইকা খাড়াইয়া খাড়াইয়া দেখতাছি। মনে লয় শাহ্ সাবে আমারে কিচু জানান দিবার চায়।'

'ঐ উল্‌টা ফিট-করা পা-ওয়ালা মানুষ আপনারে আর কী কইবো? পাওয়ের ব্যারামের কথা কইলো?'

বুলেটের বেয়াদবিতে বিরক্ত হলেও তার আগ্রহে এবং নিজের তাগিদে লালমিয়া বলে, 'কাউলকা পাওয়ের দিকে আর দেখি নাই। আউজকা দেহি, মুসল্লি সাবে হাত দুইখান তুইলা মোনাজাত করে। ঐ হাতের মইদ্যে তামাম মসজিদ হান্দাইয়া পড়ছে, খালি জায়গা পইড়া রইচে আরো, মনে লয়—।'

'আমাগো মহল্লা ভি ফিট কইরা দেওয়া যাইবো?'

'কইতে পারি না।'

শুক্রবার রাতে বুলেট নিজেই এগিয়ে গিয়ে বলল, 'চাচা, খাব দেখছেন?'

লালমিয়া খুশি হয়। সস্নেহ কৃতজ্ঞতার চোখে বুলেটের দিকে তাকিয়ে বলে, 'কাউলকা বৃহস্পতিবার রাইত গেছে না? জুম্মার রাত, জুমেরাৎ। হোওনের আগে দুই রাকাত নফল নমাজ পইড়া লইলাম।'

'ক্যান্?'

'পাগলা!' উৎসাহে লালমিয়ার স্নেহ উপচে পড়ে। সে জানায় যে পবিত্র রাতে তার স্বপ্নে কে আসে, সে কতবড়ো ওলি, তাই পাকসাফ হয়ে থাকাই ভালো। কিন্তু গতরাত্রের স্বপ্নটা ছিল ভয়ের। না, না, কঙ্কাল দেখবে কেন? গোরস্থানও দেখেনি। তাহলে? কাল সে দেখে কি, সে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে মসজিদের সামনে পানের দোকান ঘেঁষে। সে যেন খুব ভয় পেয়েছে, ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে, কিন্তু ভয়ের কারণটা চোখের সামনে নাই, হয়ত স্বপ্নের ঐ অংশটা ঘটে গেছে আগেই, ওটা হয়ত তার মনে নাই। তো পানের দোকানের সামনে একটা ছোট বেঞ্চ পাতা, সেখানে বসে রয়েছে তিনজন মওলানা সাহেব। এঁদেরও লম্বা সাদা দাড়ি, প্রত্যেকের গায়ে লম্বা আলখাল্লা। প্রত্যেকের মাথায় মস্ত মস্ত পাগড়ি। পানওয়ালাকে জর্দা দিয়ে একটা পান বানাতে বলে লালমিয়া বেঞ্চের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আসসালামোআলায়কুম্।'

'ওয়ালেকুম সালাম ওয়া রহমতুল্লা ওয়া বরকতুহু ওয়া মাগফেরাৎ', তিনজনের কোরাস জবাব শুনে লালমিয়ার মাথা থেকে পা পর্যন্ত জমে ঠাণ্ডা হয়ে যায়, বেশি ভয় পেয়ে ভয় বোঝবার শক্তি হারিয়ে ফেলে সে স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। সে ঠিক দাঁড়িয়েও ছিল না, মাটিতে পা ঠেকিয়ে যেন শুয়েছিল শূন্যের ওপর। সে কি তবে মরে গেছে? মৃত্যুর পর তাকে হাজির করা হয়েছে কাদের কাছে? এঁরা কে? পানের দোকানদার জর্দা-দেওয়া একটি পান তার দিকে এগিয়ে ধরলে ওটা মুখে দিয়ে তার বুকে একটু বল আসে। বেঞ্চের মানুষেরা তাকে বলে, 'কেয়া বেটা, বাতাও।'

লালমিয়া আরো সাহস পায়। আস্তে আস্তে বলে, 'হুজুর, নমাজে আমার বগলে বইসা নমাজ পড়ে এক বুজর্গ শাহ্ সাহেব। বহুত খাবসুরৎ। মাগর তার পাও দুইখান দেখলাম উল্‌টাদিকে, মানে পাওয়ের পাতাগুলি . . .।'

তার কথা শেষ করার আগেই মওলানা তিনজন নিজের নিজের মস্ত আলখাল্লা প্রায় হাঁটু পর্যন্ত তুলে আগের মতোই কোরাসে বলে ওঠে, 'অ্যায়সা? এইরকম?'

লালমিয়া দেখে তাদের তিনজনেরই পায়ের পাতা উল্‌টোদিকে লাগানো। পানের দোকানদারও পান বানানো স্থগিত রেখে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়েও একটু বেকায়দায় বসে তার পা দুখানি বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'এইরকম?' তারও পায়ের বিন্যাস ঠ্যাঙের বিপরীত দিকে। ওদিকে মসজিদের ভেতর থেকে উল্‌টো পা–ওয়ালা মানুষ আরো সার বেঁধে আসতে আসতে তাদের আলখাল্লা, লুঙি বা পাজামা, এমনকি কয়েকজনের প্যান্ট পর্যন্ত গুটিয়ে লালমিয়ার দিকে নিজের পা–জোড়া পেশ করলে লালমিয়া ঘুমের মধ্যেই চিৎকার করে ওঠে এবং এতেই তার ঘুম ভাঙে।

স্বপ্নের কথা বলতে বলতে এখন এই মোরগ-পোলাওয়ের হোটেলে এই জাগ্রত অবস্থাতেই ঘুমের সময়কার ভয়ে ফের গুটিয়ে যায় এবং একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বিশাল হাঁড়ির ওপরের ঢাকনার দিকে। ঢাকনার ওপর ফেলে-রাখা হাঁড়িমোছা ন্যাকড়ায় সাদা লম্বা দাড়ির ময়লা চেহারা ফুটে ওঠার সম্ভাবনা লালমিয়াকে বিচলিত করে।

লালমিয়ার বেশ কয়েকটি রাত হয়তো স্বপ্নহীন কাটে, কিংবা স্বপ্নে-পাওয়া ভয় তাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে যে, এসব নিয়ে যত কম বলা যায় ততই ভালো। পরপর কয়েকদিন রাত্রে এরকম কিছুই না বলে ক্যাশবাক্স বন্ধ করে সে বাড়ি চলে যায় দেখে বুলেট একদিন আগেভাগেই জিগ্যেস করে, 'চাচা, আপনের খাবের মইদ্যে শাহ্ সাহেবে আহে, খাবসুরাৎ কইলেন না?'

'হ।'

'লাম্বা, মোটা, দাড়ি ব্যাকটি পাকনা। ঠিক কইচি না?'

'হইতে পারে।'

'আমাগো মাহাজনের লাহান?'

'হইতে পারে।' জবাব দিয়েই লালমিয়া হঠাৎ বিষম খায়। ঐ অবস্থাতেই দেখে, বুলেট একেবারে অপলক চোখে তাকিয়ে রয়েছে তার চোখের দিকে। গ্লাস হাতে নিয়ে ঢকঢক করে পানি খেয়ে লালমিয়া হঠাৎ ধমক দিয়ে ওঠে, 'কাস্টোমারে বইয়া রইচে। যা!'

খদ্দেরের জন্য প্লেট নিয়ে কাউন্টারের কাছে রাখা মস্ত ডেকচি থেকে পোলাও নেবে বলে বুলেট ডেকচির ঢাকনা খুললে ভেতর থেকে খশবুর সঙ্গে বেরোয় খাসা সাদা ধোঁয়া। লালমিয়া সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ কারো প্রবাহিত দাড়ি লক্ষ করে বিচলিত হয়। জেগে থাকতে স্বপ্নের জুলুম সে সহ্য করে কী করে?

রাত্রে দোকান বন্ধ করে লালমিয়া বেরিয়ে যাবার আগেই বুলেট তার সামনে এসে দাঁড়ায়। আজ সন্ধ্যা থেকেই সে বেশ খুশি-খুশি, লালমিয়ার তখনকার ধমক এই খুশিতে চিড় ধরাতে পারেনি। আদুরে গলায় বুলেট ডাকে 'চাচা'।

এভাবে মাখোমাখো গলায় ডাকবার বান্দা তো বুলেট নয়! তাহলে? লালমিয়া একেবারে গলে যায়। বেইমান বাপটা এই ছেলে সম্বন্ধে তাকে কিছুই বলে গেল না,

যুদ্ধে যাবার আগে যখন এসেছিল, বিদায় নেওয়ার সময় একবার তো বলতে পারত, আমার পোলাটা রইল। না, তেজ দেখিয়ে চলে গেল। অথচ তারা সেই ছেলেবেলার দোস্ত—সেই রায়সাবাজারে মসজিদে হাফিজুল্লা মুনসির কাছে কায়দা আমপারা পড়া শুরু করে মাঝখানে খাস্ত দেওয়া, মুকুলে-রূপমহলে-নাগরমহলে সিনেমা দেখার শুরু, বাংলাবাজারে মেয়েদের স্কুলের সামনে ১০টা ৫টা ডিউটি মারা—সব তো একসঙ্গেই হলো! অথচ—বুলেটকে দেখার সম্মানজনক দায়িত্বটা পালনের অধিকার তাকে হারামজাদাটা দিয়ে গেল না। হলে কী হবে, এই দ্যাখ, তর পোলায় অহন আমার উপরে কত ভরসা করে, শহীদের বাচ্চা দেইখা যা!

সাধ্যমতন আদর মিশিয়ে লালমিয়া বলে, 'কী বাবা?'

'কাউলকা রাইতে ঐ শাহ্ সাহেব মুসল্লিরে দেখলাম। খাবে আমারে দেখা দিয়া গেল। আপনে যানি কুন মসজিদে দেখছিলেন? আমি দেখলাম খুব সুন্দর মসজিদের দোতলায় খাড়াইয়া শাহ্ সাহেবে রাস্তা দেখতাছে। পাও দুইখান তার ঠ্যাঙের লগে উল্টাদিকে ফিট করা। চাচা, আমার মনে লয়, শাহ্ সাহেবের পায়ের ব্যারাম আছে—।'

'মিছা কথা কইস না ছ্যামরা।' বিরক্তি, ভয়, ক্ষোভ এমনকি আদরে লালমিয়া চুপসে যায়, এই এতিম বালকের ভবিষ্যৎ কী? ছোঁড়া নামাজ পড়ে না, রোজা করে না, পেচ্ছাব করে পানি নেয় না, নাপাক থাকে ;—আর সে কিনা স্বপ্নে ঐ সাহেবকে দেখার স্পর্ধা করল। কী সাহস! এরকম দুঃসাহসের পরিণতি কী ও জানে? বাপের বেপরোয়া স্বভাব, তার চাপাবাজির খাসলৎ কি জেগে উঠল এই ছেলের মধ্যেও? ক্যাশবাক্সের হিসাব কোনোরকমে সেরে লালমিয়া উঠে দাঁড়ায়।

'বুলেট, যা হুইয়া পড়্, জলদি ঘুমা গিয়া।' বুলেটকে ঘুমোতে বলে বাইরে পা দিতে দিতেও তার উদ্বেগ কাটে না, ঘুমোলেই তো তার স্বপ্নগুলো এ দেখতে শুরু করবে!

হোটেলের পেছনে তক্তপোষে শুয়ে বুলেট ছটফট করে। ঠিক ছটফট নয়, তার বুকে, পেটে ও মাথায় বড্ডো হাঁসফাস শুরু হয়। লালমিয়াকে দোষ দিয়ে লাভ নাই, স্বপ্নের কথা বলতে না পারলে চোখের কোণে খচখচ করে। তক্তপোষে তার পাশে শুয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে মশলা-বাটা মাতারি হাশেমের মায়ের পোলা হাশেম। পাশের তক্তপোষে বাবুর্চি শুয়ে শুয়ে সিগ্রেট টানছে। বুলেট খুব নরম করে ডাকে, 'ওস্তাদ।'

'ক।' বাবুর্চিকে 'ওস্তাদ' বলে সম্বোধন করায় লোকটা তার দিকে মনোযোগ দেয়। বুলেট আশ্বাস পেয়ে বলে, 'কাউলকা রাইতে আমি খাব দেখি কি এক মওলানায় মসজিদের দোতলায় খাড়াইয়া রাস্তার মানুষ দেখতাছে। মানুষটার দাড়ি বহুত লাম্বা, কাপড়ও পরছে লাম্বা। কাপড়ের তলায় পাওখান তার উল্টাদিকে ফিট করা। আমি মনে করলাম, এই পাও লইয়া মানুষটা সামনে হাঁটবো ক্যামনে—।'

'চুপ থাক্। ঘুমাইতে দে। তর দেহি আমাগো মানিজারের ব্যারাম ধরছে, নিন্দের মইদ্যে মানিজার খালি খাব মারে। চাপাবাজি করনের আর জায়গা পায় না!

কাউলকা আমারে কয়, ও বাবুর্চি, মুর্গির পিলা কলেজি যেমুন কম কম ঠেহে। আউজকা কইলো, কাস্টোমার তো আইজ কম আইচে, এতগুলি চাউল ব্যাকটি শ্যাষ হয় ক্যামনে?—হালায় আমারে সন্দ করে। মাহাজনে তো দ্যাহে না, তালাশ করে না, মানিজার পসা মাইরা কেমুন খোদার খাসি হইতাছে দ্যাহস না? আবার আমারে চোর ঠাওরায়! মানিজারের মারে বাপ!'

বাবুর্চির কাছেও বুলেট সুবিধা করতে পারল না। হাশেমের মায়ের পোলা হাশেম ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করতে করতে পাশ ফিরল। তার কথাগুলো বুঝতে পারলেও ছোঁড়ার স্বপ্নটা আঁচ করা যায়। কিন্তু মনোযোগ দিয়েও তার বিড়বিড় ধ্বনি কোনো শব্দের আকার পায় না। বাইরে বড়ো রাস্তার মোড়ে বিকট আওয়াজ হলে বুলেট বিছানায় উঠে বসে। এ তো গ্রেনেডের আওয়াজ! তবে কি তার বাবা এসে বড়ো রাস্তার ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মার উড়িয়ে দিল? নাজির আলিকে কি এবারেও শুধু লাথি দিয়েই ছেড়ে দেবে?—ছেড়ে দেবে না তো?—এই উদ্বেগ ও উত্তেজনা টেকে বড়োজোর এক মিনিট, জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে চোখ গেলে মনটা খারাপ হয়ে যায় : ট্রান্সফর্মার উড়িয়ে দিলে রাস্তায় বাতি জ্বলে কী করে? পুলিশের ব্যস্ত হুইসেল ও লোকজনের কথাবার্তা যা কানে আসে তা থেকে বোঝা যায় ট্রাকের টায়ার ফাটল। দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বুলেট শুয়ে পড়ল। গ্রেনেডের শব্দও তো এমনি হয়, এটা তাহলে গ্রেনেড হলো না কেন? কাল মসজিদের দোতলায় দাঁড়িয়ে-থাকা লোকটির পায়ে একটা গ্রেনেড মারতে পারলেও তার পায়ের ব্যারামটা সারে। পেছনে হাঁটতে বড়ো কষ্ট, অনেক বিপদ। লোকটির মস্ত দাড়ি ও আলখাল্লা বিছানার ওপরকার মশারির সঙ্গে ঝোলে এবং একটু পরে বুলেটের ঘুম মশারিকে গুটিয়ে আনে দাড়ি ও আলখাল্লার ভেতরে। লোকটার গায়ের রঙ বোঝা যায় কেবল তার গালে, লালচে ফর্সা রঙ বিকালবেলার আলোতে টকটকে লাল দেখায়। খুব বড়ো চারকোণা একটা মসজিদের কারুকাজ-করা গেটের পাশে বেঞ্চ পাতা, প্রত্যেক বেঞ্চে ২/৩ জন করে লোক। আর লালমিয়ার এবং বুলেটের স্বপ্নের চেনা লোকটি বসেছে বড়ো একটা চেয়ারে। তার সাদা দাড়ি প্রবাহিত হয় দুধের নহরের মতো, নহরের দুধে তার দামি আলখাল্লা একটু ঘিয়ে সাদা। লোকটির আলখাল্লার নিচে পায়ের পাতাদুটো রোজকার মতোই ঠ্যাঙের উল্‌টো দিকে লাগানো। বুলেট লোকটির কাছে গিয়ে মাথা নুয়ে বলে, 'আসসালামোআলায়কুম্।'

'ওয়ালেকুম সালাম ইয়া রহমতুল্লা ওয়া বরকতুহু ওয়া মাগফেরাৎ', পরিচিত ওল্‌টানো পা-ওয়ালা এবং বেঞ্চে বসে-থাকা অপরিচিত ওল্‌টানো পা-ওয়ালারা কোরাসে জবাব দিলে বুলেট সরাসরি জিগ্যেস করে, 'আচ্ছা হুজুররা, বহুত দিন তো হইয়া গেল, আপনেরা আপনাগো পাওগুলি মেরামত করেন না ক্যালায়?'

এই কথায় তারা খুব রেগে বুলেটের দিকে এগিয়ে এল। কিন্তু পায়ের পাতা তাদের পেছন দিকে থাকায় তারা যতই হাঁটে বুলেটের কাছ থেকে ততই সরে সরে যায়। তারা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হওয়ার আগেই ঘুমের মধ্যেই বুলেট গড়িয়ে পড়ে অন্য

স্বপ্নে। এখানে সে নিজেকে দেখতে পায় হাউস বিল্ডিং কর্পোরেশনের উঁচু ছাদের ওপর। নিমেষের মধ্যে সে নিজেকে আর আলাদা করে দেখে না, বরং নিজেই দেখে নিচে অনেক মানুষ। আজ কি হরতাল-টরতাল আছে? মিটিং হচ্ছে নাকি? স্বপ্নের ভেতরেই এইসব ভাবনায় সে অস্থির, এমন সময় দেখা গেল লালচে ফর্সা মুখ থেকে দুধের নহরের মতো দাড়ি এবং দুধের ধারায় একটু ঘিয়ে রঙের আলখাল্লা ঝুলিয়ে তার চেনা লোকটি দাঁড়িয়ে রয়েছে জাফরি-কাটা একটি দেওয়ালের পাশে। এই লোকটির নেতৃত্বে ওল্টানো পা-ওয়ালার একটি পার্টি বুলেটের দিকে তেড়ে এসেছিল, সেটা স্বপ্নে না জাগরণে, সেটা কোন্ জায়গায়, সেটা কবে—এর কিছুই মনে করতে না পারলেও তার একটুও উদ্বেগ, এমনকি উত্তেজনাও হয় না। লোকটির পায়ের পাতাজোড়া মেরামত করতে হলে ওগুলো আগে ফেলে দেওয়া দরকার—এই বিবেচনায় বুলেট ওদিকে কী ছুঁড়বে তাই নিয়ে বেশ ভাবনায় পড়ে। সে তার প্যান্টের এ-পকেট হাতড়ায়, ও-পকেট হাতড়ায়, কিছুই নেই দেখে ভাবনা আরো বাড়ে। এইরকম ভাবতে ভাবতে তার বড্ডো পেচ্ছাব চাপে। হাউস বিল্ডিং কর্পোরেশনের ছাদে ঐ কর্পোরেশনের বা মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনের বা সরকারেরও কোনো পাবলিক টয়লেট নাই। পেচ্ছাবের বেগ বাড়ে। একরকম বাধ্য হয়েই বুলেট ছাদ থেকে হলুদ প্রস্রাবের ধারা বইয়ে দেয় নিচের দিকে। এর মধ্যেই সে তাগ করেছে গাল থেকে দুধের নহর বইয়ে দেওয়া ঘিয়ে রঙের আলখাল্লাওয়ালার ওল্টানো পায়ের পাতা। ইমামুদ্দিন ও তার রাইফেল উপাধিপ্রাপ্ত স্ত্রী উপস্থিত থাকলে ৭দিন বয়সের বুলেটের প্রস্রাবের বেগের যথাযথ বিবর্তন ও বিকাশ ঘটেছে কিনা বলতে পারত। তার তীব্র বেগ হয়তো সন্তোষজনক ছিল, কিন্তু ওল্টানো পায়ের পাতা তার প্রস্রাবের ঝাঁঝ আঁচ করতে পেরে জাফরি-কাটা দেওয়াল টপকে পেছনে হাঁটতে হাঁটতে ঢুকে পড়েছে তাদের অদৃশ্য আখড়ার ভেতরে। ওদিকে বাতাস বইছিল একটু-একটু, তার প্রস্রাবের অনেকটাই হাওয়ায় এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ে।

এইসময় ঘুম ভেঙে গেলে বুলেট তার লুঙিতে পানির অল্প তাপ পায় এবং উঠে দেখে তার লুঙ্গি তো বটেই, এমনকি তার ডানদিকে শোয়া হাশেমের মায়ের পোলা হাশেমের হাফপ্যান্ট সম্পূর্ণ ভিজে গেছে। দুর! এটা সে কি করল? দাদী কলুটোলার পীরসাহেবের তাবিজ এনে দিলে তার বিছানায় পেচ্ছাব করা বন্ধ হয়েছিল কতদিন আগে, আজ আর এক শাহ্ সাহেবের অছিলায় সেই তাবিজ কি নাকচ হয়ে গেল? তবে তার টার্গেট মিস করার দুঃখ প্রবল হওয়ায় বিছানা ভেজাবার লজ্জা আপাতত চাপা পড়ে। টার্গেট মিস করাটা তার ঠিক হলো না। একরকম জোর করে পরপর দুই গ্লাস পানি খেয়ে বুলেট ফের শুয়ে পড়ল। শিওরের বালিশ ঠিকমতো উল্টিয়ে নিলেও ডানদিক সম্পূর্ণ ভিজে যাওয়ায় বুলেটকে শুতে হয় বাঁ-পাশ ফিরে।

রচনাকাল : ১৯৯২

কান্না

'ওয়া ইয়ারহামুনাল্লাহু ওয়া ইয়াকুম। আমিন।' জিয়ারতের এই দোয়ার পর কয়েক পলকের বিরতির সুযোগে সবুজ সোয়েটার ও সবুজ-হলুদ চেক-কাটা লুঙি-পরা লোকটি কী বলতে এগিয়ে আসছিল, তার দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে আফাজ আলি একনাগাড়ে আয়াত পড়তে শুরু করে। এক সুরা শেষ করে ধরে আরেক সুরা, কোনো কোনো সুরা ৩ বার এমনকি ১০ বার পর্যন্ত পড়েও সে ক্লান্ত হয় না। আফাজ আলি পড়ে একটু ধীর লয়ে। আবৃত্তিতে তার করুণ সুর, পড়তে পড়তে ঝাপ্‌সা কান্নায় গলা ভিজে-ভিজে যায়, কিন্তু ভিজে শব্দের উচ্চারণ বেশ স্পষ্ট। সামনে দামি ইণ্ডিয়ান আগরবাতির আবছা ধূসর ধোঁয়ায় এবং হাল্‌কা মিষ্টি গন্ধে কবরের ভেতরকার লাশটির চেহারা বাইরের জ্যান্ত মানুষের জোড়া জোড়া চোখে ভাঙা-চোরা আকার পায় এবং অপরিচিত পবিত্র ভাষার রহস্যে কবরের ভিতর-বাইরের ফারাক কমতে থাকে। আফাজ আলির কাঁদো-কাঁদো গলার ঢেউ ভাষার দুর্বোধ্যতাকে ছাপিয়ে মরহুমের প্রতি সবার আবেগকে চড়িয়ে দেয় নিবেদনের চূড়ায়, সেখান থেকে হঠাৎ করে নামা কঠিন। আয়াতের ভাষায় কারও দখল না থাকায় সব কথাই হয়ে দাঁড়ায় মুর্দার সঙ্গে প্রত্যেকের যোগাযোগের প্রকাশ। তার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের মিহি ও মোটা কাহিনী একাকার হয়ে সবাইকে ব্যাকুল করে তোলে এবং শোকের আগুন উত্তাপ হয়ে ফাল্গুনের এই শেষ দুপুরে তাদের শরীরে একটু-একটু ওম দেয়। আফাজ আলি বিড়বিড় করতে করতে সবুজ সোয়েটার ও সবুজ-হলুদ চেক-কাটা লুঙিকে আরেকবার দেখে, লোকটি কৃষ্ণকাঠির কুদ্দুস হাওলাদারের ছেলে মনুমিঞা, আফাজ আলির ছেলের চাকরির ব্যাপারে কয়েকবার বরিশাল আসা-যাওয়া করেছে। দেখা হলেই টাকা, দেখা হলেই টাকা। একে এত দিলে চাকরি হবে, ওকে এত না দিলে হওয়া চাকরিটা ফসকে যাবে।—এখন দেখো, একেবারে ঢাকায় গোরস্তান পর্যন্ত হানা দিয়েছে। আফাজ আলির এখন কথা বলার সময় কোথায়? জিয়ারতের দোয়া পড়ার সুরে মুর্দার আত্মীয়স্বজন ফোঁপাতে শুরু করেছে, এই রেশটা সে নষ্ট করে কীভাবে? একটু তফাতে দাঁড়ানো মনুমিঞার মুগ্ধ চোখ সেঁটে গেছে দুই দিকের কবরগুলোর

ওপর। দেখুক, ব্যাটা ভালো করে দেখে নিক। ৭৮০৪ নম্বর কবর আগাগোড়া পাথরে বাঁধানো, লাল সিরামিক ইটে গাঁথা ৭৮১৯, সাদা সিমেন্টের ওপর মোজাইক করা ৭৯৮৪,—সবগুলো সে নয়ন ভরে দেখুক। প্রতিটি কবরের শিয়রে সেট-করা সাদা পাথরে আল্লার কালামের ২/১টা লাইন, তার নিচে মুর্দার নাম, ফেলে-যাওয়া ঠিকানা এবং জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ। খোদার কালাম বুঝতে না পারুক, বাংলা কথাগুলোই পড়ুক। তাতেও তার সময় কাটবে। কত কবরের ওপর সবুজ ঘাসের গালিচায় লাল চিনা ঘাসের বর্ডার, কোনো-কোনোটির মাঝখানে বা একধারে গোলাপ, রজনীগন্ধা কিংবা ডালিয়া। সারি সারি কবরের মাঝ দিয়ে জিন্দা মানুষের চলাচলের জন্যে সরু পাকা রাস্তা,—মনুমিঞা একটু ঘুরে ঘুরে দেখুক না। এখানে খামাখা দাঁড়িয়ে থাকে কেন? আফাজ আলির এখনো তো ঢের দেরি। মোনাজাতের জন্যে সে হাত তুললে সবার হাত উঠল। অথচ ঐ বেআক্কেল ছোঁড়াটা তাও করে না। আফাজ আলি মরহুমের নাম করে তাকে বেহেশত নসিব করার জন্যে আল্লার দরবারে এবার মিনতি জানায় বাংলায়। তার মিনতির আর শেষ নাই। মরহুমের বাবা-মা এবং আরো আগেকার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মরহুম সুখে-শান্তিতে বেহেশতবাসী হোক, আল্লা তাদের গুনাখাতা মাফ করে দিক। আল্লার দয়ার সীমা নাই, গুণাগার মানুষের ওপর রহম বর্ষণ করেন বলেই তিনি রহমানুর রহিম। মোনাজাত শুনতে শুনতে কারো কারো চোখে পানি আসে, মোনাজাতের জন্যে এক হাত নিয়োজিত রেখে অন্য হাতে চোখ মুছতে গেলে নোনা পানি নামে দুই চোখ ঝেঁপে। বেদনা ও মিনতিতে গলা কাঁপিয়ে আফাজ আলি বলে, 'হায়াৎ হোসেন খান সাহেবকে তুমি উঠিয়ে নিয়েছ, তোমার বান্দাকে তুমি ফিরিয়ে নিলে, আমাদের কোনো নালিশ নাই। আল্লা, তুমি তাঁর বিবি ও আওলাদদের এই শোক সহ্য করার তৌফিক দাও, হে আল্লা রাব্বুল আলামিন।' মরহুমের ছেলেরা হাপুস নয়নে কাঁদতে শুরু করলে মনুমিঞা রঙবেরঙের কবরের সৌন্দর্য উপভোগ করা স্থগিত রেখে শোকার্ত জটলার কাছাকাছি চলে আসে। শোকাভিভূত ও কান্নায় ভেঙে-পড়া কেউ কেউ এক হাতে নিজের নিজের পাঞ্জাবি বা প্যান্টের পকেট ছুঁয়ে দেখে। দিনকাল খারাপ, যেখানে সেখানে পকেটমার, প্রাণ ভয়ে কাঁদার পথও ভদ্রলোকদের বন্ধ হয়ে আসছে। এদের নিরঙ্কুশ শোক উদ্‌যাপনের সুযোগ দিতে আফাজ আলি চোখের ইশারায় মনুমিঞাকে একটু সরে যেতে বললেও তার অশ্রু ভেদ করে চোখের নির্দেশ বোঝা মুশকিল। আফাজ আলির মোনাজাতেই সে বরং মশগুল, তাদের কৃষ্ণকাঠির আফাজ আলি মৌলবি ঢাকার এত বড়ো বড়ো মানুষের শোককে কীভাবে উস্‌কে দিচ্ছে তাই দেখে সে অভিভূত। আফাজ আলিকে জরুরি খবরটা দেওয়া দরকার, যত তাড়াতাড়ি পারে তাকে নিয়ে লঞ্চঘাটে যেতে হবে —এসব কথা তার মনেই থাকে না।

মোনাজাত চলতে চলতেই কবরের চারদিকে বাঁশের বেড়া দেওয়া হচ্ছে। মালি ও গোরকোনদের নিজেদের মধ্যে কথা-বার্তা ও কথাকাটাকাটি কিংবা

গোরস্তানের শেষ মাথা থেকে একটি কোকিলের অবিরাম ডাক কিংবা নতুন লাশ নিয়ে ঢোকা শবযাত্রীদের কলেমা শাহাদত আবৃত্তি—কোনো কিছুই আফাজ আলির মোনাজাতে বিঘ্ন ঘটাতে বা শোকার্তদের প্রতিক্রিয়ায় চিড় ধরাতে পারে না। আফাজ আলি মোনাজাতের প্রায় শেষে এসে 'আল্লা পরওয়ার দিগার, মোহাম্মদ হাবিবুল্লার জন্যে তোমার এতগুলো বান্দা আজ—' বলতেই শবযাত্রীদের একজন বলে, 'হায়াৎ হোসেন খান।'—নাম ভুল করলেও আলিমুল গায়েব আল্লা ঠিকই সংশোধন করে নেবেন—এই আস্থা থাকা সত্ত্বেও আফাজ আলি বিব্রত হয়, মুর্দার নাম বলতে নিজের ছেলের নাম বলে ফেলায় তার মনটা খারাপ হয়ে যায়। তবে কয়েক মুহূর্তেই সামলে নিয়ে মোনাজাত অব্যাহত রাখে।

কয়েক সারি সামনে ডোরা-কাটা নীল শার্ট গায়ে, চশমা-পরা কাঁচা-পাকা-চুল-মাথা লোকটিকে হেঁটে যেতে দেখে এবং আসরের নামাজের আর দেরি নাই বলেও বটে, শবযাত্রীরা টের না পেলেও আফাজ আলি দীর্ঘ মোনাজাত শেষ করে একটু আকস্মিকভাবে। মুর্দার আত্মীয়স্বজনদের নেতৃস্থানীয় মুরুব্বির হাত থেকে ১০০ টাকার ২টা নোট এবং মুর্দার কবর ও আখেরাতের হেফাজতের দায়িত্ব নিয়ে সে বিদায় নেয়। এবার তাকে ছুটতে হয় সামনের কয়েক সারি পর আরেকটি কবরের দিকে, ৮২২২ নম্বর কবরের দিকে ছোটার তাগিদে মনুমিঞার কথাও তার মনে থাকে না। ৮২২২ নম্বরের আজ মৃত্যুদিবস, সকালবেলাতেই শরিফ মৃধাকে লাগিয়ে কবরের শুকনা ঘাসে পানি দিয়ে রেখেছে। আগাছা পরিষ্কার করে টালির রেলিংটা ভিম দিয়ে ঘষতে বলেছিল, তা মৃধা বলে, ঐ সাহেবের বিশ্বাস নাই, না-ও আসতে পারে, তখন ভিমের দাম দেবে কে? লোকটা এসেই পড়েছে যখন তো এখন বরং মৃধাকে দিয়ে সাফ করাবার কাজটা শুরু করা যায়। কিন্তু শরিফ মৃধা গেল কোথায়? আফাজ আলি লম্বা আলখাল্লা ও লুঙি সামলে প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে ৮২২২-এ পৌঁছুবার আগেই কাঁচা-পাকা-চুলের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করে দিয়েছে কাল্লুমিঞা। শরিফ মৃধা কোথায় মরতে গেল? শরিফ মৃধা আর কাল্লুমিঞা দুজনেই এই গোরস্থানের গোরকোন-কাম-মালি, কিন্তু বেশ আগে থেকে কাজ করছে বলে কাল্লুমিঞার দাপটটা একটু বেশি। হায়দর বখস ও কাল্লুমিঞা পরস্পরের পৃষ্ঠপোষকতা করে, কবর জিয়ারতের জন্যে লোকজনকে হায়দর বখসের কাছে ধরে আনে কাল্লুমিঞা এবং হায়দর বখস আবার কাল্লুমিঞাকে কবর দেখাশোনার কাজ জুটিয়ে দেয়। হায়দর বখস লালবাগের মানুষ, ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় কিছুদিন আসা-যাওয়া করেছে, উর্দু ভাষাটা তার অল্পস্বল্প জানা, এমনকি মোনাজাতের সময় উর্দু বাক্যাংশ পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু পান-জর্দা-কিমাম-ঘষা গলায় তার কাঁদোকাঁদো ভাব প্রায় আসেই না এবং উর্দু-শব্দখচিত হলেও তার মোনাজাত সংক্ষিপ্ত। তাই দাপটের গোরকোন-কাম-মালি কাল্লুমিয়াকে দিয়ে হায়দর বখস পার্টি হাতাবার যত ফন্দিই করুক, আফাজ আলির দোয়া-দরুদ আর মোনাজাত শোনার পর কারও সাধ্য নাই

যে তাকে বাদ দেয়। আবার মুর্দার কবর কি তার আখেরাতের হেফাজতের চেয়ে বরং বড়ো-বড়ো বাড়িতে মিলাদ পড়াবার দিকে হায়দর বখসের ঝোঁকটা বেশি। আফাজ আলি কি ইচ্ছা করলেই ধানমণ্ডি, গুলশান, বনানীর আলিশান বাড়িতে সামিয়ানা-টাঙানো মহফিলে মিলাদ পড়াতে যেতে পারে না? শুধু ইশারা করা। তারপর দেখো, গাড়ি এসে নিয়ে যাবে, গাড়ি দিয়ে যাবে। কিন্তু এই গোরস্তানের বাইরে বেশিক্ষণ থাকতে হলে তার ছটফট-ছটফট লাগে। কত কবরের তদারকি তাকে করতে হয়, কবরের বাসিন্দাদের জন্যে দোয়া পড়া, কোরান খতম করে তাদের নামে বকশানো, এমনকি শরিফ মৃধাকে তাগাদা দিয়ে কবরের আগাছা ছাঁটা, ঘাস গজানো, গাছ লাগানো ও ফুল ফোটাবার দায়িত্বও তো পালন করতে হয় তাকেই। এসব কাজে হায়দর বখসের মনোযোগ কম। বেশ তো, বড়ো-বড়ো বাড়ি ঘুরে তুমি মিলাদ পড়ো, চেহলামের দিন কেরাত করে নাজাতের দোয়া পড়ো,—না করেছে কে? এইসব নিয়েই থাকো। এখানে আফাজ আলির ভাগে হাত বসাতে আসো কেন? এই দেখো, কাল্লুমিঞা এখানে দাঁড়িয়েই কী কেরামতি করে ফেলেছে, হায়দর বখস এসে এখন কথা বলছে ঐ কাঁচা-পাকা-চুলের সঙ্গে। না—। আফাজ আলির এতদিনের পার্টি, আর রাখা গেল না! কাঁচাপাকাচুলের সঙ্গে ক্রমবিলীয়মান দূরত্বের তুলনায় আফাজ আলি অনেক চেঁচিয়ে বলে, 'আসসালামোআলায়কুম। আসছেন? আমি তো সকাল থিকাই পথের দিকে চাইয়া রইছি।' সালামের জবাবটা পর্যন্ত না দিয়ে কাঁচা-পাকা-চুল হায়দর বখসকে হুকুম করে, 'শুরু করেন।' হায়দর বখস দোয়া পড়ার পাঁয়তারা করতে করতেই আফাজ আলি বলে, 'আপা আসে নাই?' এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া অনাবশ্যক বিবেচনা করে কাঁচা-পাকা-চুল তাকে জিগ্যেস করে, 'কী হুজুর, আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট কোথায়? ঈদের দিন এতগুলো টাকা দিয়ে গেলাম, চীনা ঘাসের বর্ডার দেবে, আপনার কথামতো আবার গোলাপের চারা লাগাবার জন্য এক্সট্রা টাকা দিলাম, কৈ, কিছুই তো করেনি।'

হারামজাদা শরিফ মৃধা করলটা কী? সকালে এক পানি ঢালা ছাড়া ৮২২২-এ কোনো কাজই সে করেনি। আফাজ আলি কি বেইজ্জতটাই না হলো! ওদিকে হায়দর বখসও লম্বা লম্বা দোয়া পড়ছে খুব কায়দা করে। আফাজ আলি ঠিকই বোঝে, এসব হলো মক্কেল ভাগাবার মতলব। তা এত যে গলা সাধছে, কাঁচাপাকাচুল এসবের কোনো পরোয়া করে? মোনাজাতে শামিল না হয়ে শ্বশুরের কবরের সামনে সে কিনা সিগ্রেট ধরায়। বেয়াদবের একশেষ! সিগ্রেটে টান দিতে দিতে আফাজ আলিকে খামাখা বকে, 'আপনারা গোরস্তানে ব্যবসা ফেঁদেছেন তো ভালোই, তা টাকা নিয়ে কাজ করেন না কেন?' লোকটার কথার ধরনই এরকম, সুযোগ তৈরি করে মুনসি-মৌলবিদের ওপর এক চোট ঝাড়ে। তারা নাকি ধর্মের নামে ব্যবসা করে, তাদের পয়সার খাঁই নাকি বেশি, তাদের দারুণ খাবার লোভ!—বললেই হলো? আরে, মৌলবি-মুনসি ছাড়া চলবে তোদের? আফাজ

আলির শ্বশুর মওলানা আশরাফুদ্দিন উজিরপুরী বলে, মানুষ যত বড়োই হোক না কেন, ধনদৌলত বিদ্যাবুদ্ধি যতই হোক, মৌলবি ছাড়া তার জানাজা পড়াবে কে? মৌলবি ছাড়া তোদের বিয়ে পড়াবে কে? জন্মের পর আকিকা হবে মৌলবি ছাড়া? আকিকা, শাদি ও মওত—জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মুসলমানের পদে পদে মৌলবি দরকার। 'দোলনা হইতে কবর তক মৌলবি ছাড়া মুসলমানের উপায় নাই, উপায় নাই, উপায় নাই!' এসব নসিহত দেওয়ার সময় শ্বশুর সাহেবের গলায় ওয়াজের সুর এসে পড়ে। দপদপিয়া মাদ্রাসা থেকে দাখেল পাশ করে হাবিবুল্লা বাকেরগঞ্জ কলেজে ভর্তি হওয়ার জেদ ধরলে আশরাফুদ্দিন জোর বাধা দেয়, 'অন্তত আলেম পর্যন্ত পড়ো, আল্লার এলেম বরকত দেয়।' হাবিবুল্লার উদ্বেগ, মাদ্রাসা লাইনের ভবিষ্যৎ কী? তারই গ্রামের কলেজে-পড়া ছেলেরা তার দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে ছোট্ট করে হাসে, তার সহ্য হয় না। বাপ তো মৌলবি লাইনে পড়েছে, বৌ-ছেলে-মেয়ের ভরণপোষণের জন্যে তাকে পড়ে থাকতে হয় ঢাকার গোরস্থানে। এইসব শুনে আফাজ আলি উসখুস করলেও তার গোপন সায় কিন্তু ছেলের ইচ্ছায়। বি.এ., এম.এ না হোক, আই.এ পাস করেও ছেলের যদি ছোটো-খাটো চাকরি একটা জোটে তো জীবিত অবস্থায় কবরবাস থেকে সে রেহাই পায়। শ্বশুরের সঙ্গে সে তো আর বেয়াদবি করতে পারে না, কিন্তু হাবিবুল্লা নানার মুখের ওপর জবাব দেয়, 'মাইজা মামুরে তাইলে মাদ্রাসা থাইকা ছাড়াইয়া লইলেন কেন?' মওলানা আশরাফুদ্দিন উজিরপুরীর মেজো ছেলে পড়ে বরিশাল পলিটেকনিকে, পাশ করে চাকরি তো পাবেই, আর 'মাইজা মামু বেতন যা পাইবো, উপরি পাইবো কম করিয়া তার পাঁচগুণ।' নাতির এরকম বেতমিজি কথার ঝাঁকুনিতে আশরাফুদ্দিনের নসিহত থেকে ওয়াজের সুর ঝরে পড়ে, সরাসরি ভঙ্গিতে সে বলে, 'চাকরির বাজার ভালো না। এম.এ, বি.এ পাস করিয়া ছ্যামরাগুলি পথে পথে ঘুরতেয়াছে, নজরে ঠেহে না?' কিন্তু 'চন্দ্রসূর্য যতোদিন জ্বলবে, মানুষের হায়াত-মওতের আইন আল্লা যতদিন দুনিয়ায় জারি রাখবে, মৌলবি ছাড়া মানুষের চলবে না। কথাটা ভাবিয়া দেখিও।'

তা এখন মনে হয়, কথাটা আশরাফুদ্দিন ঠিক বলেছিল। একবার ফেল করে সেন্টার বদলে বোর্ড-অফিসে পয়সা খরচ করে হাবিবুল্লা এইচ.এস.সি সেকেণ্ড ডিভিশনেই পাস করল, তাতে লাভটা হলো কী? চাকরি তো জোটে না। তার চাকরির জন্যে ঘুষের টাকা জোগাতেই আফাজ আলির কাহিল হাল। মাসখানেক আগে আবদুল কুদ্দুস হাওলাদারের কাছ থেকে ৫০০০ টাকা হাওলাত করে বরিশালে ঘুষ দিয়ে এসেছে। কুদ্দুস হাওলাদারের ছেলে মনুমিঞা এখন হাজির হয়েছে ঘুষের ২য় কিস্তির টাকা আদায় করতে। তিনবছর কলেজে পড়েই চাকরি করে জাতে উঠতে পোলা তার পাগল হয়ে উঠেছে, তা সেই জাতে ওঠার জন্যে টাকাটাও তার বাপকে কামাই করতে হয় মুর্দাদের জন্যে দোয়া-দরুদ পড়ে। আল্লার কালামের বরকত না থাকলে তার সংসার চলে? মওলানা আশরাফুদ্দিন

উজিরপুরী যে সে মানুষ নয়, সমস্ত থানার মধ্যে নামকরা আলেম, তার জবাবের কথা কি আর মিথ্যা হতে পারে? এই ব্যাটা কাঁচাপাকাচুল যদি সেই কথা একটুও বোঝে! তার দিকে চশমার ভেতর দিয়ে কীরকম তাকিয়ে বলে ফেলল, 'আপনে যান হুজুর, এখানে দাঁড়িয়ে মিছেমিছি ক্লায়েন্ট হারান কেন? বড়োলোকের লাশ আবার মিস করবেন না।' লোকটা 'হুজুর' কথাটাও এমন বাঁকা করে বলে যে এর চেয়ে একটা গালি শোনা বরং ভালো। আরে ২০ টাকার বেশি তো দেওয়ার মুরোদ নাই, তোমার অত তেজ কীসের? বৌ সঙ্গে থাকলে কথাবার্তা প্রায় একরকম হলেও কিন্তু ৫০ টাকা ছাড়ে। বৌকে ব্যাজার করতে ভয় পাও, আর আখেরাতের কথা ভাবো না? কোন কলেজের মাস্টার, এই গোরস্তানে ঐসব মানুষকে পোঁছে কে? মুর্দা হোক আর জিন্দা হোক, এখানে আসে সব বড়ো-বড়ো মার্চেন্ট, ফরেনারদের অফিসে কাজ-করা সায়েবরা এখানে আসে, এই কাঁচাপাকাচুলকে এখানে গুনতির মধ্যে ধরা যায়? মরহুম শ্বশুরের জন্যে তবু এখন আসতে পারো, মরলে তোমার লাশ ঢুকতে পারবে এখানে? আজিমপুরায় রিকশাওয়ালা আর ফেরিওয়ালাদের পাশে সাড়ে তিন হাত জায়গা পেলেই বর্তে যাবে। এইসব প্রফেসর লাইনের মানুষদের আফাজ আলি হাড়ে-হাড়ে চেনে। হাবিবুল্লাকে সেকেণ্ড ডিভিশনে পাশ করিয়ে দিতে ঘুষ নিল যে লোকটা, দবিরুদ্দিন না কবিরুদ্দিন মোল্লা, সেও তো কোন কলেজের মাস্টারই ছিল। আবার মনুমিঞার সঙ্গে গিয়ে আফাজ আলি ছেলের চাকরির জন্যে ১ম কিস্তি ঘুষ দিয়ে এল, জাহাঙ্গীর কাজী,—সে লোকটিও তো বরিশাল না খুলনা না যশোর কলেজের প্রফেসর, কী একটা অফিসার পোস্টে বদলি হয়ে এসেছে '২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নারীশিক্ষা বিস্তার প্রকল্প' অফিসে। এখানে যতদিন থাকে দুই হাতে টাকা কামাবে, তারপর সরকারের মর্জিমতো কোথায় কোনো কলেজে ঠেলে পাঠাবে, আবার সেই মাস্টার তো মাস্টারই! তবে, কাজ করার মুরোদ আছে বলেই না সে টাকা নেয়। কাঁচাপাকাচুল তো সেটাও পারে না। তার এত তেজ কিসের? রাগে আফাজ আলির কদমে যেন হাওয়া লাগে, খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে সে একরকম ছুটতে থাকে গোরস্তানের গেটে মসজিদের দিকে। এই রাগ তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার জন্যে কাঁচাপাকাচুলের ওপর, না ছেলের চাকরির ঘুষের ১ম কিস্তির টাকা-নেওয়া সেই অফিসারে-পরিণত-প্রফেসরের ওপর, না তার পুরনো পার্টি ভাগিয়ে নেওয়ার জন্যে হায়দর বখসের ওপর, না হায়দর বখসকে ডেকে আনার জন্যে কাল্লুমিঞার ওপর, না ঠিকমতো হাজির না থাকার জন্যে শরিফ মৃধার ওপর—স্থির করতে না পারায় উত্তেজিত হয়ে সারি-সারি কবরের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যার সঙ্গে ধাক্কা খায়, চোখ মেলে দেখে যে সেই লোকটি হলো মনুমিঞা। সঙ্গে-সঙ্গে তার রাগের টার্গেট পেয়ে আফাজ আলি প্রায় ধমক দিয়ে জিগ্যেস করে, 'কী মিঞা, কী মনে করিয়া?'

'চাচা আপনে ঐ গোরের দাফন করিয়া কৈ গেলেন আমি আর দেহি না।'

'আরে, আমর কি মরনের টাইম আছে? লও, আগে নমাজ পড়িয়া আসি। আজান হইল, লও যাই।'

কাতারে দাঁড়িয়ে ৪ রাকাত সুন্নত বেশ তাজিমের সঙ্গে পড়লেও ফরজের ২য় রাকাতের রুকুতে যাবার সময় ইমাম সায়েবের বুলন্দ গলার 'আল্লাহ আকবর' আওয়াজ ছাপিয়ে আফাজ আলির কানে বেজে ওঠে গোরস্তানের গেটে কয়েকটা গাড়ি থামার, গাড়ির দরজা খোলার ও বন্ধ করার মিঠে বোল। এই বোলেই গাড়ির খানদানের ইশারা স্পষ্ট। এইসব গাড়ির সঙ্গে মানানসই কোনো শরিফ ভদ্রলোক দুনিয়া থেকে চিরকালের জন্যে বিদায় নিয়েছে! এখন নিশ্চয়ই অ্যাডভান্স পার্টি এল, কবরের জায়গা বাছাই করবে, কবর কাটার গোরকোন নিয়োগ করবে। বাদ মগরেব বা বাদ এশা বায়তুল মুকাররমে জানাজার পর লাশ আসবে। এই লাশের দাফন, জিয়ারত, মোনাজাত ধরতে পারলে কিছু কামাই হয়, তাহলে মনুমিঞাকে দিয়ে বাড়িতে কয়েকটা টাকা পাঠানো যায়। হাবিবুল্লার চাকরির কদ্দুর কী হলো কে জানে? আবার কত টাকার ধাক্কা! এখন কাল্লুমিঞা আবার এই নতুন পার্টিকে হাত না করে ফেলে!

না, গোরস্তানে লাশ এখন পর্যন্ত আনা হয়নি। আহা রে! জোয়ান ছেলে এভাবে মরে! বাপ কোন ফরেন কোম্পানির খুব বড়ো অফিসার, ছেলের লাশ নিয়ে পৌঁছেছে আজ দুপুরবেলা। আহা! বাপের কষ্টের সীমা নাই। ২/৩ মাস লাখ-লাখ টাকা খরচ করে ছেলের চিকিৎসা করাল লন্ডনে ; আবার দেখো, নিজে এসেছে ছেলের কবরের জায়গা ঠিক করতে। মরহুমের ভাই-বোন সব থাকে অ্যামেরিকা, জার্মানি, জাপানে। সবাই এসে পড়েছে, জার্মানির বোন না ভাইয়ের ফ্লাইট আসবে সন্ধ্যার দিকে। সে এসে পড়লে বাদ এশা জানাজা, বায়তুল মুকাররম থেকে লাশ নিয়ে সোজা গোরস্তান। এদের আয়োজন সব নিখুঁত, গোরস্তানে এত সব রডলাইটের ছড়াছড়ি, রাতদিনের ফারাক নাই, কিন্তু এর মধ্যেও এরা নিয়ে এসেছে ১৫/২০টা চার্জ লাইটার। শরিফ মৃধা এখন আর গাফলতি করেনি। কবর খোঁড়া, বাঁশ, চাটাই জোগাড়ের ভার সে দখল করে নিয়েছে, তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তার পিছে ঘুরছে মনুমিঞা। আফাজ আলি মসজিদে ঢুকলে ছোকরা সটকে পড়ল কখন? যাক, ছ্যামরা সফরে আছে, নামাজ কাজা করে পড়লেও চলে। গেরাইম্যাটা বরং ভালো করে সব দেখুক, দেখুক টাকা রোজগারের জন্যে আফাজ আলির খাটনির কোনো সময় অসময় নাই, রাতদিন তাকে দুই পায়ে খাঁড়া থাকতে হয়। তাকে দেখে মনুমিঞা এগিয়ে আসে, বলে, 'চাচা, হাবিবুল্লার খবর তো ভালো না।'

'কেন? ট্যাহা তো তোমার মোকাবেলাইতে দিলাম। আরেক কিস্তি এই মাসে আর পারলাম না। শবে বরাত যাউক, ট্যাকা দেমানে? ঐ সায়েবে তোমারে কিছু কইছে? হাবিবে তোমারে পাঠাইলো কোন আক্কেলে? হারামজাদায় ভাবলে ঢাকায় বুঝি ট্যাকার গাছ আছে, না? হ্যায় বললে আর মুই গাছ থন ট্যাকা পাড়িয়া

দিলাম?' দীর্ঘ সংলাপের ঝাঁঝে কিছুক্ষণ আগের মুর্দার জন্যে রোনাজারি সম্পূর্ণ মুছে গেলে সে থামে। এই সুযোগে মনুমিঞা বলে, 'না চাচা, ট্যাকার মামলা না। কয়দিন হাবিবের খুব দাস্ত। আর—'

'অর দাস্তের সোম্বাদ পৌঁছাইতে তুমি ঢাকা আইছো? বাকেরগঞ্জে সরকার হাসপাতাল বানাইলো কি তোমাগো বায়োস্কোপ দ্যাহাইতে?'

'না চাচা, কথা হেইডা না। কথাডা শোনেন।' মনুমিঞার কথা শেষ করার আগেই শরিফ মৃধা এগিয়ে এসে তাকে একটু আড়ালে নিয়ে যায়। এখানে দুই সারি কবরের মাঝখানে সরু রাস্তার ৪টে কবর আফাজ আলি আর শরিফ মৃধার এখতিয়ারে। পাথরে বাঁধানো কবর ঘেঁষে আফাজ আলি দাঁড়ালে শরিফ মৃধা বলে, 'হুজুর, আপনে আজই বাড়ি যান। আপনের পোলার কঠিন ব্যারাম। এই লোকে আমারে সব বলছে।'

কয়েক হাত দূরে নতুন সারির শুরুতেই ওপরে রডলাইট এবং নিচে চার্জলাইটের চোখ-ঝলসানো আলোয় কবর খুঁড়ছে গোরকোনরা, ফাল্গুন মাসেও তাদের মাটি-মাখা গেঞ্জি ঘামে কাদা। এত আলো, অথচ তাদের কালো-কালো গতর ও সেইসব গতরের আরো-কালো ছায়ায় কবরের ভেতরটা আন্ধার ঠেকে। মনুমিঞা মরিয়া হলে বলে, 'চাচা, গেলে আজই মেলা করা লাগে। হাবিবের অবস্তা আমি যা দেখিয়া আসছি—।'

সে কী দেখে এসেছে? এই জন্যেই কি একটু আগে ১২৩৪৫ নম্বরে দাফনের পর মোনাজাতে আল্লা তাকে দিয়ে হাবিবুল্লার নামে আগাম আরজি করে রাখল?—৭৭৬৯ নম্বরের পাথরের চওড়া ও মসৃণ রেলিঙে আফাজ আলি ধপ করে বসে পড়লে তারই তদারকিতে ও শরিফ মৃধার হাতে লাগানো গোলাপের কাঁটা তার ঘাড়ে খোঁচা মারে। গর্দানটা তার একটু মোটাই, কিন্তু চামড়া সে তুলনায় পুরু নয় বলে ঘাড়টা চিনচিন করে উঠল। এই সঙ্গে অনেক আগেকার শিশু হাবিবুল্লা তার ঘাড়ের ওপর বসে দোল খেতে থাকলে সেখানটা শিরশির করে এবং আরেকটু ওপরে খচখচ করে বেঁধে এখনকার হাবিবুল্লার চাকরির ঘুষ বাবদ হাওলাত-করা ৫০০০ টাকার নোটের কোণাগুলো। গোলাপকাঁটার খোঁচা থেকেই যায়, টাকার চাপে মিলিয়ে যায় শিশু হাবিবুল্লার ছোট্ট পায়ের দুলুনি। টুপির নিচে তার গোটা মুণ্ডু জ্বলে ওঠে দপ করে ; শবে বরাতের বাকি মোটে ৬ দিন, এখন কি তার বাড়ি যাবার সময়? কত মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, সাফসুতরো করতে হবে কত মুর্দার নাম এবং তাদের জন্মমৃত্যুর তারিখ। ৬৬৯৮ নম্বরে গালিচার মতো ঘাস না দেখলে মুর্দার মেজর জেনারেল ছেলে আফাজ আলির ওপরে কী অপারেশন চালাবে আল্লা মালুম। উত্তরের শেষ কবর অনেক দিনের, এর বাসিন্দার মৃত্যুর সময় তার ছেলের বয়স ছিল ১৫/১৬। লোকটি এখন ৩৫/৩৬ তো হবেই, এই ২০টি বছর ধরে শবেবরাতের সন্ধ্যায় সে একবার আসবেই। কবরের বেলফুলের গাছগুলো সাফ করাতে হবে। এ কি একটা দুটো কবর? পুরনো সব পার্টির অনেকে

মুর্দার কথা ভুলে যায়। নিজের বাপ মায়ের কবর, এমনকি কেউ কেউ ছেলেমেয়ের কবর বাঁধিয়ে দিয়ে গেছে কবে! অনেকেই মালিও হয়তো ঠিক করে গিয়েছিল মাসকাবারি চুক্তিতে, ২/১ বছর নিয়মিত আসা-যাওয়া করতে করতে তাদের শোক চাপা পড়েছে নানা ধান্দায়। হয়তো ৩/৪ বছর ধরে লাপাত্তা। হয়তো এর মধ্যে মুর্দার ছেলের হার্টের বাইপাশ সার্জারি হবে ব্যাঙ্ককে কিংবা তার একমাত্র মেয়ের ব্লাড ক্যানসার ধরা পড়েছে, চিকিৎসা করতে রওয়ানা হবে অ্যামেরিকা, মুর্দার বিধবা স্ত্রী এসে স্বামীর কাছে দোয়া চাইতে এলে আফাজ আলি তার মোনাজাতকে প্রথমে ফোঁপানি ও ক্রমে হাউমাউ কান্নায় চড়িয়ে সেই বিবিসায়েবকে কাবু করে ফেলেছে। শোকের ওপর চাপা-দেওয়া ছাই উড়ে গেলে বেগমসায়েবের কাছে ২০০/৩০০ এমনকি ৫০০ টাকাও কোনো ব্যাপারই নয়। আফাজ আলির হাতে টাকাটা ধরিয়ে দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে ছেলের কাঁধে ভর দিয়ে পা ছেঁচরে ছেঁচরে হেঁটে গেটে গিয়ে সেই যে গাড়িতে উঠল, হয়তো ৪ বছর তার আর দেখাই নাই। তবে তাদের সবার নাম, ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর সব নোট করা আছে আফাজ আলির ডায়রিতে। শবেবরাতের আগে-আগে কাছাকাছি কয়েকটা দোকান থেকে আফাজ আলি তাদের সবাইকে টেলিফোন করে। কারো কারো ফোন নম্বর পাল্টে গেছে, তাদের হদিস করা যায় না ; বাপ-মা কি ছেলেমেয়েকে আঙ্কার গোরে সেঁধিয়ে কেউ-কেউ পাড়ি দিয়েছে সৌদিতে কি সিঙ্গাপুরে কি অ্যামেরিকায়। যাদের পাওয়া যায় তাদের কেউ কেউ বলে, আফাজ আলিকে আব্বার কি আম্মার ভার দিয়ে তারা নিশ্চিন্তে আছে। স্মৃতিতে-বেদনায়-ভারি-গলায় তারা বলে, 'আব্বা গোলাপফুল বড়ো ভালোবাসতেন হুজুর, কবরে ভালো গোলাপের চারা লাগিয়ে দেবেন? দাম যা লাগে দেব। শবেবরাতের রাতটা আব্বার সঙ্গেই থাকব ভাই।' কারও মায়ের প্রিয় ফুল ছিল রজনীগন্ধা। মুর্দাদের পছন্দ অনুসারে ও তাদের ছেলেমেয়েদের অনুরোধে গোলাপ, রজনীগন্ধা, ডালিয়ার চারা লাগানো হয়। ছেলেমেয়েরা অনেকেই অর্ডার দিয়েই খালাস, শেষ পর্যন্ত আসতে পারে না। যারা আসে তাদের কাছ থেকে আফাজ আলি আর শরিফ মৃধা বাধ্য হয়ে দাম নেয় তিনগুণ চারগুণ। লোকসান পুষিয়ে না নিলে তাদের চলবে কেন? তবে খোদার রহমতে শবেবরাতে তার লোকসান হয় না। ঐ রাতে এখানে যেন মেলা বসে যায়! মুর্দার সাথে জিন্দার সেদিন মিলনের রাত। মুর্দা প্রিয়জনদের জন্যে জিন্দা মানুষের মোহাব্বত ছোটে সেদিন নহরের পানির মতো। গোরস্তানের বাইরে ফকির মিসকিনের ভিড় ঠেলে মানুষের ঢুকতেও খুব কষ্ট হয়। গাড়ি থাকে সেদিন ঐ দূরে বড়ো রাস্তার কিনারে। গোরস্তানের ভেতরে যেমন জিন্দার সাথে মুর্দার মিলন, বাইরে তেমনি খালি গাড়ি আর ভিখারি। এত গাড়ি আসে যে, সামলাতে ডজন-ডজন পুলিশ হিমসিম খায়। ফকির-মিসকিনদের সেদিনকার রোজগার তাদের সারা বছরের কামাইয়ের সমান। লোকে পয়সা, দেয়, রুটি হালুয়াও দেয় দেদার। রুটি যা মেলে ব্যাটা ফকুরনির বাচ্চারা রোদে শুকিয়ে বাড়ি নিয়ে যায়,

কয়েক সপ্তাহ ধরে তাই গেলে। সে তুলনায় হুজুরদের রোজগার আর কী? এর ওপর মানুষ কত ফন্দিই শিখেছে। আজকাল যেখানে-সেখানে মাদ্রাসা, মাদ্রাসা করার চেয়ে সোজা কাজ মনে হয় আর কিছু নাই। দীনের নামে সব ফেরেব্‌বাজি। মাদ্রাসার তালেবেলেমদের ধরে এনে তাদের দিয়ে দোয়া পড়িয়ে লোকজন সস্তায় বেহেশতে পাঠাতে চায় বাপ-মাকে। অত সোজা? আল্লার কালাম জানে না, দোয়া পড়তে পারে না সহিমতো, তাদের দিয়ে তোমরা আখেরাতের ফায়দা লুটতে চাও? তবে হ্যাঁ, আছে, বুঝদার শরিফ মানুষও আছে, তারা মুনসি-মৌলবি ঠিকই চেনে, কদরও করতে জানে। টেলিফোনে সেইসব মানুষকেই বাপ-মায়ের প্রতি তাদের দায়িত্বের কথাটা মনে করিয়ে দেয় আফাজ আলি। শবেবরাতের পবিত্র রাতে এসে তারা নিজেদের ইহকাল ও মৃত আত্মীয়স্বজনের আখেরাতের জন্যে বড়ো উদ্বিগ্ন ও বিচলিত হয়। মরহুম আব্বা-আম্মা কিংবা ভাইয়া ও আপাদের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে আফাজ আলির মোনাজাত শুনতে শুনতে তারা ফোঁপায় এবং কারো-কারো ফোঁপানি গড়ায় কান্নায়। তারপর দায়িত্ব সম্পন্ন করে ঘরে ফেরার সময় তাদের কারুকাজ-করা পাঞ্জাবির পকেট থেকে পুরুষ্ট মানিব্যাগ বের করে আফাজ আলির হাতে যা দেয় তাতেই সে সন্তুষ্ট। পার্টির সামনে টাকা সে গুনেও দেখে না। এই ফজিলতের রাতে গোরস্তান জুড়ে আল্লার ফেরেশতা, যেখানে যা পাওয়া যায় তাতেই বরকত। মাত্র কয়েকদিন বাদে শবেবরাতের এই বেহেশতি মহফিলে শরিক হতে না পারলে আল্লার রহমত তার জুটবে কোত্থেকে? হাবিবুল্লার চাকরির জন্যে ঘুষের ২য় কিস্তির অন্তত সিকিটা পেলেও একটু এগিয়ে থাকা যায়। বাকি টাকার জন্যে হাত পাততে হবে কুদ্দুস হাওলাদারের কাছে। ৫০০০ নেওয়ার সময় চুক্তি হয়েছিল যে, চাকরি হলেই প্রথম মাসের বেতনের সবটাই কুদ্দুসকে দিতে হবে। বাকি টাকা শোধ হবে মাসে ৪০০ টাকা করে দিয়ে। এর ওপর লাভ দিতে হবে ২০% হারে। পরহেজগার মানুষ, কুদ্দুস সুদ নিতে পারে না বলে লাভের অংশ নেয়। তাকে লাভ দিতে দিতেই তো হাবিবুল্লা ফতুর হয়ে যাবে, আফাজ আলি নিজে কিছু দিতে পারে তো কুদ্দুসকে লাভ দেওয়া থেকে খানিকটা বাঁচা যায়। এই সময় বাড়ি না গেলেই কি নয়?

'মনুমিঞা, হাবিবুল্লার অবস্থা কি খুব খারাপ ঠেহে? ধরো, শবেবরাতটা যদি পার করিয়া যাই—'

'চাচা, গেলে আইজই মেলা করা লাগে।' মনুমিঞাকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসে শরিফ মৃধা, 'হুজুর, বাড়ি যান। শবেবরাতের অহনও ছয় দিন। আপনের আসা-যাওয়া ধরেন দুই দিন, বাড়ি থাকবেন একদিন। ঢাকায় আওনের বাদেও আপনে তিনদিন পাইতাছেন।'

ভোরে বরিশাল ঘাটে নেমে প্রথম বাসে বাকেরগঞ্জ পৌঁছেই ইসহাক রিকশাওয়ালার মুখে খবর পাওয়া গেল। হাবিবুল্লার দাফন হয়ে গেছে কাল বিকালে। ওর রিকশায় উঠে আফাজ আলি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে

সামনের দিকে। দোয়া-দরুদ পড়া দূরের কথা, ইন্নালিল্লা বলার কথাও তার মনে নাই। আড়াইবাঁকি ঘাটে খেয়া নৌকায় পায়রা নদী পাড়ি দিতে দিতে ঢেউয়ে-ঢেউয়ে নৌকা দোলে, আফাজ আলির দিকে তাকিয়ে অপরিচিত কোনো যাত্রী বলে, 'হুজুর দোয়া-দরুদ পড়েন। এই রবিবার দিন শিবপুরের মধু সাহার গুয়ার নাওখান ডোবলো। কন তো, ফাল্গুন মাসিয়া নদী, বাও নাই বাতাস নাই, কৈ থন কী হইয়া গেল!' আফাজ আলি শুধু পায়রার ঢেউ দেখে। ফাল্গুনের রোদে ঢেউগুলো রোদ পোহায়, এইসব ঢেউয়ের নিচে জলস্রোত ওঠানামা করে জলে-ডোবা মানুষের লাশের ওপর। নিচে কী হলো যে কবরগুলো এভাবে কাঁপে? ওখানে কি গোর-আজাব হচ্ছে? চমকে উঠে আফাজ আলি আস্তাগফেরুল্লা পড়ে এবং গ্রামের ঘাট পর্যন্ত আস্তাগফেরুল্লা পড়াই অব্যাহত রাখে।

আফাজ আলি বাড়ির ভেতরে ঢোকার আগেই হামলে কেঁদে ওঠে হাবিবুল্লার মা। দরজায় তাকে জড়িয়ে ধরে তার শ্বশুর, 'বাবা, আর একটা দিন আগে আসলে দেখা হইতো।' তারপর সে সান্ত্বনা দেয়, 'আল্লার মাল, আল্লায় নিছে। মনডা শক্ত করো, শক্ত করো।'

না, মনুমিঞা ঢাকায় গিয়ে খবর গোপন করেনি, হাবিবুল্লা মারা গেছে মনুমিঞা যখন বরিশাল থেকে ঢাকায় রওয়ানা হয়ে গেছে। দাস্তের রোগী, পরে বমিও হচ্ছিল, এই রোগীর লাশ বেশিক্ষণ রাখা নিরাপদ নয়। এই দক্ষিণে দাস্তের ব্যারাম খুব হচ্ছে, শরিয়তমতো সব লাশের দাফন পর্যন্ত করা যাচ্ছে না। বাকেরগঞ্জ হাসপাতালে ডাক্তারদের কেউই সপ্তাহে দুই দিনের বেশি হাসপাতালে থাকে না। ছোকরা এক নতুন ডাক্তার এসেছে, সে একাই সামাল দিচ্ছে কয়েকটা ইউনিয়নের রোগী। হাসপাতালে স্যালাইনের ব্যাগ ছিল মোটে কয়েকটা, মওলানা আশরাফুদ্দিন উজিরপুরীর প্রভাবে তার একটির নোনাজল মিশেছে হাবিবুল্লার পানসে রক্তের সঙ্গে। হায়াৎ নাই, ওষুধ থাকলেই আর কী হতো?

খালের ধারে মাঝে-মাঝে বেতবন, খাল পেরিয়ে গোরস্তান। গোরস্তানের অপর পাশে মোটা-মোটা বাঁশের ঘন ঝাড়। দাস্ত-বমিতে কয়েকদিন হলো রোজই মানুষ সাফ হচ্ছে, এখানেও কয়েকটা নতুন কবর। আবদুল কুদ্দুস হাওলাদার জিয়ারতের দোয়া পড়তে মওলানা আশরাফুদ্দিন উজিরপুরীকে অনুরোধ করলে সে আবার বলে আফাজ আলিকে, 'দাফনের সময় আমি দোয়া পড়ছি। তুমি নিজে জিয়ারত করো, মোনাজাত করো, বাপ-মায়ের কান্দন খোদায় শোনে।'

বিড়বিড় করে জিয়ারতের দোয়া পড়তে শুরু করে আফাজ আলি। একটু হোঁচট খায়। না, না, দোয়া তার ভুল হয়নি, কখনো হয়ও না। এই গোরস্তানের কি ছিরি, এখনে এই দোয়া পড়ে আল্লার কালাম নাপাক করে ফেলা হয় না? এ কী গোরস্তান না ভাগাড়? এ সব কি মুর্দাকে ইজ্জতের সঙ্গে দাফন করা, নাকি লাশ দড়ি বেঁধে টেনে এনে পুঁতে রাখা হয়েছে? খালের ধারে বেতবন থেকে মানুষের ও বাঁশঝাড় থেকে পর্দানশিন মেয়েমানুষের গুয়ের গন্ধ, রাত্রে শেয়ালের-খোঁড়া

কবরগুলোর ভেতর থেকে উঁকি-দেওয়া বয়স, লিঙ্গ ও পেশা নির্বিশেষে মুর্দাদের খুচরা-খাচরা ঠ্যাং, রান বা হাঁটুর গন্ধ এবং গিজগিজ করা গাছপালা-লতাগুলোর ভেষজ গন্ধ মিশে ফাল্গুনের ফুরফুরে হাওয়ায় অবিরাম ঘুরপাক খায়। দুষ্টুমি করে এর সঙ্গে লুকোচুরি খেলে নদীপথ হয়ে খালের পানিতে ভেসে-আসা নোনা বাতাসের ঝাপ্‌টা। স্থানীয় গন্ধের অবিরাম ঘুরপাক ও সমুদ্রের বাতাসের অনিয়মিত ধাক্কা সামলানো আফাজ আলির পক্ষে ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়ে। জিয়ারতের দোয়া তবু মুখস্ত পড়া গেল।—আল্লা তার ছেলেকেই নিল, তা আল্লার কালাম আল্লাকে নিবেদন করতে আফাজ আলির আর কী কষ্ট হবে? কঠিন কাজ হলো আল্লার দরবারে মোনাজাত করা, আল্লার কাছে সে চাইবে কী? ছেলের রুহের মাগফেরাতের জন্যে আর্জি করতে গেলেই তার গর্দানে লাগে আবদুল কুদ্দুস হাওলাদারের নিশ্বাস। মোটা গর্দানের তুলনায় পাতলা চামড়ায় ছ্যাঁক লাগে। ছেলের রোজগারে মাসে মাসে ঋণশোধের রাস্তা তার চিরকালের জন্যে বন্ধ হয়ে গেল। হায়রে, নিজের আওলাদ তাকে এটুকু সাহায্যও করল না! নদীপথ হয়ে খালের-ওপর-দিয়ে আসা সমুদ্রের নোনা বাতাসে আফাজ আলির চোখে পাতলা মেঘ জমতে না জমতে আবদুল কুদ্দুস হাওলাদারের নিশ্বাস-মেশানো স্থানীয় হাওয়া সব শুষে ফেলে এবং সেই সঙ্গে গলার আর্দ্রতাও শুকিয়ে গেলে দুই হাত তুলেও লোকটা কিছুই চাইতে পারে না। গোরস্তান থেকে ফিরতে ফিরতে এমনকি তার শরীরের রক্ত পর্যন্ত শুকিয়ে যাওয়ার দশা হয়, আফাজ আলি সেই শুকনা শরীরে বল সঞ্চয়ের আশায় কথা বলতে চায় মনুমিঞার সঙ্গে। কিন্তু কী বলবে তাও মনে করতে পারে না।

সেই কথা তার মনে পড়ে পরদিন। হাবিবুল্লার চাকরির জন্যে দেওয়া ঘুষের ১ম কিস্তির টাকাটা কি মনুমিঞা ফেরত আনতে পারে?

না, তা হয় কী করে? বন্ধুবিয়োগে কাতর মনুমিঞা জানায়, '২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নারীশিক্ষা বিস্তার' অফিসার জাহাঙ্গীর কাজী স্যর তো টাকাটা পেয়েই বিভিন্ন জায়গায় ভাগবাঁটোয়ারা করে দিয়েছে, তার পকেটে গেছে সামান্য একটি অংশ। তবে টাকা পরিশোধের জন্যে আফাজ আলি এত অস্থির হচ্ছে কেন? আবদুল কুদ্দুস হাওলাদার তো টাকাটা এক্ষুণি চাইছে না। এটা কোথাও খাটালে তার কিছু লাভ তো হতোই, আফাজ আলির এত বড়ো বিপদ, লাভ যতটা কম দেওয়ার জন্যে সে বরং একটু তাড়াতাড়ি টাকাটা শোধ করুক। পাশের গাঁয়ের মানুষ, নানাদিক থেকে আত্মীয়তাও আছে, আফাজ আলির বিপদ মানে তারও বিপদ। আফাজ আলিও যেন তার কথা ভাবে।

এদিকে বাড়িতে আফাজ আলির বৌয়ের দাস্ত শুরু হয়েছে। আফাজ আলির এখন উপায়? শবেবরাতের আর মোটে ৪ দিন বাকি। তার সমস্যা বোঝে আশরাফুদ্দিন, 'কত বড়ো-বড়ো মানুষ তাগো মুর্দা ময়মুরুব্বির জিম্মাদারি তোমার হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্তে আছে, তুমি এখানে বসিয়া থাকলে চলবে?' তারপর

যেচে সে জামাইয়ের হাতে ১০০০ টাকা তুলে দিয়ে পরামর্শ দেয়, এটা সে বাড়িতে রেখে যাক, এ দিয়ে হাবিবুল্লার মায়ের চিকিৎসা হবে, কয়েক দিন তার সংসারও চলবে। তবে শবেবরাতের পরপরই আফাজ আলি যেন টাকাটা মানি-অর্ডারে পাঠিয়ে দেয়। তার নিজের টাকা হলে কথা ছিল না, কিন্তু মাদ্রাসা ফাণ্ডের টাকা, 'এম পি সায়েবে বহুত তদ্‌বির করিয়া তিরিশহাজার স্যাংসন করাইছে, আমার হাতে দশহাজার দিয়া বললে, এই দিয়া বিসমিল্লা করেন, টাকা আসতে আছে। শবেবরাতের পর কনোসটেরাকশনের কামে ইনশাআল্লা হাত দিমু। টাকা নাজাই পড়লে শরম পামু, মনে করিয়া পাঠাইয়া দিও বাবা।' বলতে বলতে মওলানার শোককাতর গলার ভার লাঘব হয়, সে জানায় এদিকে মাদ্রাসায় মাদ্রাসায় কাজের ধুম পড়ে গিয়েছে। আফাজ আলির ছোটোছেলে প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হয়েছিল হাবিবুল্লার তাগাদায়, ঝড়ে ঐ স্কুল ভেঙে যাওয়ার পর এখনো মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। তার কাছেই এবতেদায়ি মাদ্রাসায় দেওয়া হচ্ছে নতুন টিনের ছাউনি, সামনের বার মেঝেও পাকা হবে,—আফাজ আলি বললে আশরাফুদ্দিন ছেলেটাকে ওখানে ভর্তি করিয়ে দেবে। বাকেরগঞ্জে আলিয়া মাদ্রাসার বিল্ডিং করার টাকা এসেছে মেলা, বিলাত না অ্যামেরিকার কোন নাসারা প্রতিষ্ঠান টাকা ঢালছে আমাদের দীনি এলেমের জন্যে, তারা বুঝতে পাচ্ছে, ইসলাম ছাড়া আর গতি নাই। আফাজ আলির চিন্তার কোনো কারণ নাই, এই লাইনে পড়লে তার ছোটোছেলের রুজির অভাব ইনশাআল্লা কখনো হবে না।

আল্লার এলেম শিখতে শিখতে ছেড়ে দিয়েছিল বলে হাবিবুল্লার ওপর আল্লা কি নারাজ হয়েছে? হঠকারি জ্যেষ্ঠ পুত্রের ওপর ক্ষোভে তার জন্যে আফাজ আলির শোক দানা বাঁধতে পারে না, আবার টলোমলো শোক এলিয়ে দেয় তার ক্ষোভকে। শোক বা ক্ষোভ তাকে জ্বালাতে বা বিঁধতে না পারলে তার সামনে সব বড়ো ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকে। ফাঁকা শরীর ও ফাঁকা মাথার ওপর তার নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তবে তাকে সচল রাখে আসন্ন শবেবরাত। শবেবরাতের আর ৪ দিন, প্রতি পলকে সময়টা কমে আসছে। দুপুরে ভাত খেয়ে রওয়ানা হলে সন্ধ্যার মধ্যেই বরিশাল। বরিশাল থেকে ৮টার লঞ্চ ধরতে পারলে পরদিন ভোরবেলা ঢাকা। তাহলে কালকের দিনটা পুরো কাজে লাগানো যায়। কত মানুষকে টেলিফোন করতে হবে, এবার দরকার হলে সে না হয় বাড়ি-বাড়ি ঘুরে মানুষের ছাইচাপা শোককে উস্‌কিয়ে দিয়ে আসবে।

'আসসালামুআলায়কুম ইয়া আহলালে কুবরে'। নিজের কর্মস্থলে পা দিয়ে আফাজ আলি গভীর তাজিমের সঙ্গে মুর্দাদের সালাম করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, কবরগুলো থেকে নীরব জবাব তার কানে আসে, 'ওয়ালেকুম সালাম ইয়া রহমতুল্লা ইয়া বরকাতুহু ইয়া মাগফেরাতু।' শবেবরাতের সাজো-সাজো রব পড়ে গেছে, গোরস্তানের বাইরে থেকেই এর আয়োজন শুরু। দেশের নানা এলাকা থেকে ফকির-মিসকিন এসেছে সপরিবারে, সারি করে বসেছে তারা রাস্তা জুড়ে, নিজেদের

মধ্যে ঝগড়াঝাটি ও মারামারির মধ্যে দিয়ে চলছে তাদের উৎসব এবং মহোৎসবের প্রস্তুতি। এদের ওপর আফাজ আলির কোনো রাগ নাই আজ, গরিবের দোয়া আল্লা কবুল করে সবার আগে।

ভেতরে ঢুকতেই পাওয়া গেল শরিফ মৃধাকে। ৮১৩০ নম্বর কবর বড়ো অবহেলায় ছিল, সেটা সাফ করা হয়েছে তো? ৫০৬৮তে গোলাপ ফুটল? এই মুর্দা গোলাপ পছন্দ করত, তার মেয়ে প্রতি শবেবরাতের দিন বিকালবেলা এসে বাপের কবর থেকে বাপের লাশের বাসিরক্তে-লাল ও শুকনা-মজ্জায়-পুরুষ্ট একটি গোলাপ তুলে ভ্যানিটি ব্যাগে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফেরে, ঐ ১টি গোলাপের দাম এমনকি ২০০ টাকা পর্যন্ত উঠতে পারে, এর ১৫০ টাকাই তার, বাকিটা দিতে হয় শরিফ মৃধাকে। ৬৬৯৮-এ সবুজ ঘাসের গালিচা না দেখলে মুর্দার মেজর জেনারেল ছেলের শোক ঠিক মতো জমে না। ঘাস গজাবার কদ্দুর কী হলো?

'সবই হইবো হুজুর, ঘাবড়ায়েন না।' শরিফ মৃধা তাকে আশ্বস্ত করে। কিন্তু আরো জরুরি কাজ পড়ে রয়েছে, হুজুর বরং সেদিকে নজর দিক। কী?—'সেইদিন যে পার্টি দেইখা গেলেন, উনিরা আসছে। আপনে তো বাড়ি গেলেন গিয়া, দাফনের সব বন্দোবস্ত করলাম আমি। কাল্লুরে ঢুকবার দেই নাই। হায়দর বখস হুজুরে ঐদিন দোয়া পড়ছে। আজ অগো কুলখানি, অহন তারা আইছে জিয়ারত করতে। কয়টা গাড়ি ভইরা মানুষ, মনে হয় ১৫/২০জনের কম না। গাড়িই আইছে ৮/১০ খান। হায়দর বখস হুজুরে গেছে ইসকাটন, মিলাদ পড়াইতে। আপনে জিয়ারত পড়েন। পার্টি মালদার। আমার কথাটা কইয়া রাইখেন। হায়দর বখসরে দিয়া কাল্লু এইটা দখল করার তালে আছে। দেইখেন কিন্তু।'

ঐ কবরের সামনে ভিড়। ওদের দেখে লম্বাচওড়া এক ভদ্রলোক বলে, 'ঐ মওলানা সাহেব কোথায়? দাফনের দিন ছিলেন, তিনি নেই?'

'ঐ হুজুরে বাড়ি গেছে, তার ছেলের অসুখ।' শরিফ মৃধার এই জবাবে আফাজ আলি চমকে উঠে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে জানায়, 'তিনি কোথায় মিলাদ পড়াতে গেছেন। এসে পড়বেন। আপনারা একটু অপেক্ষা করবেন?'

কবরের চারদিকে বাঁশের চাটাই দিয়ে কী সুন্দর বেড়া দিয়েছে, অস্থায়ী বেড়া, তাতেই কী কারুকাজ! মুর্দার শিয়রে বেড়ার সঙ্গে ঝুলছে দামি অ্যালুমিনিয়ামের পাত, সাদা ঝকঝকে পাতে ঘন কালো বর্ডারের ভেতর কালো অক্ষরে ফুটে উঠেছে মুর্দার নাম এবং তার জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ। জন্ম ও মৃত্যুর দিন, মাস ও বছর। হাবিবুল্লার জন্ম তারিখ আফাজ আলির ঠিক মনে পড়ছে না, কিন্তু সাল কি ভুলতে পারে? কাঙালের মতো আফাজ আলি মিনতি করে, 'আমি জিয়ারত পড়িয়া দেই স্যর। আমারে পড়তে দেবেন?'

অনুমতি পাওয়ার আগেই আফাজ আলি জিয়ারতের দোয়া পড়তে শুরু করল।

কবরের চার কোণা থেকে ওঠে দামি আগরবাতির ধোঁয়া, সেই ধোঁয়ার গন্ধ খচিত হয় পাশের কবরের গোলাপ ও উল্টোদিকের কবরের বেলফুলের গন্ধে।

জমায়েত শোকার্ত আত্মীয়স্বজনের কারো-কারো পারফিউমের সুবাস ও মুরুব্বিগোছের কারো জামার মেশক্‌অম্বর আতরের খুস্‌বু ঐ আগরবাতি, গোলাপ ও বেলফুলের গন্ধের সঙ্গে মিশে আফাজ আলির কণ্ঠের আয়াতগুলোকে আলগোছে ঝুলিয়ে রাখে কবরের ওপর এবং একই সঙ্গে পরম যত্নে গুঁজে গুঁজে দেয় কবরের চারপাশে। ছেলেটা ঘুমাক, মশা-মাছিতে সে যেন এতটুকু উসখুস না করে। তার কাফনে কি মাটির দাগ লেগেছে? গোসল করানোর সময় তার শরীর থেকে দাস্তের সমস্ত চিহ্ন ভালো করে মুছে ফেলা হয়েছে তো? মাটির ভেতরে শুয়ে-থাকা তার শরীরের সমস্ত নাপাক জিনিস সাফ করতে আফাজ আলি দোয়া পড়ে একটু ঝুঁকে। ধীরে ও বিলম্বিত লয়ে আয়াত পড়তে পড়তে অনেকক্ষণ পান-না-খাওয়া গলা তার ভিজে যায় এবং সেই সঙ্গে ভেজায় শোকার্ত আত্মীয়স্বজনের চোখের কোণ। মোনাজাতের জন্যে হাত তুললে আগরবাতির ধোঁয়ার মেঘ নামে তরল হয়ে, তরল ধোঁয়ার সঙ্গে পারফিউম, মেশক্‌অম্বর আতর, গোলাপ ও বেলফুল এবং সর্বোপরি আগরবাতির গন্ধ আফাজ আলির বিড়বিড়-করা ঠোঁটের ভেতর দিয়ে ঢুকে পড়ে তার গলায়। জিয়ারতের দোয়া শেষ হলে ঐ গলায় তার মোনাজাত বলকায়, 'আল্লা পরওয়ারদিগার, তোমার রহমতের শেষ নাই। তোমার পেয়ারের বান্দাকে তুমি তোমার কোলে টেনে নিয়েছ, তাকে তুমি বেহেশত নসিব করো আল্লা। তার আব্বা-আম্মা, ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আজ তোমার দরবারে তার রুহের মাগফেরাত চাইতে এসেছে, আল্লা রাব্বুল আলামিন, তাদের দোয়া তুমি কবুল করো আল্লা।' একটু থেমে সে ফের নতুন উদ্যমে শুরু করে, 'আল্লা, তোমার পেয়ারের বান্দাকে তুমি তোমার কোলে টেনে নিয়েছ, আমাদের কোনো নালিশ নাই, কারো কোনো নালিশ নাই, আমার কোনো নালিশ নাই!' শেষ শব্দদুটি ভাঙা রেকর্ডের মতো তার ভাঙাচোরা গলা থেকে বারবার বেরুতে থাকলে শোকার্তদের কারো-কারো চোখে বিষাদের সঙ্গে মেশে বিস্ময়। এবারে 'আল্লা' বলে আফাজ আলি মোনাজাতে-তোলা দুই হাতের চওড়া ফাঁকের ভেতর দিয়ে কবরের বেড়ায় ঝোলানো অ্যালুমিনিয়ামের পাতের দিকে তাকিয়ে থাকে। বেশ কয়েক সেকেন্ড ধরে চোখের নোনা মেঘের আড়াল ছিঁড়ে তরুণ মুর্দার নাম সে ভালো করে পড়ে নেয়, বানান করে করে পড়ে, স্পষ্ট করে পড়ে। তারপর ধীরে ধীরে বলে, 'শাহতাব কবির তোমার পেয়ারের বান্দা, তুমি তাকে তুলে নিলে, কারো কোনো নালিশ নাই আল্লা।তুমি তাকে এতই মোহাব্বত করো যে, তার বাপ-মায়ের কথা তোমার একবারো মনে পড়লো না? আল্লা পরওয়ারদিগার, তোমার রহমতের দরিয়া কি শাহতাব কবিরের ওপর ঢেলে ঢেলেই শুকিয়ে ফেললে?' এইবার সে ফোঁপায়, গলা খাঁকারি দিয়ে ফোঁপানি নিয়ন্ত্রণে মধ্যে এনে ফের বলে, 'আল্লা, এত বড়ো উপযুক্ত পোলাডারে তুমি বাপের বুক হইতে কাড়িয়া লইলা? অর মায়ের বুকডা তুমি খালি করিয়া দিলা?' কবরের পাশে-দাঁড়ানো লোকজন তাদের রক্তসূত্রে-পাওয়া অভিজাত সংযমে কান্নাকে লুকিয়ে রাখে শরীরের খাঁজে-খাঁজে, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে তারা

শোককে আব্রু দিতে জানে। কিন্তু তাদের জোয়ান ছেলের জন্যে আফাজ আলির মোনাজাত তাদের চাপা ঠোঁটে ঢুকে পড়েছে ; তারা একটু বিহ্বল হয় এবং মৌলবিটার প্রতি কৃতজ্ঞতায় এই কবরে প্রতিদিন নিয়মিত কোরানপাঠের কাজে তাকে মাসকাবারি চুক্তিতে নিয়োগদানের বিষয়ে বিবেচনা করে। আফাজ আলি আল্লাকে জিগ্যেস করে, 'আল্লা, তার নাদান বাপটার কথা একবার তুমি ভাবিয়া দেখলা না?'

মোনাজাতে আফাজ আলির গেরাইম্যা লব্জের প্রয়োগে শরিফ মৃধা উদ্বিগ্ন হয়, মোনাজাতে হুজুরের জবান সবসময় খুব চোস্ত। শোকার্ত আত্মীয়স্বজনের দিকে তাকিয়ে শরিফ মৃধা তাদের চোখমুখের জরিপ করে। না, ওদিকে মুসিবতের আভাস নাই। অনেকের চোখেই মেঘ জমেছে, এখন মেঘ থেকে অঝোরে পানি ঝরানো চাই। কিন্তু আফাজ আলির এরকম দশা শরিফ মৃধা আগে কখনো দেখেনি। মোনাজাত করতে করতে আবার ভুলভাল কিছু বলে ফেললে সব পণ্ড হবে।

আফাজ আলি শরিফ মৃধার দিকে খেয়াল না করে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে, 'আল্লা, আল্লা রাব্বুল আলামিন, শাহতাব কবিররে তুমি বেহেস্ত নসিব করো আল্লা। কিন্তু, পাক পরওয়ারদিগার, তার বাপটারে কি তোমার নজরে পড়লো না? বাপটা কি তামাম জীবন খালি গোরস্তানে গোরস্তানেই থাকবো?' এবার শোকার্তদের বেশ কয়েকজনের শরীরের ভেতর লুকিয়ে-রাখা-শোক ধাক্কা দেয় তাদের গলায় এবং তাদের অন্তত তিনজনের মোনাজাতে-নিয়োজিত হাতের বিন্যাস ভেঙে পড়লে সেইসব হাত নিজেদের মুখে চেপে ধরে তারা ফোঁপায়। প্রায় একই সময়ে আফাজ আলির হাতও ঝুলে পড়ে নিচে এবং উপুড় হয়ে পড়ে-যাওয়া ঠেকাতে ঐ হাতজোড়া দিয়ে সে আঁকড়ে ধরে কবরের বেড়ার দুটো খুঁটি। তাতে একটু বল পেয়ে সে বলে, 'আল্লা, তার নাদান বাপটা কি খালি গোর জিয়ারত করার জন্যেই দুনিয়ায় বাঁচিয়া থাকবো। আল্লা!' তার ফোঁপানি চড়ে গেছে কান্নায়, আল্লার প্রতি তার নিবেদন এবং আল্লার কাছে তার মোনাজাত চাপা পড়ে তার ভেউভেউ কান্নার নিচে। আফাজ আলি প্রাণপণে ডাকে, 'আল্লা, আল্লা গো! আল্লা।' তার কান্নায় আল্লার নাম ভিজে চপচপে হয়ে যায়, ভিজতে ভিজতে এমনকি মুছে যাবার হাল হলেও আফাজ আলি হাউমাউ করে কাঁদে।

রচনাকাল : ১৯৯৪

রেইনকোট

ভোররাত থেকে বৃষ্টি। আহা! বৃষ্টির ঝমঝম বোল। এই বৃষ্টির মেয়াদ আল্লা দিলে পুরো তিন দিন। কারণ শনিতে সাত মঙ্গলে তিন, আর সব দিন দিন। এটা জেনারেল স্টেটমেন্ট। স্পেসিফিক ক্ল্যাসিফিকেশনও আছে। যেমন, মঙ্গলে ভোররাতে হইল শুরু, তিন দিন মেঘের গুরুগুর। তারপর, বুধের সকালে নামল জল, বিকালে মেঘ কয় এবার চল। বৃহস্পতি শুক্র কিছু বাদ নাই। কিন্তু এখন ভুলে গেছে। যেটুকু মনে আছে, পুরু বেড-কভারের নিচে গুটিসুটি মেরে শুয়ে আর-একপশলা ঘুমিয়ে নেওয়ার জন্যে তাই যথেষ্ট। অন্তত তিন দিন ফুটফাট বন্ধ। বাদলায় বন্দুক-বারুদ কি একটু জিরিয়ে নেবে না? এই কটা দিন নিশ্চিন্তে আরাম করো।

তা আর হলো কৈ? ম্যান প্রোপোজেস—। এমন চমৎকার বাদলার সকালে দরজায় প্রবল কড়া নাড়া শেষ হেমন্তের শীত শীত পর্দা ছিঁড়ে ফালাফালা করে ফেলল। সব ভেস্তে দিল। মিলিটারি! মিলিটারি আজ তার ঘরে। আল্লা গো। আল্লাহুম্মা আন্তা সুবহানকা ইন্নি কুন্তু মিনাজ জোয়ালেমিন।—পড়তে পড়তে সে দরজার দিকে এগোয়। এই কয়েকমাসে কত সুরাই সে মুখস্ত করেছে। রাস্তায় বেরুলে পাঁচ কলেমা সব সময় রেডি রাখে ঠোঁটের ওপর। কোনদিক থেকে কখন মিলিটারি ধরে।—তবু একটা না একটা ভুল হয়েই যায়। দোয়া মনে হলো ঠিকই কিন্তু টুপিটা মাথায় দিতে ভুলে গেল।

দুটো ছিটকিনি, একটা খিল এবং কাঠের ডাঁশা খুলে দরজার কপাট ফাঁক করতেই বাতাস আর বৃষ্টির ঝাপটার সঙ্গে ঘরে ঢোকে প্রিন্সিপ্যালের পিওন। আলহামদুলিল্লাহ! মিলিটারি নয়। পিওনকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু লোকটার চিনচিনে গলা গম্ভীর স্বরে হাঁকে, 'স্যার নে সালাম দিয়া।' বলেই ভাঙাচোরা গালের খোঁচাখোঁচা দাড়িতে লোকটা নিজের বাক্যের কোমল শাঁসটুকু শুষে নেয় এবং হুকুম ছাড়ে, 'তলব কিয়া। আভি যানে হোগা।'

কী ব্যাপার?

বেশিকথা বলার সময় নাই—কলেজের দেওয়াল ঘেঁষে কারা বোমা ফাটিয়ে গেছে গত রাতে।

মানে?

'মিসকিরিয়ান লোগ ইলেকটিরি টেরানসফার্মার তোড় দিয়া। অওর ওয়াপস যানে কা টাইম পিরিনসিপাল সাহাবকা কোঠিমে গেরেনড ফেকা। গেট তোড় গিয়া।'

ভয়াবহ কাণ্ড। ইলেকট্রিক ট্র্যানস্‌ফর্মার তো কলেজের সামনের দেওয়াল ঘেঁষে। দেওয়ালের পর বাগান, টেনিস লন। তারপর কলেজ দালান। মস্ত দালান পার হয়ে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার মাঠ। মাঠ পেরিয়ে একটু বাঁ দিকে প্রিনসিপ্যালের কোয়ার্টার। এর সঙ্গে মিলিটারি ক্যাম্প। কলেজের জিমনাশিয়ামে এখন মিলিটারি ক্যাম্প। প্রিনসিপ্যালের বাড়ির গেটে বোমা ফেলা মানে মিলিটারি ক্যাম্প অ্যাটাক করা। সামনের দেওয়ালে বোমা মেরে এতটা পথ ক্রস করে গেল কী করে? সে জানতে চায়, 'ক্যায়সে?'

প্রিনসিপ্যালের পিওন জানবে কী করে? 'উও আপ হি কহ সকতা।'

মানে? সে-ই বা বলবে কী করে? পিওন কি তাকে মিসক্রিয়ান্টদের লোক ভাবে নাকি?—তার মাথাটা আপনাআপনি নিচু হলে মুখ দিয়ে পানির মতো গড়িয়ে পড়ে. 'ইসহাক মিয়া, বৈঠিয়ে। চা টা খাইয়ে। আমার এই পাঁচ সাত মিনিট লাগেগা।'

'নেহি।' নাশতার আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দিয়ে ইসহাক বলে, 'আব্দুস সাত্তার মিরধাকা ঘর যানে হোগা। আপ আভি আইয়ে। এক কর্নেল সাহাব পঁওছ গিয়া। সব পরফসরকো এত্তেলা দিয়া। ফওরন আইয়ে।'

কর্নেলের নেতৃত্বে মিলিটারির হাতে কলেজটা এবং তাকেও ন্যস্ত করে ইসহাক বেরিয়ে যায়, রাস্তায় ঘরঘর-করতে-থাকা বেবি ট্যাকসির গর্জন তুলে সে রওয়ানা হলো জিওগ্রাফির প্রফেসরের বাড়ির দিকে। ইসহাক নিজেই এখন মিলিটারির কর্নেল বললেও চলে। তবে ভোরবেলা কলেজের ভেতরে কর্নেল খোদ চলে আসায় সে হয়তো ডেমোটেড হয়েছে লেফটেনান্ট কর্নেলে। আরো নিচেও নামাতে পারে। কিন্তু ক্যাপ্টেনের এদিকে তাকে ঠেলা মুশকিল। মিলিটারি প্রাদুর্ভাবের পর থেকে তাকে দেখে কলেজের সবাই তটস্থ। এপ্রিলের শুরু থেকে সে বাংলা বলা ছেড়েছে। কোনকালে দাদা না পরদাদার ভায়রার মামু না কে যেন দিল্লিওয়ালা কোন সাহেবের খাস খানসামা ছিল, সেই সুবাদে দিনরাত এখন উর্দু বলে। প্রিনসিপ্যাল গাট্টাগোট্টা বেঁটেখাটো মানুষ, নিজের চাপরাশির সঙ্গে নতুন জবাব লবৃজ করতে গিয়ে গলায় তার রক্ত উঠে যায়, 'ইসাক মিয়া, দেশতে বহুত মুসিবত হো রহা হ্যায়। প্রফেসর লোক আদমিকো হুঁশিয়ার থাকতে বলিয়ে। গুজব বোলনা মানা কর দিজিয়ে। আভি মিলিটারি সাহাবকো মদদ করনা এখন ফরজ কাম হ্যায়।'

'জরুর।' দেশলাইয়ের কাঠির মতো রোগাপটকা শরীরের ওপর ফিট-করা ভিজে বারুদের মতো ছোট্ট মাথাটা ঝাঁকিয়ে ইসহাক আরো তিনবার সম্মতি দেয়, 'জরুর। জরুর। জরুর।' কয়েকদিন আগের ইসহাকের এই 'জরুর' বৃষ্টিতে ভিজে আরো টাটকা হয়ে তার কানে বাজতে না বাজতে শব্দটিই কোথায় যেন ফেটে

পড়ে দুম করে। এই বৃষ্টিতে কি ফের শুরু হলো নাকি?—না, না, এটা স্রেফ মেঘের গর্জন। বৃষ্টি বোধহয় বাড়ছে। না—। এখন বেরুতেই হয়। আল্লা ভরসা।

'যেতেই হবে? অসময়ের বৃষ্টিতে ভিজে তোমার হাঁপানির টানটা আবার—।' বৌয়ের এসব সোয়াগের কথা শুনলে কি তার চলবে? বৌ কি প্রিনসিপ্যালের ধমকের ভাগ নেবে? এর ওপর কলেজে কর্নেল এসেছে। কপালে আজ কী আছে আল্লাই জানে! ফায়ারিং স্কোয়াডে যদি দাঁড় করিয়েই দেয় তো কর্নেল সাহেবের হাতে পায়ে ধরে ঠিক কপালে গুলি করার হুকুম জারি করানো যায় না? প্রিনসিপ্যাল কি তার জন্যে কর্ণেলের কাছে এই তদ্‌বিরটুকু করবে না? পাকিস্তানের জন্যে প্রিনসিপ্যাল দিনরাত দোয়া-দরুদ পড়ছে। সময় নাই অসময় নাই আল্লার দরবারে কান্নাকাটি করে এবং সময় করে কলিগদের গালাগালিও করে। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি প্রিনসিপ্যাল মিলিটারির বড়োকর্তাদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করেছিল, পাকিস্তান যদি বাঁচাতে হয় তো সব স্কুলকলেজ থেকে শহিদ মিনার হঠাও। এসব আনঅথরাইজড কনস্ট্রাকশন হলো হিন্দুর শিবলিঙ্গের সামিল, এগুলো হলো পাকিস্তানের শরীরের কাঁটা। পাকিস্তানের পাক সাফ শরীরটাকে নীরোগ করতে হলে এসব কাঁটা ওপড়াতে হবে। তা মিলিটারি ডক্টর আফাজ আহমদের পরামর্শ শুনেছে, গ্রামে-গঞ্জে যেখানেই গেছে, প্রথমেই কামান তাগ করেছে শহিদ মিনারের দিকে। দেশে একটা কলেজে শহিদ মিনার আর অক্ষত নাই। তা প্রিনসিপ্যাল তাদের এত বড়ো একটা পরামর্শ দিল, আর সামান্য এক লেকচারারকে গুলি করার সময় শরীরের আলতুফালতু জায়গা বাদ দিয়ে কপালটা টার্গেট করার অনুরোধটা তার মানবে না? আবার প্রিনসিপ্যালকে সে এত সার্ভিস দিচ্ছে, তার কলিগের, তওবা, সাব-অর্ডিনেটের জন্যে এতটুকু করবে না?

প্যান্টের ভেতর পা গলিয়ে দিতে দিতে সে শোনে রান্নাঘর থেকে বৌ বলছে, 'তাড়াতাড়ি চলে এসো। বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগে মীরপুর ব্রিজের দিক থেকে গুলির আওয়াজ আসছিল। কখন কী হয়।'

এসব কথা এখন বলার দরকারটা কী?—রেডিও টেলিভিশনে হরদম বলছে, সিচুয়েশন নর্ম্যাল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক। দুষমনকে সম্পূর্ণ কব্‌জা করা গেছে। মিসক্রিয়েন্টরা সব খতম। প্রেসিডেন্ট দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। কিছুদিন বাদে বাদে তার ভাষণ শোনা যায়, আওয়ার আলটিমেট এইম রিমেইনস দ্য সেম, দ্যাট ইজ টু হ্যান্ডওভার পাওয়ার টু দি ইলেকটেড রিপ্রেজেনটেটিভস অব দ্য পিপল। সবই তো নর্ম্যাল হয়ে আসছে। বাঙালি, আই মিন, ইস্ট পাকিস্তানি গভর্নর, মন্ত্রীরা ইস্ট পাকিস্তানি। সবই তো স্বাভাবিক। এখন বৌ তার এসব বাজে কথা বলে কেন? ইস! আসমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। পরশু রাতে বিছানায় ছটফট করতে করতে বলে কি, রাত্রে দুই-চারবার গুলিগালাজের আওয়াজ না শুনলে ঘুম হয় না।—এর জন্যেই তার ঘরে কখন যে কী মুসিবত নেমে আসে আল্লাই জানে।

'এই বৃষ্টিতে শুধু ছাতায় কুলাবে না গো।' বৌয়ের আরেক দফা সোয়াগ শোনা গেল, 'তুমি বরং মিন্টুর রেইনকোটটা নিয়ে যাও।'

ইস! আবার মিন্টু। বৌয়ের এই ভাইটার জন্যেই তাকে এক্সট্রা তটস্থ হয়ে থাকতে হয়। বাড়ি থেকে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার মগবাজারের দুই কামরার ফ্ল্যাট থেকেই তো মিন্টু চলে গেল জুন মাসে, জুনের ২৩ তারিখে। জুলাইয়ের পয়লা তারিখে সে বাড়ি শিফট করল। বলা যায় না, ওখানে যদি কেউ কিছু আঁচ করে থাকে। ও চলে যাবার তিনদিন পরেই পাশের ফ্ল্যাটের গোলগাল মুখের মহিলা তার বৌকে জিগ্যেস করেছিল, 'ভাবি, আপনার ভাইকে দেখছি না।' ব্যস, এই শুনেই সে বাড়ি বদলাবার জন্যে লেগে গেল হন্যে হয়ে। মিলিটারি লাগার পর থেকে এই নিয়ে চারবার বাড়ি পাল্টানো হলো। এখানে আসার পর নিচের তলার ভদ্রলোক একদিন বলছিল, 'আমার ভাইটাকে আর ঢাকায় রাখলাম না। যে গোলমাল, বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম।' শুনে বুকটা তার টিপটিপ করছিল, এবার যদি তার শালার প্রসঙ্গ তোলে? নিরাপত্তার জন্যেই সে এখানে এসেছে। কলেজ থেকে দূরে, আত্মীয়স্বজন থেকে দূরে। শহর থেকেও দূরেই বলা যায়। ভেবেছিল নতুন এলাকা, পুবদিকে জানলা ধরে দাঁড়ালে চোখে পড়ে বিল আর ধানক্ষেত। তা কী বিপদ! এদিকে নাকি নৌকা করে চলে আসে স্টেনগানওয়ালা ছোকরার দল। এদিককার মানুষ চোখে খালি নৌকা দেখে, নৌকা ভরা অস্ত্র। এর ওপর বৌ যদি মিন্টুর কথা তোলে তো অস্ত্র ঢুকে পড়ে তার ঘরের মধ্যিখানে। মিন্টু যে কোথায় গেছে তা সে-ও জানে তার বৌ-ও জানে। আবার দেখো, নিজের ভাইয়ের গৌরব প্রতিষ্ঠা করতে আসমা ছেলেমেয়েদের কী বলেছে, তারা পর্যন্ত বলে, 'ছোটোমামা গেছে খানসেনাদের মারতে।' কোন কথায় কী বিপদ হয়, কেউ বলতে পারে? তা আসমার যদি এতই সাহস তো সেও ভাইয়ের সঙ্গে কোমর বাঁধল না কেন?—মুখে বলা যায় না, কিন্তু বলার জন্যে তার জিভ কাঁপে, মিন্টুর কথা ভুলে যাও আসমা, ভুলে যাও। আমাদের সঙ্গে কেউ নাই, কেউ নাই। কিসিনজার সাহেব বলেছে, এসব হলো পাকিস্তানের ইনটার্নাল অ্যাফেয়ার।—মানুষ মেরে সাফ করে দেয়, বাড়িঘর, গ্রাম, বাজারহাট জ্বালিয়ে দিচ্ছে,—কারো কোনো মাথাব্যথা নাই। এসব হলো ইনটার্নাল অ্যাফেয়ার।—না, না, এ ধরনের ভাবনা ধারে কাছে ঘেঁষতে দেওয়াও ঠিক নয়। নিচের ফ্ল্যাটে থাকে এক ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপের মালিক, তার শ্বশুর নিশ্চয়ই সর্দার গোছের রাজাকার। সপ্তাহে দুইদিন-তিনদিন মেয়ের বাড়িতে রেফ্রিজারেটর, টেপ রেকর্ডার, দামি দামি সোফাসেট, ফ্যান, খাট-পালং সব চালান পাঠায়। একদিন এমনকি হিন্দুদের কোন দেবতার মূর্তি পর্যন্ত এসেছিল, সোনার কিনা কে জান। ট্রাক-ট্রাক মাল আসে, আবার চলেও যায়। রাজাকার এসব পায় কোথায়? লোকটা যদি টের পায় যে তার জামাইয়ের ওপরতলায় প্রফেসারের শালা হলো মিসক্রিয়েন্ট, মিলিটারি খতম করার নিয়ত করে সে চলে গেছে এই বোনের ঘর থেকেই, তা হলে গোলাগুলি চলবে এই বাড়িতেই, এই ঘরের মধ্যে। সেই গুলির

বোলে আসমাকে ঘুম পাড়তে হবে সারা জীবনের জন্যে।—এখানে কথাবার্তা বলার সময় হুঁশ ঠিক রাখা দরকার।

'দেখি তো, ফিট করে কিনা।' আসমা এগিয়ে এসে তার গায়ে রেইনকোট চড়িয়ে দিতে দিতে বলে, 'মিন্টু তো আবার অনেক লম্বা। তোমার গায়ে হবে তো?'—দেখো, ফের মিন্টুর দৈর্ঘ্যের তুলনা করে তার সঙ্গে। এই ভাইকে নিয়ে এরকম বাড়াবাড়ি করাটা কি আসমার ঠিক হচ্ছে?

'ভালোই হলো। তোমার গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা পড়েছে। পায়েও বৃষ্টি লাগবে না।' এখানেই আসমার শেষ নয়। রেইনকোটের সঙ্গেকার টুপি এনে চড়িয়ে দেয় তার মাথায়। মিন্টুটার কাজ! শালা তার আবার কী মহৎ কীর্তি স্থাপন করল। না, এবার তার কৃতিত্ব অন্যরকম। কী? না, 'আলনায় ঝুলিয়ে গেছে রেইনকোট, টুপিটা রেখে গেছে ওয়ার্ডরোবের মাথায়। কাল কোরান শরিফ নামাতে গিয়ে দেখি ওটা পড়ে আছে।'

আর কিছু রাখেনি তো? নিজের চোখে দেখতে সে ওয়ার্ডরোবের ওপরটায় ভালো করে চোখ বোলায়। মগবাজারে এক বাড়িতে মিলিটারি ঢুকে খাটের নিচে চাইনিজ রাইফেল পেয়েছিল তিনটে। অথচ বাড়ির বাসিন্দা, গোবেচারি ডাক্তার এর কিছুই জানত না। ঘরের জিনিসপত্র রোজ রোজ দেখে রাখা ভালো।

'আব্বু ছোটোমামা হয়েছে। আব্বু ছোটোমামা হয়েছে।' মেয়ের সদ্য-ঘুম-ভাঙা গলায় ভাঙা ভাঙা বুলি শুনে সে চমকে ওঠে, মিন্টু কি ঢুকে পড়লো অস্ত্রশস্ত্র হাতে? এর মানে ওর পিছে পিছে ঢুকছে মিলিটারি। তার মানে—। না, দরজার ছিটকিনি ও খিল সব বন্ধ। আড়াইবছরের কন্যা বিছানায় বসে বসেই হাততালি দেয়, 'আব্বু ছোটোমামা, আব্বু ছোটোমামা।'

তাকে কি মিন্টুর মতো দেখাচ্ছে? মিলিটারি আবার ভুল করে বসবে না তো? এর মধ্যে তার পাঁচ বছরের ছেলেটা গম্ভীর চোখে তাকে পর্যবেক্ষণ করে রায় দেয়, 'আব্বুকে ছোটোমামার মতো দেখাচ্ছে। আব্বু তা হলে মুক্তিবাহিনী। তাই না?'

এ তো ভাবনার কথা। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের নতুন রূপে সে ভ্যাবাচ্যাকা খায়। রঙ খাকি নয়, আবার জলপাই রঙও নয়। মাটির মতো রঙটা একটু জ্বলে গেছে, তবে তাতে জেল্লা কমেনি। দেখতে একটু মিলিটারি মিলিটারি লাগছে। মিলিটারির মতো দেখা নিরাপদ নয়। রেইনকোট পরাকে মিলিটারির ছদ্মবেশ বলে গণ্য করলে মিলিটারি তাকে ধরে সোজা পাঠিয়ে দেবে ক্যান্টনমেন্ট। না—! খামাখা ভয় পাচ্ছে। বৃষ্টির দিনে রেইনকোট গায়ে দেওয়াটা অপরাধ হবে কেন? মিলিটারির কি আর বিবেচনাবোধ নাই? প্রিনসিপ্যাল ডঃ আফাজ আহমদ ঠিকই বলে, 'শোনেন, মিলিটারি যাদের ধরে, মিছেমিছি ধরে না। সাবভার্সিভ অ্যাকটিভিটিজের সঙ্গে তারা সামহাউ অর আদার ইনভলভড।' তা সে তো বাপু এসব থেকে শতহাত দূরে। শালা তার বর্ডার ক্রস করল, ফিরে এসে দেশের ভেতরে দমাদম মিলিটারি মারে। তাতে আর দুলাভাইয়ের দোষটা কোথায়? এই যে মিলিটারি প্রত্যেকদিন এই ঢাকা শহরেই বাজার পোড়ায়, বস্তিতে আগুন

লাগিয়ে টপাটপ মানুষ মারে, মেয়েদের ধরে নিয়ে যায়,—সে কখনো এসব নিয়ে টুঁ শব্দটি করেছে? কলেজের দেওয়াল ঘেঁষে প্রিনসিপ্যালের কোয়ার্টারের পাশে মিলিটারি ক্যাম্প, ক্লাশটাশ সব বন্ধ। ছেলেরা কেউ আসে না। মাস্টারদের হাজিরা দিতে হয়, তাও বহু টিচার গা ঢাকা দিয়েছে কবে থেকে। সে তো রোজ টাইমলি যায়। স্টাফ রুমে কলিগরা ফিসফিস করে, কোথায় কোন ব্রিজ উড়ে গেল, কোথায় সাত মিলিটারির লাশ পড়েছে ছেলেদের গুলিতে, এই কলেজের কোন কোন ছেলে ফ্রন্টে গেছে,—কৈ, সে তো এসব আলাপের মধ্যে কখনো থাকে না। এসব কথা শুরু হলেই আলগোছে উঠে সে চলে যায় প্রিনসিপ্যালের কামরায়। ডঃ আফাজ আহমদের খ্যাসখ্যাস গলায় হিন্দুস্তান ও মিসক্রিয়েন্টদের আশু ও অবশ্যম্ভাবি পতন সম্বন্ধে নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী শোনে। ঐ ঘরে আজকাল সহজে কেউ ঘেঁষে না। উর্দুর প্রফেসর আকবর সাজিদকে প্রিনসিপ্যাল আজকাল তোয়াজ করে। তো ঐ সাজিদ আবার স্যারকে আমল দেয় না। বরং মাঝে মাঝে 'আপকা তবিয়ৎ ভালো হ্যায়?' বলে প্রিনসিপ্যালের উর্দুচর্চা নিয়ে ঠাট্টা করে। ডঃ আফাজ আহমদ পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন থাকে বলে কিংবা জবাব দেওয়ার জন্যে ঠিকঠাক উর্দু বাক্য গঠন করতে পারে না বলে চুপ করে থাকে। আবার কথার জবাব না পেয়ে সাজিদ পাছে রাগ করে এই ভেবে হেঁ হেঁ করে, 'জি হাঁ। আপনার মেহেরবানি।' সাজিদ হাসে, 'আমার মেহেরবানি? আমি মেহেরবানি করার কে? বলিয়ে জেনারেল সাহাবকোঁ মেহেরবানি।' এরপর কথা বলতে গেলে উর্দু জবাবে আর কুলাবে না বলে প্রিনসিপ্যাল খামোশ মেরে যায়। উর্দুর প্রফেসারকে নিয়ে লোকটা মুশকিলে পড়েছে। কোনটা তার ঠাট্টা আর কোনটা অ্যাপ্রিসিয়েশন বোঝা দিনদিন শক্ত হয়ে পড়েছে। এমনকি মিলিটারির তৎপরতায় অভিভূত প্রিনসিপ্যালের যুদ্ধ সম্বন্ধে বিশ্লেষণ শুনতে শুনতে সাজিদ একদিন 'আপনি মিলিটারি সায়েন্সের ওপর ডক্টরেট করে ফেলেন স্যার। মোহাম্মদপুরের এক এল এম এফ ডাক্তার আজকাল হোমিওপ্যাথি শুরু করেছে, অ্যালোপ্যাথি ভি ছাড়ল না। তো মহল্লার মানুষ ওর নাম দিল ডবল ডক্টর। তা আপনি ডবল ডক্টর হয়ে যান।' বলতে বলতে হো হো করে হাসলে ডঃ আফাজ আহমদকে তার সিঙ্গল ডক্টরেট নিয়েই হেঁ হেঁ করতে হয়। কলিগরা পড়ে বিপদে। এই অসময়ে কোন রসিকতায় হাসাটা নিরাপদ তারা ঠিক ঠাহর করতে পারে না।

মিন্টুর ফেলে-যাওয়া নাকি রেখে-যাওয়া রেইনকোটে ঢোকার পর থেকে তার পা শিরশির করছে, আর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। প্রিনসিপ্যাল তাকে ডেকে পাঠিয়েছে সেই কখন!

রাস্তায় একটা রিকশা নাই। তা রিকশার পরোয়াও সে এখন করছে না। রেইনকোটের ভেতরে হাঁটতে হাঁটতে বাসস্ট্যান্ডে যেতে তার কোনো অসুবিধে হবে না। রেইনকোটের ওপর বৃষ্টি পড়ছে অবিরাম। কী মজা, তার গায়ে লাগে না একটি ফোঁটা। টুপির বারান্দা বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়লে কয়েক ফোঁটা সে চেটে দেখে। ঠিক পানসে স্বাদ নয়, টুপির তেজ কি পানিতেও লাগল নাকি? তাকে কি মিলিটারির মতো দেখাচ্ছে? পাঞ্জাব আর্টিলারি, না বালুচ রেজিমেন্ট, না কম্যাণ্ডো

ফোর্স, নাকি প্যারা মিলিটারি, না মিলিটারি পুলিশ,—ওদের তো একেক গুষ্টির একেক নাম, একেক সুরত। তার রেইনকোটে তাকে কি নতুন কোনো বাহিনীর লোক বলে মনে হচ্ছে? হোক। সে বেশ হনহন করে হাঁটে। শেষ হেমন্তের বৃষ্টিতে বেশ শীত শীত ভাব। কিন্তু রেইনকোটের ভেতরে কী সুন্দর ওম। মিন্টুটা এই রেইনকোট রেখে গিয়ে কী ভালোই যে করেছে। এটা নিতে ছোঁড়াটা যে কবে ফেরে!—আহা, এই তুমুল বৃষ্টির মধ্যে ছেলেটা কোথায় কোন নদীর তীরে ওৎ পেতে বসে রয়েছে। হয়তো পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি প্ল্যাটুন গ্রাম জ্বালিয়ে শ-দুয়েক মানুষ মেরে লাশগুলোকে ফেলে জিপে করে নিয়ে যাচ্ছে জ্যান্ত জোয়ান মেয়েদের. মিন্টুর স্টেনগান নিশ্চয়ই তাক করে রয়েছে ঐ মিলিটারিগুলোর দিকে। মিলিটারির সব কটাকে খতম করে মেয়েগুলোকে বাঁচাতে পারবে তো? পারবে না?—বড়ো রাস্তায় মিলিটারির লরি দেখে তার চৈতন্যোদয় ঘটে। মিন্টুকে নিয়ে এতক্ষণের ভাবনা আড়াল করতে নিজের চোখজোড়ায় পুরু করে ভক্তি মাখিয়ে সে তাকিয়ে থাকে লরিটার দিকে। না বাবা। ওদের সঙ্গে চোখাচোখি না হওয়াই ভালো। লরি চলে যায় উত্তরে, তাকে তাই তাকাতে হয় দক্ষিণের দিকে। কিন্তু লরির বৃষ্টি-ভেজা আওয়াজ মুছে ফেলা কি এতই সোজা? মীরপুর ব্রিজ থেকে আসমা কাল রাতে গোলাগুলির আওয়াজ পেয়েছে, লরি কি ওদিকেই গেল?—আরে কোথায় কী হয়, আর আসমা নিত্য শোনে গুলির শব্দ। এসব স্রেফ গুজব। প্রিনসিপ্যাল বলে, গুজব ছড়ানো আর গুজবে কান দেওয়া সমান অপরাধ। ঐ যে, পদ্য আছে, অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে—। এটা হিন্দুর লেখা বলে কিংবা পরের কথাগুলো মনে নাই বলে প্রিনসিপ্যাল ঐ পর্যন্ত বলেই থেমে যায়। বরং উর্দুতে বলে, 'সাজিদ সাহেব, গুজব সব গজব হোতা।' সাজিদ সঙ্গে-সঙ্গে ছন্দ লাগায়, 'গুজব জো থা ওহি সব আজ গজব হো চুকা হ্যায়।' প্রিনসিপ্যাল ভক্তিগদগদ হয়ে ঘর্ঘর গলায় বলে, 'ইকবালের নাকি? দাঁড়ান লিখে নিই।' আকবর সাজিদ বাধা দেয়, 'তওবা। ইকবালের কেন হবে। গুজব তো বাংলা কথা হলো। উর্দুমে ইসকো'—প্রিনসিপ্যালের তর সয় না, 'এটাই ভালো। আপনি বলেন, আমি লিখে নিই।' অনুপ্রাসটি রাখার খাতিরে সাজিদ গুজবের উর্দু প্রতিশব্দ ব্যবহার করে না। এর সঙ্গে সে আবৃত্তি করে পরের লাইনটি, 'আর্মি কে আরমান পুরে হো চুকে হ্যাঁয়।'

'মানে?'

'মানে হলো আর্মির ইচ্ছা ফুলফিল হয়েছে।' বলতে বলতে সাজিদ আরো চরণ তৈরি করে। হাত পা নেড়ে সে পুরো কবিতাটি আবৃত্তি করে,

গুজব জো থা ওহি সব আজ গজব হো চুকা হ্যাঁয়।
আর্মি কে আরমান পুরে হো চুকে হ্যাঁয়।
আল্লা এক, রসুল এক, পাকিস্তান ভি এক,
ইসে জিসকো ঈমান নেহি উও নালায়েক।
কুচল দো উস গাদ্দারকো জাঁহা ভি মিলে,
পাকিস্তানি ফওজ কভি পিছে না হিলে।

স্টাফরুমে এসে সাজিদ বলে, প্রিনসিপ্যাল যদি এটা কোনো মেজর কি কর্নেলকে শোনায় তো তার শাস্তি হবে, মিলিটারি বলবে, তুম মজাক কর রহা? তার কলিগরা চুপ করে থাকে। সাজিদের সামনে এখন কেউ এসব নিয়ে কথা বলতে চায় না। এমনকি তার বন্ধু হিস্ট্রির আলী কবিরও একটু এড়িয়েই চলে। ওদিকে নিজের কামরায় বসে খাস পিওন ইসহাকের সামনে প্রিনসিপ্যাল বাংলা হরফে লেখা এই উর্দু পদ্যটি বারবার আবৃত্তি করে এবং কয়েকদিনের মধ্যে এটিকে স্বরচিত বলে ভাবতে শুরু করে। আবৃত্তি করার সময় সুখে ও ভক্তিতে তার চোখজোড়া বুঁজে বুঁজে আসে।

রেইনকোটে বৃষ্টির জলতরঙ্গ বাজে ঐ কবিতার ছন্দে এবং হঠাৎ করে তার মনে হয়, প্রিনসিপ্যাল হয়তো কর্নেলকে ওটাই আবৃত্তি করে শোনাচ্ছে। গুজবের উর্দু প্রতিশব্দ জানতে চেয়ে জবাব না পেয়ে কর্নেল যদি হঠাৎ করে চটে যায়? উর্দুর প্রফেসর আকবর সাজিদ সেনাবাহিনীর তৎপরতা নিয়ে নানারকম ঠাট্টা-মশকরা করে। জিওগ্রাফির আব্দুস সাত্তার মৃধা ফিসফিস করে বলে, নিজের মাতৃভাষাকে বর্মের মতো ব্যবহার করে লোকটা নিশ্চয়ই মিসক্রিয়ান্টদের হয়ে কাজ করছে। আবার ইংরেজির খোন্দকার একদিন সবাইকে হুঁশিয়ার করে দেয়, 'ওর কথায় সায় দেবেন না। ও আসলে এইসব বলে আপনাদের অ্যাটিচুডটা জানতে চায়। বেটা নির্ঘাৎ আর্মির লোক।' তা আকবর সাজিদ কয়েকদিন হলো একটু চুপচাপই থাকে। স্টাফরুমে সে বসলে সবাই উসখুস করে, আবার প্রিনসিপ্যালের কামরায় যেতেও তার ভালো লাগে না। সে নিজেও সাজিদের কাছ থেকে দূরে দূরেই থাকে। দরকার কী? তবে, রেইনকোটের কল্যাণে গায়ে পানি না লাগিয়ে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে আকবর সাজিদের সঙ্গে গোপনে কয়েকটা কথা বলার জন্যে প্রাণটা তার আইটাই করে। এর মানে কী?

না, এসব হাউস ভালো নয়। সেনাবাহিনী নিয়ে বাংলা কিংবা উর্দুতে ঠাট্টা-মশকরা করার ভাবনা থেকে যতটা মুক্ত থাকা যায়। বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে বাসের জন্য তাকে তাকাতে হয় উত্তরেই। মিলিটারি লরির ল্যাজটাও দেখা যাচ্ছে না। আবার তার বাসেরও তো নামগন্ধ নেই। বাসস্ট্যান্ডে জনপ্রাণী বলতে সে একেবারে একলা। রাস্তার পাশে পান-বিড়ি-সিগ্রেটের ছোটো দোকানটার ঝাঁপ একটুখানি তুলে দোকানদারও তাকিয়ে রয়েছে উত্তরেই, ওদিকে কি কোনো গোলমাল হলো নাকি? দোকানদার ছেলেটা একটু বাচাল টাইপের। বাসস্ট্যান্ডে তাকে দেখলেই ছোঁড়াটা বিড়বিড় করে, 'কাল শোনেন নাই? মিরপুরের বিল দিয়া দুই নৌকা বোঝাই কইরা আইছিল। একটা জিপ উড়াইয়া দিছে, কমপক্ষে পাঁচটা খানসেনা খতম। বিবিসি কইছে, রংপুর-দিনাজপুরে হাফের বেশি জায়গা স্বাধীন, কাল চরমপত্র শুনছেন?' এর সামনে সে বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না। এসব গুজব শোনার সময়ও সে যদি ধরা পড়ে তো! গুজব জো থা ওহি সব আজ গজব হো চুকা হ্যায়। প্রিনসিপ্যাল বলে, গুজবই হলো বাঙালির কাল। গুজবের আকর্ষণ ভারি তীব্র, গুজব মাত্রেই সুস্বাদু। এই যে এখন বৃষ্টির আড়াল পেয়েও হতে পারে, কিংবা রেইনকোটের কল্যাণে বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পাবার স্বস্তির ফলেও হতে পারে,

সে এগিয়ে গেল দোকানদারের দিকে। একটা গুজব শোনার হাউস করে সে জিগ্যেস করে, 'বাস আসেনি কতক্ষণ?'

'আর বাস! বাস আসবে কৈ থাইকা?' বলে ছেলেটা তাড়াতাড়ি ঝাঁপ ফেলে মুখ গুঁজে দিল দোকানের ভেতরে। তার ভাবনা হয়, বাস ডিপোতে কোন হামলা হয়েছে নাকি? আসমার শোনা ঐ গোলাগুলির শব্দ কি আসছিল বাস ডিপো থেকে? মিলিটারি লরি কি ওদিকেই গেল? বাস ডিপোর পেছনে একটা বস্তি আছে, সেখানে মিলিটারি কি আগুন দিতে গেল? জায়গাটা খুব একটা দূরে তো নয়, সে একবার ঘুরেও তো আসতে পারে। বৃষ্টিটাও ধরে এসেছে। যাবে নাকি একবার?—তার যাওয়া হলো না। এর মধ্যেই ছিপছিপে বৃষ্টিতে লালচে আভা তুলে এসে পড়ল লাল রঙের স্টেট বাস।

বাসে যাত্রী কম। না, না, কন্ডাক্টররা সবসময় যেমন খালি-গাড়ি বলে চ্যাঁচায়, সেরকম নয়। সত্যি সত্যি অর্ধেকের বেশি সিট খালি। সে বাসে উঠলে তার রেইনকোটের পানি পড়তে লাগল বাসের ভিজে মেঝেতে। এ জন্যে তার একটু খারাপ কথা, অন্তত টিটকিরি শোনার কথা। কিন্তু তাকে কেউ কিছু বলে না।

বাসে এত খালি সিট। বাঁশ বনে ডোম কানা—প্রবাদটি মনে না পড়লেও ঠোঁটে তার একটু হাসি বিছানো থাকে। এই নীরব কিন্তু স্পষ্ট হাসির কারণ কি এই যে, তার রেইনকোটের পানিতে বাসে সয়লাব হয়ে গেলেও কেউ টুঁ শব্দটি করছে না? তার পোষাক কি সবাইকে ঘাবড়ে দিল নাকি?

খালি রাস্তা পেয়ে বাস চলে খুব জোরে। কিন্তু তার আসনটি সে নির্বাচন করতে পারছে না। টলতে টলতে একবার এই সিট দেখে, পছন্দ হয় না বলে ফের ঐ সিটের দিকে যায়। এমন সময় পেছনের দিক থেকে দুজন যাত্রী উঠে পড়ে তাড়াহুড়া করে, 'রাখো রাখো' বলতে বলতে ঝুঁকি নিয়ে তারা নেমে পড়ে চলন্ত বাস থেকে। সে তাদের দিকে তাকায় এবং বুঝতে পারে, এরা পালাল ঠিক তাকে দেখেই। লোক দুটো নিশ্চয়ই ক্রিমিনাল। একটা চোর, আরেকটা পকেটমার। কিংবা দুটোই চোর অথবা দুটোই পকেটমার। নামবার মুহূর্তে দুটোর মধ্যে সর্দার টাইপেরটা তার দিকে পেছন ফেরে তাকাল। সেই চোখ ভরা ভয়, কেবল ভয়।

জুৎসই সিট বেছে নিয়ে সে ধপাস করে বসতেই ফোমে ফস করে আওয়াজ হয় এবং তাইতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় সামনের সিটে বসা তিনজন যাত্রী। হুঁ! এদেরও সে ঠিক চোর অথবা পকেটমার বলে ঠিক শনাক্ত করে ফেলে। ডাকাতও হতে পারে। কিংবা মিলিটারি কোনো বস্তিতে আগুন লাগিয়ে চলে এলে এরা ছোটে সেখানে লুটপাট করতে। অথবা মিলিটারি কোথাও লুটপাট করলে এরা গিয়ে উচ্ছিষ্ট কুড়ায়। তিনটেই পরের স্টপেজে নামার জন্যে অনেক আগেই ধরফর করে উঠে দাঁড়ায় এবং বাস থামার সঙ্গে-সঙ্গে নেমে পড়ে ঝটপট পায়ে। তিনটে ক্রিমিনালের একটাও তার দিকে আর ফিরেও তাকায় না। তার মানে তাকে বেশ ভয় পেয়েছে বলেই তার সঙ্গে চোখাচোখি এড়াতে এদের এত কসরৎ।

যাক, মিন্টুর রেইনকোটে তার কাজ হচ্ছে। চোর ছ্যাঁচোর পকেটমার সব কেটে পড়ছে। ভালো মানুষেরা থাক। সে বেশ সৎসঙ্গে চলে যাবে একেবারে কলেজ পর্যন্ত।

আসাদ গেট বাসস্টপেজে ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল বেশ কয়েকজন মানুষ। ছাতা হাতে কেউ-কেউ নিজ-নিজ ছাতার নিচে এবং ছাতা ছাড়া অনেকেই অন্যের ছাতার নিচে মাথার অন্তত খানিকটা পেতে দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট থেকে আত্মরক্ষা করতে শরীরগুলোকে আঁকাবাঁকা করছিল। বাস থামলে সে দেখল, একে একে নয়জন প্যাসেঞ্জার বাসে উঠল। সে বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবাইকে দেখে। তো তার দিকে তাকিয়ে নয়জনের তিনজন 'আরে রাখো-রাখো' এবং একজন 'রোখো-রোখো বলতে বলতে নেমে পড়ল ধরফর করে। শেষের জন বোধ হয় এমনি অর্ডিনারি চোর, ছিঁচকে চোর হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আর প্রথম তিনটে মিলিটারির হোগায়-হোগায় ঘোরে। কোথাও সুন্দরী মেয়েমানুষ দেখলে মিলিটারিকে খবর দেয় কিংবা মিলিটারির কাছ থেকে বন্দুক নিয়ে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান দিয়ে মহল্লায়-মহল্লায় ঘোরে আর সুন্দরী মেয়েদের ধরে এনে পৌঁছে দেয় মিলিটারি ক্যাম্পে। এগুলো হলো ভাউরা, রাজাকার ভাউরা। ফের নতুন করে অপরাধীমুক্ত বাসে যেতে এখন ভালো লাগছে। জানালার বাইরে বৃষ্টির আঁশ উড়ছে ঠাণ্ডা হাওয়ায়, গাছপালা ও লোকজন ও দোকানপাট ও বাড়িঘরের ওপর ট্রান্সপারেন্ট আবরণ দেখে তার এক্সট্রা ভালো লাগে। সমস্ত ভালো-লাগাটা চিড় খায় বাস হঠাৎ করে ব্রেক কষলে। তখন তাকে তাকাতে হয় বাঁয়ে, চোখে পড়ে নির্মীয়মান মসজিদের ছাদের দিকে। দরজা থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগে তার মুখে এবং নাকের ভেতর দিয়ে সেই হাওয়া ঢুকে পড়ে বুকে, সেখানে ধাক্কা লাগে ; ক্রাক-ডাউনের রাত কেটে ভোর হলে মিলিটারির গুলিতে এই মসজিদের ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছিল মোয়াজ্জিন সাহেব। ঠাণ্ডা হাওয়ার ধাক্কা রেইনকোটের তাপে এতটাই গরম হয়ে ওঠে যে, মনে হয় ভেতরে বুঝি আগুন ধরে গেল। মসজিদের উল্‌টো দিকের বাড়িতে তিনতলায় থাকত তখন তারা! রাতভর ট্যাঙ্কের হুঙ্কার আর মেশিনগান আর স্টেনগানের ঘেউঘেউ আর মানুষের কাতরানিতে তাদের কারও ঘুম হয়নি সে রাতে। ছেলেমেয়ে নিয়ে ছেলেমেয়ের মায়ের সঙ্গে সে শুয়েছিল খাটের নিচে। ভোরবেলা মিলিটারি মানুষ মারায় একটু বিরতি দিলে ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়ে এবং বন্ধ জানলার পর্দা একটু তুলে সে রাস্তা দেখতে থাকে। রাস্তার ওপারে মসজিদের ছাদে মোয়াজ্জিন সাহেব দাঁড়িয়েছিল আজান দিতে। সাধারণত জুম্মার নামাজটা সে নিয়মিত পড়ে। তবে সেই ভোরে তার আজান শুনতে ইচ্ছা করছিল খুব। মোয়াজ্জিনের আজান দেওয়াটা সম্পূর্ণ দেখবে বলে সে জানলার ধার থেকে সরে না। সারা এলাকায় ইলেক্‌ট্রিসিটি নষ্ট, মসজিদের মাইক্রোফোন অকেজো। মোয়াজ্জিন সাহেব গমগমে গলায় যতটা পারে জোর দিয়ে বলে উঠল 'আল্লাহু আকবর।' দ্বিতীয়বার আল্লাহর মহত্ত্ব ঘোষণা করার সুযোগ তার আর মেলেনি, এর আগেই সম্পূর্ণ অন্যরকম ধ্বনি করে লোকটা পড়ে যায় রাস্তার ওপর। সেদিন সকালে বৃষ্টি ছিল না। আজ বৃষ্টির সকালে মিলিটারি কি ঐ দৃশ্যের পুনর্ঘটনের পাঁয়তারা করছে? এখন তো কোনো নামাজের ওয়াক্ত নেই, তবে আজান দেওয়াবে কি করে? এরা বোধহয় যে-কোনো সময়কেই নামাজের ওয়াক্ত ঘোষণা করে নতুন হুকুম জারি করেছে।

মিলিটারি এখন যাবতীয় গাড়ি থামাচ্ছে। গাড়ির প্যাসেঞ্জারদের নামিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয় রাস্তার ধারে। আরেক দল মিলিটারি স্টেনগান তাক করিয়ে রেখেছে এই মানুষের সারির ওপর। অন্য একটি দল ফের ঐসব লোকের জামাকাপড় ও শরীরের গোপন জায়গাগুলো তল্লাসি করে। মিলিটারি যাদের পছন্দ করছে তাদের ঠেলে দিচ্ছে পেছনে দাঁড়ানো একটা লরির দিকে। তাদের বাসটিতে এসে উঠল লম্বা ও খুব ফর্সা এক মিলিটারি।

এখন বাসের ভেতর কোনো আওয়াজ নাই। যাত্রীদের বুকের টিপটিপ শব্দ এই নীরবতার সুযোগে বাড়ে এবং এটাই তার মাথায় বাজে দ্রাম-দ্রাম করে। বারান্দাওয়ালা টুপির নিচে শব্দের ঘষায় ঘষায় আগুন জ্বলে এবং তার হল্‌কা বেরোয় তার চোখ দিয়ে। তবে একটু নড়ে বসলে মাথার ও বুকের ধ্বনি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং এসবকে পরোয়া না করে সে সরাসরি তাকাল মিলিটারির মুখের দিকে। মিলিটারির চোখ ছুঁচলো হয়ে আসে এবং ছুঁচলো চোখের মণি কাঁটার মতো বিঁধে যায় তার মুখে। সেও তার চোখের ভোঁতা কিন্তু গরম চাউনিটাকে স্থির করে আলগোছে বিছিয়ে দেয় মিলিটারির খাড়া নাকে, ছুঁচলো চোখে, গোঁফের নিচে ও নাক, গোঁফ ও চোখের আশেপাশের ও নিচের লালচে চামড়ায়। এতে কাজ হলো। মিলিটারির চোখা চোখ সরে যায় তার মুখ থেকে, নেমে পড়ে তার রেইনকোটের ওপর। মনে হয় রেইনকোটের পানির ফোঁটাগুলো লোকটা গুণে গুণে দেখছে। ভেতরের তাপে এইসব পানির ফোঁটা কি একটু লালচে দেখছে? পানির দেশে মানুষ মারতে এসে পানির ফোঁটা দেখে মিলিটারির এত থ মেরে যাবার কী হলো? লোকটা কি এগুলোতে রক্তের চিহ্ন দেখে? রেইনকোটের বৃষ্টির ফোঁটা গোণাগুনতি সেরে মিলিটারি হঠাৎ বলে, 'আগে বাড়ো।' বাস হঠাৎ স্টার্ট দিয়ে কয়েক পা লাফিয়ে আগে বাড়ে এবং যাত্রীদের স্বস্তির নিশ্বাসের ধাক্কায় অতিরিক্ত বেগে ছুটে পার হয়ে যায় ঢাকা কলেজের গেট। নিউ মার্কেটের সামনে এসে পড়লে সে উঠে দাঁড়ায় এবং হুকুম করে, 'রাখেন নামবো।' বাস একটু স্লো হলে তার রেইনকোটের জমানো পানি গড়িয়ে পড়তে দিয়ে অপরাধীমুক্ত বাস থেকে নামতে নামতে সহযাত্রীদের দিকে তাকিয়ে সে ঠোঁট বাঁকায়, এতে তার সামনের সারির দাঁতও কেলিয়ে পড়ে। যারা দেখেছে তারা তার সেই ভঙ্গিটিকে ঠিক হাসি বলে শনাক্ত করতে পেরেছিল বলে তার ধারণা হয়।

প্রিনসিপ্যালের কামরায় প্রিনসিপ্যালের সিংহাসন-মার্কা চেয়ারে বসে রয়েছে জাঁদরেল টাইপের এক মিলিটারি পাণ্ডা। তার ভারিক্কি মুখ থেকে অনুমান করা যায়, পাণ্ডাটি কর্নেল কিংবা মেজর জেনারেল, অথবা মেজর বা ব্রিগেডিয়ার। তাকে দেখে প্রিনসিপ্যালের কালো মুখ বেগুনি হয়, ডক্টর আফাজ আহমদ এম. এস.সি, পি. এইচ. ডি, ই পি এস ই এস হওয়ার চেষ্টা করতে করতে স্যর বলে, 'হি ইজ প্রফেসর নুরুল হুদা।'

কিন্তু ডঃ আফাজ আহমদ এম. এসসি, পি. এইচ. ডি নিজের ভুল সংশোধন না করে পারে না, 'সরি হি ইজ নট এ প্রফেসর। এ লেকচারার ইন কেমিস্ট্রি।'

'শাট আপ।'

এবার প্রিনসিপ্যাল থামে।

তাকে এবং আবদুস সাত্তার মৃধাকে নিয়ে মিলিটারি জিপে তোলার আগে জাঁদরেল কর্নেল না ব্রিগেডিয়ার প্রিনসিপ্যালকে কড়া গলায় বলে, সেনাবাহিনীকে নিয়ে মজাক করে শায়েরি করা খুব বড়ো অপরাধ। এবার তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো, তবে কড়া ওয়াচে রাখা হবে। উর্দুর প্রফেসর আকবর সাজিদের দোহাই পেড়ে প্রিনসিপ্যালের সুবিধা হয় না। নুরুল উদ্বিগ্ন হয়, সাজিদ সাহেব যদি পালিয়ে না থাকে তো তার কপালে যে কী আছে তা জানে এক আল্লা আর জানে এই মিলিটারি।

তাদের দুজনের চোখ বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, জিপ চলছিল এঁকেবেঁকে। মস্ত উঁচু একটা ঘরে তাদের এনে ফেলা হলো। চোখ খুলে দিলে সে আবদুস সাত্তার মৃধাকে দেখতে পায় না। জায়গাটাও একেবারে অচেনা। একটা ডেক-চেয়ারে সে যে কতক্ষণ বসে থাকল তার কোনো হিসাব নেই। তার সামনে একটা চেয়ারে এসে বসল এক মিলিটারি। তাকে ইংরেজিতে নানান প্রশ্ন করে, সে জবাব দেয়। লোকটা চলে গেলে তাকে অন্য ঘরে নিয়ে ফের অন্য একটা লোক এসে তাকে প্রশ্ন করে এবং সে জবাব দেয়। প্রশ্নগুলো প্রায় একইরকম এবং তার উত্তরেরও হেরফের হয় না। যেমন, কিছুদিন আগে তাদের কলেজে কয়েকটা লোহার আলমারি কেনা হয়েছে। ওগুলো বয়ে নিয়ে এসেছিল কারা?

সে জবাব দেয়, ঠিক। অফিসের জন্যে তিনটে, বোটানি হিস্ট্রি জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের জন্যে দুটো করে এবং ইংরেজির জন্যে একটা, সর্বমোট দশটি আলমারি কলেজে নিয়ে আসা হয়েছে।

এত কথা বলার দরকার নাই তার। ঐ আলমারিগুলো নিয়ে আসা হয় কয়েকটা ঠেলাগাড়ি করে। ঠেলাগাড়িওয়ালাদের তো সে ভালো করেই চেনে।

নুরুল হুদা জবাব দেয়, তাদের সে চিনবে কোত্থেকে? তারা হলো কুলি. সে একজন লেকচারার।

তাহলে সে তাদের সঙ্গে এত কথা বলছিল কেন?

প্রিনসিপ্যালের আদেশে সে আলমারিগুলোর স্টিলের পাতের ঘনত্ব, দেরাজের সংখ্যা ও আকার, তালাচাবির মান, রঙের মান প্রভৃতি পরীক্ষা করে দেখছিল, তার দায়িত্ব ছিল—।

মিলিটারি শান্ত গলায় তথ্য সরবরাহ করার ভঙ্গিতে বলে, মিসক্রিয়েন্টরা কলেজে ঢুকেছিল কুলির বেশে। এটা তার চেয়ে আর ভালো জানে কে? তারা আজ ধরা পড়ে নুরুল হুদার নাম বলেছে। তাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ নিয়মিত, সে গ্যাঙের একজন সক্রিয় সদস্য।

'আমার নাম? সত্যি বলেছে? আমার নাম বলেছে?' নুরুল হুদার হঠাৎ চিৎকারে মিলিটারি বিরক্ত হয় না, বরং উৎসাহ পায়। উৎসাহিত মিলিটারি ফের বলে, কুলিরা ছিল ছদ্মবেশী মিসক্রিয়েন্ট। তারা কলেজের টিচারদের মধ্যে নুরুল হুদার নামই বলেছে।

নুরুল হুদা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। তারা কি তাকে চেনে? কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে আলমারি সাজিয়ে রাখার সময় এক কুলি দাঁড়িয়েছিল তার গা ঘেঁষে। তখন তো ঘোরতর বর্ষাকাল, ঢাকায় এবার বৃষ্টিও হয়েছে খুব। রাতদিন এই বৃষ্টি নিয়ে সে কী যেন বলেছিল, তাতে কুলিটা বিড়বিড় করে ওঠে, 'বর্ষাকালেই তো জুৎ।' কথাটা দুবার বলেছিল। এর মানে কী? স্টাফরুমে কে একজন একদিন না দুদিন ফিসফিস করেছিল, বাংলার বর্ষা তো শালারা জানে না। রাশিয়ায় ছিল জেনারেল উইনটার, আমাদের জেনারেল মনসুন।—ঐ ছদ্মবেশী ছেলেটা কি এই কথাই বুঝিয়েছিল? তার ওপর তাদের এত আস্থা?—উৎসাহে নুরুল হুদা এদিক-ওদিক তাকায়। তার মৌন মিলিটারিকে আরেকটু নিশ্চিত করে।

কিছুক্ষণ পর, কতক্ষণ পর সে বুঝতে পারে না, মিলিটারি তাকে ফের একই প্রশ্ন করে জবাব না পেয়ে প্রবল বেগে দুটো ঘুষি লাগায় তার মুখে। প্রথম ঘুষিতে সে কাত হয়, দ্বিতীয় ঘুষিতে পড়ে যায় মেঝেতে। মেঝে থেকে তুলে তাকে মিলিটারি ফের জিগ্যেস করে, ওদের আস্তানা কোথায় সে খবর তার তো ভালোভাবেই জানা আছে। সে জবাব দেয়, 'হ্যাঁ!'

ঐ ঠিকানাটা বলে দিলেই তাকে সসম্মানে ছেড়ে দেওয়া হবে এই নিশ্চয়তা দিয়ে তাকে পাউরুটি ও দুধ খাওয়ানো হয়। তাঁকে ভাবতে সময় দিয়ে মিলিটারি চলে যায়। কিছুক্ষণ পর, কতক্ষণ সে জানে না, মিলিটারি ফিরে এসে ফের বলে, মিসক্রিয়েন্টদের ঠিকানা তো তার জানা আছে। সে ফের জবাব দেয়, 'হ্যাঁ।' কিন্তু পরের প্রশ্নের জবাব না পেয়ে মিলিটারি তাকে নিয়ে যায় অন্য-একটি ঘরে। তার বেঁটেখাটো শরীরটাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো ছাদে-লাগানো একটা আংটার সঙ্গে। তার পাছায় চাবুকের বাড়ি পড়ে সপাৎ সপাৎ করে। তবে বাড়িগুলো বিরতিহীন পড়তে থাকায় কিছুক্ষণের মধ্যে সেগুলো নুরুল হুদার কাছে মনে হয় স্রেফ উৎপাত বলে। মনে হচ্ছে যেন বৃষ্টি পড়ছে মিন্টুর রেইনকোটের ওপর। রেইনকোটটা এরা খুলে ফেলেছে, কোথায় রাখল কে জানে। কিন্তু তার ওম তার শরীরে এখনো লেগেই রয়েছে। বৃষ্টির মতো চাবুকের বাড়ি পড়ে তার রেইনকোটের মতো চামড়ায় আর সে অবিরাম বলেই চলে, মিসক্রিয়েন্টদের ঠিকানা তার জানা আছে। শুধু তার শালার নয়, তার ঠিকানা জানার মধ্যে কোনো বাহাদুরি নাই, সে ছদ্মবেশী কুলিদের আস্তানাও চেনে। তারাও তাকে চেনে এবং তার ওপর তাদের আস্থাও কম নয়। তাদের সঙ্গে তার আঁতাতের অভিযোগ ও তাদের সঙ্গে তার আঁতাত রাখার উত্তেজনায় নুরুল হুদার ঝুলন্ত শরীর এতটাই কাঁপে যে চাবুকের বাড়ির দিকে তার আর মনোযোগ দেওয়া হয়ে ওঠে না।

রচনাকাল : ১৯৯৫

জীবনপঞ্জি

১৯৪৩ : তৎকালীন রংপুর ও বর্তমান গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা থানার গোটিয়া গ্রামে মাতামহের বাড়িতে জন্ম ১২ ফেব্রুয়ারি। তাঁর পুরো নাম আখতারুজ্জামান মোহাম্মদ ইলিয়াস। ডাক নাম মঞ্জু। তিনি মা মরিয়ম ইলিয়াস এবং পিতা বি. এম. ইলিয়াসের প্রথম সন্তান। বি. এম. ইলিয়াস তখন বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি হাই স্কুলের হেডমাস্টার এবং বগুড়া জেলা মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারি। বাঙলায় তখন ১৯৪৩-এর মন্বন্তর।

১৯৪৩-১৯৪৬ : পূর্ব পুরুষের গ্রাম বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি থানার চন্দনবাইসা থেকে এসে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের পিতামহ বগুড়া শহরের উপকণ্ঠে করতোয়া নদীর তীরে নারুলি গ্রামে বাড়ি করেছিলেন। নারুলি গ্রামে ইলিয়াসের শৈশবের প্রথম কয়েক বছর কাটে। ইতিমধ্যে দুই অনুজ শহিদুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৪) এবং নূরুজ্জামান ইলিয়াসের (১৯৪৬) জন্ম হয়েছে।

১৯৪৬-১৯৪৯ : পিতা বি. এম. ইলিয়াস ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং দেশ বিভাগের দু'বছর পর প্রাদেশিক আইন পরিষদের পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। এ সময় বি. এম. ইলিয়াস সপরিবারে ঢাকা চলে এসেছেন এবং ২ নং সিম্পসন রোডের (বর্তমানে কোতয়ালি থানা) 'পার্টি হাউসে' অবস্থান করছেন। পিতার সক্রিয় রাজনীতির সূত্রে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের শৈশব একটি রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে কেটেছে। ১৯৪৯ এ ঢাকার লক্ষ্মীবাজারের সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি। একই বছর কনিষ্ঠ সহোদর খালিকুজ্জামান ইলিয়াসের জন্ম।

১৯৫০ : সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স স্কুল ছেড়ে কে. এল. জুবিলি স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি।

১৯৫১ : তৃতীয় শ্রেণীতে না পড়েই ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি।

১৯৫২ : আবার স্কুল পরিবর্তন। এবার বগুড়া জেলা স্কুলে। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই প্রচুর পড়ার নেশা এবং লেখালেখিতে হাতেখড়ি। কলকাতা থেকে প্রকাশিত *সত্যযুগ* পত্রিকার ছোটদের পাতায়, *আজাদ* পত্রিকার ছোটদের পাতা 'মুকুলের মহফিলে' কবিতা গল্প ছাপা হয়েছে। ক্লাশ টেন-এ পড়ার সময় *সওগাত* পত্রিকায় গল্প ছাপা হয়েছে।

১৯৫৮-১৯৬০ : বগুড়া জেলা স্কুল থেকে ১৯৫৮ সালে ম্যাট্রিক পাস করার পর ঢাকা কলেজে আই. এ. ক্লাশে ভর্তি। থাকেন কলেজের নর্থ হোস্টেলে। অবিরাম গল্প লিখছেন আর পত্রিকায় পাঠাচ্ছেন। অধিকাংশ ফেরত আসে। দু'একটা ছাপা হয়। নতুন ধরনের গল্প লেখার চেষ্টা করছেন। বন্ধু শহিদুর রহমান এবং আব্দুল মান্নান সৈয়দের সঙ্গে গল্প লেখার নানা দিক নিয়ে আলোচনা চলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৬০ সালে আই. এ. পাশ।

১৯৬১-১৯৬৪ : আই. এ. পাশ করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে Sociology পড়ার আগ্রহ ছিল। কিন্তু সে বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে Sociology প্রথম বর্ষে কোন ছাত্র ভর্তি করা হয়নি বলে Sociology পড়া হলো না। ভর্তি হলেন বাংলা সাহিত্যে। থাকেন ফজলুল হক মুসলিম হলে। ১৯৬১ সালে চিকেন পক্স-এ আক্রান্ত হলে বেশ কিছুদিন মিটফোর্ড হাসপাতালে থাকতে হয়। হাসপাতালের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখেন "অতন্দ্র" নামের একটি গল্প।

ষাটের দশকের গোড়ার দিকে ছাত্রাবস্থায় লিখিত গল্পগুলোর মধ্যে *সমকাল* এ প্রকাশিত 'অতন্দ্র' এবং 'স্বগত মৃত্যুর পটভূমি' উল্লেখযোগ্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় আড্ডা, সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্যবিষয়ক পড়াশোনা চলেছে সমান্তরালভাবে। শরিফ মিয়ার ক্যান্টিনে মুহম্মদ মুজাদ্দেদ, চিত্তরঞ্জন হালদার, আব্দুল মান্নান সৈয়দ, ইকবাল রুমী ও আসাদ চৌধুরীর মতো সহপাঠি ও বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডার পাশাপাশি পাবলিক লাইব্রেরি ও ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরিতে সাহিত্যবিষয়ক পড়াশোনা। কবিতাপত্র *স্বাক্ষর*-এর সঙ্গে জড়িত।

বাংলা সাহিত্যে এম. এ. পাশ (১৯৬৪)

১৯৬৫-১৯৭০ : জগন্নাথ কলেজে প্রভাষক হিসেবে যোগদান (আগস্ট, ১৯৬৫)। এর আগে করটিয়া সাদত কলেজে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু দুএকদিন পরই সে চাকরি ছেড়ে দেন।

এই বছরগুলো ইলিয়াসের ভাষায় 'আরজু আর রেকস্ days'। জিন্নাহ এভেন্যুর রেস্টুরেন্ট 'রেকস্' এবং নবাবপুরের হোটেল 'আরজু'তে জমজমাট আড্ডা। এছাড়াও বাংলাবাজারের 'বিউটি বোর্ডিং' এবং কাপ্তান বাজারের 'নাইল ভ্যালি' রেস্টুরেন্টেও কিছু কিছু আড্ডায় ইলিয়াস সামিল হন। আড্ডায় সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি, ইতিহাস, দর্শন, পুরাতত্ত্ব, সিনেমা, প্রেম, সঙ্গীত— এমন বিষয় নেই যা নিয়ে আলোচনা হয় না।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আড্ডার সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন খালেদ চৌধুরী, বুড়ো ভাই (মুশাররফ রসুল), আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ, শহীদ কাদরী, নির্মলেন্দু গুণ, বিপ্লব দাশ, রণজিৎ পাল চৌধুরী, জামাল খান, মোহাম্মদ খসরু, ইয়াসিন আমিন, রফিক আজাদ, প্রশান্ত ঘোষাল, আসাদ চৌধুরী, মাজহারুল ইসলাম ও মাহবুবুল আলমসহ আরো অনেকেই।

আড্ডার পাশাপাশি গল্প, কবিতা লিখছেন। আর পড়ছেন প্রচুর। বিশেষত আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্য।

আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পাদিক *সাম্প্রতিক ধারার গল্প* গ্রন্থে তরুণ ইলিয়াসের 'স্বগত মৃত্যুর পটভূমি' গল্প অন্তর্ভুক্ত হয় (১৯৬৪)। এ সময় উপন্যাসও লেখার চেষ্টা করেছেন। ১৯৬৫ সালে আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পাদিক *কণ্ঠস্বর* পত্রিকায় 'পূর্ব পাকিস্তানের তরুণতম লেখকদের কয়েকটি প্রকাশিতব্য গ্রন্থে'র বিজ্ঞাপনে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'অন্ধকারকে কেঁদে' নামক প্রকাশিতব্য উপন্যাসের উল্লেখ ছিল। বলাবাহুল্য এই নামে তাঁর কোন উপন্যাস প্রকাশিত হয়নি। ১৯৬৯-এর মার্চ মাসে লিটল ম্যাগাজিন *আসন্ন*তে 'চিলেকোঠায়' নামক গল্প প্রকাশিত হয়।

আটষট্টি-উনসত্তুরে গণআন্দোলন প্রত্যক্ষ করেছেন ঘনিষ্ঠভাবে। প্রতিটি মিটিংয়ের মনোযোগী শ্রোতা! বিশেষত মওলানা ভাসানীর মিটিং কোনটাই বাদ যায় না। দৈবে সৈবে মিছিলেও যোগ দিচ্ছেন। আড্ডায়ও প্রতিদিনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ হচ্ছে।

চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব এবং পরবর্তীকালে নকশাল বাড়ি আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহ অনুসরণ করছেন আগ্রহ নিয়ে।

এ সময়ের প্রথম দিকে থাকেন জোড়পুর লেন-এ, জগন্নাথ কলেজের ব্যাচেলর টিচার্স হোস্টেলে এবং নওয়াবপুরে ১০১, লুৎফর রহমান লেনে। তারপর কিছুদিন ছিলেন গেণ্ডারিয়ার ১ নং অক্ষয় দাস লেন-এ। সেখান থেকে ওয়ারির ১/১-এ হেয়ার স্ট্রিট-এ।

১৯৭১ : মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পরিচিত মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ রাখছেন, বাড়িতে আশ্রয় দিচ্ছেন।

এ সময় কিছু প্রকাশ্য, কিছু গোপন আড্ডাও হয়। গুলিস্তান সিনেমা হল সংলগ্ন 'গুলসিতান' রেস্টুরেন্ট-এ নতুন আড্ডায় মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সহানভূতিশীল দুয়েকজন অবাঙালি (উর্দুভাষী) বন্ধুও যোগ দেন।

এ বছরের মাঝামাঝি সময় থেকে জগন্নাথ কলেজের সহকর্মী কথাসাহিত্যিক শওকত আলীর ৪২ বি হাটখোলা রোড-এর বাসায় ভাড়া থাকেন।

১৯৭৩ : বিয়ে। স্ত্রী সুরাইয়া (তুতুল) সিরাজগঞ্জ মহিলা কলেজের ইতিহাসের প্রভাষিকা। বিয়ের পর স্ত্রী চাকরি ছেড়ে স্বামীর কাছে ঢাকায় চলে আসেন।

১৯৭৪ : পুত্র আন্দালিব ইলিয়াসের জন্ম। দেশে '৭৪-এর দুর্ভিক্ষ। প্রচণ্ড অর্থকষ্টে কাটে এ সময়।

১৯৭৫ : বাকশাল গঠিত হলে সরকারি কলেজের শিক্ষক হিসেবে বাকশালে যোগ দেয়ার চাপ থাকলেও যোগ দেননি।

এ সময় প্রথম উপন্যাস 'চিলেকোঠায়' নামে *দৈনিক সংবাদ*-এর সাহিত্য পাতায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল। সরকার পরিবর্তনের পর *সংবাদ কর্তৃপক্ষ* উপন্যাসটি প্রকাশ বন্ধ করে দেয়। এর কারণ ইলিয়াসের ভাষায়, "তখন সংবাদের অদ্ভুত ধারণা হলো যে সেই Govt. highly pro-Pakistani সুতরাং পাকিস্তান নিয়ে কোন ঠাট্টা করা যাবে না। আমার উপন্যাসে তো পাকিস্তান নিয়ে প্রচুর ঠাট্টা ছিলো। একটা character আছে না? basic democrat রহমতুল্লাহ, যে ডাঁট মারতে মাঝে মাঝে জিন্নাহ টুপি পরে। ওরা ছাপালো 'basic democrat', 'পাকিস্তান', 'জিন্নাহ' শব্দগুলো বাদ দিয়ে। ওদের ধারণা এতে তখনকার Govt. ক্ষেপে যাবে। আমি ভীষণভাবে protest করলাম। কিন্তু কিছু change করতে চাইলাম না, এর পর আর এক কিস্তি ছাপিয়ে বন্ধ করে দিলো। আমি তখন বললাম পাঠকরা এটাকে লেখকের দায়িত্বহীনতা ভাবতে পারে, বললাম আপনারা যে ছাপতে পারছেন না সেটা লিখে দিন। ওরা লিখে দিয়েছিলো।"

১৯৭৬ : প্রথম গল্পগ্রন্থ *অন্য ঘরে অন্য স্বর* প্রকাশিত (মে)। প্রকাশক : অনন্যা। উৎসর্গ মা মরিয়ম ইলিয়াসকে। এই গ্রন্থে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা', 'উৎসব', 'প্রতিশোধ', 'যোগাযোগ', 'ফেরারী', 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' গল্পগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়। গল্পগুলোর রচনাকাল ১৯৬৫-১৯৭৫।

রাজশাহী থেকে প্রকাশিত *সংবর্ত* নামক লিট্‌ল ম্যাগাজিনে হাসান আজিজুল হক বইটির সমালোচনা লিখেন 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বিষবৃক্ষ' নামে (জুলাই)। এছাড়া মাহবুবুল আলম, সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়, মুনতাসীর মামুন আবুল হাসানাত এবং মাজহারুল ইসলাম যথাক্রমে *গণসাহিত্য*, দৈনিক *সংবাদ*, সাপ্তাহিক *বিচিত্রা*, *সমকাল* এবং *দৈনিক বাংলায়*

গ্রন্থটির উপর আলোচনা করেন। সৈয়দ শামসুল হক টেলিভিশনের একটি অনুষ্ঠানে গ্রন্থটির প্রশংসা করেন।

১৯৭৭ : বাঙলাদেশ লেখক শিবির কর্তৃক 'হুমায়ুন কবির স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান।

বাড়ি পরিবর্তন। এখন ভাড়া থাকেন ১২/৩ কে এম দাস লেন-এ।

১৯৭৮ : লিটল ম্যাগাজিন *উত্তরকাল*-এ 'পরিচয়' গল্প প্রকাশ। পরবর্তীকালে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস *চিলেকোঠার সেপাই*'-এর কিছু চরিত্রের সাদৃশ থাকায় গল্পটি উল্লেখযোগ্য।

এলার্জিক আর্থ্রাইটিস রোগে আক্রান্ত।

১৯৭৯ : সহকারী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি।

১৯৮১ : সাপ্তাহিক *রোববার*-এ ধারাবাহিকভাবে *চিলেকোঠার সেপাই* প্রকাশ শুরু (জানুয়ারি)।

১৯৮২ : গল্পগ্রন্থ *খোঁয়ারি* প্রকাশ (সেপ্টেম্বর)। প্রকাশক : তরঙ্গ প্রকাশন, রাজশাহী। উৎসর্গ : রণজিৎ পাল চৌধুরীকে। এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয় *খোঁয়ারি, অসুখ-বিসুখ, তারাবিবির মরদপোলা* ও *পিতৃবিয়োগ*—এই চারটি গল্প। গল্পগুলোর রচনাকাল ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৯।

১৯৮৩ : সাপ্তাহিক *রোববার*-এ *চিলেকোঠার সেপাই* প্রকাশ সমাপ্ত (জানুয়ারি)।

বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ।

১৯৮৪ : বাঙলাদেশ লেখক শিবিরে যোগদান।

সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি (মে)।

১৯৮৫ : গল্পগ্রন্থ *দুধ ভাতে উৎপাত* প্রকাশিত (ফেব্রুয়ারি)। প্রকাশক : মাওলা ব্রাদার্স। উৎসর্গ : বন্ধু ফিরোজ হোসেনকে। গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত গল্প : 'মিলির হাতে স্টেনগান', 'দুধভাতে উৎপাত', 'পায়ের নিচে জল' এবং 'দখল'।

১৯৮৬ : প্রথম উপন্যাস *চিলেকোঠার সেপাই* প্রকাশিত (অক্টোবর)। প্রকাশক : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড। উৎসর্গ : পিতা বি. এম. ইলিয়াসকে।

১৯৮৭ : আলাওল সাহিত্য পুরস্কার লাভ।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে উপ-পরিচালক (জানুয়ারি)।

লেখক শিবিরের উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী 'মার্কসবাদ ও নন্দনতত্ত্ব' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন।

পিতা বি. এম. ইলিয়াসের মৃত্যু (আগস্ট)।

উপাধ্যক্ষ, সরকারি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়, ঢাকা (ডিসেম্বর)।

১৯৮৮ : পঁয়তাল্লিশতম জন্মদিনে ডায়াবেটিস রোগ ধরা পড়ে।
অন্যঘরে অন্য স্বর-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত। প্রকাশক ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।
বন্যা ত্রাণ কার্যে অংশগ্রহণ (সেপ্টেম্বর)।
লেখক শিবিরের উদ্যোগে 'বাংলাদেশের শিক্ষা : অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ' শীর্ষক সেমিনার আয়োজনে মুখ্য ভূমিকা পালন (ডিসেম্বর)।

১৯৮৯ : গল্পগ্রন্থ *দোজখের ওম* প্রকাশিত। প্রকাশক : প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা। প্রয়াত ছাত্র ও বন্ধু হেলালউদ্দিনের স্মৃতিতে নিবেদিত। অন্তর্ভুক্ত গল্প : *কীটনাশকের কীর্তি, যুগলবন্দি, অপঘাত* ও *দোজখের ওম। খোঁয়ারি* দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ। প্রকাশক : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

১৯৯০ : বাঙলাদেশ লেখক শিবিরের উদ্যোগে ৩ দিনব্যাপী জাতীয় সাহিত্য সম্মেলন আয়োজনে মুখ্য ভূমিকা পালন।
লেখক শিবির কর্তৃক প্রকাশিত *বাংলাদেশের শিক্ষা : অতীত বর্তমান ভবিষ্যত* গ্রন্থ সম্পাদনা।

১৯৯১ : জণ্ডিসে আক্রান্ত।

১৯৯২ : তাঁর সম্পাদনায় বাঙলাদেশ লেখক শিবিরের সাহিত্য পত্রিকা *তৃণমূল* প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় (ফেব্রুয়ারি)।
পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ী গণ পরিষদ এবং হিল্‌স্ উইমেন্স ফেডারেশনের আমন্ত্রণে বৈসাবি উৎসবে যোগদানের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর। লোগাং হত্যাযজ্ঞের কারণে উৎসব বাতিল (এপ্রিল)।
এজাজ ইউসুফ সম্পাদিত *লিরিক*-এর আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা প্রকাশ।

১৯৯৩ : *চিলেকোঠার সেপাই*-এর ২য় সংস্করণ প্রকাশিত (আগস্ট)।
পঞ্চাশ বর্ষপূর্তিতে কলকাতা থেকে *গল্প সংগ্রহ* প্রকাশিত (জানুয়ারি)। প্রকাশক : একুশে। উৎসর্গ : বন্ধু মুহম্মদ মুজাদ্দেদকে। অন্তর্ভুক্ত গল্প : 'উৎসব', 'অন্য ঘরে অন্য স্বর', 'খোঁয়ারি', 'অসুখ বিসুখ', 'পিতৃবিয়োগ', 'দুধভাতে উৎপাত', 'পায়ের নিচে জল', 'যুগলবন্দি', 'দোজখের ওম'।
কলকাতার বাংলাদেশ মিশন কর্তৃক আয়োজিত গ্রন্থমেলায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে কলকাতা সফর (এপ্রিল)।
কলকাতা থেকে *চিলেকোঠার সেপাই* প্রকাশিত (জুন)। প্রকাশক : প্রতিভাস। *চিলেকোঠার সেপাই*-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত (আগস্ট)।

১৯৯৪ : দৈনিক *জনকণ্ঠের* সাপ্তাহিক সাহিত্য পাতায় *খোয়াবনামা* ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি (মে)।

লেখক-শিল্পীদের উপর ধর্মীয় ফ্যাসিবাদীদের আক্রমণ ও 'ব্লাসফেমী আইন' প্রণয়নের চক্রান্তের বিরুদ্ধে লেখক শিবিরের উদ্যোগে লেখক শিল্পীদের মিছিল ও সমাবেশ আয়োজনে মুখ্য ভূমিকা পালন (জুলাই)।

১৯৯৫ : স্ত্রীর চিকিৎসার উদ্দেশ্যে সস্ত্রীক কলকাতা গমন; শান্তিনিকেতন ভ্রমণ (ফেব্রুয়ারি-মার্চ)।

দুধভাতে উৎপাত দ্বিতীয় সংস্করণ এবং *চিলেকোঠার সেপাই* তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত।

শেষ হওয়ার আগেই *জনকণ্ঠ খোয়াবনামা* প্রকাশ বন্ধ করে দেয়।

মাতৃবিয়োগ (অক্টোবর)।

অক্টোবর থেকেই অসুস্থ। পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা। ব্যথা উপেক্ষা করে *খোয়াবনামা* লিখছেন, প্রুফ দেখছেন। ব্যথার জন্য ডাক্তার বাতের চিকিৎসা দিচ্ছেন। *খোয়াবনামা* লেখা শেষ হয় ৩১ ডিসেম্বর।

১৯৯৬ : পায়ের হাড়ে ক্যান্সার ধরা পড়ে (১৩ জানুয়ারি)।

উপন্যাস *খোয়াবনামা* প্রকাশিত (ফেব্রুয়ারি)। প্রকাশক : মাওলা ব্রাদার্স। উৎসর্গ : বন্ধু মাহবুবুল আলমকে। ডান পায়ে অস্ত্রোপচার; সম্পূর্ণ পা কেটে বাদ দেয়া হলো (২০ মার্চ)।

খোয়াবনামার জন্য প্রফুল্ল কুমার সরকার স্মৃতি আনন্দ পুরস্কার লাভ (এপ্রিল)। দেশে প্রত্যাবর্তন (২৭ এপ্রিল)।

'সাদত আলী আকন্দ' পুরস্কার লাভ।

দোজখের ওম-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ।

খোয়াবনামা-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ (অক্টোবর)।

'কাজী মাহবুবউল্লাহ' স্বর্ণপদক লাভ।

বাড়ি পরিবর্তন করে ৭০/এ, আজিমপুর এস্টেট-এর বাসায়। কলেজের নিকটবর্তী হবে বলে প্রথমবারের মতো সরকারি বাসায় এবং পুরনো ঢাকার বাইরে।

১৯৯৭ : *শৈলী : আখতারুজ্জামান ইলিয়াস* সংখ্যা প্রকাশ (১ জানুয়ারি)। ৪ জানুয়ারি ভোর ৬-৩০ মিনিটে মালিবাগ কমিউনিটি হাসপাতাল, ঢাকায় মৃত্যু। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজিমপুরের বাসভবনে গিয়ে শোক জ্ঞাপন করেন। ঢাকা কলেজের মাঠে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে জানাজা হয়। লেখক শিবিরের